আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী

(১৯২০-১৯২৫)

নলিনীমাধব চৌধুরী

বাক্‌ সাহিত্য (প্রাইভেট) লিমিটেড

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

ভূমিকা

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আশ্রয় করিয়া লিখিত ডকুমেন্টারী, পোলিটিকেল উপন্যাস সিরিজের চারখানি খণ্ড, রাজনগর (১৯০৫-৬), দেবানন্দ (১৯০৭-৯), স্ফুলিঙ্গ (১৯১০-১৪) ও অভিযাত্রী (১৯১৫-১৯ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আবির্ভাব (১৯২০-২৫) এই সিরিজের পঞ্চম গ্রন্থ।

কাহিনীর পরিচয়ঃ কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে শতাব্দীর গোড়া হইতে।

বরেন্দ্র অঞ্চলের এক প্রাচীন পল্লীগ্রাম, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে রাজনগর, সেই পল্লীর দুইটি পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে: প্রাচীন ভূস্বামীবংশের হরিনারায়ণের পরিবার এবং সেই পরিবারের গুরুবংশীয় পণ্ডিত শ্যামানন্দের পরিবার। এই দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন ঘটিয়াছিল হরিনারায়ণের পুত্র ইন্দ্র এবং পণ্ডিত শ্যামানন্দের ইংরাজি শিক্ষিত পৈতৃক বৃত্তিত্যাগী, সরকারী চাকুরীয়া জীবানন্দের পুত্র দেবানন্দের মধ্যে আবাল্য বন্ধুত্ব এবং পরে দেবানন্দের ভগ্নী লক্ষ্মীর সঙ্গে ইন্দ্রের বিবাহের ফলে।

কৈশোরে রাজনগরের এই দুই তরুণ স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে আসিয়াছিল। দেবানন্দ বরিশাল কনফারেন্সের (১৯০৬, এপ্রিল) পরে বাংলায় নবগঠিত বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, ইন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনের অর্থ ও সমাজনৈতিক আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে রাজনগরে সেবকাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

এই দুইটি পরিবারের তিন পুরুষের কথা প্রথম খণ্ড (১৯০৫) হইতে অষ্টম ও শেষ খণ্ড (১৯৪৮) পর্যন্ত মূল কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের ক্রমিক অগ্রগতি এবং সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে মূল কাহিনীর অসংখ্য শাখা প্রশাখা বাংলার বহু অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে এবং বহু নূতন চরিত্রের উদ্ভব হইয়াছে।

প্রথম চার খণ্ডের বিষয়বস্তুর পরিচয়ঃ "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী"র প্রকাশিত চার খণ্ডের প্রথম খণ্ড রাজনগরে স্বদেশী আন্দোলন উদ্ভবের সামাজিক পশ্চাদপট, পল্লীঅঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসার

ও বরিশাল কনফারেন্স (১৯০৬) পর্যন্ত আন্দোলনের অগ্রগতির ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় খণ্ড দেবানন্দে প্রধানতঃ বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী প্রচেষ্টার প্রথম অধ্যায়ের ও তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় আছে। তৃতীয় খণ্ড স্ফুলিঙ্গে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন-সংক্রান্ত বড় বড় ষড়যন্ত্র মামলাব কথা ও সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র আছে। চতুর্থ খণ্ড অভিযাত্রীতে প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৫-১৯) সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য পরাধীন ভারতবাসীর নির্মম রক্তমোক্ষণ, দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্দশা, ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের সকল উদ্যম নষ্ট করিবার জন্য ব্যাপক ও কঠোর উৎপীড়ন, যুদ্ধের অবসানে ভারতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর নূতন রুদ্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশের ফলে পুরাতন রাজনৈতিক চিন্তা, আদর্শ ও কর্মধারাব পরিবর্তনের সূচনার কথা বলা হইয়াছে। অধুনা বিস্মৃত বাংলার "ডেটিন্যু যুগের" কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলির কথা এবং বাঙালীর জীবনে নিদারুণ বিপর্যয়ের কথাও এই খণ্ডে আছে।

এই চারখানি উপন্যাস স্বাধীনতা-সংগ্রামের কয়েকটি অধ্যায়ের কাহিনী মাত্র নয়। সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে দেশের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর যে পরিবর্তন ঘটিতেছিল, দেশবাসীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পুরাতন সম্পর্কের যে পরিবর্তন ঘটিতেছিল, দেশবাসীর চিন্তা, আদর্শ ও আচরণের যে পরিবর্তন অলক্ষ্যে ঘটিতেছিল তাহার বিবরণও দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে এই চারখানি উপন্যাসে লেখকের ভূমিকা দেশের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনের নিরপেক্ষ কথাকারের ভূমিকা। পঞ্চম উপন্যাসেও এই ভূমিকার পরিবর্তন হয় নাই।

আবির্ভাব (১৯২০-২৫): "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী"র পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভের পরে ভারতবাসী মহাযুদ্ধে বিরাট ও বিপুল সহায়তার জন্য পুরস্কার পাইল জালিয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও কালা আইন (রাউলাট এক্ট)।

দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হইল পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের প্রতিকারের দাবিতে এবং কালা আইনের প্রতিবাদে। গান্ধীজী এই নব পর্যায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

এই নূতন আন্দোলন সম্বন্ধে একটা বড় কথা এই যে, ব্রিটিশের প্ররোচনায় স্যর সৈয়দ আহমেদ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার পরে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথম সম্প্রদায় হিসাবে ভারতের ইসলামধর্মী অধিবাসিগণ কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিল। বিজয়ী মিত্রশক্তি তখন তুর্কী সাম্রাজ্য ভাগবাটোয়ারা করিতে উদ্যত। কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগ দিবার মূল্য দাবি করা হইল তুর্কী সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য পরাধীন ভারতীয় মুসলমানগণের পরিকল্পিত খিলাফৎ আন্দোলনেব সঙ্গে কংগ্রেসকে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা করিতে হইবে। নূতন আন্দোলনের নেতা গান্ধীজী এই মূল্য দিতে স্বীকৃত হইলেন।

প্রেস আইন অমান্য কবিয়া নিষিদ্ধ পুস্তক ও পুস্তিকা রাস্তায় ফেরি করিবার আন্দোলনে গান্ধীজী, সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মালবীয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন মহম্মদ আলি জিন্না।

আবির্ভাবে আলোচিত ইতিহাসের ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইতেছে :

১ খণ্ড : রাউলাট এক্টের প্রতিবাদে আন্দোলন, সত্যাগ্রহ (১৯১৯ মার্চ, এপ্রিল); জালিয়ানাওয়ালা বাগ (১৯১৯, ১৩ই এপ্রিল); সত্যাগ্রহ সাময়িকভাবে স্থগিত, হাণ্টার কমিশন; কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন; অসহযোগের নীতি ও প্রোগ্রাম; খিলাফৎ আন্দোলন; নাগপুর কংগ্রেস—আংশিক সহযোগেব নীতি; ব্যাপক ধর্মঘট ও হরতাল; রাজনগরে অসহযোগ আন্দোলন।

২য় খণ্ড : পঞ্চক্রোশীতে অসহযোগ আন্দোলন; গান্ধীজীর আদর্শ; গণজাগরণের চিত্র; দয়াল ঠাকুরের কাহিনী; কলিকাতায় অসহযোগ; আদিবাসী সমাজ ও অসহযোগ; আফগান আক্রমণের গুজব; চাষী-মজুর আন্দোলন, বোলশেভিজম; চট্টগ্রামে হরতাল; মোপলা হাঙ্গামা; প্রিন্স অব ওয়েলশের আগমন উপলক্ষ্যে হরতাল—বোম্বাই ও কলিকাতা; রাজনগরে অসহযোগ।

৩য় খণ্ড : পঞ্চক্রোশীতে অসহযোগের শেষ অধ্যায়—বার্দোলী সিদ্ধান্ত; রাজনগরে অসহযোগের শেষ অধ্যায়—বার্দৌলী সিদ্ধান্ত; কংগ্রেসের মাস সিভিল-ডিজওবিডিয়েন্স নীতি; বার্দৌলী সিদ্ধান্তের পরে কলিকাতার কথা।

৪র্থ খণ্ড : বার্দৌলীর প্রতিক্রিয়া; বিপ্লবী আন্দোলন; হিন্দু সংগঠ আন্দোলন; স্বরাজ্য দল; কম্যুনিজম।

৫ম খণ্ড : তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ; সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ; চাষী-মজদুর আন্দোলন; কম্যুনিষ্ট পার্টি; স্বরাজ্যদলের সঙ্গে গান্ধীজীর আপোষ; বিধান সভায় প্রবেশের প্রশ্ন।

৯৭ বালিগঞ্জ প্রেস
কলিকাতা—১৯

১ম খণ্ড

এক

রাজনগর (১৯১৯-২০)

মিনু হইবার পর অনেকদিন লক্ষ্মীর আর কোন সন্তান হয় নাই। পাঁচ বৎসর পরে এক ছেলে হইল। ছেলের নাম রাখা হইল গোতম

মেয়েকে নিজের আদর্শ ও শিক্ষামত গড়িবার চেষ্টা অস্ত ছিল না লক্ষ্মীর। ইন্দ্র লক্ষ্মীর ছেলেবেলার পুতুল খেলার সঙ্গে পরিচিত ছিল। মেয়েকে লইয়া তাহার কাণ্ড দেখিয়া সে ভাবিল লক্ষ্মী আবার নূতন করিয়া পুতুল খেলা আরম্ভ করিয়াছে। মেয়ের পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে নানা রকম ব্রতে হাতে খড়ি হইল। ফলে দেখা গেল, শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া মা মেয়েকে যাহা শেখায় এক রকমের খেলা বলিয়া মেয়ে তাহা গ্রহণ করে।

অশ্বথ পাতা ব্রতে মেয়ে মাথায় অশ্বথ পাতা হাত দিয়া চাপিয়া খিড়কীর পুকুরে ডুব দিতে শিখিল মায়ের হাত ধরিয়া। বিকালে বৈঠকখানা দালানের বারান্দায় বসিয়া মেয়ে খেলিত। ইন্দ্র দেখিত বাগানের যে কোন ফুল গাছের পাতা ছিঁড়িয়া সে দুই হাতে তাহা মাথায় চাপিয়া ধরিত আর বলিত,

পাকা পাতাটি মাতায় দিলে পাকা চুলে সিঁদুর পলে।

কথাগুলি সে ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিত না কিন্তু বার বার মন্ত্র বলিয়া তাহার ক্লান্তি হইত না। সন্ধ্যাবেলা মা দেখিত বড় বড় কোঁকড়া চুলের মধ্যে এক রাশ পাতা জড়াইয়া ধূলা বালি মাখিয়া মেয়ে অপরূপ সাজিয়াছে। চুলের মধ্যে এত পাতা দিয়াছে কেন জিজ্ঞাসা করিলে মেয়ে দুই হাত মাথায় চাপিয়া বলিত, পাকা পাতাটি মাতায় দিলে পাকা চুলে সিঁদুর পলে।

তারপর মাথা নোয়াইয়া বলিত,

ভুস্ ভুস্, গঙ্গা গঙ্গা।

অর্থাৎ মাথায় পাতা চাপিয়া সে পুকুরে ডুব দিতেছে।

অন্দরের উঠানে পুকুর কাটিয়া তাহার পাড়ের উপর কড়ি, সুপারি, হলুদ রাখিয়া, পুকুরের মধ্যে বেল গাছের ডাল পুঁতিয়া ও ডালের কাঁটায় কন্ধে ফুল বসাইয়া মা মেয়েকে পুণ্যিপুকুর ব্রত করিতে শিখাইত। মা মন্ত্র বলিত,

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজেরে সকাল বেলা
আমি সখী লীলাবতী সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী
এ পূজনে কি হয়? সাবিত্রী সমান হয়।
মরি যেন গঙ্গা জলে মরে হই রাজরাণী।

দুপুরে, বিকালে ফাঁক পাইলেই মেয়ে ঘটি লইয়া সেই পুকুরে জল ঢালিত আর আঁজলা আঁজলা সেই জল দুই হাতে মাথায় থাবড়াইয়া মন্ত্র বলিত, আমি হই লাজার লাণী।

অগ্রহায়ণ মাসে পিটুলির দশটি পুতুল, শ্রীহরির চরণ, ভগবতীর চরণ আঁকিয়া দুর্বা, ফুল, চন্দন, তুলসী পাতা দিয়া পূজা করিয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে মন্ত্র বলিত,

সীতার মত সতী হই রামের মত পতি পাই
পৃথিবীর মত ভার সই।

এই ব্রত শিখিবার পরে মেয়ে পিতা, পিশী, বনমালী সরকার, পাঁচু ঠাকুর, দেরাজ সর্দার, বাড়ীর পাঠশালার যাদব পণ্ডিত সকলের কাছে মনের বাসনা জানাইত, লামের মত পতি পাই।

সন্ধ্যাবেলা মা তুলসীতলায় প্রদীপ দিত, গলায় আঁচল জড়াইয়া মন্ত্র বলিত। মেয়ে তুলসী বেদীতে প্রণাম করিয়া মায়ের সঙ্গে মন্ত্র বলিত,

তুলসী তুলসী মাধবীলতা কওগো তুলসী কৃষ্ণকথা
কৃষ্ণকথা শুনলাম কানে শতেক প্রণাম তুলসী চরণে।

মেয়ের ভক্তি এমন প্রবল যে তুলসীগাছ ত ভাল, বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে গোলাপ, রজনীগন্ধা, চাঁপা, কুন্দ সকল রকম গাছের কাছে দাঁড়াইয়া যুক্ত করে নমস্কার করিত ও মন্ত্র বলিত, পেন্নাম তুলসী চলণে।

রাত্রে মাতা যখন শুইতে আসিত মেয়ের তখন এক ঘুম হইয়া যাইত। অনেক সাধ্যসাধনার পরে একবাটি দুধ খাওয়াইয়া মা তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু মেয়ে ঘুমাইবে কি তখন তাহার ব্রতকথা বলিবার সময়

উপস্থিত হইয়াছে। ঘরের এককোণে পিতলের বড পিলসুজে তেলের মৃদু আলো জ্বলিত। কোমরে ডুরে শাড়ী জড়াইয়া কোঁকড়া চুলের রাশ বাঁ হাতে সরাইয়া দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া মেয়ে মাতাকে আদেশ করিত, ভালো মেয়ে হয়ে বসো। আমি বেত্য কথা বলছি।

প্রথমে আরম্ভ হইত মায়েব কাছে শেখা সন্ধ্যামণি ব্রতেব মন্ত্র।

সন্ধ্যামণি কনক তারা   সন্ধ্যামণি জলে ঝারা

সন্ধ্যামণি কবে কে   সাত ভায়ের বোন যে।

সন্ধ্যামণি বাড়ী যাচ্ছেন গামছা মাথায় দিয়ে।

বলিতে বলিতে মাতাকে প্রশ্ন কবিত,—হাঁ মা, গামছা মাথায় দিয়ে যায় কেন? ডুবে সাড়ী মাতায দেযনা কেন সন্ধ্যামণি? মাতা উত্তর দিত, নাইতে যাচ্ছেন কিনা তাই গামছা মাথায় দিয়েছেন।

মেযে প্রশ্ন কবিত, সাত ভাযের বোন কে মা? আমাব তো একটা ভাই, আব সব ভাই কই মা?

মেয়ের প্রশ্ন শুনিযা হাসিতে গিযা মাতার বিষম লাগে, বলে, হবে, হবে। কই তোর বেত্যকথা বল।

মেযে বলে, হাঁ, বলছি। ভালো মেযে হয়ে বোস।

তারপব আরম্ভ করে, বেগুন পাতা ডোলা ডোলা মাযে কানে সোনাল দোলা।

এক যে ছিল লাণী। লাণীর ছেলে হয় না। লাণী কেবল কাঁদে, দুধ খায় না, ভাত খায় না, কেবল কাঁদে। দাসী বলে, লাণী মা কেঁদো না, বেত্য কলো। লাণী বলে, কি বেত্য কলবো দাসী? দাসী বলে শ্রীহলির চরণ বেত্য কলো লাণী মা। বেত্য কললে

মনভলা ধন হবে   সভা আলো ছেলে হবে।

দিদির ব্রত কথার শব্দে ভাই জাগিয়া উঠিয়া আঁ-উঁ শব্দ করিতে আরম্ভ করিত। ব্রতকথা বন্ধ করিয়া ভাইয়েব দিকে ফিরিয়া সে বলিত, য়্যাঁ, তোল ঘুম ভাঙলো দুষতু ছেলে।

ভাইয়ের কানের উপর মৃদু চাপড়াইতে সে ঘুমপাড়ানী ছড়া আরম্ভ করিল,

আয়রে পাখী ন্যাজ ঝোলা   তোরে দেব দুধ কলা

ভায়ের চোখে ঘুম দে যা।

রাজনগরে ইন্দ্রের পারিবারিক জীবন এই চিরন্তনী ছন্দে চলিতেছিল। রাজনগরের পরিচিত আর সকলের কথা বলা হইতেছে।

দেবানন্দ বাড়ী ফিরিবার অল্পদিন পরে রজনী ডাক্তারের মৃত্যু হইল। রজনী ডাক্তার ইন্দ্রের পরম হিতৈষী বন্ধু, পরোপকারী লোক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইন্দ্র মনে বড আঘাত পাইল। জীবানন্দের গৃহে এখন তাঁহার বিধবা ত্রিনয়নী, দেবানন্দ ও আশ্রিত কুটুম্ব বালক হিমাংশু থাকে। জীবানন্দের কনিষ্ঠপুত্র উমানন্দ কলিকাতায় হোষ্টেলে থাকিয়া কলেজে পড়ে।

দেবানন্দ প্রায় এক বৎসর বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে। বেশীব ভাগ সময় তাহার ইন্দ্রের গৃহেই কাটে। এগাবো বৎসব সে দেশেব সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্যুত হইয়া ছি-। মোটামুটি ঘটনাগুলি ছাডা দেশের অবস্থার বিশেষ কিছু সে জানিতে পাবে নাই। ইন্দ্রের বাড়ীতে বসিয়া নানা বকম পত্রিকা ও পুস্তক পড়িয়া, ইন্দ্রেব সঙ্গে আলোচনা কবিযা সে দেশের বিগত এগাবো বৎসরেব ইতিহাসের জ্ঞানলাভ ক-িতে ব্যস্ত ছিল। ইন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কি ভাবে দেবানন্দেব ভবিষ্যৎ জীবন নিযন্ত্রিত হইবে এ প্রশ্নও উঠিত। এ প্রশ্নেব আলোচনা বেশী দূর অগ্রসর হইত না।

দেবানন্দকে মাঝে মাঝে তারাপুবে যাইতে হইত ব্রজনাথকে দেখিবাব জন্য। তাহার চেষ্টার ফলে ব্রজনাথেব চিকিৎসাব ব্যবস্থা হইল। পুনঃপুনঃ আবেদনের উত্তরে অবশেষে গভর্নমেণ্টেব অনুমতি মিলিলে দেবানন্দ পুবী যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া পুষ্প ও হিমাংশুকে সঙ্গে দিয়া ব্রজনাথ ও সবস্বতীকে বওনা কবাইয়া দিল। পুষ্পকে সে রাজনগরে ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিল কিন্তু পুষ্পের আগ্রহে তাহাকেও যাইতে দিতে হইল। তাবাপুরের বাড়ীতে বৃদ্ধা শরৎসুন্দরী একা রহিলেন। বাড়ী ছাড়িয়া তাঁহার অন্যত্র যাইবাব ইচ্ছা ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না।

রাজনগর ও তারাপুরের তিনটি পবিচিত পরিবারের পারিবারিক জীবন যখন এইভাবে চলিতেছিল দেশে তখন বিপুল আলোডন আবম্ভ হইয়া গিয়াছে একটি উদ্দীপনার উৎসকে কেন্দ্র করিয়া। এই উদ্দীপনার উৎস মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

রাউলাট এক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য সত্যগ্রহ সভা গঠিত হইল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল আন্দোলন আরম্ভ করিবার দিন স্থির

হইলেও দিল্লীতে এক সপ্তাহ আগে, অর্থাৎ ৩১ মার্চ আন্দোলন আরম্ভ হইল। জনতার উপর পুলিশ গুলি চালাইল, গুর্খার উদ্যত বেয়নেটের সম্মুখে গৈরিক বস্ত্র পরিহিত সন্ন্যাসী লালা মুনশীরাম অগ্রসর হইয়া নগ্নবক্ষে দাঁড়াইলেন। দেশবাসী দিল্লী সত্যাগ্রহের বিবরণ পড়িয়া চমকিত হইল। ৬ই এপ্রিল দেশের সর্বত্র সত্যাগ্রহ দিবস উপলক্ষ্যে হরতাল হইল। হরতালের অপ্রত্যাশিত সাফল্যে দেশবাসীর মধ্যে বিপুল উৎসাহ জাগিল।

নূতন ভাবের আবেগে সাবধানী মডারেট দলের কাগজ পর্যন্ত বিচলিত হইয়া লিখিল, "হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ফলে দেশে যে নূতন উৎসাহের জোয়ার আসিয়াছে কে সে জোয়ার রোধ করিবে? মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানী, দিল্লীওয়ালা, মুসলমান, নাখোদা, গুজরাটি, শেঠী—যাহারা স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সাড়া দেয় নাই, আজ তাহারা জাগিয়া উঠিয়াছে।

অন্য একখানি কাগজে সংবাদ দিল, "মিঃ গান্ধী প্রেস একট অমান্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সরোজিনী নাইডু, মিঃ জিন্না, পণ্ডিত মালব্য সরকারের বাজেয়াপ্ত করা পুস্তক ও পুস্তিকা ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতেছেন।"

দেশবাসীর প্রতি গান্ধীজীর আবেদনের উল্লেখ করিয়া একখানি কাগজ লিখিল, "আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের নূতন নেতা মহাত্মা গান্ধীর আদেশ পালন করিব। চরিত্রবলের দ্বারা পাশবিক শক্তিকে কি ভাবে নত করা যায় গান্ধীজী তাহা দেখাইলেন। তাঁহার সাহস দেশবাসীকে সাহসী করিয়া তুলিবে। যে দেশে তাঁহার মত ব্যক্তির জন্ম হইতে পারে সে দেশ দুর্বল নয়।

৬ই এপ্রিলের পরে ঘটনাবলী দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

পাঞ্জাবে রাউলাট এক্টের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধের সময়ে মাইকেল ওডায়ারের সৈন্য সংগ্রহের সম্পর্কে জুলুমবাজির বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিল। গান্ধীজীর পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। ডাঃ কিচলু, সত্যপাল প্রভৃতি নেতা গ্রেপ্তার হইলেন। ১০ই এপ্রিল তাঁহাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নিরস্ত্র শোভাযাত্রার উপর নেশনাল ব্যাঙ্কের ইংরাজ ম্যানেজার গুলি চালাইল। অমৃতসর ষ্টেশনে কয়েকজন শিখ মহিলাকে কৃপাণ রাখিবার জন্য দেহতল্লাসীর নামে বেইজ্জত করিবার সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। ক্ষিপ্ত জনতা প্রতিশোধ লইবার জন্য কয়েকজন ইংরাজকে হত্যা

করিল, কয়েকটি ব্যাঙ্কের বাড়ী পোড়াইয়া দিল। ১০ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে গুর্খা ও বেলুচী লইয়া গঠিত এক সেনা-বাহিনী বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের আদেশে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাইয়া সহস্রাধিক লোককে নিহত ও আহত করিল। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হইয়া গেল। গুজরাণওয়ালায় নিরস্ত্র জনতার উপর এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ করা হইল। কামানের গোলায় বাজার উড়াইয়া দেওয়া হইল।

কঠোর সংবাদ নিয়ন্ত্রণের ফলে সামরিক আইনের আমলে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কাহিনী বাহিরে প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল। ধীরে ধীরে নানাসূত্রে খবর বাহিরে পৌঁছিতে লাগিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পাইয়া দেশের লোক শিহরিয়া উঠিল। প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল দেশের সর্বত্র। পাঞ্জাবের বীভৎস অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের নিকট পত্র লিখিয়া জানাইয়া দিলেন তিনি নাইট উপাধি পরিত্যাগ করিলেন।

পাঞ্জাবে যখন গোলমাল চলিতেছিল সেই সময়ে বোম্বাইতে সত্যাগ্রহী জনতার উপর গুলি চলিল। আমেদাবাদে গোলমাল হইল, কলিকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে পুলিশ গুলি চালাইল।

সারা দেশের উপর দিয়া উত্তেজনার ঝড় বহিতে লাগিল। বাংলার লাট লর্ড রোনাল্ডশে ঘোষণা করিলেন মিঃ গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন দেশে বিপ্লব আনিতেছে, ইহা রোধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কোন কোন সরকারী কর্মচারী ঘোষণা করিলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পিছনে বোলশেভিক প্রভাব আছে। মিসেস এনি বেশান্ত সত্যাগ্রহ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এখন তিনি ঘোষণা করিলেন সত্যাগ্রহ সরকার বিরোধী আন্দোলন, এই আন্দোলন চালাইবার জন্য বোলশেভিস্টরা অর্থ সাহায্য করিতেছে।

পাঞ্জাবের গোলযোগের পর গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিলেন।

পাঞ্জাবে সামরিক আইনের আমলের অত্যাচারের সম্পর্কে প্রবল আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেণ্ট লর্ড হাণ্টারের অধীনে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করিলেন। কমিটির সভ্য মনোনয়ন সম্পর্কে আপত্তি প্রকাশ করিয়া কংগ্রেস বে-সরকারী অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করিল।

হাণ্টার কমিটির নিকটে প্রদত্ত সাক্ষ্য হইতে দেশবাসী পাঞ্জাবে বীভৎস অত্যাচারের সঠিক ও বিস্তারিত সংবাদ জানিতে পারিল।

অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ মাইলস আয়ার্ভিং সাক্ষ্যে বলিল জালিয়ানয়ালাবাগে ২০০০০ হাজার লোকের সভা হইতেছিল। গুলি চালাইবার আগে জনতাকে সাবধান করা হয় নাই। সৈন্যদল হঠাৎ উপস্থিত হইয়া গুলি চালাইতে থাকে। দশমিনিট ধরিয়া ১৬৫০ রাউণ্ড গুলি চলে। গুলি চালাইবার পর আহতদিগের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না করিয়া সৈন্যদল প্রস্থান করিল। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ডায়ার সাক্ষ্যে বলিলেন গুলি না চালাইয়া জালিয়ানাওয়ালাবাগের জনতাকে তিনি সরাইয়া দিতে পারিতেন কিন্তু "the crowd would have come back again and laughed at him and he would have made a fool of himself." (জনতা ফিরিয়া আসিত এবং তাঁহাকে উপহাস করিত; তিনি বেকুব বনিয়া যাইতেন) তিনি বলিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জনতাকে শিক্ষা দেওয়া। "I thought I should shoot strong and well. The firing did a jolly lot of good." (আমি স্থির করিয়াছিলাম শক্ত হাতে, ভাল মত গুলি চালাইব। গুলি বর্ষণের ফল হইয়াছিল অতি চমৎকার)। সাক্ষ্যে তিনি প্রকাশ্যে বেত মারিবার ও হামাগুড়ি দিবার আদেশের সমর্থন করিলেন।

লাহোরের এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সাক্ষ্যে কি ভাবে পথচারীদিগকে ধরিয়া প্রায় উলঙ্গ করিয়া প্রকাশ্যে বেত মারা হইত এবং এই ভাবে বেত মারিবার কতগুলি আদেশ তিনি স্বয়ং দিয়াছিলেন, জানাইলেন। তিনি জানাইলেন ব্রিটিশ অফিসারদিগকে সেলাম না করিবার অপরাধের জন্য বেত্রদণ্ড দেওয়া হইত।

মিঃ মার্সডেন তাঁহার সাক্ষ্যে জানাইলেন কাসুরে ছয়টি স্কুলের ১৩ হইতে ১৬ বছরের সকল ছেলেকে বেত্র প্রহার করা হইয়াছিল। তাহারা কোন অপরাধ করে নাই, কিন্তু একটি স্কুলের হেড মাষ্টার সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে তাঁহার স্কুলের ছাত্ররা অবাধ্য, সেইজন্য ছয়টি স্কুলের ছাত্রকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

ভদ্র ইতর সকল শ্রেণীর পথচারীকে ধরিয়া রাস্তায় হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা, শতাধিক বন্দীকে একটি খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া প্রদর্শন, বেশ্যাদিগের সমক্ষে পথচারীদের উলঙ্গ করিয়া বেত্র প্রহার, সাধু সন্ন্যাসীদিগকে ধরিয়া গায়ে মুখে

চুণের কলি লাগাইয়া দেওয়া, স্কুলের ছাত্রদিগকে সুদীর্ঘ পথ দ্রুত মার্চ করিয়া যাইতে বাধ্য করা ইত্যাদি বিচিত্র পদ্ধতির শাস্তির বিবরণ ছাড়া কংগ্রেস কমিটির রিপোর্টে ডেপুটি কমিশনার বসওয়েল স্মিথ কর্তৃক পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক দিগকে প্রকাশ্যে উলঙ্গ করিয়া বেত্র প্রহার, তাহাদিগের মুখে থুথু দেওয়া, নিজের কান ধরিয়া উবু হইয়া থাকা, সৈন্যদিগের দ্বারা বেইজ্জত করিবার আদেশ দিবার কথা প্রকাশ পাইল।

ইন্দ্রের গৃহে সন্ধ্যার পরে আলোচনা হইতেছিল। ইন্দ্র ও দেবানন্দ ছাড়া শরৎ পণ্ডিত, যোগেন্দ্র উপস্থিত ছিল। বড়লাটের নিকট রবীন্দ্রনাথের পত্র ও চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক সত্যাগ্রহ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরের কথা উঠিল। তারপর উঠিল বহুসংখ্যক এংলো-ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক কর্তৃক ডায়ারের সমর্থন করিয়া পার্লামেণ্টে আবেদন পাঠাইবার ও ডায়ারের সাহায্যের জন্য এদেশের এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের চাঁদা উঠাইবার কথা।

দেবানন্দ বলিল, যুদ্ধের সময়ে পাঞ্জাবী সৈন্যের প্রশংসায় ইংরাজরা পঞ্চমুখ হয়েছিল। যুদ্ধের পরে পাঞ্জাবীরা তাঁদের বীরত্বের উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছেন জালিয়ানওয়ালাবাগে, দোষী নির্দোষী নির্বিচারে পাঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষের প্রতি অকথ্য অত্যাচার ও লাঞ্ছনায়, পাঞ্জাবের সাতটি জেলা তছনছ করে দেওয়ায়।

ইন্দ্র—হাণ্টার কমিটির কাছে সাক্ষ্যে অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ হওয়াতে ইংরাজ কাগজগুলো কিছুদিন মুখ বন্ধ করেছিল। এখন তারা বলতে সুরু করেছে ও সব ভুলে গিয়ে রিফর্মস নিয়ে নাও। ওদের কোন কোন কাগজ আবার আপত্তি করে বলছে রিফর্মস চালু হলে এদেশে ব্রাহ্মণ অলিগার্কির প্রতিষ্ঠা হবে, ডেমোক্রেসী হবে না।

শরৎ পণ্ডিত—কথাটার মানে কি?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—জন কয়েক ব্রাহ্মণের রাজত্ব কায়েম হবে দেশে, জনসাধারণ কোন ক্ষমতা পাবে না।

ব্যাখ্যা শুনিয়া শরৎ পণ্ডিত বলিলেন—অঃ! তারপর বলিলেন, কিন্তু গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করলেন কেন?

ইন্দ্র—কাগজে বলছে পাঞ্জাবের নেতাদের ওপর সামরিক আদালতের বিচারে যে ভয়ানক শাস্তির আদেশ হয়েছিল তার আপীল বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল গ্রাহ্য করেছে বলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করা হয়েছে। কোন কোন কাগজ

বলছে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করলে জনসাধারণের মনোভাব লক্ষ্য করে গভর্ণমেণ্ট রাউলাট এক্ট তুলে দেবেন এই আশায় আন্দোলন বন্ধ করেছেন।

যোগেন্দ্র অস্ফুটস্বরে কি বলিল কেহ শুনিতে পাইল না। শরৎ পণ্ডিত বলিলেন, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার মত না নিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা হয়েছে বলে তুমি যেন চটে গিয়েছ। তাই নাকি বাপু?

যোগেন্দ্র জবাব দিল না। তাহার দিকে চাহিয়া দেবানন্দ বলিল, যোগেন্দ্র, গান্ধীজী আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করছেন। তবে মনে হচ্ছে আন্দোলনের প্রকৃতির পরিবর্তন হবে।

যোগেন্দ্র—কি পরিবর্তন ঘটবে?

দেবানন্দ—সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। সোজাসুজি আইন অমান্যের পথ ছেড়ে বোধহয় ঘোরা পথে গভর্ণমেণ্টের ওপর চাপ দেওয়া হবে। কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হচ্ছে। এই অধিবেশনে বোধহয় একটা কিছু স্থির হবে।

ইন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল শরৎ পণ্ডিত হাত তুলিয়া বাধা দিলেন। এক টিপ নস্য লইয়া কোঁচার খুঁটে তিনি নাক মুছিলেন। তারপর বলিলেন, আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। তোমরা যাকে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন বলছ সেটা নাকি আসলে বোলশেভিক আন্দোলন? যোগেন্দ্রদের হেড মাষ্টার আমাকে সেই কথা বলছিলেন।

বোলশেভিক মতের প্রসঙ্গে হেড মাষ্টারের নামের উল্লেখে যোগেন্দ্র হাসিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক জাত লয়ালিষ্ট, এখনও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গোপালকৃষ্ণ গোখেল ও ফিরোজ শা মেটা ছাড়া আর কাহাকেও নেতা বলিয়া স্বীকার করেন না।

ইন্দ্র বলিল, বোলশেভিক প্রভাব সম্বন্ধে হেড মাষ্টারের ঘ্রাণ শক্তি বড় প্রখর। একখানা মুসলমান কাগজের উল্লেখ করে সেদিন আমাকে বললেন, ইন্দ্রবাবু, মুসলমানের কাগজ হয়ে লিখেছে কি না গরু কোরবাণীতে হিন্দুরা যখন মনে আঘাত পান গো কোরবাণী বন্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য। এটা নিশ্চয় বোলশেভিক প্রভাবের ফল, কি বলেন?

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিল।

ইহার পর কিছুক্ষণ হাট লুটের কথা চলিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কাপড়, লবণ, কেরোসিন তেলের দুর্মূল্যতার জন্য পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে ব্যাপকভাবে এই অপরাধ আরম্ভ হইয়াছিল, এখনও তাহার জের মিটিল না।

শরৎ পণ্ডিত আফগান যুদ্ধের কথা তুলিলেন। আমীর আমানুল্লা ভারত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় দেশের অনেকে, বিশেষ করিয়া মুসলমানরা আনন্দিত হইয়াছিলেন। দেবানন্দ বলিল, আফগানিস্থানের বর্তমান কর্তারা অতি বিচক্ষণ লোক। জার্মানী ও তুর্কীকে নিয়ে ইংরাজ ব্যস্ত। ভারতবর্ষের মুসলমানরা অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হয়েছেন তুর্কীর সাম্রাজ্য ভাগবাটোয়ারা নিয়ে। সুযোগ বুঝে আমীর লড়াই বাধিয়ে দিয়েছেন।

যোগেন্দ্র পূর্ব বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাবের কথা তুলিয়া বলিল, দেশের আর্থিক দুর্গতি বোধহয় সরকার বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি লোককে কিছু পরিমাণে সহানুভূতিসম্পন্ন করেছে।

শরৎ পণ্ডিতের হাই উঠিতেছিল। যোগেন্দ্রের কথা শেষ হইতে তিনি বলিলেন, অনেক রাত হল, এবার ওঠা যাক।

সেদিনকার সান্ধ্য আসর ভাঙ্গিল।

কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের দিন আগাইয়া আসিল। দেবানন্দ ইন্দ্রকে জানাইল সে এই উপলক্ষ্যে কলিকাতা যাইবে। ইন্দ্র তাহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। খবর শুনিয়া যোগেন্দ্র জানাইল সেও যাইবে। সে বলিল তাহার প্রধান উদ্দেশ্য গান্ধীজীকে একবার চাক্ষুষ দেখিবে। তিন জনের যাওয়া স্থির হইল।

রওনা হইবার দিন তিনেক আগে ইন্দ্রের মেয়ে মিনুর জ্বর হইল। খবর পাইয়া দেবানন্দ তাহাকে দেখিতে আসিলে লক্ষ্মী বলিল, দাদা, পুরী থেকে সরী লিখেছে তার শাশুড়ী নাকি পড়ে গিয়ে খুব অসুস্থ হয়েছেন। ব্রজবাবু ফিরে আসবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছেন, সরী কোন মতে ঠেকিয়ে রেখেছে। সরী লিখেছে এখান থেকে কেউ গিয়ে যদি তাঁকে দেখে সঠিক সংবাদ দেয় তাহলে ওরা আসবে কিনা স্থির করবে।

লক্ষ্মীর কথা শুনিয়া দেবানন্দ কিছুক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল, ব্রজবাবুর অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে। এখন চলে আসা ঠিক হবে না। এখান থেকে যাবার লোক ত আর কাউকে দেখছি না, আমাকেই যেতে হয়।

লক্ষ্মী বলিল, আপনারা কলকাতা যাওয়া ঠিক করেছেন, তাই ভাবছিলাম। ওঁকে এখনও সরীর চিঠির কথা বলিনি।

দেবানন্দ—ইন্দ্র কোথায়? কাছারীতে আছে কি?

লক্ষ্মী—বোধহয় বাইরে কোথাও গিয়েছেন।

দেবানন্দ—ওকে তুই বলিস আমি তারাপুর যাচ্ছি। আমার ফিরতে দেখি হলে ওরা যেন কলকাতা চলে যায়, আমার জন্ম অপেক্ষা না করে। আমি যাবার আগে হয়ত ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা হবে না।

ইন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া লক্ষ্মীর কাছে সরস্বতীব চিঠির কথা ও দেবানন্দের তারাপুরে যাইবার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া বলিল, দেবুদা বোধহয় কলকাতা যেতে পারবে না, আমিও যেতে পারব কিনা বলতে পারিনে। এখানে কেউ থাকবে না, মিন্নুর জ্বরটা দু'এক দিনের মধ্যে বন্ধ না হলে যাওয়া হবে না।

লক্ষ্মী বলিল, দাদার সঙ্গে কি দেখা করে আসবে?

ইন্দ্র বলিল, হাঁ, এখুনি যাচ্ছি।

বিকালে চারটার গাড়ী ধরিতে হইবে। দুপুরের পর দেবানন্দ ষ্টেশনে রওনা হইয়া গেল।

দুই

স্বামীর মৃত্যুর পর ত্রিনয়নীর জীবনের ধারার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে।

এগারো বৎসর পরে জ্যেষ্ঠপুত্র বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তিনি ভাবিলেন তাহাব বিবাহ দিয়া সংসার আবাব নূতন করিয়া সাজাইবেন। দুই তিন মাসের মধ্যে তিনি বুঝিলেন তাঁহার আশা পূর্ণ হইবাব নহে। তাঁহাব প্রতি, ভগ্নীদেব প্রতি দেবানন্দের ব্যবহারে কোন ত্রুটি নাই। পিতাব মৃত্যুব পরে স্বাভাবিক ভাবে যে সকল বৈষয়িক কর্তব্যের ভার তাহার উপর পড়িযাছে সেগুলি সে যথারীতি করে। কিন্তু সংসারে সে থাকে কতকটা নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত অতিথিব মত।

ত্রিনয়নী ভাবেন কেন দেবানন্দের এমন ভাব হইল। এগারো বৎসর সে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাটাইয়াছে, তাই কি গাছের কাটা ডালের মত সে আব পরিবারের সঙ্গে জোড়া লাগিতে চাহিতেছে না? অথবা সে মনে মনে আবার কোন বিপজ্জনক কাজের কল্পনা করিতেছে? এক এক বার তাঁহাব মনে হয় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র উমানন্দেব ব্যবহার কি ইহার জন্য দায়ী? উমানন্দ আইন পড়িতেছে ওকালতি করিবে বলিয়া। বয়সে সে দেবানন্দের অনেক ছোট, কিন্তু এই বয়সেই তাহার স্বভাবে কেমন যেন অনুদারতা, স্বার্থপরতার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। ত্রিনয়নী বুঝিতে পারেন না দেবতুল্য চরিত্রের পিতার পুত্র হইযা, আত্মত্যাগী, সন্ন্যাসীতুল্য দেবানন্দের ভ্রাতা হইযা উমানন্দের চরিত্রের এই দুর্বলতা কোথা হইতে আসিল। ছেলেবেলায় তো সে এমন ছিল না। জামাতা ব্রজনাথের মারাত্মক অসুখ ও কন্যা সরস্বতীর ভবিষ্যতের চিন্তা ত্রিনয়নীর মন খানিকটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। আশ্রিতা পুষ্পের কথা তাঁহার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিয়াছিল। পুষ্পের বিদ্রোহে তিনি যে আঘাত পাইয়াছিলেন সে আঘাতের ক্ষত আজিও শুকায় নাই।

স্বামীর মৃত্যুর পরে কয়েক মাস যাইতে না যাইতে ত্রিনয়নী উপলব্ধি করিলেন সংসারে মানুষের আত্মকর্তৃত্বের অহঙ্কার কত অকিঞ্চিৎকর। তিনি

সংযত, শান্ত স্বভাবের মানুষ। স্বামীর বৃহৎ আশ্রয় সরিয়া যাইবার পরে নিজের প্রকৃত অবস্থা অনুভব করিয়া তিনি ধীরে ধীরে সংসারের আসক্তি হইতে মনকে সরাইয়া দুর্বল, আহত হৃদয়ের পরমআশ্রয় ভগবানের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূজা, জপ, ধর্মগ্রন্থ পাঠে তিনি বেশী করিয়া সময় ব্যয় করিতে লাগিলেন।

তারাপুর হইতে দেবানন্দের পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে শরৎসুন্দরী মৃত্যু শয্যায়, বাঁচিবার কোন আশা নাই। সব দিক বিবেচনা করিয়া সে ব্রজনাথকে প্রকৃত অবস্থা জানাইয়াছে।

যোগেন্দ্র একা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষ্যে কলিকাতায় গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইন্দ্রের কাছে সে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিল।

সে বলিল, কংগ্রেসের অধিবেশন বা তার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে লোকের তত আগ্রহ নাই যত আগ্রহ গান্ধীজীকে দেখবার জন্য। তিনি যেখানে যান অসংখ্য লোকের ভিড় তাঁর পিছনে চলেছে। এই ভিড়ের মধ্যে বিহারী, মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, হিন্দুস্থানী, উড়িয়ার সংখ্যা বেশী। পাঞ্জাবীও আছে। তুলনায় বাঙ্গালী অনেক কম। মুসলমানের সংখ্যাও অনেক। বাংলার রাজধানীতে যে কত অবাঙ্গালী আছে এই ভিড় দেখলে বোঝা যায়। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম এই মুসলমান, মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানীদের ব্যবহারে। বাঙ্গালীরা মহাত্মাজীকে তেমন মানছে না দেখে তারা বড় খাপ্পা। বিহারী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া কুলি, মুটে, মজুর, দারোয়ানদের মুখপাত্র হয়ে মারোয়াড়ীরা প্রচার করছে মহাত্মাজী একজন দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, বাঙ্গালী বাবুরা নাস্তিক, তাই মহাত্মাজীকে তারা উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানাতে পারছে না।

ইন্দ্র—অসহযোগের প্রোগ্রাম নিয়ে নাকি দলাদলি হয়েছে?

যোগেন্দ্র—অসহযোগের মূল নীতি সম্বন্ধে সকলে একমত কিন্তু প্রোগ্রাম নিয়ে দু'দল হয়েছে কংগ্রেসের মধ্যে। গান্ধীজীর অনুগামীরা খেতাব বর্জন, সরকারী স্কুল কলেজ বর্জন, আইন-ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় বর্জন, আর্বিট্রেশন কোর্ট ও সৈন্য এবং পুলিশের চাকুরি বর্জন, প্রোগ্রামের সবগুলি দফা কার্যে পরিণত করতে চান। তাঁদের বিরোধীদল এখনই সবগুলি দফা কার্যে পরিণত করতে ইচ্ছুক ন'ন, তাঁরা বলছেন ধীরে ধীরে দেশবাসীকে প্রস্তুত করে পুরো

প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হবে। এঁরা নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান।

ইন্দ্র—কাগজে দেখলাম গান্ধীজীর বিরোধী দলও একমত ন'ন।

যোগেন্দ্র—হাঁ, বাংলার বিরোধী দল ছাড়া মিসেস বেশান্তের পার্টি, মাদ্রাজের সত্যমূর্তি ও রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের পার্টি, মহারাষ্ট্রের সি, খাপার্দের পার্টি, পণ্ডিত মালবীয় ও মিঃ জিন্নার পার্টি, এই কয়েকটি দল রয়েছে বিরোধীদের মধ্যে।

ইন্দ্র—বাংলার বিরোধীদলের অনেকে নাকি কোন পক্ষে ভোট দেন নাই ?

যোগেন্দ্র—গান্ধীজীর প্রস্তাব পাশ হলে মাদ্রাজের বিরোধী দল কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেলেন কিন্তু বাংলার বিরোধী দলের সি, আর, দাশ ও জে, এম, সেনগুপ্ত প্রমুখ দু'জন সভ্য কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে নূতন কাউন্সিলের নির্বাচন প্রার্থীদের তালিকা থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করেছেন।

ইন্দ্র· অসহযোগ সম্বন্ধে লোকে কি বলছে ?

যোগেন্দ্র—কোন দিকে হাওয়া বইবে বোঝা যাচ্ছে না এখনও। কেউ বলছে অসহযোগ impracticable idea (অবাস্তব ধারণা), কেউ বলছে বাংলায় ঐ মত চলবে না। কেউ বলছে পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খালিফের প্রতি অবিচারের প্রতিকার করা অসহযোগের উদ্দেশ্য, স্বরাজ লাভের কথা তো বলা হচ্ছে না। কেউ বলছে "non-co-operation is a humbug and meaningless and cannot be worked out". (অসহযোগ একটা ধাপ্পা এবং অর্থহীন, ইহা কাজে পরিণত করা চলে না), কেউ আবার বলছে non-co-operation হচ্ছে national strike.

অসহযোগ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনার পর ইন্দ্র বলিল, অসহযোগের প্রোগ্রামের অনেকগুলো দফা এদেশে আগেও প্রচার হয়েছে কিন্তু কাজ কিছু হয় নি। গান্ধীজী কিছু কাজ দেখাতে না পারলে বাংলায় উৎসাহ জাগাতে পারবেন কি ?

আরও কিছুক্ষণ অন্যান্য প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনার পর যোগেন্দ্র উঠিল। বলিল, দিন দু'য়ের জন্য আমাকে একবার বাড়ী যেতে হবে। মা খুব তাগাদা দিয়ে যেতে লিখেছেন। তারাপুরের কোন খবর পেলেন ?

ইন্দ্র—খবর বিশেষ ভাল নয়। দেবুদার ফিরতে দেরি হবে।

যোগেন্দ্র চলিয়া গেল।

দিন কয়েক পরের কথা।

সংবাদ পত্রে বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু সংবাদ পড়িয়া ইন্দ্র বিমর্ষ চিত্তে তিলকের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক পুরাতন কথা ভাবিতেছিল। কন্যা মিনু একখানা খোলা চিঠি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল মা দিল।

ইন্দ্র দেখিল তারাপুর হইতে মাতাকে লিখিত দেবানন্দের পত্র। পত্র পড়িয়া সে জানিল শরৎসুন্দরী মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর আগের দিন ব্রজনাথ পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলে ব্রজনাথকে আবার পুরী পাঠাইয়া সে রাজনগরে ফিরিবে।

পত্র পড়িয়া কন্যার হাতে উহা ফিরাইয়া দিয়া সে বলিল, মাকে দিয়ে এস।

মিনু চলিয়া গেল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ইন্দ্র ভাবিল শরৎসুন্দরীর দুঃখময় দীর্ঘজীবনে এতদিনে পূর্ণ শান্তি মিলিল। ব্রজনাথের স্বাস্থ্যোন্নতির সংবাদে সে আশ্বস্ত বোধ করিল।

দিন অনেক পরে যোগেন্দ্র ফিরিয়া আসিল। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কাজ শেষ হল?

যোগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, শেষ আর হল কই? মা ডেকেছিলেন বিয়ের কথা পাকা করবার জন্য।

ইন্দ্র—পাকা হল?

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিল, শুনেছি একলক্ষ কথা না হলে নাকি বিয়ের কথা পাকা হয় না। ঐ সংখ্যার ধারে কাছে এখনও যেতে পারা যায় নি।

একটু থামিয়া সে বলিল, তারাপুরের কোন খবর পেলেন

ইন্দ্র—পেলাম। ব্রজবাবুর মা মারা গেছেন। ব্রজবাবু পুরী থেকে এসেছেন। তাঁর শরীর কিছু ভাল হয়েছে।

ব্রজনাথের স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা শুনিয়া যোগেন্দ্র আনন্দ প্রকাশ করিল। বলিল, ব্রজবাবুর মত পণ্ডিত, হৃদয়বান, গভীর দেশপ্রেমিক লোক আমি আর দেখিনি। আমার সঙ্গে দু'দিনের আলাপ, সেই দু'দিনের মধ্যে দেখলাম তাঁর সমস্ত জীবন যেন দেশপ্রেমের সুরে বাঁধা। অথচ দেখুন তাঁকেই আঘাত করবার জন্য ভগবান সব মারণাস্ত্রগুলো তৈরী করেছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, তাঁর সাংঘাতিক অসুখের

কথা শুনে কতবার মনে হয়েছে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে থাকি, তাঁর সেবা করি।

ইন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, যদি ইচ্ছে হয়েছিল গেলে না কেন ?

যোগেন্দ্র উত্তর দিল না। ইন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া অবশেষে সে বলিল, তাঁর সেবা করবার উপযুক্ত লোক সেখানে আছে ভেবে—

কথা শেষ না করিয়া সে চুপ করিল। ইন্দ্র বুঝিল যোগেন্দ্র পুষ্পের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছে।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া ইন্দ্র বলিল, তোমাদের অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে কোন আলোচনা শুনলে ? না, আমাদের এদিকটার মতই ঠাণ্ডা ?

যোগেন্দ্র বলিল, অসহযোগ আন্দোলন না হোক গান্ধীজীর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। পঞ্চক্রোশীতে নাকি একজন ঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর নাম দয়াল ঠাকুর, কেউ কেউ বলে দয়াল বাবা। লোকে বলছে দয়ালবাবা গান্ধীজীর সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনেকে দয়াল ঠাকুরের ভক্ত হয়েছে। কলকাতায় স্পেশাল কংগ্রেসের সময়ে আমার একজন জ্ঞাতি ভ্রাতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বিহারে কোথায় চাকুরি করেন। কথাবার্ত্তায় বুঝলাম গান্ধীজীর একজন উৎসাহী ভক্ত। আমাকে বললেন চাকুরি ছেড়ে দিয়ে, গোবিন্দপুরে গিয়ে গান্ধীজীর কাজ করবেন। আমি আসবার দিন খবর পেলাম তিনি চাকুরি ছেড়ে দিয়েছেন, শীঘ্রই গ্রামে আসবেন।

দিন দুই পরে সন্ধ্যার পরে ইন্দ্রের গৃহে আলোচনা হইতেছিল। মধুসূদন মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য সদরে গিয়াছিল। আগের দিন রাত্রে সে ফিরিয়াছে। সে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছিল। কলিকাতা হইতে দুইজন নেতা আসিয়াছিলেন। টাউনহলে তাঁহারা খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। মুসলমানদের মধ্যে খুব উৎসাহ, তাহারা দলে দলে টাউনহলের সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। বক্তৃতার আরম্ভ হইতে আলি ভাই কি জয়! মহাত্মা গান্ধী কি জয়! ধ্বনি উঠিল। বক্তৃতার সারমর্ম অমুসলমানের কর্তৃত্ব হইতে জাজিরা-তুল-আরব উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হইবে। তুর্কীর উপর অন্যায় সন্ধি জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহার প্রতি-বিধান করিতে হইবে। পাঞ্জাবের মর্মন্তুদ অত্যাচারের প্রতিকার চাই। মহাত্মা গান্ধী ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে হিন্দু মুসলমান সকল দেশবাসী সমবেত হউন।

তুর্কীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ যে সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাই হিজারত করিতে চাহেন তাঁহারা এই শয়তান গভর্ণমেণ্টকে অচল করিবার জন্য শপথ গ্রহণ করুন। বক্তৃতার শেষে আবার ধ্বনি—আল্লা হো আকবর! মহাত্মা গান্ধী কি জয়!

মধুসূদন বলিল, দ্বিতীয় বক্তা অসহযোগের প্রোগ্রাম ব্যাখ্যা করলেন। সরকারী স্কুল কলেজ ছাড়বার প্রস্তাবে ছেলেরা চিৎকার করে সমর্থন জানাল। আদালত বয়কট প্রস্তাবে একটু তুষ্ণীভাব দেখা গেল। কাউন্সিল বর্জন, বিদেশী বস্ত্র বয়কটের প্রস্তাবের সমর্থন পাওয়া গেল। একজন উঠে জিজ্ঞাসা করল—ট্যাক্স বন্ধের কথা বলছেন না কেন? "চুপ, চুপ" "বসো বসো" ইত্যাদি চিৎকার উঠল চারদিক থেকে। বক্তা বললেন, আপনারা ধৈর্য ধরুন। আমরা গভর্ণ-মেণ্টের ট্যাক্স, জমিদারের খাজনা, মহাজনের গলাকাটা সুদ সব বন্ধ করব, যথা সময়ে। ধাপে ধাপে আন্দোলন অগ্রসব হবে। প্রথম ধাপ স্কুল কলেজ বর্জন। ছেলেরা চিৎকার কবে উঠল, আল্লা হো আকবর! মহাত্মা গান্ধী কি জয়। হিন্দু মুসলমান কি জয়! সভা শেষ হতে কোলাকুলি আরম্ভ হল, হিন্দু-মুসলমানে কোলাকুলি, মাবোয়াড়ী বাঙালীতে কোলাকুলি, মারোয়াড়ী মুসলমানে কোলাকুলি, কোলাকুলিব বহব দেখে পালিয়ে বাঁচি।

ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে শরৎপণ্ডিত কান, মাথা ও গলা জড়াইয়া কমফাটার বাঁধিয়া এককোণে বসিয়া মধুসূদনের গল্প শুনিতেছিলেন। দুই আঙ্গুলের মধ্যে ধৃত নস্যটুকু নাসিকায় প্রবেশ করাইতে যাইতেছিলেন, মধুসূদনের কথা শেষ হইতে থামিলেন। হাসিয়া বলিলেন, কোলাকুলির শ্রীক্ষেত্র বলো। আমার পাপ মনে কিন্তু ইতিহাসেব পুবনো শিবাজী-আফজল খাঁর গল্প মনে পড়ছে। বলি ধীরে রজনী, ধীরে।

এক টিপ নস্য লইলেন শরৎ পণ্ডিত। আবার বলিলেন, অসহযোগের প্রোগ্রামটি যেন রাধার নাচবার আগে পোড়ানোর জন্য সাত মণ তেলের বায়নার মত মনে হচ্ছে।

যোগেন্দ্র উত্তেজিতভাবে কি বলিতে যাইতেছিল শরৎ পণ্ডিত হাত তুলিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, হয়ত আমার বোঝবাব দোষ। তোমার উদ্যত পাশুপত অস্ত্র সংবরণ কর যোগেন্দ্র।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল, সব কথায় রহস্য করবার পুরনো অভ্যাস আপনার গেল না।

শরৎ পণ্ডিত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, একে অভ্যাস, তায় পুরনো। পুরাতন অম্লশূলের অধিক দুরারোগ্য ব্যধি। সহজে কি যায় ভায়া?

কমফাটার খুলিয়া তিনি নূতন করিয়া বাঁধিলেন। বলিলেন, ঠাণ্ডাটা বেশ চেপে পড়েছে। এবার ওঠা যাক। মধুসূদন, পথ প্রদর্শনে তোমার লণ্ঠনটি আলোক দানে সাহায্য করবে কি?

মধুসূদন উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চলুন। আপনার লণ্ঠন কি হল? শরৎ পণ্ডিত—আর বলো কেন ভায়া? কর্মিষ্ঠা কনিষ্ঠা কন্যা জ্বালাতে গিয়ে চিমনিটিকে তিন খণ্ডে ভগ্ন করেছে।

শরৎ পণ্ডিত ও মধুসূদনের সঙ্গে যোগেন্দ্রও উঠিল।

পরদিন সকালে ইন্দ্র বৈঠকখানা দালানের বারান্দায় বসিয়া নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনের খবর পড়িতেছিল। মিনু কাছে মাদুরে বসিয়া পুতুল খেলিতেছিল ও মাঝে মাঝে তাহার পুত্র কন্যাগণের স্বাস্থ্য, পড়াশোনা, অবাধ্যতা সম্বন্ধে পিতার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছিল। খেলিতে খেলিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, বড় মামা!

ইন্দ্র কাগজ সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কখন এলে দেবুদা? তারাপুরের খবর কি?

দেবানন্দ বারান্দায় উঠিয়া একটি মোড়ায় বসিল। বলিল, এসেছি অনেক রাতে। তারাপুরের খবর আপাততঃ ভাল। ব্রজবাবুর শরীর কিছু ভাল হয়েছে। তাকে পুরী পাঠিয়ে আমি ফিরব বলে দেরি করছিলাম। বিষয় সম্পত্তির একটা বন্দোবস্ত করে সে যেতে চায়। টাকা যাতে নিয়মিত পাঠানো হয় সে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিছুদিন দেরি হবে। আমি শুধু শুধু বসে থেকে কি করব ভেবে চলে এলাম। হিমাংশুও আমার সঙ্গে এসেছে, ওর পড়ার ক্ষতি হচ্ছিল। ওরা পুরী যাবার সময় আমাকে খবর দেবে, আমি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব।

ইন্দ্র—পুষ্প এল না?

দেবানন্দ—সে আসতে চায়নি আর আমিও দেখলাম পুষ্প না থাকলে ওদের সংসার অচল হবে। মেয়েটা বড় কাজের, বড় ভাল।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া দেবানন্দ বলিল, নাগপুর কংগ্রেসের খবর কি বল? ইন্দ্র বলিল, সভাপতি বিজয় রাঘবচারিয়ারের বক্তৃতা কারো ভাল লাগেনি এক

ইংলিশম্যান কাগজ ছাড়া। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ পাওয়া যাবে গান্ধীজীর এই উক্তির সমালোচনা করে কোন কোন কাগজ বলছে, এই উক্তির অর্থ পরিষ্কার নয়। স্বরাজ বলতে গান্ধীজী কি বোঝাতে চান? স্বায়ত্তশাসন না স্বাধীনতা?

দেবানন্দ বলিল, এই সন্দেহ এখন উঠেছে, পরেও উঠবে।

ইন্দ্র বলিল, সি. আর. দাশ নন-কো অপারেশন পাঁচ বছর পিছিয়ে দেবার প্রস্তাব এনেছিলেন। সভাপতি বিজয় রাঘবচারিয়ারের লক্ষ্য equal partnership in the British Commonwealth by virtue of compact entered into of our free will and consent. তাঁর কথায় বোঝা যায় তিনি মনে করেন অসহযোগ বা বয়কট হচ্ছে এই compact করতে ইংরাজকে বাধ্য করবার অস্ত্র। আমরা কানাডার মত শাসনপ্রণালী চাই, এ কথাও তিনি বলেছেন।

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, কংগ্রেস অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে গান্ধীজীর উৎসাহে, কিন্তু কংগ্রেসের পোলিটিকেল ফিলোসফি এখনও ডব্লু. সি. ব্যানার্জি ও তেলাংয়ের যুগ অতিক্রম করে নাই।

একজন পরিচারিকা আসিয়া জানাইল মা বড় মামাবাবুকে ডাকিতেছেন। দেবানন্দ ও ইন্দ্র উঠিয়া ভিতরে গেল।

তিন

কলিকাতা (১৯১৯ ২১)

কাক ডাকিবাব সঙ্গে সঙ্গে রোজকার মত সবলা দেবীব ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিতে গত রাত্রের ব্যাপাব দুঃস্বপ্নের মত তাঁহাব মনে পডিল। কিন্তু এরকম দুঃস্বপ্নে তিনি একবকম অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর সাধ্বী স্ত্রীর অভ্যস্ত না হইয়া উপায় কি? ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম স্মরণ করিয়া তিনি শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রশস্ত শয়ন কক্ষের দ্বিতীয় খাটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন শয্যা শূন্য। তাঁহাব পরিষ্কার মনে আছে রাটমহলের সাহায্যে গভীর রাত্রে নীচেব খাসকামরার মেঝে হইতে স্বামীকে তুলিয়া শযনকক্ষে আনিযা বিছানায় শোয়াইয়াছিলেন তিনি। এত সকালে উঠিয়া স্বামী গেলেন কোথায়?

নীচে রাটমহলেব গলা শোনা গেল। সরলা দেবী তাহাকে ডাকিলেন। রাটমহল্ উপরে আসিয়া জানাইল সাহেব গোসল সারিয়া অফিস কামরায় মোকদ্দমার কাগজপত্র লইয়া বসিয়াছেন, তাহাকে কফি দিবাব আদেশ দিয়াছেন।

সরলা দেবী বলিলেন, এত সকালে অফিস কামবায়?

রাটমহল বলিল, আজ বড় কেস আছে। সাতটায় পটপটিয়াজী ও বলাই সরকার বাবু আসবেন, কাল শুনেছি মা। আমি যাই, এখুনি কফির জন্য ডাকবেন।

রাটমহল নীচে নামিয়া গেল।

সরলা দেবী বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন আশ্চর্য মানুষ বটে। রাত নয়টার সময়ে সি. আর. দাশের বাডী হইতে ফিরিলেন কংগ্রেসের ব্যাপার সম্বন্ধে কথাবার্তা সারিয়া। এগারোটা পর্যন্ত বলাই সরকার, ফণী সিংহ, এককডিবাবু, নিমাই শাস্ত্রীর সঙ্গে পাঞ্জাবের ব্যাপার, শাসন সংস্কার, নূতন কাউন্সিলে

নির্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তারপর আর সকলে চলিয়া গেলেন, বলাইকে লইয়া তিনিও বাহিরে চলিয়া গেলেন। অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, রাটমহলের ডাকে ঘুম ভাঙিল।

রাটমহল বলিল, মা, সাহেব ফিরে খাসকামরায় ঢুকে আবার বোতল নিয়ে বসেছেন। সরলা দেবী বলিলেন, সাহেব কোথায় গিয়েছিলেন জানিস ?

রাটমহল—তাতো জানিনে মা, সাহেব ট্যাকসি গাড়ী থেকে নামলেন। যখন নামলেন তখনই বে-এক্তিয়ার। তাঁকে খাসকামরায় রেখে আমি আপনাকে খবর দেব বলে দোরের কাছে যেতে সাহেব ধমক দিলেন, বাহার মৎ যানা। বোতল বের করে দিতে হল। খানিক বাদে স্লুট করে বেরিয়ে এলাম আপনাকে খবর দেবার জন্য।

সরলা দেবী নীচে নামিয়া খাসকামরায় ঢুকিয়া দেখিলেন স্বামী মেঝেতে কার্পেটের উপর পড়িয়া আছেন।

সেই মানুষ এত সকালে উঠিয়া মোকদ্দমার কাগজ দেখিতে বসিয়াছেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তিনি কি চিন্তা কবিলেন, তারপব বাথরুমে প্রবেশ কবিলেন।

সরলা দেবীর স্বামী হরিশঙ্কব বড পশারওয়ালা ব্যারিষ্টার, সুবক্তা, পলিটিশিয়ান। ছাত্রাবস্থায় ভগবদ্ভক্তিব প্রেবণায় গৃহত্যাগ করিয়া পরমহংস প্রেমানন্দ মহারাজেব কাছে দীক্ষা লইয়াছিলেন। দীক্ষান্তে ব্রহ্মচর্য ব্রত লইয়া বহু তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পুরীতে পৌছিয়া গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। একজন তীর্থযাত্রী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া দয়া কবিয়া তাঁহার বাড়ীতে সংবাদ পাঠান। পিতা মাতা আসিয়া তাহাকে গৃহে ফিবাইয়া লইয়া যান। কৈশোরের ব্রহ্মচারী লীলাধ্যায় এইভাবে শেষ হইল। মাতার সাধ্য .ধনায় তিনি আবার পডাশুনায মন দিলেন।

ছাত্রাবস্থায় বক্তা ও ছাত্র নেতা বলিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি কংগ্রেসের নেতাদেব সঙ্গে মিশিতে ও রাজনীতির খেলার পাঠ লইতে আরম্ভ করেন। তাঁহাব উন্নত, বলিষ্ঠ, সুন্দব চেহারা, ইংরাজি ও বাংলায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিবার শক্তি, ছোট বড সকল রকম লোকের সঙ্গে মিশিয়া যাইবাব ক্ষমতা দেখিয়া ও প্রসিদ্ধ এটর্ণী রামশঙ্করবাবুর পুত্র বলিয়া মান্যগণ্য নেতারা তাঁহাকে স্নেহাশ্রয় ও প্রশ্রয় দিতে কুন্ঠিত হইতেন

না। বিলাত যাইবার আগেই হরিশঙ্করের নেতৃত্বের আসন রচিত হইয়া রহিল।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া হরিশঙ্কব সরলা দেবীকে বিবাহ করিলেন। পুত্রের বিবাহ দিবার কয়েক মাসের মধ্যে রামশঙ্কর দেহ রক্ষা করিলেন। মাতাও অল্পদিনের মধ্যে স্বামীর অনুসবণ করিলেন। স্বর্গীয় পিতার ঋণের পরিমাণ প্রকাশ হইয়া পড়িতে হরিশঙ্করের চক্ষুস্থির হইল। কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অক্লান্ত সাধনায় ভাগ্য সদয় হইল। ভাগ্যের প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করিয়া তাহার প্রতিভা খুলিয়া গেল। পশাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুরুব্বী, বন্ধু, মোসাহেব জুটিল, নূতন উপসর্গও দেখা দিল। তখন হইতে সরলা দেবীর দুঃখেব দিন আরম্ভ হইল।

তিনি অতিশয় শান্ত, সংযত স্বভাবেব ভদ্রমহিলা। স্বামীর অপরিমিত পানা-শক্তি ও পরকীয়াতত্ত্বের চর্চায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত ও শঙ্কিত হইলেন, কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। নিজেব মনের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া অবশেষে স্বামীকে সংযত রাখিবার অক্ষমতার দুঃখের মধ্যে তিনি এক সান্ত্বনাব সূত্র খুজিয়া বাহির করিলেন। তিনি ভাবিলেন লম্বায় চওড়ায় এই প্রকাণ্ড মানুষটাব অজস্র প্রাণশক্তি। সময়ের হিসাব হারাইয়া বাহ্যজ্ঞান বহিত হইয়া তিনি ব্যবসায় উন্নতির জন্য খাটিয়াছেন, একা মানুষ কয়েক বৎসবেব মধ্যে পিতাব পর্বতপ্রমাণ ঋণ শোধ করিয়াছেন। আজ তাঁহার পশার সুপ্রতিষ্ঠিত, অতিবিক্ত পরিশ্রমেব চাপ নাই। বোধহয় সেইজন্য অন্যদিকে তিনি আলগা দিযাছেন। স্ত্রী হইলেও তিনি ক্ষুদ্র মেয়ে মানুষ, তাঁহার কি শক্তি আছে এই ঐরাবতকে বাঁধিয়া বখিবার? আর একটা কথাও তিনি ভাবিতেন। দিনের পব দিন এই কাণ্ড চলিতেছে কিন্তু বাক্যে বা ব্যবহারে কোন সময়ে স্বামী তাঁহার অসম্মান কবেন নাই। তিনি সম্মুখে থাকিলে অত্যন্ত বে-এক্তিয়াব অবস্থাতেও স্বামী সংযত ও ভদ্র হইবার চেষ্টা করিতেন। ভাব দেখিয়া মনে হইত বাড়ীর গৃহিণীর প্রাপ্য সম্মানের কোনরূপ হানি না হয় সম্পূর্ণ প্রমত্ত অবস্থাতেও একথা তাঁহার মন হইতে মুছিয়া যাইত না। এইটুকু লইয়াই সরলা দেবীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত।

সাধ্বী স্ত্রী না হইলে এমন সান্ত্বনার সূত্র কেহ কি আবিষ্কার করিতে

পারে? পিতৃগৃহে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিভাবের দীক্ষা পাইয়াছিলেন। এই ভক্তিভাব মানসিক স্থৈর্য রক্ষায় তাঁহাকে সাহায্য করিল।

পশার জমিবার পর হরিশঙ্কর রাজনীতির মঞ্চে দেখা দিলেন উৎসাহী হোমরুলার রূপে। হোমরুল আন্দোলনে ভাটা পড়িতে তিনি ব্যবসা লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। অবসর সময়ে সংবাদপত্রে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিতেন। ইহারই সুযোগে তাঁহার প্রসাদপ্রার্থী হইয়া দেখা দিলেন কাগজের সম্পাদক এককড়িবাবু। তারপর রাউলাট এক্টের প্রতিবাদে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইল। পাঞ্জাবে মার্শাল ল আমলের অত্যাচারের কাহিনী গুজবের আকারে ছড়াইয়া পড়িয়া দেশে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। হরিশঙ্কর ঘন ঘন সি আর. দাশের গৃহে যাইতে লাগিলেন কি ভাবে দেশবাসীর বিক্ষোভকে সংহত আন্দোলনের রূপ দেওয়া যায় তাহার পরামর্শ সভায়। এই সময়ে আসল বলাই সরকার ও ফণী সিংহ, আর আসিলেন খ্যাতনামা দেশপ্রেমিক ও সাংবাদিক পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রী। তাঁহার সহপাঠী, হাইকোর্টের বিশিষ্ট উকিল মৌলভী মুকুল হক এই সময় হইতে তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুদ্ধের সময়ে কাপড় ও পাটের বাজারে মুনাফা লুটিয়া ক্রোড়পতি মক্কেল বালাচাঁদ পটপটিয়ার রাজনীতিতে যোগ দিবার শখ হওয়াতে তিনিও এই সময় হইতে ঘনঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন তাঁহার গৃহে।

হরিশঙ্করের বন্ধু ও ভক্তদলের মধ্যে বলাই সরকার ও ফণী সিংহের কথা কিছু বলা আবশ্যক।

বলাই সরকারের কোথায়, কোন কুলে জন্ম কেহ সঠিক জানে না। শোনা যায় বালক বলাই মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া এক বড় ব্যারিষ্টারের গৃহে সাধারণ ভৃত্য রূপে প্রবেশ করিয়াছিল। কর্মদক্ষতায় সে কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্যারিষ্টার সাহেবের খানসামাগিরিতে বহাল হয়। তারপর খানসামা হইতে বাজার সরকার, বাজার সরকার হইতে বাবু, বাবু হইতে প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে তাহার উন্নতি হইল। সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে কাজ করিতে করিতে বলাই কলিকাতার অভিজাত মহলে সুপরিচিত হইল। বিকাশের উর্বর ক্ষেত্র পাইয়া তাহার প্রতিভা খুলিয়া গেল। বলাইয়ের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে, সে অভিজাত সমাজের খিড়কীদ্বার দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়া নূতন নূতন

কর্মক্ষেত্র আবিষ্কার করিত। কত বড়লোকের জন্য কত রকমের কাজ যে সে করিয়া দিত বলাই ছাড়া তাহা কেহ জানিত না। হঠাৎ চড়া সুদে ঋণের প্রয়োজন হইলে, বিরুদ্ধ পক্ষকে কূটজালে জব্দ করিবার প্রয়োজন হইলে, কাহারও গুপ্ত কথা জানিবার প্রয়োজন হইলে, গোপনে আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইলে বলাইয়ের ডাক পড়িত। লাভের প্রত্যাশা থাকিলে বলাই ডাকে সাড়া দিতে কার্পণ্য কবিত না। বলাই যখন উন্নতির শিখর হইতে শিখরে উঠিতেছে সেই সময় কোন বন্ধুর সঙ্গে কথায় কথায় বলাইয়েব প্রসঙ্গ উঠিলে তাহার ভুক্তভোগী ব্যারিষ্টার মনিব বলিয়াছিলেন, বলাই একজন অসাধারণ ব্যক্তি। বোধহয় পূর্বজন্মের কোন পাপের ফলে খানসামা হয়ে আমার বাড়ীতে ওকে ঢুকতে হয়েছিল, ওর যোগ্যস্থান ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে। কলকাতার সকল বড়লোকেব দুর্বলতার কথা ও জানে, বড় বড় পরিবাবের বহু গুপ্ত রহস্য ওর নখদর্পণে। He trades on the weeknesses of big folks, he thrives by pandering to some and by blackmailing others. He is a rare g nius. (বড়লোক-দিগের দুর্বলতা লইয়া ব্যবসায় চালায়। কাহাকে প্রশ্রয় দিয়া, কাহাকে হাটে হাঁড়ি ভাঙিবার ভয় দেখাইয়া সে ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি কবে। এখন প্রাতভাধব কদাচ দেখা যায়।) বলাই চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়াছিল। অনন্যসাধারণ কর্মদক্ষতাগুণে কয়েক বৎসবেব মধ্যে বলাই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইল। ইহার কিছুদিন আগে এক পাবিবাবিক দুর্ঘটনা ঘটিল। দুর্ঘটনা তাহাব স্ত্রীর আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যাব কাবণ সম্বন্ধে বলাইয়ের শত্রুপক্ষ নানা কথা বটাইল। তাহাবা প্রচার করিল প্রতিষ্ঠানেব ভূতপূর্ব কর্তাকে হাতের মুঠাব মধ্যে আনিবার জন্য বলাই নাকি তাহার স্ত্রীকে ব্যবহাব করিয়াছিল। শত্রুপক্ষের এই রটনায় বিরক্ত হইয়া বলাই কিছু দিন আত্মগোপন করিয়া রহিল।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতের মধ্যে আনিবার পর নিশ্চিন্ত হইয়া বলাই রাজনীতির দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। উদয়োন্মুখ প্রতিভাশালী নেতারূপে হরিশঙ্কর তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ কবিল। কিছুদিনের চেষ্টায় বলাই হরিশঙ্করের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া দাড়াইল।

বলাই বলিত সে ফণী সিংহকে জুটাইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্য নয়।

এক ডাকাতির মোকদ্দমায় ১৯১০ হইতে পাঁচ বৎসর জেলে তারপর তিন বৎসর অন্তরীণ অবস্থায় কাটাইয়া ফণী কিছুদিন আগে মুক্তি পাইয়াছিল। মুক্তি পাইবার পর প্রধান সমস্যা হইল জীবিকা নির্বাহের উপায় করা। গরীব গৃহস্থ ঘরের ছেলে, নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে পেট চলে না। সামান্য কিছু পুঁজি সংগ্রহ করিয়া পুরাতন দলের একজনকে অংশীদার করিয়া সে চায়ের দোকান খুলিল। দলের অনেকে এই খবর পাইয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। সকলেই প্রায় পুরা, নয় অর্ধ বেকার। পুলিশের ভয়ে চাকুরি দিতে চাহে না কেহ, উঞ্ছবৃত্তি করিয়া কোনমতে চলে। দোকানে বসিয়া তাহারা চা খায়, নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলে, ভবিষ্যতের চিন্তা করে। চায়ের দোকানের লাভের গুড় এইসব পিপীলিকা খাইয়া দেয়। কয়েকমাসের মধ্যে লোকসান খাইয়া ফণী ও তাহার অংশীদারকে দোকান তুলিয়া দিতে হইল। তারপর ফণী পানের দোকান খুলিল। আড্ডা দিবার ও বিনা পয়সায় পান খাইবার জন্য সেখানেও দলের লোকেরা আসিতে লাগিল।

এই সময় কোন সূত্রে ফণী খবর পাইল ব্যারিষ্টার হরিশঙ্কর নাকি অতিশয় উদার হৃদয় দেশপ্রেমিক লোক, গোপনে অনেক দুরবস্থাগ্রস্থ এক্স-রিভোল্যুশনারীকে সাহায্য করেন। ফণী একদিন হরিশঙ্করের সঙ্গে দেখা করিল।

হরিশঙ্কর বলিলেন, এক্স-রিভোলুশনারী পরিচয় দিয়ে অনেক বাজে লোক আমার কাছে সাহায্য নিয়েছে, আমি আর কাউকে সাহায্য করতে পারব না।

ফণী কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছে দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন এদেশে এক্স-রিভোল্যুশনারী বলে নূতন একটা জাত সৃষ্টি হয়েছে। কাজে বা অকাজে দু'এক বছর জেল খাটলে বা দু'এক বছর অন্তরীণ থাকলে যে কেউ এই জাতে উঠতে পারে। কাজ কর্ম কিছু করব না, দেশের লোক আমাদের বসে বসে খাওয়াবে, নূতন জাতটির এই হচ্ছে দাবি।

ফণী এবার উত্তর দিল। বলিল আপনার কথা ঠিক নয় স্যর। কাজকর্ম আমরা করতে চাই। কিন্তু আমাদের জাতের কথা শুনে কেউ কাজ দিতে চায় না। আমাদের কেউ কেউ চাকুরিতে ঢুকে বেশ ভালভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা এক্স-রিভোলুশনারী একথা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিনা নোটিশে তাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি চাইলে এ রকম ঘটনার কথা যতগুলো আমার জানা আছে তার তালিকা তৈরী করে দিতে পারি, ইচ্ছে হলে

আপনি যাচাই করে দেখতে পারেন আমার বর্ণনা সত্য কি মিথ্যা। দেশের লোকের কাছে আমরা অচ্ছুৎ। তারা দুনিয়াকে ভয় করে, আমাদের ভয় করে না, করে ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য। ভাল বা মন্দ যে কাজই আমরা করে থাকি না কেন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তা করিনি। এই অপরাধের জন্য গভর্ণমেণ্ট ও দেশের লোক আমাদের না খাইয়ে মারবার সংকল্প করেছে, এ দিকটা আপনি ভেবে দেখেছেন বলে মনে হয় না। আমরা যদি কাজের লোক হই কেন আমরা কাজ পাব না? আমরা যে ভিক্ষে করতে বাধ্য হই তার জন্য দায়ী কে?

ফণীর কথা শুনিয়া হরিশঙ্কর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। তারপর বলিলেন, তুমি কাজের কথা বলছ, কি কাজ করতে চাও?

ফণী একটু হাসিয়া বলিল, যে কাজ দেবেন, লোকের মাথা ফাটানো থেকে ঘর ঝাড় দেওয়া পর্যন্ত যে কোন কাজ করতে পারি।

হরিশঙ্কর ফণীর কথা শুনিয়া হাসিলেন। বলিলেন, তুমি কথা বল ভাল। কি নাম তোমার বললে?

ফণী—ফণী সিংহ, বন্ধুরা বলেন ফণী দি লায়ন-হার্টেড।

হরিশঙ্কর বলিলেন, তুমি কাজ পাবে। খবরটা তোমার লায়ন-হার্টেড বন্ধুদের দিয়ো না ফণী, আমাকে পাগল করে ছাড়বে। তোমার দলে কত জন এক্স-রিভোল্যুশনারী আছে?

ফণী—বিশ পঁচিশ জন মজুদ আছে স্যর, খবরাখবর করলে দু'একশ যোগাড় করতে পারি।

হরিশঙ্কর—আপাততঃ খবরাখবর করো না। আমার মাথায় একটা স্কীম এসেছে তোমাদের জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করবার। ইলেকশনে ক্যানভাসারের কাজ করতে পারবে?

ফণী—আপনি যদি দাঁড়ান করব।

হরিশঙ্কর—আমি দাঁড়াব কিনা বলতে পারছিনে। না দাঁড়ালেও তোমার দলের সাহায্য আমার দরকার হতে পারে। তুমি কাল সন্ধ্যাবেলা এস, বলাইয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।

ফণী—বলাই? কে, বলাই সরকার? সেই যার স্ত্রীর আত্মহত্যা নিয়ে—

হরিশঙ্কর বাধা দিয়া বলিলেন, চুপ, চুপ। যা কানে শুনবে তাই কি সব

জায়গায়, বলতে হবে ? তুমি এক্স-রিভোল্যুশনারী, বেফাঁস কথা বলবার কত বিপদ জানো না ?

হরিশঙ্কর টেবিলের টানা খুলিয়া পঁচিশ টাকার নোট বাহির করিয়া ফণীর হাতে দিলেন। বলিলেন, আসছে মাসের সাত তারিখে আবার পাবে। এখন যাও, কাল সন্ধ্যায় আসবে।

বলাইয়ের সঙ্গে ফণীর আলাপ হইল। হরিশঙ্করের অনুরোধে বলাই ফণীর দলের কয়েকজনকে চাকুরি জুটাইয়া দিল, ফণীও একটা কাজ পাইল তাহার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে। ফণী চাকুরি করিত আবার বেকার এক্স-রিভোল্যুশনারী বন্ধুদের নাম করিয়া মাঝে মাঝে হরিশঙ্করের কাছে টাকা আদায় করিত। কিছুদিন পরে সরলা দেবীর সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয় হইবার পর সে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। কথায় তাঁহার সদয় হৃদয় গলাইয়া এক্স-রিভোল্যুশনারী বন্ধুদের কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়, অসুখের চিকিৎসা ইত্যাদি অজুহাতে সে তাঁহার কাছে অর্থ আদায় করিত। হাতে ১৫০ টাকা জমিলে একখানা ছোট বাড়ী ভাডা করিয়া সে দেশ হইতে পরিবারবর্গকে আনিল এবং দলের কয়েকজন প্রকৃত দুঃস্থ লোককে সেই বাড়ীতে আশ্রয় দিল।

হরিশঙ্করের গৃহের গাড়ী বারান্দার পাশে একখানি ঘর ছিল সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের বসিয়া অপেক্ষা করিবার জন্য। ফণী ও তাহার দলের দুইজন যুবক এই ঘরে বসিয়া আইরিশ বিদ্রোহ ও কর্কের মেয়র টেরেন্স ম্যাকস্যুইনের প্রায়োপবেশনে মৃত্যুর কথা আলোচনা করিতেছিল। একজন ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোক লম্বাচওড়ায় বিরাট পুরুষ, গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, পরণে ঢিলা পায়জামা ও আচকান, মাথায় লাল তুর্কী টুপী। ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট যুবকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ব্যারিষ্টার সাহেব আছেন ?

কেহ উত্তর দিবার আগেই ফণীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, আরে কে, ফণী বাবু না ?

ফণী উঠিয়া দাঁড়াইতে তিনি অগ্রসর হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, I see you after ages my dear friend Phani Babu. তাহলে ছাড়া পেয়েছ ? কাজ কর্ম কিছু করছ না পুরনো সিন্দুক ভাঙ্গবার ব্যবসা চলছে ?

ফণী আপনাকে আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিল। মনে মনে বলিল, আচকানটিতে কত রকমের গন্ধ যে লেগে রয়েছে! তারপর হাসিয়া বলিল, সেলাম আলেকুম মৌলবী সায়েব। আপনার ডিফেন্সের দৌলতে পাঁচটি বছর ঘানি টেনেছি, আর ঐ কাজে হাত দিই? নাকে খত দিয়ে ও পথ ছেড়ে দিয়েছি। এবার নূতন কিছু করবার চেষ্টায় আছি। আপনি নাকি ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন শুনলাম। আবার কেউ কেউ বলছে আপনি হিজারত করবেন। সত্যি?

মৌলবী সাহেব হাসিলেন। আমার এন্তেকাল হয়েছে এ খবর শোননি কোথাও?

ফণী চিন্তার ভান করিয়া বলিল, কই, শুনিনি তো।

মৌলভী সাহেব উচ্চ হাস্য করিলেন, Oh you rogue!

হাসি থামাইয়া বলিলেন, ব্যারিষ্টার সায়েব আছেন বাড়ীতে? আমাকে আসবার জন্য খবর পাঠিয়েছিলেন।

ফণী—আপনি বসুন, আমি দেখছি।

একটু পরে সে ফিরিয়া আসিয়া মৌলভী সাহেবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, এমন সময় এককড়ি বাবু দেখা দিলেন! মৌলভী সাহেবকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, এই যে নুরুল হক সায়েব! কেমন আছেন?

মৌলভী সাহেব বলিলেন, সেলাম। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে মশায়।

এককড়ি বাবু—আমারও কিছু কথা আছে। আপনি স্পেশাল কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতিতে নাম দিয়েছেন, আবার ইলেকশনেও নাকি দাঁড়াচ্ছেন? দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলতে চান?

মৌলভী সাহেব—চারখানা ঠ্যাং থাকলে চার নৌকোয় পা দিয়ে চলতাম এককড়ি বাবু। অবশ্যি দু'খানা ঠ্যাং নিয়েও সে কেরামত কেউ কেউ দেখাচ্ছে। নাম করতে চাইনে।

এককড়ি বাবু কোন উত্তর না দিয়া পা চালাইয়া হরিশঙ্করের অফিস কামরায় প্রবেশ করিলেন। মৌলভী সাহেবও তাঁহার ঘরে ঢুকিলেন।

হরিশঙ্কর তাঁহাদের দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, মক্কা ও কাশীর এক সঙ্গে প্রবেশ, symbolical of Hindu-Moslim unity (হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক), আসুন, আসুন।

এতক্ষণ পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রীর সঙ্গে হরিশঙ্করের আলোচনা চলিতেছিল। মৌলভী সাহেব ও এককড়ি বাবুকে দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, তাহলে এখন আমি উঠি। বালাচাঁদের আসবার কথা আছে আমার বাড়ীতে।

হরিশঙ্কর, আচ্ছা আসুন। আপনি যা বললেন দাশ সাহেবকে বলব। বালাচাঁদকে একবার এখানে আসতে বলবেন কাল।

শাস্ত্রী মহাশয় দরজা পর্যন্ত গিয়াছেন, হরিশঙ্কর ডাকিলেন—আপনার গায়ের চাদর ফেলে যাচ্ছেন শাস্ত্রী মশায়।

ফণী দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি চাদরখানি আনিয়া শাস্ত্রী মহাশায়কে দিল। চাদর কাঁধে ফেলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

হরিশঙ্কর মৌলভী সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ওহে হক, তুর্কী ডেলিগেটরা ত্রিশক্তির শান্তি সর্ত যে গ্রহণ করে বসল।

মৌলভী সাহেব—ইসলাম-বিরোধী এই শান্তি সর্ত মুসলিম জাহান কখনও মেনে নেবে না। তুর্কী ডেলিগেটরা ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ইংরাজের শয়তানি আছে এর মধ্যে। কাগজে পড়োনি ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ ধূয়া তুলেছেন য়ুরোপ থেকে তুর্কীকে তাড়িয়ে দিতে হবে আর ইংরাজি ভাষাভাষী একশ আমেরিকান বিশপের নেতা সেজে নিউ ইয়র্কের বিশপও সেই ধূয়া তুলেছে? এই এংলো-স্যাকসন জাতটা হাড়ে পাজি। ইটালী ও ফ্রান্স তুর্কীর শান্তি সর্তের বিরোধিতা করেছে, পড়েছ বোধহয়। এই সর্ত নাকচ করবার জন্য আমরা—

এককড়িবাবু—যাচ্ছে তাই করব।

মৌলভী সাহেব চক্ষু পাকাইয়া এককড়িবাবুর দিকে চাহিলেন, কি বললেন আপনি?

হরিশঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিলেন, হক, বোম্বের টেলিগ্রাম দেখেছ? খিলাফৎ কমিটি নন-কোঅপারেশন আরম্ভ করবার জন্য ১লা আগষ্ট হরতাল ঘোষণা করেছে। ননকো আন্দোলনের প্রস্তাব কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে আলোচনা করা হবে। কংগ্রেস এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করবার আগেই খিলাফৎ কমিটি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল কেন? Is it not forcing the hands of the Congress (ইহা কি কংগ্রেসকে বাধ্য করিবার জন্য নহে)?

এককড়িবাবু—নিশ্চয় ! নিজেদের অবস্থা সঙ্গীন হচ্ছে দেখে খিলাফৎ আন্দোলনের পাণ্ডারা এই চাল্ চেলেছেন। আরে বাপু, তুর্কীর সুলতান স্বয়ং খলিফা যখন মনে করেন না শান্তি সর্ত মেনে নিলে ইসলাম ধ্বংস হবে তখন ইংরাজের গোলাম এদেশের মুসলমানদের এত তড়পানি কেন ?

মৌলভী সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিলেন, এককড়িবাবু, আপনার পার্ভার্টেড কম্যুন্যাল মেণ্টালিটি নিয়ে মুসলমানের কর্তব্য নির্দেশ করবার চেষ্টা করবেন না। আমাদের প্রিয় খলিফা আজ বেইমান ইংরাজের হাতে বন্দী। খলিফা, তাঁর সাম্রাজ্য ও ইসলামকে রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

এককড়িবাবু—আপনাদের পবিত্র কর্তব্য আপনারা করুন গে। কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন কেন ? তুর্কী গভর্ণমেণ্ট তার অবস্থা বুঝে শান্তি সর্ত মেনে নিয়েছে, কংগ্রেসের এতে বলবার কি আছে ? হিন্দুদের এতে কেন মাথাব্যথা হবে ? তুর্কী লড়াইতে যোগ দিয়ে হেরে গেছে, তার ফল ভোগ করবে না ?

মৌলভী সাহেব দুই চক্ষু বুঁজিয়া উদাত্তস্বরে বলিলেন—The fate of India and Asia hangs on the Khilafat question. Like the Moslems our Hindu brethren must also join the non-co-operation movement started by the Khilafat committee. (ভারত ও এশিয়ার ভাগ্য খিলাফতের সমস্যা সমাধানের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদিগকেও খিলাফত কমিটি যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে যোগ দিতে হইবে।)

বলাই সরকার পরদা সরাইয়া ঘরে ঢুকিল। অভ্যাস মত সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া সে অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিল। তারপর মৌলভী সাহেবের প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া বলিল, মৌলভী সাহেব, আপনি এখানে এদিকে একদল পেশোয়ারী ও মেছো-বাজারী গুণ্ডা আপনার বাড়ী চড়াও করেছে শুনলাম। আপনি না কি সেদিন মার্কাস স্কোয়ারের কাউন্সিল বয়কট সম্বন্ধে বক্তৃতা করে এসে কাউন্সিল ইলেকশনে দাঁড়িয়েছেন, তাই তারা আপনার মাথা কাটবে বলে শাসাচ্ছে।

মৌলভী সাহেব বিচলিত হইয়া বলিলেন, পুলিশ,—পুলিশকে খবর দেয়া হয় নি ?

বলাই বলিল, তা জানিনে, কি হয় বলা যায় না। আপনার বাড়ী যাওয়া আবশ্যক।

মৌলভী সাহেব, তা তো আবশ্যক, কিন্তু যাই কি করে মশাই? একা যাব গুণ্ডাদের মধ্যে? মাথা কাটতে পারে, ঠ্যাং ভেঙ্গে দিতে পারে। ও হরিশঙ্কর, একটা উপায় করো ভাই।

বলাই বলিল, ফণীবাবুরা আপনাকে পৌঁছে দিতে পারে। আমি ডাকছি ফণীবাবুকে, আপনি বলুন।

বলাই সরকার ফণীকে ডাকিয়া আনিল। আসন হইতে উঠিয়া ফণীকে জড়াইয়া ধরিয়া মৌলভী বলিলেন, ফণীবাবু, তোমার দলের ষণ্ডা গুণ্ডা দেখে ক'টিকে আমার সঙ্গে দিয়ে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দাও ভাই, বড় বিপদে পড়েছি। তোমরা এক্স-রিভোল্যুশনারীরা ছাড়া এ উপকারটুকু আর কে করবে?

ফণী সব কথা শুনিয়া বলিল চলুন, এক্স-রিভোল্যুশনারী রিলিফ ফাণ্ডে কিছু দিতে হবে মৌলভী সাহেব।

মৌলভী সাহেব ফণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, দেব, বাড়ী গিয়ে দিয়ে দেব। দেখো, এবার কথার খেলাপ হবে না। পকেটে যে কিছু নেই, নইলে আগাম দিতাম। চল ফণীবাবু, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

হরিশঙ্কর বলিলেন, হক, তোমার সঙ্গে যে অনেক কথা ছিল। অভ্যর্থনা সমিতির তালিকা থেকে তোমার নামটা না হয় বাদ দেয়া যাক।

মৌলভী সাহেব—না, না, এখনই বাদ দিও না। একটু ভাবতে দাও ভাই। না হয় নমিনেশান পেপার ফাইল করব না। একটু ভেবে দেখার সময় দাও। আজ আসি। কই ফণীবাবু, চল চল।

মৌলভী সাহেব চলিয়া গেলেন।

এককড়িবাবু হরিশঙ্করের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গ হাস্যে বলিলেন, খলিফাকে উনি ইংরাজের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

হরিশঙ্কর—একটু কাজ আছে এককড়িবাবু, এবার আমাকে উঠতে হবে।

এককড়িবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, আমার একটু প্রয়োজন ছিল। তেমন কিছু নয়, একটু আর্থিক অনটন, স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য—

হরিশঙ্কর—কাল আসবেন। এসো বলাই!

হরিশঙ্কর বলাইকে লইয়া খাসকামরায় প্রবেশ করিলেন। শূন্য ঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া এককড়িবাবু ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চার

হরিশঙ্করের ইতিহাসের একটি কাহিনীর এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই।

রসা রোডে সি, আর, দাশের গৃহে হরিশঙ্কর যখন সত্যাগ্রহ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন খবরের কাগজে বড় বড হেডিং দিয়া সে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকে জানেন না অতি অল্প সময়েব মধে এই স্বাক্ষর কার্যটি শেষ হইলেও স্বাক্ষর করিবাব প্রস্তুতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে অনেক সময়, উৎসাহ ও বুদ্ধি ব্যয় হইয়াছিল।

এই প্রস্তুতির প্রেরণাদাতা ছিল বলাই সবকাব, আর সেই প্রেবণার বাহিকা ছিল পদ্মিনী সবকাব।

পদ্মিনী বলাইয়ের ভগ্নী। স্ত্রীব শোচনীয় আত্মহত্যাব বছব দুই আগে বলাই পদ্মিনীকে দেশের বাড়ী হইতে আনিয়াছিল। তাহাকে মিশনাবী মেয়ে স্কুলে পড়াইয়া, ওস্তাদ রাখিয়া গান বাজনা শিখাইয়া কলিকাতাব সভ্য সমাজেব উপযুক্ত করিয়া তুলিবাব চেষ্টাব অন্ত ছিল না বলাইয়েব। হাল চাল শিখিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহাকে সঙ্গে করিয়া অভিজাত সমাজে লইয়া যাইত। ভগ্নীর শিক্ষার উন্নতি দেখিয়া তাহাব আশা হইল ভগ্নীকে দিয়া তাহার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইবে। এই সময়ে তাহার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া বসিল। স্ত্রী মরিল, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মিনীকেও মারিয়া রাখিয়া গেল। বলাই লক্ষ্য করিল চালাক চতুর, সপ্রতিভ পদ্মিনী হঠাৎ যেন বোকা বনিয়া গিয়াছে। সে কোথাও যাইতে চাহে না বাড়ীতে থাকিতে তাহার ভাল লাগে না, দেশের বাড়ীতে যাইবার জন্য বায়না করে। বলাইয়েব সন্দেহ হইল তাহার স্ত্রী মরিবাব আগে পদ্মিনীকে হয়ত কোন কথা বলিয়া গিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপারের কতখানি পদ্মিনী শুনিয়াছে জানিবার জন্য বলাই মাঝে মাঝে তাহাকে জেবা করিতে উদ্যত হইত, কিন্তু মৃতা বৌদিদির প্রসঙ্গে পদ্মিনীর মুখে চোখে এখন আতঙ্কের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিত যে বাধ্য হইয়া বলাইকে জেরায় ক্ষান্ত দিতে হইত। অবশেষে বলাই তাহাকে এক মেয়ে বোডিংয়ে পাঠাইয়া দিল। এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের পরে পদ্মিনীকে সে আগেকার গ্রাম্যঅবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্য দেশে পাঠাইতে ইচ্ছুক ছিল না।

নূতন পাড়ায় বাড়ী ভাড়া করিয়া বছর দুই পরে বলাই পদ্মিনীকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিল। এই দুই বছরে পদ্মিনীর পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সে বিস্মিত রইল। মেয়ে বোর্ডিং যে লাজুক, অনভিজ্ঞ মেয়েদের স্বভাব সংশোধনের ও অভিজ্ঞতা অর্জনের এমন উত্তম স্থান সে আগে জানিত না। সর্ব বিষয়ে ভগ্নীর উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সে সন্তুষ্ট হইল।

ইহার কিছুদিন আগে হরিশঙ্করের সঙ্গে বলাইয়ের আলাপ ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে বলাই যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাহার প্রধান কর্তাকে সরাইয়া নিজে তাঁহার পদ অধিকার করিয়াছিল আগে বলা হইয়াছে। যৌথ মূলধনের দ্বারা পরিচালিত বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মোটা টাকার শেয়ার কিনিয়া প্রভূত বিত্তের মালিক হইয়াছিল সে। বহু গণ্যমান্য বড়লোকের বাড়ীঘর, সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিয়া তাঁহাদের সে মুঠার মধ্যে আনিয়াছিল। তাহার মনে ক্ষোভ ছিল এত করিয়াও সে রাজদ্বারে সম্মানলাভ করিতে পারে নাই, দেশনেতার উচ্চপদ লাভ করিতে পারে নাই। কাহাকে আশ্রয় বা ব্যবহার করিয়া এই দিকে তাহার উচ্চাশা সফল হইতে পারে ভাবিতে ভাবিতে হরিশঙ্করের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। বনেদী ঘরাণায়, ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠায়, চেহারায়, বাগ্মিতায় সে প্রথম শ্রেণীর নেতা হইবার যোগ্য-ব্যক্তি। কিন্তু ভদ্রলোকের উচ্চাশা নাই। অগাধ টাকা রোজগার করিয়া, লোক খাওয়াইয়া, প্রবঞ্চক সাহায্যপ্রার্থীদের নির্বিচারে সাহায্য করিয়া, মদে ও মেয়ে মানুষে টাকা উড়াইয়া সে সন্তুষ্ট। বলাই ভাবিল হরিশঙ্করের কাঁধে চড়িয়া তাহাকে ঠিক পথে চালাইতে পারিলে একদিন তাহাকে ডিঙাইয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারা যাইতে পারে। কিন্তু লোকটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ও প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন; এখনও সে বলাইকে বাজার সরকারের চাইতে উচ্চস্তর শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করে না।

অনেক চিন্তা করিয়া বলাই স্থির করিল এই লোকটির দুর্বলতার রন্ধ্র পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হাতের মধ্যে আনিতে হইবে। যে বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া সে বাজার সরকার হইতে এতখানি উচ্চে উঠিয়াছে সেই বিদ্যা হরিশঙ্করের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে হইবে। মদ খাইয়া বেহেড হইবার মানুষ নয় হরিশঙ্কর, মদের পিপার মধ্যে বসিয়া সে মোকদ্দমার ব্রীফ পড়ে, তাহাকে বেহেড করিবার অস্ত্র মেয়ে মানুষ। কিন্তু এই মেয়ে মানুষ তাহার নিজের হাতের অস্ত্র না হইলে

হরিশঙ্করকে বশীভূত করিয়া স্বার্থ সাধনে ব্যবহার করিবে কি উপায়ে? হঠাৎ তাহার মৃতা স্ত্রীর কথা মনে পড়িতে ক্ষণকালের জন্য বলাই যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখনই প্রবল চেষ্টায় সে এই বিহ্বল ভাব ঝাড়িয়া ফেলিল।

হরিশঙ্করের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে বলাই মাঝে মাঝে তাঁহার নৈশ অভিযানের পথপ্রদর্শক হইত। এক নৈশ অভিযানের কালে বলাই হরিশঙ্করকে নিজের গৃহে লইয়া আসিল। বলিল—আপনি একটু বসুন, একটা জরুরী কাজের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, কাজটা সেরে আপনাকে নিয়ে বেরুব।

বলাইয়ের শিক্ষামত পদ্মিনী আসিয়া হরিশঙ্করকে অভ্যর্থনা করিল। হরিশঙ্কর কিছু খাইবেন না জানা থাকলেও খাবার সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল, দুই খানা গান শুনাইল তাঁহাকে।

বলাই যখন কাজ সারিয়া হরিশঙ্করকে লইয়া গাড়ীতে উঠিবে হরিশঙ্কর তখন পদ্মিনীকে বলিলেন—তুমি চমৎকার গাইতে পারো তো। কাল আমার বাড়ীতে যেও, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবে। যাবে তো?

পদ্মিনী এত বড় ব্যারিষ্টারের গৃহে যাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া মহা খুশী হইল। সলজ্জভাবে মাথা নাড়াইয়া জানাইল সে যাইবে।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তরঙ্গ এতদিন বাংলাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। পাঞ্জাবের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ পাইলে বাঁধ ভাঙিয়া সে তরঙ্গ বাংলায় প্রবেশ করিয়া বিক্ষোভ উপস্থিত করিল। বড়লাটের নিকট রবীন্দ্রনাথের পত্র ঘরে ঘরে সাগ্রহে পঠিত হইল। সি. আর. দাশ সত্যাগ্রহ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

হোমরুলার রূপে রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা দিলেও হরিশঙ্কর জাতিতে ছিলেন লিবারেল। ব্রিটিশ রাজত্বের স্থায়িত্বে, ব্রিটিশ জাতির আন্তরিক সততায় তিনি বিশ্বাস করিতেন। আরও বিশ্বাস করিতেন যে ভারতবাসী এখন পূর্ণ স্বরাজ পাইবার অনুপযুক্ত। লিবারেল দলের মত রিফর্মস গ্রহণ করিবার পক্ষে ছিলেন তিনি। কিন্তু দেশে বিপরীত হাওয়া বহিতে দেখিয়া তিনি সতর্ক হইয়া বক্তৃতা দিতেন। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি উহা অবাস্তব বলিয়া সমালোচনা করিলেন। তাঁহার অনুগ্রহভাজন এককড়ি বাবু নিজের কাগজে গান্ধীজীকে ও তাঁহার আন্দোলনকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া লিখিতেন। উহাতে সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া তিনি বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি কয়েকটি

প্রদেশের বিরুদ্ধভাবের পুরাতন কথা তুলিয়া বাঙালীর প্রাদেশিকতাবোধকে উসকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হরিশঙ্কর এককড়ি বাবুর বুদ্ধির তারিফ করিয়া তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন,—"১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতার, এখন মিঃ গান্ধী অবতাররূপে দেখা দিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই রাজনৈতিক সন্ন্যাসী এবং উভয়েই স্পিরিচুয়ালিজমের জন্য সুপরিচিত। মিঃ ঘোষের মত মিঃ গান্ধীরও অনুচরের সংখ্যা বিস্তর। মিঃ গান্ধীর আন্দোলন অবাস্তব, এই আন্দোলন ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

মিঃ অরবিন্দ ঘোষ এখনও ভারতবর্ষের অন্যতম রাজনৈতিক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রূপে সম্মানিত হন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষ এখন রাজনৈতিক উন্নতির যে স্তরে অবস্থিত তাহাতে আংশিক স্বরাজ লইয়া তাহার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।"

এই বক্তৃতা দিবার কয়েক দিন পরে চিত্তরঞ্জন দাশের গৃহে তাঁহার ডাক পড়িল। দাশ সাহেবের সত্যাগ্রহ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। হরিশঙ্কর অনুমান করিলেন দাশ সাহেব তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করিবেন। স্বাক্ষর করিবার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক-গুলি মনে মনে সাজাইয়া লইয়া তিনি সন্ধ্যার পরে বলাইয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বলাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য হরিশঙ্কর এখন প্রায়ই তাহার গৃহে আসেন।

বলাই বাড়ী ছিল না। পদ্মিনী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

অন্য দুই চারিটা কথার পর হরিশঙ্কর বলিলেন—তুমি আমার বাড়ীতে যাও না কেন? আমার বাড়ীতে অনেক লোকজন আসে। তাদের ফেলে রেখে আমাকে ছুটে আসতে হয় এখানে।

পদ্মিনী তাঁহার দিকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে চাহিয়া মুচকিয়া হাসিয়া বলিল—কেন ছুটে আসেন?

হরিশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দেবার চেষ্টা করব কি? উত্তর শুনে ঘর থেকে পালাবে না তো?

পদ্মিনী বলিল, পালিয়ে যাব কোথায়?

হরিশঙ্কর কি বলিতে যাইতেছিলেন, বলাই ঘরে ঢুকিল। বলিল, আজ আপনার দাশ সাহেবের বাড়ীতে যাবার কথা ছিল না?

হরিশঙ্কর—কাল যাব খবর দিয়েছি। তবে সত্যি বলতে কি যাবার বিশেষ ইচ্ছা নাই।

বলাই বলিল, না, না, নিশ্চয় যাবেন। পদ্মিনী আমাকে বলছিল দাশ সাহেব সত্যাগ্রহী হয়েছেন, উনি কেন এখনও প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করেন নি? নূতন আন্দোলনে যোগ দিলে ওঁর খ্যাতি কত বেড়ে যাবে দেখো। আমি গিয়ে ওঁকে অনুরোধ করব, আমার কথা উনি ফেলতে পারবেন না!

হরিশঙ্কর পদ্মিনী দিকে চহিয়া বলিলেন, তুমি বলেছ এ কথা পদ্মিনী?

পদ্মিনী কোন কথাই বলে নাই। দাদার দিকে চাহিয়া তাহার চোখের ইসারা বুঝিয়া সে সলজ্জহাস্যে বলিল, বলেছি।

একটু থামিয়া দ্বিধার সঙ্গে সে বলিল, দাদা বলছিলেন গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ না দিলে দেশের লোক কাউকে আর নেতা বলে মানবে না।

বলাই ভগ্নীর উপস্থিতবুদ্ধিতে চমৎকৃত হইল। এ কথা সে তাহাকে বলিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। হয়ত বলিয়াছে, মনে নাই।

হরিশঙ্কর চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন। বলাই তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় ভগ্নীর দিকে একবার ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

হরিশঙ্কর চিন্তা করিতেছিলেন মিঃ গান্ধীর আন্দোলন অতিশয় বিপজ্জনক আন্দোলন। উগ্র খিলাফাৎওয়ালারা ইহাতে যোগ দিয়া একটা সংঘর্ষ বাধাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

একদিকে ব্যক্তিগত স্বার্থহানির সম্ভাবনা, অন্যদিকে নেতৃত্বের সম্মান ও প্রভাব হারাইবার সম্ভাবনা।

পদ্মিনী হরিশঙ্করের চেয়ারের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অতি সন্তর্পণে পিছন হইতে তাঁহার কাঁধ স্পর্শ করিয়া বলিল, এত কি ভাবছেন? দাশ সাহেবের বাড়ী গিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করে আসুন।

হরিশঙ্কর সজাগ হইয়া পিছনে হাত বাড়াইলেন পদ্মিনীকে ধরিবার জন্য, পদ্মিনী চট করিয়া সরিয়া গেল।

হরিশঙ্কর বলিলেন, তুমি খুশী হও সহি করলে?

পদ্মিনী—খুব খুশী হই। আপনি বড় নেতা হন, সকলে ধন্য ধন্য করুক, আমরা তাই চাই।

বলাই ফিরিয়া আসিল। হরিশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া অবস্থা বুঝিয়া সে বলিল—আপনার নেতৃত্ব হতে দেশের লোককে বঞ্চিত করবার অধিকার নাই আপনার। সবাই আপনাকে চাইছে। আমি এখুনি যাচ্ছি দাশ সাহেবের বাড়ীতে খবর দিতে। কাগজের অফিসেও খবরটা পাঠাতে হবে।

হরিশঙ্করের দৃষ্টি পদ্মিনীর প্রতি আবদ্ধ ছিল। সে হাসিতেছিল। সাফল্যের হাসি। হরিশঙ্কর ভাবিলেন পদ্মিনী হাসিতে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছে। বলাই দাশ সাহেবের গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, হরিশঙ্কর তাহাকে নিষেধ করিলেন না।

পরদিন দাশ সাহেবের গৃহে গিয়া হরিশঙ্কর প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা স্পেশাল কংগ্রেস হইয়া গেল। হরিশঙ্করের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলাই কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হইল।

নাগপুর কংগ্রেসের চারদিন আগে বলাই ও ফণীর দলের কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া হরিশঙ্কর নাগপুর যাত্রা করিলেন। ষ্টেশনের প্লাটফরমে পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রী ও মৌলভী নুরুল হকের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহারাও নাগপুর চলিয়াছেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে হরিশঙ্কর ভাবিলেন পদ্মিনীকে সঙ্গে আনিলে হইত, কয়েকটা দিন তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। কথাটা এত বিলম্বে মনে হইবার জন্য তিনি আপনাকে অভিসম্পাত করিলেন।

নাগপুরে অধিবেশন চলিতেছে, কলিকাতায় আন্দোলনের সমর্থক ও বিরোধী-দলের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হইল কাগজে।

পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রীর কাগজ লিখিল, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতি মুসলমান সমাজে অভূতপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার করিয়াছে, হিন্দুরা মুসলমান ভ্রাতাদের সঙ্গে সমান তালে চলিতে পারিতেছেন না। এককড়ি বাবুর কাগজ লিখিল, কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও খিলাফৎ কমিটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, কংগ্রেসের পৃথক অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। আরও লিখিল, অসহযোগ নীতি একটা ধাপ্পা। বাংলা গান্ধীর আদেশ মানিতে ইচ্ছুক নহে। অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের এখনও বাংলার ভাষা ও চিন্তাধারা বুঝিবার ক্ষমতা জন্মায় নাই। আমরা অরবিন্দের মত নেতা চাই।

নিমাই শাস্ত্রীর কাগজ লিখিল, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতি জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাইয়াছে, ঐক্যের প্রেরণা আনিয়াছে। এককড়ি-বাবুর কাগজ লিখিল, অসহযোগ নীতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়িয়াছে, মজুর শ্রেণী উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। অসহযোগ ও বোলশেভিক নীতির মধ্যে প্রভেদ সামান্য। দেশের ইতর সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া গান্ধী দেশে বোলশেভিজম আনিতেছেন। গভর্ণমেণ্টের ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সতর্ক হওয়া কর্তব্য।

দুই দলের লড়াই যখন জমিয়া উঠিতেছিল নাগপুর কংগ্রেসে তখন লাঠালাঠি হইতেছিল।

প্রথম দিনেই বাংলার দল ও অসহযোগীদের দলে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপার লইয়া লাঠালাঠি হইল। কংগ্রেসের লক্ষ্য পবিবর্তন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া গান্ধীজী ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদেব কথা বলিলেন। মি জিন্না বলিলেন রক্তপাত ভিন্ন ভাবত-বর্ষের স্বাধীনতা আসিবে না এবং দেশবাসীর অভিযোগের প্রতিকার না হইলে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছেদন করিবার নোটিশ দিবার প্রস্তাব করিলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইলে লোকে জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিল কোন দলের জয় হইল? কেহ কেহ উত্তর দিল বেঙ্গল ক্যাম্পেব একস-রিভোল্যুশনাবীদেব লাঠিব জোরে আংশিক অসহযোগীদের জয় হইয়াছে গান্ধীজীকে আপোষ করিতে হইয়াছে।

এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভের অর্থ লইয়া বিতর্ক আরম্ভ হইল।

নিমাই শাস্ত্রী নাগপুব হইতে ফিরিয়া ছাত্রদিগকে স্কুল কলেজ ছাড়িতে আহ্বান করিয়া সভা করিতে লাগিলেন। কিছু কিছু ছাত্র স্কুল কলেজ হইতে বাহিব হইয়া আসিতে লাগিল।

হবিশঙ্কর বড় একটা মোকদ্দমা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে বলাইয়ের বাড়ীতে আসিয়া পদ্মিনীকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বেড়াইতে যাইতেন। ঘন্টা দুই পবে নামাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন। কোন কোন দিন বলাই বাড়ীতে না থাকিলে তাহার বাড়ীতে সময়টা কাটাইয়া চলিয়া যাইতেন। একদিন পদ্মিনী বেড়াইয়া ফিরিবার আগেই বলাই বাড়ীতে ফিরিল। সে লক্ষ্য করিল, ভগ্নীর পরিধানে মূল্যবান শাড়ি, আঙ্গুলে বহু-

মূল্যের হীরার আংটি, গলায় বেলফুলের গোড়ে। তখন সে কিছু বলিল না।

আহারে বসিয়া পদ্মিনী বিশেষ কিছু খাইল না। বলিল, খিদে নাই।

বলাই বলিল, আজ কোথায় গিয়েছিলি?

পদ্মিনী তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। একটু পরে বলিল, কালীঘাট।

শুনিয়া বলাই বিস্মিত হইল। ভগ্নীর নূতন সাজসজ্জা দেখিয়া তাহার কি একটা সন্দেহ হইয়াছিল। হরিশঙ্কর তাহাকে কালীঘাটে লইয়া গিয়াছিলেন শুনিয়া সেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। হরিশঙ্কর কি কোন প্রকার বিবাহের অভিনয় শেষ করিয়া রাখিলেন? সে ভগ্নীকে আর কোন প্রশ্ন করিল না।

একটু পরে সে বলিল, ব্যারিষ্টার সাহেব মোকদ্দমার মধ্যে ডুবে রয়েছেন, এদিকে স্কুল কলেজে ষ্ট্রাইক আরম্ভ হয়েছে। তারা দাশ সাহেবের বাড়ীতে গিয়েছিল তাঁকে প্র্যাকটিস ছাড়বার জন্য অনুরোধ করতে। আমার মনে হয় [illegible] শাস্ত্রী শিখিয়ে দিয়েছিলেন। শুনছি ব্যারিষ্টার সাহেবের কাছেও তারা যাবে।

পদ্মিনী একটু ভাবিয়া বলিল, প্র্যাকটিস ছাড়লে চলবে কি করে?

বলাই হাসিয়া বলিল ত্যাগ স্বীকার না করলে আজকাল কি লীডর হওয়া যায়? আগের আমলের সুখের লীডরগিরির দিন এখন আর নেই। তোকে বলতে হবে ব্যারিষ্টার সাহেবকে প্র্যাকটিস ছেড়ে দিন।

পদ্মিনী বলিল, তুমি তোমার অফিস ছাড়বে?

বলাই আমি ছাড়ব কেন? আমি কি লীডর?

পদ্মিনী—লীডর হতে চাও তো?

বলাই—চাই, তবে এখনকার ডামাডোলের বাজারে নয়। সে সব কথা যাক। কাল তোকে বলতে হবে ব্যারিষ্টার সাহেবকে।

পদ্মিনী শুধু বলিল, আচ্ছা।

পরদিন ফণী আসিল বলাইয়ের বাড়ীতে। বলিল—বলাইবাবু কিছু টাকা চাই, ভয়ানক দরকার।

বলাই বলিল—আমি তোমাকে খুঁজছিলাম দরকারী কথা আছে।

ফণী বলাইয়ের মুখের দিকে চাহি বলিল - এককড়িবাবুর মাথা ফাটাতে

হবে? না নূতন লেডী টাইপিষ্টের খোঁজ চাই? অফিসে বড় কানাঘুষা চলছে মশাই।

বলাইয়ের মুখ কঠিন হইল। সে বলিল—কানাঘুষা চলছে? কারা কানাঘুষা চালাচ্ছে নাম বল তো। সব ক'টাকে সিধে করছি।

ফণী হাসিয়া বলিল—সরী, আমি ব্যাকবাইটার নই। দরকারী কথাটা কি বলুন শুনি।

বলাইয়ের মুখের চেহারা আবার সহজ হইল। সে বলিল—বলছি। যারা স্কুল কলেজ ছেড়েছে এমন কতকগুলো ড্যাফো ছেলেকে ব্যারিষ্টার সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দাও প্র্যাকটিস ছাড়বার জন্য চাপ দিতে। আর স্কুল কলেজে পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফণী বলিল—একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ছেলেরা স্কুল কলেজ ছেড়ে রাস্তায় হৈ হৈ করবে, তাদের খাওয়াবে কে?

বলাই—যারা বরাবর খাওয়ায় সেই অভিভাবকরা খাওয়াবে, দেশের সবাইকে কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বৈকি।

ফণী ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—ত্যাগ স্বীকার? বেশ, আপনি কিছু অর্থ ত্যাগ করুন, তারপর দেখছি কি করা যায়।

ফণী টাকা লইয়া উঠিল। বাহিরে যাইবার সময়ে সে দেখিল পাশের ঘরের জানালার পরদা সরাইয়া একটি মেয়ে তাহাকে দেখিতেছে। চোখাচোখি হইতে মেয়েটি সরিয়া গেল। ফণী নিজের মনে বলিল—বাব্বা, ঘরেও লেডি টাইপিষ্ট মজুদ দেখছি।

বলাই সরকার অফিসে যাইবার জন্য বাহির হইবে এমন সময় এককড়ি বাবু আসিলেন। বলিলেন—আপনি বেরুচ্ছেন দেখছি। আমার আসতে দেরি হয়ে গেল একটু, পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রী এসেছিলেন। "মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে লেখা আপনাকে ছাড়তে হবে"—বলে আমার হাত জড়িয়ে ধরে কান্না। সে যে কি বিপদ মশাই কি বলব? বললেন ছেলেরা বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আপনার বিরুদ্ধে, অহিংসার উপদেশ দিয়ে তাদের শান্ত রেখেছি। আপনি এ পথ ছাড়ুন, নইলে তাদের ঠেকানো যাবে না। কোন মতে তাঁকে বিদায় দিতে না দিতে বালার্চাঁদ পটপটিয়া আসল। তারও ঐ এক কথা। মহাত্মাজী শ্রীশ্রীরামজীর আওতার, সাক্ষাৎ দেওতা। তাঁকে আমি গালাগালি করছি দেখে

তাঁর বুক ভেঙ্গে গেইল। এই বুরা কাম ছাড়তে হবে। আমি বললাম, বালাচাঁদজী, আমার কথায় তোমার বুক ফাটছে, বড় বাজারে যখন পিকেটিং সুরু হবে তোমার কলিজা যে ভেঙ্গে চৌচিক হো জায় গা। তখন কি করে গা ?

বলাই বলিল – আসুন, গাড়ীতে উঠুন। যেতে যেতে কেন আপনাকে ডেকেছি বলব।

গাড়ী চলিতে লাগিল। বলাই বলিল—আপনার লেখার ধরণ বদলাতে হবে এককড়ি বাবু, খেসারৎ পাবেন। সকল প্রদেশ যখন গান্ধীজীর জয়গান করছে বাংলায় আপনার কাগজের মত কয়েকখানা কাগজ তাঁকে লক্ষ্য করে কাদা ছুড়ছে। এতে বাংলার সম্মানের হানি হচ্ছে।

অনেক যুক্তি তর্ক দিয়া এককড়ি বাবুর মত ফিরাইতে না পারিয়া বলাই বলিল, আপনি কুৎসাপূর্ণ লেখা বন্ধ না করলে অহিংস অসহযোগী ছেলেরা কিছু না বললেও ফণী সিংহের দল আপনাকে ছাড়বে না। ভেবে দেখুন।

এককড়ি বাবু বলিলেন- আমার পেট চলবে কি করে মশাই? বড়লোকদের গালাগালি করে আমি পেট চালাই, ঐ আমার পেশা। তবে আপনারা যদি একটু সদয় হয়ে ব্যবস্থা করেন গান্ধীজীকে আমি দেওতা বানিয়ে দেব, গালাগালি করবার জন্য দুসরা লোক খুঁজে বের করব।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পরে পকেটে কয়েকখানি নোট পুরিয়া এককড়ি বাবু বলাই সরকারের অফিসের ফটকের কাছে নামিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন।

কয়েকদিন পরে এককড়ি বাবুর কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হইল "দেশের সেবায় অতুলনীয় আত্মত্যাগ !"

"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার হরিশঙ্কর দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া হাইকোর্টে তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ করিতেছেন। তাঁহার এই অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগে বাংলা মায়ের মুখোজ্জ্বল হইল। তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা বাংলা দেশকে প্লাবিত করিবে।"

সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে হরিশঙ্করের গৃহে লোকের ভিড় আরম্ভ হইল। ছাত্রের দল বাড়ী ভরিয়া ফেলিল। তাহাদের জয় ধ্বনিতে পাড়া মুখরিত হইল। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হরিশঙ্করকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য

আসিতে লাগিলেন। ছাত্রদের ভিড ঠেলিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন। পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রী আসিলে ছাত্রের দল জয়ধ্বনি করিতে করতে তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া ভিতরে লইয়া গেল। ভিড়ের চাপে কাঁধ হইতে চাদরখানি কোথায় পড়িয়া গেল।

বাহিরে যখন এই কাণ্ড চলিতেছে ভিতরে দোতলার ড্রইংরুমের দরজার বাহিরে ফণী ও বলাই দাঁড়াইয়া, সরলা দেবী একখানি কৌচে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বলাই ও ফণী মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে সরলা দেবী বলাইকে ডাকিলেন। সে ভিতরে আসিতে তিনি বলিলেন, উনি আপানাকে বড্ড বকেছেন বলাই বাবু, রাগের মাথায় যা তা বলেছেন, কিছু মনে করবেন না। ওঁর বিশ্বাস কাগজে এই মিথ্যা খবর বের হবার পেছনে আপনার হাত আছে। আপনি অস্বীকার করলেও উনি আপনার কথা বিশ্বাস করছেন না।

বলাই বলিল, আমি যথার্থ বলছি—

সরলাদেবী বাধা দিয়া বলিলেন—অনিষ্ট যা হবার হয়েছে এখন আর বলাবলিতে কি ফল হবে? একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে: প্র্যাকটিশ বন্ধ করলে ওঁর চলবে কি করে? আমাদের সংসারের খরচ কত জানেন? জমানো টাকায় আর কদিন চলবে?

বলাই বলিল, যে মহৎ কাজে উনি নামছেন—

সরলাদেবী—ওসব কথা সভা সমিতির জন্য, বাড়ীর গৃহিণীর জন্য নয়।

বলাই একটু অপ্রতিভ হইল। তখুনি সে ভাব চাপা দিয়া বলিল, যদি ভরসা দেন তবে এইটুকু বলতে পারি যতদিন আমরা আছি ওঁর চলে যাবে, ঠেকবে না।

সরলা দেবী একটু বিষণ্ণভাবে হাসিলেন। বলিলেন, ফণী, উনি বাইরে গেলেন কোথায়? দেখা করবার জন্য অনেকে আসছেন।

ফণী বলিল, সে ব্যবস্থা আমি করেছি। অফিস কামরায় লোক বসে আছে। বড় বড় লোক এলে বসিয়ে বলা হচ্ছে সাহেব জরুরী কাজে একটু বাইরে গেছেন, এখুনি ফিরবেন। শুনে অনেকেই আবার আসবেন বলে চলে যাচ্ছেন।

নীচে হইতে ফণীকে কে ডাকিল। বলিল দাশ সাহেবের বাড়ী হইতে লোক আসিয়াছে চিঠি লইয়া। ফণী ও বলাই নীচে নামিয়া গেল।

ফণী বলিল, সাহেব গেলেন কোথায় জানেন বলাই বাবু? আপনার ওপর বাস্তবিক ভয়ানক রেগে গেছেন।

বলাই কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর মুখে ভিড ঠেলিয়া ফটকের দিকে চলিল। তাহার কানে আসিল ভিড়ের মধ্যে কে বলিতেছে—লর্ড রোনাল্ডশে তাঁর বক্তৃতায় বাঙালী উকিল ব্যারিষ্টারদের বলেছেন মিঃ গান্ধীর বিরুদ্ধে তোমাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করা উচিত। এবার মুখের মত জবাব পেলেন।

রাস্তায় আসিয়া বলাইয়ের মুখ প্রসন্ন হইল। নিজের মনে সে বলিল, প্রথম চাল সফল হয়েছে। ব্যারিষ্টার সাহেবকে এবার বাধ্য হয়ে ননকো আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। মহাত্মা গান্ধীকে টেলিগ্রাম করে খবরটা জানিয়ে রাখতে হবে।

বলাই বাড়ী ফিরিতে পদ্মিনী বলিল, তোমার সঙ্গে ব্যারিষ্টার সাহেবের দেখা হয়নি রাস্তায়? উনি এই গেলেন।

বলাই কোথায় গেলেন?

পদ্মিনী বললেন দাশ সাহেবের বাড়ী যাবেন।

এককড়ি বাবুর কাগজ দিনের পর দিন ছাত্রসমাজকে সম্বোধন করিয়া লিখিতে লাগিল—বাংলার ছাত্রদল, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ কাটাইয়া অগ্রসর হও। বিশ্ববিদ্যালয় আজ গোলামখানায় পরিণত হইয়াছে। চাকুরির খাতিরে অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ তোমাদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহাদের স্তোকবাক্যে ভুলিও না। আত্মত্যাগী নেতাদের অনুসরণ করিয়া জয়যাত্রায় অগ্রসর হও।

অন্য একখানি কাগজ লিখিল, স্কুল কলেজের ছেলেদের কি হইয়াছে? এতদিন অসহযোগী নেতাদিগের বড় বড় বক্তৃতায় তাহারা কর্ণপাত করে নাই, আজ হঠাৎ কেন তাহারা দল বাঁধিয়া স্কুল কলেজ ছাড়িতেছে? ট্যাক্সিওয়ালারা ধর্মঘট করিয়াছে। প্রাইভেট গাড়ীর সোফারেরা ধর্মঘট করিতে উদ্যত, মহিষের ও গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা সভা করিতেছে ও মহাত্মা গান্ধী কি জয় বলিয়া চিৎকার করিতেছে। ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যান, রিক্সওয়ালারা ও ট্রামের কর্মচারীরা ধর্মঘট করিবার কথা বলিতেছে। দেশ কোন পথে যাইতেছে?

দিনকয়েক পরে সি, আর, দাশের প্র্যাকটিস বন্ধ করিবার সংবাদ প্রকাশিত হইলে কলিকাতায় ও বাংলা দেশে উত্তেজনার সীমা রহিল না। বঙ্গবাসী ও রিপণ কলেজের সকল ছেলে, সিটি ও মেট্রোপলিটনের অধিকাংশ ছেলে, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের পাঁচশত ছেলে ধর্মঘট করিল।

ছাত্র ধর্মঘটের সমালোচনা করিয়া একখানি কাগজ লিখিল—The students are being fooled with the story that if they give up their studies they will obtain swaraj in less than 1 year. (ছাত্রদিগকে এই বাজে আশ্বাস দেওয়া হইতেছে যে তাহারা পড়াশোনা বন্ধ করিলে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ পাওয়া যাইবে।)

ছাত্রদের তখন এই সমালোচনায় কর্ণপাত করিবার মত অবস্থা নয়।

কয়েকদিন পরে ডিউক অব কনোটের আগমন উপলক্ষে হরতাল ঘোষিত হইল।

পাঁচ

রাজনগর (১৯২০-২১)

অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ধীরে ধীরে দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ষোল বছর আগেকার স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউয়ের মত নূতন আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পুরাতন রাজনগরের প্রান্তে আঘাত করিল। স্বদেশী আন্দোলনের যাহারা কর্মী ছিল তাহাদের পিছনে রাখিয়া নূতন কর্মীদল আগাইয়া আসিল।

দেবানন্দ ও ইন্দ্রের মধ্যে আলোচনা হইতেছিল। আলোচনার বিষয় কলিকাতা হইতে লিখিত উমানন্দের পত্র।

উমানন্দ লিখিয়াছে, তাহাদের কলেজের সব ছেলে কলেজ ছাড়িয়াছে। দুই চার জন যাহারা অভিভাবকের ভয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিল, খুব সকালে আসিয়া লুকাইয়া কলেজে ঢুকিয়া ক্লাসে বসিয়া থাকিত, জোর পিকেটিংয়ের ফলে তাহাদেরও কলেজে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। অধ্যাপকরা রেজিষ্টার বগলে করিয়া ছাত্রশূন্য ক্লাসে ঢুকেন, কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া যান। হোষ্টেল, বোর্ডিং হইতে অনেক ছাত্র চলিয়া যাইতেছে। অনেকে যাইতেছে গ্রামে অসহযোগের নীতি প্রচার করিবার জন্য। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটি করিয়া এই সব গ্রাম্য কমিটির সাহায্যে অসহযোগের আদর্শ প্রচার করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী আদেশ দিয়াছেন। অভিভাবকরা টাকা পাঠানো বন্ধ করিয়া দেওয়াতে কোন কোন ছাত্রকে বাধ্য হইয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে। সে নিজে কলিকাতায় কাজ করিবে না নিজের গ্রামে কাজ করিবে এখনও স্থির করিতে পারে নাই। শীঘ্রই স্থির করিয়া ফেলিবে।

ইন্দ্র বলিল, একটা কথা আমি ক'দিন ভাবছি দেবুদা, জানিনে তোমার মতের সঙ্গে মিলবে কিনা। প্রথমে ভেবেছিলাম অহিংস অসহযোগ কি বস্তু বুঝেছি, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত জিনিসটার অর্থ হেঁয়ালি হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের চাইতে মহাত্মা গান্ধী ক্রমে বড় হয়ে উঠছেন। যেটাকে রাজনৈতিক আন্দোলন বলে ভেবেছিলাম সেটার রাজনৈতিক রূপ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

দেবানন্দ—তোর কথার অর্থ আমি ভাল করে বুঝলাম না, একটু বিস্তারিত করে বল।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—বেশ, বিস্তারিত করেই বলছি। যখন বলা হয় Non-cooperation is a peaceful means of averting revolution (অসহযোগ বিপ্লব পরিহার করিবার শান্তিপূর্ণ উপায়) তখন আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা যায়। কিন্তু যখন বলা হয় non-cooperation is a spiritual struggle (অসহযোগ আত্মিক সংগ্রাম), non-cooperation means a process of self-purification and not paralysis of Government, non-cooperation is a development of soul force (অসহযোগ আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া সরকারকে অচল করিবার উপায় নয়, অসহযোগ আত্মিক শক্তির বিকাশ) তখন খটকা লাগে। মনে হয় নেতারা কোন পথে আমাদের নিয়ে যেতে চান, হয় আমাদের কাছে লুকিয়ে রাখতে চান নয়তো আন্দোলনের লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরাই নিঃসংশয় নন।

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া দেবনান্দ মৃদু হাসিতে লাগিল। ইন্দ্র বলিল, হাসছ কেন?

দেবানন্দ—হাসছি তার কারণ আছে। সব কথা নাই বা বললাম। একটা জিনিস তুই লক্ষ্য করেছিস কিনা জানিনে। তুই বললি অসহযোগের প্রকৃত অর্থ হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু লক্ষ্য করেছিস কি masses বা যাদের আমরা জনসাধারণ বলি তারা অসহযোগের একটা অর্থ বুঝে নিয়েছে, তাদের ভেতরে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠছে। গুঞ্জন সংগীতে পরিণত হবে না গর্জনে পরিণত হবে অনুমান করতে পারিস?

ইন্দ্র—তুমি যা বলতে চাইছ আমি বুঝেছি কিন্তু আসল ব্যাপারটা এখনও বোধগম্য হয়নি। অসহযোগ প্রোগ্রামের যে অংশকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা হচ্ছে, খেতাব বর্জন, কাউন্সিল বর্জন, আইন আদালত বর্জন, স্কুল কলেজ বর্জন, সে অংশ তো সম্পূর্ণরূপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পর্কিত ব্যাপার। বিদেশী বস্ত্র বর্জন, তাঁত ও চরকা নিয়ে আমরা অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করেছি, জনসাধারণ এই সব আইটেম আগ্রহ করে গ্রহণ করেনি কোনদিন, এখনও করবে কিনা সন্দেহ আছে। অথচ অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে একটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে।

দেবানন্দ - একটু আগে তুই বলছিলি মহাত্মা গান্ধী তাঁর আন্দোলনের

চাইতে বড় হয়ে উঠেছেন। অসহযোগের প্রোগ্রামের মধ্যে জনসাধারণের স্থান যদি না থাকে তাহলে কি বুঝতে হবে মহাত্মা গান্ধীর ব্যাক্তিত্বকে আশ্রয় করে তারা জেগে উঠতে চাইছে? এই কথাই কি বলছিলি?

ইন্দ্র—মহাত্মা গান্ধীর ব্যাক্তিত্ব নয়, তাঁর নাম আশ্রয় করে। তাঁর ব্যক্তিত্ব 'মাস' বুঝে নিয়েছে এতখানি বিশ্বাস আমার 'মাসের' ওপর নাই।

দেবানন্দ কি বলিতে যাইতেছিল যোগেন্দ্রকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে থামিয়া গেল।

যোগেন্দ্র রাজনগরে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা। সে জুতা ছাড়িয়াছে, বাহুল্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। আগে সে স্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকিত, বোর্ডিং ছাড়িয়া ইন্দ্রের পুরাতন সেবাশ্রমের বাড়ীর সীমানার মধ্যে একখানি কুটিরে সে আশ্রয় লইয়াছে। প্রত্যুষে উঠিয়া নিয়মিত চরকা কাটে স্বপাক খায়। স্কুলের কাজের ফাঁকে সভাসমিতি করে নিম্নশ্রেণীর উৎসাহী ছেলেদের লইয়া, অসহযোগের আদর্শ ব্যাখ্যা করে তাহাদের কাছে। তাহার আগেকার কথাবার্তা, চালচলনের এত পরিবর্তন হইয়াছে যে তাহাকে দেখিয়া মনে হয় নূতন এক সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত লইয়াছে সে।

ইন্দ্র ও দেবানন্দ যোগেন্দ্রের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে এ সম্বন্ধে আলাপও হইয়াছে। স্বদেশী যুগের এই দুই কর্মী নূতন আন্দোলনকে বুদ্ধি দিয়া বিচার করিতে চাহিয়াছে, যোগেন্দ্র তাহা চায় নাই। ডাক আসিবামাত্র সে সাড়া দিয়াছে যেমন তাহারা ষোল বছর আগে স্বদেশী আন্দোলনে সাড়া দিয়াছিল। হয়ত ইহা বয়সের ধর্ম। যে যাহা হউক, যোগেন্দ্রের উপস্থিতিতে তাহারা নূতন আন্দোলনের বিচার বিশ্লেষণ করিত না।

যোগেন্দ্রকে দেখিয়া ইন্দ্র বলিল, নূতন খবর কিছু আছে যোগেন্দ্র?

যোগেন্দ্র বলিল, সি. আর. দাশের প্র্যাকটিশ ছাড়বার খবর আসবার পর থেকে ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নিজেদের মধ্যে তারা সভাসমিতি করছে। হেডমাষ্টার মশায় ভয় পেয়েছেন।

ইন্দ্র—সোনাউল্লা ফরাজি নাকি উলিপুরের খিলাফৎ কমিটির নূতন কর্তা হয়েছে?

যোগেন্দ্র—হাঁ, খিলাফৎ কমিটি হাতে নিয়ে সোনাউল্লা খিলাফৎ ভলান্টিয়ার দল তৈরী করছে খবর পেলাম।

ইন্দ্র বলিল, একটা কথা তোমাকে বলব, কিছু মনে করো না। সোনাউল্লা ফরাজি এখন মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত হয়েছে। তার এন্টিসিডেণ্টস ভাল নয়, দাংগা, ফেসাদ বাধাবার ওস্তাদ। তোমাদের কংগ্রেস কমিটি সোনাউল্লার খিলাফৎ কমিটির হাত ধরে বেশী দিন চলতে পারবে কিনা সন্দেহ। একটু সতর্ক থেকো।

বারন্দায় মিনুর সাড়া পাওয়া গেল। একটু পরে সে কলরব করিতে করিতে ভ্রাতার হাত ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। দেবানন্দকে দেখিয়া সে বলিল —ভাইটি কি বলে জানো বড়মামা? বলে আব্বা। বাবা বলতে পারে না ভাইটি। ছেলে মানুষ কিনা!

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—মিনু বুড়ীর অনেক বয়েস হয়েছে, কেমন?

মিনু ভ্রাতাব হাত ছাড়িয়া দিয়া হাতের আঙুলগুলি প্রসারিত করিযা বলিল, এতো বড় হয়েছে। মা বলে আদ্যিকালের বুড়ি। আভ্যিকাল কাকে বলে বড মামা?

দেবানন্দ মিনুকে কোলে বসাইয়া আভ্যিকালের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল।

যোগেন্দ্র বলিল, শুনলাম উমানন্দ বাবুব নাকি চিঠি এসেছে?

ইন্দ্র—এসেছে। লিখেছে সে শীঘ্রই স্থির করবে কলকাতায় থাকবে, না রাজনগবে আসবে।

যোগন্দ্র এই খবরের জন্য আসিয়াছিল। খবব সংগ্রহ করিয়া সে চলিয়া গেল।

উমানন্দের মন স্থির করিতে বেশী বিলম্ব হইল না। উপরের কথাবার্তার দিন পাঁচেক পরে সে রাজনগরে পৌছিল। সে আসিবাব সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার আবহাওয়াব অস্থিরতা রাজনগরের হাওয়ায় সংক্রামিত হইল।

দেবানন্দ ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিল, কলেজ বন্ধ হয়েছে, কলকাতায় হট্টগোলের মধ্যে না থেকে বাড়ী এসে ভাল করেছ। বাড়ীতে পড়াশোনা কর। দু'চাব মাসের মধ্যে কলেজ আবার খুলবে, তখন যেও।

উমানন্দ বলিল, যারা বেরিয়ে এসেছে তাদের একজনও ইংরাজের গোলামখানায় আর ঢুকবে না প্রতিজ্ঞা করেছে।

দেবানন্দ—এতগুলো ছেলে কি করবে?

উমানন্দ—অসহযোগ আন্দোলন প্রচার করবে যাতে এক বছরের মধ্যে আমরা স্বরাজ পাই।

দেবানন্দ—তারপর ?

উমানন্দ—স্বরাজ পেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কলেজ, জাতীয় স্কুল হবে। তখন আমরা আবার পড়াশোনা করব।

দেবানন্দ—এতদিন পড়াশোনা বন্ধ থাকবে ?

উমানন্দ—সি. আর. দাশ বলেছেন Education can wait but Swaraj cannot (স্বরাজের জন্য অপেক্ষা করিবার সময় নাই, শিক্ষার জন্য অপেক্ষা করা চলে।)

দেবানন্দ—বুঝলাম তুমি পড়াশোনা করবে না, কি করবে এখন ?

উমানন্দ—কি করব দু'চার দিনের মধ্যে দেখবেন। আপনি কি মনে করেছেন খেয়ে, ঘুমিয়ে, গল্প করে সময় কটাবার জন্য আমি রাজনগরে এসেছি ?

ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া উমানন্দ আবার বলিল, আপনারা ছিলেন ভায়োলেন্সপন্থী, দেশকে এক ইঞ্চি স্বরাজের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি আপনারা। আমরা অহিংস অসহযোগীরা এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আনব।

দেবানন্দ আর কথা বলিল না। বলিয়া লাভ কি ? বাক্য ও ব্যবহারের উগ্রতায় অহিংস অসহযোগীরা হিংসা-পন্থীদের ছাড়াইয়া যাইতে চাহে।

দিন দুই পরে সন্ধ্যাবেলা ইন্দ্রের গৃহে কথা হইতেছিল। বক্তা উমানন্দ, শ্রোতা ইন্দ্র, যোগেন্দ্র, শরৎপণ্ডিত, মধুসূদন প্রভৃতি। দেবানন্দ ভিতরে লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল।

উমানন্দ গল্প করিতেছিল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের গোলমালের সময়ে ১৩ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় গুলি চলিবার দিনের নিজের অভিজ্ঞতার কথা। সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতেছে, পথে ঘাটে সর্বত্র হিন্দু মুসলমানের মিলনের দৃশ্য। সত্যাগ্রহ কমিটির নির্দেশে ৬ই এপ্রিল হরতাল হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার পথে পথে অগণিত মানুষের ভীড়, দোকানপাট সব বন্ধ। বড় রাস্তাগুলির মোড়ে মোড়ে সওয়ার পুলিশ, সার্জেন্টদের ঘাঁটি বসিয়াছে। সার্জেন্টরা মাঝে মাঝে জনতাকে তাড়া করিতেছে, অশ্বারোহী পুলিশ জনতার ঘাড়ের উপর ঘোড়া চালাইয়া দিতেছে, তবু নির্বিঘ্নে হরতাল হইল।

১৩ই তারিখে রাস্তায় সশস্ত্র সৈন্যদল দেখা দিল। বড়বাজার এলাকায় সৈন্যদের বিশেষ সমারোহ। বিকালের দিকে গুজব রটিল অবাধ্যতার অপরাধে একজন গোরা সার্জেন্ট কনেষ্টবল শিউপূজন সিংহকে গুলি করিয়াছে। গুজব ছড়াইয়া পড়িতে বড়বাজার এলাকায় জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সৈন্যদল

পথচারীদের বেপরোয়া প্রহার করিতে লাগিল, কয়েক রাউণ্ড গুলি চালাইল। আহত ও নিহতদের সংখ্যা সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলিতে লাগিল।

উমানন্দ বলিল, সন্ধ্যার দিকে বড়বাজারের অবস্থা দেখবার জন্য আমি হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা ফাঁকা, দোকানপাট বন্ধ, মিটমিট করে গ্যাসের আলো জ্বলছে। কলেজ ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোডের জংশনে পৌঁছে পশ্চিম দিকে এগোতে এক দরজা-ভেজানো দোকান ঘর থেকে একজন লোক ডেকে বলল, ওদিকে যাবেন না মশায়, কিছুক্ষণ আগে গুলি চলেছে। আমার তখন কি রোখ চেপেছে মাথায়, দোকানীর কথা না শুনে এগোতে লাগলাম। ফুটপাত ধরে চলছিলাম আধা অন্ধকারে। হঠাৎ কর্কশ হাঁক শুনে চেয়ে দেখি সামনে গুর্খাদের ঘাঁটি একজন গুর্খা বেয়নেট এগিয়ে ধরেছে আমার দিকে। বলল, কাঁহা যাতা?

আমি বললাম—ষ্টেশন যাতা।

আদেশ হল—বিচমে যাও।

আমি ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নেমে এগোতে লাগলাম। মারোয়াড়ী হাসপাতালের কাছে পৌঁছে দেখি রাস্তার মধ্যে একটি ছোটখাট জনতা উত্তেজিত স্বরে কি বলাবলি করছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলাম এই জায়গায় সৈন্যদের গুলিতে একজন লোক মারা গিয়েছে। রাস্তায় তখনও মৃত ব্যক্তির রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। সেই রক্তসিক্ত স্থানটি ঘিরে লোকগুলো দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের মুখের ভাব অত্যন্ত উত্তেজিত। একজন লোক ভিড় থেকে সরে দাঁড়িয়ে জনতাকে লক্ষ্য করে ছোট একটু বক্তৃতা দিল। বক্তৃতার মর্ম, দুষমন আংরেজের তনখাখোর সিপাহীরা কুত্তার মত আমাদের গুলি করে মারছে, দোষী নির্দোষ বিচার নাই। এর প্রতিশোধ নিতে হবে। আমরা লড়াই করব। বাংগালী লোক বুদ্ধি দেবে, মারোয়াড়ী লোক রুপেয়া দেবে, হামলোক জান দেবে।

ভাল করে চেয়ে দেখলাম, পোষাকে ও চেহারায় বক্তাকে হিন্দুস্তানী মুসলমান বলে মনে হল। বক্তৃতা শেষ করে ভিড় ঠেলে যেখানে মাটিতে রক্ত জমাট হয়েছিল সেখানে গিয়ে রক্তের মধ্যে আঙ্গুল ডুবিয়ে নিজের কপালে সে আঙ্গুল ছোঁয়াল। আশপাশের লোকদের কপালে রক্ততিলক পরিয়ে দিতে দিতে বলল, ভাই সব, জান কবুল করে ওয়াদা কর দুষমণ আংরেজের হুকুমত আমরা খতম করব।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া উমানন্দ বলিল, লোকটি আমার কপালেও রক্ততিলক পরিয়ে দিয়েছিল। সেদিন সেই প্রায়ান্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ইংরাজের শাসন আমরা খতম করব। আজ আমাদের সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

উমানন্দর কথা শেষ হইবার পরে অনেকক্ষণ সকলে নির্বাক হইয়া রহিল। যোগেন্দ্রের মুখ দেখিয়া মনে হইল উত্তেজনায় সে যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

উমানন্দ ও যোগেন্দ্র মিলিয়া রাজনগরে কাজ আরম্ভ করিল।

প্রথমে আরম্ভ হইল বাজনগর স্কুলের উপর আক্রমণ। ছেলেরা অনেকে প্রস্তুত হইয়া ছিল। উমানন্দ স্কুল বয়কটেব জন্য তাহাদের আহ্বান করিতে তাহারা সাড়া দিতে বিলম্ব কবিল না। হেডমাষ্টাব মহাশয়ের আবেদন, অনুরোধ, ভয় প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া ছেলেরা ক্লাস ছাড়িতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকের উপর ক্লাস খালি হইয়া গেল। যাহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল তাহাদের স্কুল প্রবেশে বাধা দিবার জন্য পিকেটিং আবম্ভ হইল।

গোলযোগের সূত্রপাতে হেডমাষ্টার মহাশয় ইন্দ্র ও স্কুল কমিটির অন্যান্য মেম্বারদের কাছে অভিযোগ করিলেন। বলিলেন, স্কুল কমিটি অনুমোদন করিলে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেব নিকট তার করিবেন। অন্যান্য সভ্যরা এই প্রস্তাবে রাজি থাকিলেও কমিটিব সভাপতি ইন্দ্র ছাত্রদের ঠেঙ্গাইবাব জন্য পুলিশ ডাকিবার প্রস্তাব সমর্থন করিল না। পুলিশ আসিলে এই পিকেটিং লইয়াই হয়ত ঠেঙানি আবম্ভ হইবে। ইন্দ্র দেবানন্দেব কাছে পরামর্শ চাহিল। স্কুল বয়কটে দেবানন্দের মত ছিল না কিন্তু ইন্দ্রেব মত সেও পুলিশ ডাকিবার বিরোধী। সে বলিল, কিছুদিন ধৈর্য ধবে থাকা ছাড়া আমি আর কোন উপায় দেখিছি না, ইন্দ্র। আসল কথা, ছেলেরা দল বেঁধে কোন অঘটন না ঘটায়। মানে, যারা স্কুল ছাড়তে চাইছে না তাদের বা শিক্ষকদেব ওপর উৎপীড়ন না করে দেখতে হবে। এই হুজুককে বাধা দিতে গেলে ছেলেদের রোখ চেপে যাবে। ছেলেদের মধ্যেও আবার দল আছে। লুকিয়ে কতকগুলো ছেলে ক্লাসে আসছে শুনলাম। এই দুই দলে গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পাবে যে কোন মুহূর্তে, সে দিকে চোখ রাখতে হবে। রাজনগরের অসহযোগ আন্দোলনের নেতাদের এর পরের প্রোগ্রাম কি জানা যাচ্ছে না, জানতে পারলে সুবিধে হত।

তারপর বলিল, তারা প্রথম রাউণ্ডে আরও সফল হবে আশা করেছিল, না

হওয়াতে একটু যেন হতাশ হয়েছে। তারা তোকে ও আমাকে আন্দোলনের শত্রু বলে মনে করে।

স্কুলের কর্তৃপক্ষ পুলিশ না ডাকিলেও পুলিশ আসিল। তাহারা স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঘাঁটি বসাইল। পুলিশের আবির্ভাব সত্ত্বেও পিকেটিং চলিতে লাগিল। পুলিশের লোক সভা সমিতিতেও উপস্থিত হইতে লাগিল। গুজব রটিল সভা সমিতি করা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারি হইবে রাজনগরে।

স্কুলের পিকেটিং শান্তিপূর্ণ ভাবেই চলিতেছিল। অধ্যয়ননিষ্ঠ ছেলেরা পিকেটারদের এড়াইয়া অন্যপথে স্কুলে প্রবেশ করিত। শিক্ষকরাও তাহাই করিতেন। কিন্তু শান্তি বজায় থাকিলে পুলিশের আবির্ভাব একেবারে নিরর্থক হইয়া যায়। কয়েকদিন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়া পুলিশ দল বিরক্তি বোধ করিল। বিরক্তি অপনোদন কবিবার জন্য পিকেটারদিগকে গুঁতা-গাতা দিতে সুরু করিল। ইহার ফল হইল বিপরীত। যাহারা লুকাইয়া স্কুলে ঢুকিতেছিল তাহারা দল বাঁধিয়া পুলিশের চোখের সম্মুখ দিয়া প্রকাশ্যে স্কুল হইতে বাহির হইয়া আসিল। স্কুল কমিটি হেড মাষ্টারকে উপদেশ দিল অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্কুলের ছুটি ঘোষণা করুন। পুলিশ এই আদেশের বিরোধিতা করিয়া বলিল, স্কুল খোলা রাখিতে হইবে, শিক্ষকদিগকে স্কুলে হাজিরা দিতে হইবে।

পুলিশের আবদারে বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধ হেড মাষ্টার বলিলেন, শিক্ষকদের হাজিরা দিতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁরা করবেন কি? তোমরা যদি দয়া করে ক্লাসে এসে বস, তাঁরা পড়াতে রাজি আছেন।

পুলিশ বলিল, শিক্ষক যোগেন্দ্রবাবু ছেলেদের উস্কাইতেছে, তাহাকে তাড়াও।

হেড মাষ্টার ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, একটু বিলম্বে তোমাদের অনুরোধটা এসেছে। যোগেন্দ্রবাবু কয়েকদিন আগে স্কুল কমিটির কাছে পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে রাজনগর হাটেও পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছিল। একদিন রাত্রে পুলিশের ঘাঁটিতে ঢিল পড়িল। উত্তেজিত হইয়া পুলিশ নির্বিচারে ছেলেদের ধরপাকড় করিতে আরম্ভ করিল। এই ধরপাকড় লইয়া সমস্ত গ্রামে উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ছেলেদের ও পুলিশের মধ্যে একটা সংঘর্ষ আসন্ন বলিয়া মনে হইল।

দেবানন্দ ও ইন্দ্র পরামর্শ করিতে লাগিল কি করিয়া অবস্থা আয়ত্তে রাখা যায়।

কোন ব্যবস্থা হইবার আগেই জরুরী তার পাইয়া দেবানন্দকে তারাপুর রওনা হইতে হইল। সরস্বতী তার করিয়াছে তাহার স্বামীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

দেবানন্দ তারাপুরে চলিয়া যাইবার পর ইন্দ্র ভাবিল উমানন্দ ও যোগেন্দ্রকে ডাকিয়া পুলিশের সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়াইয়া কাজ করিতে বলিবে। সে নিজে চারদিকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিল।

সে দেখিল বাস্তবিক একটা সম্পূর্ণ নূতন হাওয়া উঠিয়াছে। লোকের মুখে কেবল মহাত্মা গান্ধীর নাম। মহাত্মা গান্ধীব প্রাচীন কালের ঋষিদের মত জীবনযাত্রাপ্রণালী, তাঁহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নানা গল্প লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা শৌকত আলি সর্বদা ছায়ার মত মহাত্মা গান্ধীর অনুসবণ করেন। এই দুই ভাইয়ের ভয়ে গভর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর কাছে আগাইতে সাহস পায় না। সাহস পাইবেই বা কি করিয়া? বডলাট মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। বাত্রে তিনি এমন ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলেন যে জাগিয়া উঠিয়া তখনই নিজেব আদেশ নাকচ করিতে হইল। সিপাহী, শান্ত্রী, কামান, বন্দুক মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে কি কবিবে? একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া তিনি ইংবাজেব সব সিপাহী শান্ত্রীকে মাটির পুতুলের মত করিয়া দিতে পারেন। মহাত্মাব বিশিষ্ট ভক্তেরা কেহ কেহ দেখিয়াছেন তিনি ঘুমাইবার সময়ে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ধনুকবাণ লইয়া তাঁহাকে পাহারা দেন।

অহিংস অসহযোগীদের বাহিনীতে নিত্য নূতন লোক আসিয়া নাম লিখাইতে লাগিল। হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, ভদ্র, অভদ্র লইয়া নূতন বাহিনী গঠিত হইতে লাগিল। মুখে তাহাদের নূতন মন্ত্র—হিংসা করিয়ো না, প্রেমের দ্বারা শত্রুকে জয় করিতে হইবে।

দেখিয়া ইন্দ্র বিস্মিত হইল, কিছুটা মুগ্ধও হইল। অনেক দিন আগে একখানি ইংরাজি পুস্তকে পঠিত কয়েকটি কথা বার বার তাহার মনে হইল—I did not understand it at all, but it was fine, very fine. অহিংস অসহযোগের নীতির প্রকৃত তাৎপর্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এখনও বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু এই নীতিকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশে যে একটা নব-জাগরণ ঘটিতেছে তাহা দিবালোকের মত স্পষ্ট। কোন দিন, কোন মন্ত্রে যাহাদের জাগানো যাইবে মনে হয় নাই দেশের সেই ভদ্রেতর শ্রেণী আজ

জাগিয়া উঠিতেছে। কোন যাদুমন্ত্রে ইহা সম্ভব হইতেছে? ইহা কি মহাত্মা গান্ধীর নামের যাদুমন্ত্র?

উমানন্দ ও যোগেন্দ্রকে ইন্দ্র ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। উমানন্দ আসিল না, যোগেন্দ্র ও তাহার সঙ্গে হিমাংশু আসিল। হিমাংশু পড়াশোনা ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। ইন্দ্র হাসিয়া হিমাংশুকে বলিল, হিমাংশু, তুমি না বোমা মেরে ইংরাজকে তাড়াবে বলতে, তুমি অহিংস অসহযোগের পথ ধরলে?

হিমাংশু বলিল, মহাত্মা গান্ধী বলেছেন অহিংস অসহযোগের পথে আমরা এক বছরের মধ্যে স্বরাজ পাব।

ইন্দ্র—যদি না পাও?

হিমাংশু—নিশ্চয় পাব, মহাত্মাজী নিজে বলেছেন।

ইন্দ্র যোগেন্দ্রকে বলিল, উমানন্দ বুঝি খুব কাজে ব্যস্ত?

যোগেন্দ্র উত্তর দিবার আগে হিমাংশু বলিল, আপনারা সরকারের পক্ষের লোক কিনা তাই আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে না, তিনি বললেন।

শুনিয়া ইন্দ্র একটু হাসিল। যোগেন্দ্রকে বলিল, তোমাদের যা ইচ্ছে কর শুধু পুলিশের সঙ্গে গোলমাল বাধিয়ো না। তাতে তোমাদের কাজের ব্যাঘাত হবে।

যোগেন্দ্র বলিল, পুলিশ তো এসেছে গোলমাল বাধাতে। আমরা সংঘর্ষ এড়াতে চাইলেও তারা উপলক্ষ্য খুঁজে নেবে। দোকানীরা স্বেচ্ছায় দোকান বন্ধ রাখতে চায়, পুলিশ চায় তাদের ভয় দেখিয়ে দোকান খোলা রাখতে। পিকেটাররা গাঁজার দোকানের সামনে শুধু হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিশ তাদের ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়, পেটে, পিঠে, পাছায় লাঠির গুঁতো মারে, অশ্রাব্য গাল দেয়। বাধা দেয়া দূরে থাক মুখে পর্যন্ত কোন পিকেটার এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করে না।

হিমাংশু—আমরা বাক্যে অহিংস, কাজে অহিংস।

ইন্দ্র—কিন্তু কতদিন অহিংস থাকতে পারবে? এই তো সেদিন পুলিশের ক্যাম্পে ঢিল ফেলা নিয়ে পুলিশ কত লোককে মারধোর করেছে।

যোগেন্দ্র—ঢিল ফেলবার অভিযোগ মিথ্যা। কোন ভলান্টিয়ার অহিংসার প্রতিজ্ঞা ভাঙেনি।

ইন্দ্র—পুলিশের পীড়নের মুখে কতদিন প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে?

হিমাংশু—স্বরাজ না হওয়া পর্যন্ত। স্বরাজ হলে ওদের তাড়িয়ে দেব।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল, ভাল কথা। এক তরফা অহিংসার অভিযান তোমরা যদি চালিয়ে যেতে পার আমার কিছু বলবার নাই। তবে অনেক রকমের লোক তোমাদের দলে ঢুকেছে। তাদের মধ্যে অসহিষ্ণু স্বভাবের লোক থাকতে পারে। পুলিশের এজেন্ট প্রোভোকোটিওর থাকতে পারে। একটু সতর্ক থেকো।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর যোগেন্দ্র ও হিমাংশু উঠিল। যাইবার সময়ে যোগেন্দ্র বলিল, দেবানন্দবাবু কোন খবর দিয়েছেন? ব্রজনাথবাবু কেমন আছেন?

ইন্দ্র বলিল, দেবুদা এখনও কোন চিঠিপত্র দেননি। আর দিন দুই দেখে আমার শাশুড়ী তারাপুর যাবেন। আমিও যেতে পারি।

দুই দিন পরে ত্রিনয়নী তারাপুরে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাড়ীর ফটকে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য। ইন্দ্র তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সে পোষ্টাফিসে লোক পাঠাইয়াছিল আজিকার ডাকে কোন চিঠি আসিল কিনা জানিবার জন্য। ত্রিনয়নীও এই সংবাদের অপেক্ষায় আছেন।

চিঠি আসিল। দেবানন্দ লিখিয়াছে, এখানে পৌঁছা অবধি চিঠি লেখবার সময় পাইনি। আজ সময় হয়েছে।

আমি পৌঁছে দেখলাম শহর থেকে ডাক্তার এসেছে, পঞ্চক্রোশী থেকেও একজন ডাক্তার এসেছে। কবিরাজ একজন উপস্থিত। সরী এসব ব্যবস্থা নিজেই করেছিল। ডাক্তাররা বললেন কোন আশা নেই তবু যতক্ষণ শ্বাস আছে আমরা চেষ্টা করব। কবিরাজ ঘণ্টায় ঘণ্টায় অনুপান বদল করে মকরধ্বজ দিচ্ছেন যদি নাড়ী একটু সবল হয় আশায়। রোগী আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার মুখের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পুষ্প শিয়রে বসে আছে। সরীকে খুঁজে বের করলাম গোবিন্দজীর মন্দিরে। দেখলাম গোবিন্দজীর পায়ের কাছে মাথা রেখে মেজেতে পড়ে রয়েছে। ডেকে সাড়া না পেয়ে কাছে গিয়ে পিঠে হাত দিতে সে মাথা উঠিয়ে চেয়ে দেখল। তারপর উঠে বসে আমার পা জড়িয়ে বলতে লাগল, দাদা, আমার স্বামীকে বাঁচান, আমার স্বামীকে বাঁচান!

শেষে এসে সংসারের ভার নিয়েছেন, সরীর ছেলেকে চোখে চোখে রাখছেন।

কয়েকদিন এই অবস্থায় চলল। পঞ্চম দিনে রোগীর জ্ঞান ফিরে এল। সরী তার পায়ের কাছে বসে ছিল। সে বলল, শোন, আমি কি পিঠে যেন খেতে ভালবাসি নামটা ভুলে যাচ্ছি। একখানা করে খাওয়াবে?

সরী মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে ঘর থেকে বাইরে যাবে ব্রজনাথ বলল, কাছে এসো তো, চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিনে। মাথার কাপড় ফেলে দাও। তোমার মুখ শুকনো দেখাচ্ছে, কিছু খাওনি বুঝি? যাও খেয়ে এসো।

একটু চুপ করে থেকে অস্ফুটস্বরে সে কি বলল। পুষ্প তার মুখের ওপর হেঁট হয়ে বলল, দাদা, আমাকে কিছু বলছেন?

ব্রজনাথ বলল, কে পুষ্প? আমার ডায়েরীখানা দেখ তো পুষ্প, কতদূর লিখেছি। আবির্ভাব পর্যন্ত লিখেছি না? ঠিক তো?

পুষ্প আগের মত হেঁট হয়ে বলল, "মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ভারতবর্ষের কত বড় সৌভাগ্য"- এ পর্যন্ত লিখেছেন, আমি দেখেছি।

ব্রজনাথ—হাঁ, কত বড় সৌভাগ্য,—ঐ পর্যন্ত থাক। তোমার কাকাবাবুকে দেখছি না, তিনি কি চলে গেছেন?

পুষ্প বলিল, ঐ যে জানালার কাছে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

ব্রজনাথ-ওঁকে বলো আন্দামানের ধুলো আছে ওঁর পায়ে, সেই ধুলো আমার মাথায় একটু দিন। মিঠুকেও—

হঠাৎ যন্ত্রণাসূচক শব্দ করে ব্রজনাথ চুপ করে গেল।

পুষ্প তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আপনার কষ্ট হচ্ছে দাদা, আর কথা বলবেন না।

ব্রজনাথ অনেকক্ষণ কথা বলল না। কবিরাজ নাড়ী দেখলেন। কবিরাজ তার হাত ধরে রয়েছেন, ব্রজনাথ বলল, সোমনাথকে দেখলাম পুষ্প, সে ভাল আছে। সে বলল তুই—। ব্রজনাথের ঠোঁট নড়তে লাগল, শব্দ বের হল না।

সরস্বতী পিঠা তৈরী করেছে এর মধ্যে। রেকাবীতে দু'খানা পিঠে নিয়ে সে ঘরে ঢুকে ব্রজনাথের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল।

ব্রজনাথের ঠোঁট নড়া বন্ধ হয়েছে, চোখের তারা স্থির হয়েছে, দৃষ্টি যেন সরীর দিকে আবদ্ধ।

কবিরাজ নাড়ী দেখতে লাগলেন।

ঘণ্টা দুই এই অবস্থায় কাটবার পর হিক্কার লক্ষণ দেখা দিল। মাঝ রাত্রির দিকে সব শেষ হল।

* * *

তারপর দেবানন্দ লিখিয়াছে সে কবে ফিরিতে পারিবে স্থির নাই। শ্রাদ্ধের ব্যাপার চুকাইয়া বিষয় সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরস্বতী বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সে একটু শান্ত না হইলে আসিবার কথা তাহাকে বলা যাইবে না। পুষ্প সরস্বতীকে এই অবস্থায় রাখিয়া ফিরিতে অনিচ্ছুক। সম্ভব হইলে মা এখানে আসিয়া কয়েকদিন থাকিতে পারেন।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া ইন্দ্র স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল অনেকক্ষণ। ব্রজনাথের সঙ্গে পরিচয়ের দিন হইতে পরবর্তী ইতিহাসের অধ্যায়গুলি একটির পর একটি করিয়া মনে পড়িল তাহার। কাকা রঘুনাথ, তারপর তিন ভ্রাতা আদিনাথ, সোমনাথ, ব্রজনাথ। দেশের স্বাধীনতা কামনা করিবার অপরাধে একটা পরিবার ধ্বংস হইয়া গেল চোখের সম্মুখে। দেশ হয়ত স্বাধীন হইবে একদিন; স্বাধীনতার সংগ্রামের এই সব আত্মত্যাগী, বীর সৈনিকের কথা কেহ কি মনে রাখিবে তখন?

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেবুদার চিঠিখানা তাহার মায়ের হাতে দিতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

এক

পঞ্চক্রোশী—(১৯১৯-২১)

পঞ্চক্রোশীর প্রসিদ্ধ জয়কালী মন্দিরের মাইল খানেক দক্ষিণে কেউটিয়া নদীর বড় বাঁক, জায়গাটা কয়েক বছর আগেও ছিল ঘন জঙ্গলে আবৃত, বরা, চিতা-বাঘের আশ্রয়স্থান। সে জঙ্গলে মানুষ ঢুকিত না বছরের একটি দিন ছাড়া।

কার্তিক পূর্ণিমার দিন পঞ্চক্রোশীর হাড়ি, বাগ্দী, কেওট, বাউরী, বুনোরা দলে দলে জঙ্গলে ঢুকিত বেতাই চণ্ডীর থানে পূজা দিবার জন্য। বেতাই চণ্ডী দেবী তাহাদের সকলের কুলদেবতা।

জঙ্গলের মধ্যে অতি প্রাচীন একটা কুল গাছের নীচে ইটের বেদীর উপর ত্রিকোণ প্রস্তরখণ্ড দেবীর বিগ্রহ। ঘন বেতের বন দেবীর আসন, বিগ্রহ ও প্রাচীন কুল গাছ বেষ্টন করিয়াছিল। সারা বৎসর দেবী বেতবনের মধ্যে লোক চক্ষুর অগোচরে থাকিতেন। পূজার আগে বেতবন কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেবীর থানে পৌঁছিবার পথ করা হইত।

খুব সকাল হইতে ঢাক ও কাঁসি বাজাইতে বাজাইতে ভক্তরা দলে দলে জঙ্গলে ঢুকিত। ঘটা করিয়া পূজা হইত। হাঁস, পায়রা মোরগ, গোসাপ বলি দেওয়া হইত, কাহারও মানত থাকিলে বরা, পাঁঠাও বলি হইত। ভাত, মাংস ও ধেনো মদ ভোগ দেওয়া হইত দেবীকে। এই একটি দিন হাড়ি, বাগ্দী, কেওট, বাউরী, বুনো সকলে মিলিয়া দেবীর প্রসাদ পাইত, কুলীন অকুলীন, ছোট, বড় বিচার স্থগিত থাকিত।

পূজা হইত, সঙ্গে সঙ্গে হইত গায়েন। বেতাই চণ্ডী দেবীর আবির্ভাব, দেবতাদের জন্য সম্বা নম্বা অসুরের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ, যুদ্ধজয়ের পরে কূটবুদ্ধি বাওন নারুদ ঠাকুরের পরামর্শে দেবীর হীন কুলে জন্ম বলিয়া দেবতাদের দ্বারা তাঁহার স্বর্গ হইতে বিতাড়ন, মনের খেদে বেতবনে তাঁহার তপস্যা, তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ধর্মদেবের বরদান, পৃথিবীতে তাঁহার পূজা প্রচলন করিবার জন্য হীন কুলে কন্যারূপে দেবীর মনুষ্য জন্ম গ্রহণ,—এই ছিল গায়েনের বিষয়। পূজার পরদিন

হইতে এই গায়েন আরম্ভ হইত, তারপর একমাস ধরিয়া প্রতি শনি মঙ্গলবার এই গায়েন চলিত।

এই গায়েন হইত দেবীর পুরোহিত শুভঙ্কর পণ্ডিতের বাড়ির আঙ্গিনায়। শুভঙ্কর পণ্ডিতের বাড়ি ছিল বাগ্‌দীপাড়ায়। বেতাই চণ্ডীর থান ও জয়কালী মন্দিরের মধ্যে কেউটিয়া নদীর ধারে যে বাগ্‌দীপাড়া, তাহার নাম বড় বাগ্‌দী-পাড়া। সে আমলে পঞ্চক্রোশীর বাবুদের দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল বাহিনীর সেরা রংরুট ছিল বাগ্‌দীরা। জয়কালী মন্দিরের ও গ্রামের রক্ষা-ব্যূহ হিসাবে তাঁহারা নদী হইতে গ্রামে প্রবেশ করিবার পথে বাগ্‌দী-উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সে লাঠিয়াল বাহিনী আর নাই, বাগ্‌দীদের সে বলবিক্রমও নাই।

বড় বাগ্‌দীপাড়ার শুভঙ্কর পণ্ডিতের পূর্বপুরুষেরা ছিল পেশাদার লাঠিয়াল ও ডাকাত। সময়ের পরিবর্তনে কুলগত পেশার পরিবর্তন হইয়াছে সমাজের সর্বস্তরে। শুভঙ্করের পরিবারে এই পরিবর্তনের ফলে লাঠিয়াল ও ডাকাত বংশের ছেলে হইল পণ্ডিত।

শুভঙ্করের পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল। ছেলেকে সে লেখাপড়া শিখাইতে-ছিল। বাবুদের স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে তাহার অন্য এক কঠিন শিক্ষাও লাভ হইল। অর্থাৎ সমাজের উচ্চতর শ্রেণীরা তাহাদের শ্রেণীকে কি চোখে দেখে সেই শিক্ষা লাভ হইল। চোখের সেই দৃষ্টি অনেক দিন হইতে ছিল কিন্তু দৃষ্ট ব্যক্তিরা সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল না। হাওয়ায় এই চেতনার বীজ ছড়াইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

মনের ক্ষোভে শুভঙ্কর স্কুল ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে নিজের চেষ্টায় বিদ্যার্জন করিতে বসিল। বেতাই চণ্ডীর প্রাচীন পুরোহিত গদাধর পণ্ডিতের মৃত্যু হইলে সমাজের প্রধানগণ শুভঙ্করকে "পণ্ডিত" উপাধি দিয়া দেবীর পূজার পৌরহিত্য করিতে অনুরোধ করিল। দেবীর পুরোহিতের বৃত্তিগত পদবী পণ্ডিত। শুভঙ্করের বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র। পিতার আদেশে তাহাকে এই সম্মানের ও দায়িত্বের পদ গ্রহণ করিতে হইল।

বেতাই চণ্ডী দেবীর পুরোহিত হইয়া শুভঙ্করের মনে ক্রমে ধর্মভাব আসিল। উপদেশ লইবার জন্য সে জয়কালী বাড়ীর কানা ঠাকুরের কাছে যাইতে আরম্ভ করিল।

জয়কালী বাড়ীর কানা ঠাকুর বা জ্ঞানীশ্বর ঠাকুরের ইতিহাস বিচিত্র। তিনি জয়কালীর পুরোহিত বংশের সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পুরোহিত

হইয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও ধার্মিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল, পূজা অর্চনাও তিনি খুব ভাল করিতেন। সামান্য একটু দুর্বলতা সব নষ্ট করিল। পাঁঠা বলির দৃশ্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই দুর্বলতা বাড়িয়া চলিল। লোকে বলে পূজা করিতে বসিয়া তিনি মায়ের কাছে তাঁহার ছাগবক্ত পিপাসার জন্য অভিযোগ করিতেন। পঞ্চক্রোশীর জয়কালীর কাছে আগে নাকি নরবলি হইত। সময়েব পবিবর্তনে নববক্তপায়িনী দেবী নিরীহ ছাগরক্তপায়িনী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আরও নিরীহ হইবাব প্রার্থনায় জাগ্রতা দেবী কুপিতা হইলেন। একদিন পাঁঠাবলির সময়ে জ্ঞানীশ্বব ঠাকুব মাথায় দুই হাত চাপিযা চিৎকাব করিয়া উঠিলেন, তাবপব জ্ঞান হাবাইয়া মাটিতে পডিযা গেলেন। জ্ঞান হইলে সকলে দেখিল দেবী ঠাকুবেব দৃষ্টিশক্তি হবণ করিযাছেন।

অন্ধ হওয়াতে জ্ঞানীশ্বব ঠাকুবের পুরোহিত পদ গেল, তাঁহার ছোট ভাই মুনীশ্বর পুবোহিত হইলেন। কানা জ্ঞানীশ্বর ঠাকুব পুবোহিত বাড়ীব এক কোণে নিজের সাধনভজন লইযা বসিলে॰। জ্ঞানীশ্বর ঠাকুরের অনুরোধে তাঁহাব স্ত্রী উঠানের এক কোণে একটি তুলসী চারা পুতিযাছিলেন। উহা দেখিতে পাইযা তাঁহার ছোট ভাই নেড়া বোষ্টম বলিযা গালাগালি কবিয়া তাঁহাকে ও তাঁহাব স্ত্রীকে বাড়ী হইতে তাডাইযা দিলেন। স্ত্রীব হাত ধবিযা জ্ঞানীশ্বর ঠাকুব পঞ্চক্রোশী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় খবব পাইযা ছোট তরফের জমিদাব শরিক বাধানাথবাবু আসিয়া বাধা দিলেন। বাধানাথবাবু ছিলেন জমিদার শরিকদেব মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ, প্রতাপশালী, ধার্মিক লোক। মুনীশ্বব ঠাকুরকে বহু ভৎ'সনা কবিয়া পুরোহিত বাড়ীর এক অংশ তিনি কানা ঠাকুরেব জন্য ভাগ কবিয়া দিলেন ও নিজের তরফ হইতে তাঁহার জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা কবিযা দিলেন।

জয়কালী বাড়ীর সীমানার মধ্যে অবস্থিত পুরোহিত বাড়ীব একাংশে যখন হবিসংকীর্তন আরম্ভ হইল অন্যান্য শবিকদের কাছে তাহা বিসদৃশ মনে হইলেও রাধানাথের ভয়ে তাঁহারা কেহ হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইলেন না।

শুভঙ্কর কানা ঠাকুরের কাছে ধর্মের উপদেশ লইত, স॰কীর্তন শুনিত, কিন্তু মদ্য মাংসপ্রিয় কুলদেবতা বেতাই চণ্ডী দেবীর পৌরহিত্য ছাড়িল না। বরং পুরোহিত পদের সুযোগ লইয়া সে নিজেব সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে নূতন ভাব প্রচার করিতে, সমাজের আচার ব্যবহারের সংস্কার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বেতাই চণ্ডীর গায়েনের মধ্যে সে অনেক নূতন কথা সন্নিবিষ্ট করিল। তাহার

চেষ্টায় বেতাই চণ্ডীর থানের জঙ্গল অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছিল। তারপর দেবীর থানে টিনের ঘর উঠল। পূজার নিয়ম কানুনেরও কিছু পরিবর্তন হইল।

ইহার পরে অনেকগুলি বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

কানা ঠাকুর বহু দিন মারা গিয়াছে। শুভঙ্কর এখন বয়সে প্রবীণ হইয়াছে। তাহার পুত্র দীনদয়াল দুইটা পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছে।

একদিন খবর আসিল কোন সূত্রে বোর্ডিংয়ে তাহার পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়াতে অন্য ছেলেরা মিলিয়া অপমান ও প্রহার করিয়া দীনদয়ালকে বোর্ডিং হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। মনের ধিক্কারে দীনদয়াল কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না। শুভঙ্কর পণ্ডিত নিজে কলিকাতায় গিয়া অনুসন্ধান করিল, কত জায়গায় ঘুরিল। দীনদয়ালের সন্ধান পাওয়া গেল না। বাড়ী ফিরিয়া অসুস্থ হইয়া সে শয্যা লইল। সেই শয্যা ত্যাগ করিয়া সে আর উঠিতে পারিল না। ছয় মাস পরে তাহার মৃত্যু হইল।

শুভঙ্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে, তখন যুদ্ধ চলিতেছে, সন্ন্যাসীর বেশে দীনদয়াল হঠাৎ একদিন গ্রামে ফিরিয়া আসিল। তাহার বৃদ্ধা মাতা মহেশ্বরী হারানো ছেলেকে ফিরিয়া পাইয়া ইনাইয়া বিনাইয়া অনেক কাঁদিল। কয়েক দিন পরে সুস্থ হইয়া ছেলের সন্ন্যাসী বেশ ছাড়াইয়া বিবাহ দিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইল। মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য দীনদয়াল সন্ন্যাসীর বেশ ছাড়িল কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি হইল না। বলিল, তুমি যদি জোর জুলুম করো আমি আবার সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাব।

শুনিয়া মহেশ্বরী ভয়ে চুপ করিয়া গেল। মনে মনে শপথ করিল ছেলে নিজে বিয়ের কথা না বলিলে সে আর তাহার বিয়ের সম্বন্ধে একটি কথাও বলিবে না। মহেশ্বরী মনে আরও একটা কথার উদয় হইল। সে দেখিল লেখাপড়ায়, কথাবার্তায়, চালচলনে তাহার পুত্র এখন ভদ্রলোক হইয়া গিয়াছে যে পঞ্চক্রোশীর বাগ্দী সমাজে তাহার উপযুক্ত মেয়ে মিলিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যেমন তেমন মেয়ের সঙ্গে সে কি তাহার এই ছেলের বিয়ে দিতে পারে?

শুভঙ্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর পর বেতাই চণ্ডী দেবীর পুরোহিত পদ তাহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা পাইয়াছিল। দীনদয়াল গৃহে ফিরিলে সমাজের প্রধানগণ তাহাকে ঐ পদ লইতে অনুরোধ করিল। উত্তরে দীনদয়াল জানাইল পূজার ভার যে পাইয়াছে তাহার উপর থাকুক, তবে তাহার মনে একটা কাজ করিবার ইচ্ছা

আছে, প্রধানগণ সাহায্য করিলে সে তাহাতে হাত দিতে পারে। প্রধানগণ কাজটা কি জানিতে চাহিলে সে বলিল বেতাই চণ্ডী দেবীর থানের জঙ্গল কাটিয়া সে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবে। আশ্রমে ছেলেরা লেখাপড়া শিখিবে, পরের সেবা করা শিখিবে। সেখানে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হইবে, কীর্তন, কথকতা হইবে। প্রধানরা দীনদয়ালের উদ্দেশ্য ভাল বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য কবিবার প্রতিশ্রুতি দিল। প্রতিশ্রুতি দিল আন্তরিকভাবেই দীনদয়াল একজন পণ্ডিত, মাথাওয়ালা লোক। পঞ্চক্রোশীর বাবুদের ছেলেরাও লেখাপড়ায় তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। দীনদয়াল সন্ন্যাসী হইয়া কত তীর্থে কত দেশবিদেশে ঘুরিয়াছে, কত কি দেখিয়াছে, এজন্য বাবুবা পর্যন্ত তাহাকে সমীহ করে। সন্ন্যাসী বেশে গ্রামে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত সাধুপুরুষ বলিয়া চারিদিকে তাহার খ্যাতি রটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাদের সমাজের এই রকম একজন লোককে নিজেদের মধ্যে পাইয়া পঞ্চক্রোশীর নিম্নতব শ্রেণীগুলির মধ্যে বল ভরসা যথেষ্ট বাড়িয়া গেল। দীনদয়ালকে গ্রামে ধরিয়া রাখিবাব ও তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য প্রস্তুত হইল।

দীনদয়ালের কাজ আরম্ভ হইল।

বেতাই চণ্ডীর থানের জঙ্গল একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল। দেবীর টিনের মণ্ডপের নিকটে একখানি বড খড়ের আটচালা উঠিল। ফুলেব বাগান, শাক-সব্জীর বাগান হইল। জন কয়েক নানা বয়সেব ছেলেকে লইয়া দীনদয়াল পাঠশালা খুলিল। আগে বেতাই চণ্ডী দেবী বৎসরে একদিন পূজা পাইতেন। দীনদয়াল তাঁহার প্রাত্যহিক পূজা, আরত্রিকের ব্যবস্থা করিল। দেবীর কাছে পশুবলির প্রথা. মদ মাংস ভোগ দিবাব প্রথা বন্ধ হইল। বাউরী পাড়ার গণেশ কীর্তনীয়া প্রতি শনি মঙ্গলবারে কীর্তন গাহিত।

এইভাবে দীনদয়ালের আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল।

দুই তিন বৎসরের মধ্যে দীনদয়ালের নাম ও তাহার আশ্রমের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। বাগ্দী দীনদয়াল ভক্ত সাধক, নিরলস কর্মী, কঠোর সমাজ সংস্কারক দীনদয়াল, ঠাকুর নামে পরিচিত হইল। নিম্নশ্রেণীর ভক্তরা তাঁহাকে বলিত দয়াল বাবা। পঞ্চক্রোশীর বাগ্দী, হাড়ি, কেওট, বাউরী সমাজে দীনদয়াল ঠাকুরের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। একটা নূতন জীবনের স্পন্দন আরম্ভ হইল এই চিরদিনের উপেক্ষিত, উৎপীড়িত সমাজের মধ্যে. কতদিনের সামাজিক কুপ্রথা, কতদিনের ব্যক্তিগত কুঅভ্যাস আপনা হইতে দূরীভূত হইল, ভয়,

আত্মপীড়ন, সঙ্কোচের জটিল পাশ ছিন্ন হইয়া গেল কেমন করিয়া, বহুকালের অশিক্ষা ও হীনতাবোধের গ্লানি মুক্ত হইয়া নূতন মানুষ জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল পুরাতন খোলসের মধ্যে।

নীরবে যে বিপ্লব ঘটিতেছিল পঞ্চক্রোশীর সমাজের নিম্নস্তরে তাহার ফলাফল সম্বন্ধে উচ্চস্তরের সমাজে কোন কৌতূহল পর্যন্ত জাগ্রত হইল না।

দেশে যখন অহিংস অসহযোগের আদর্শ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে সমাজের একাংশের কাছে দীনদয়াল ঠাকুর তখন পঞ্চক্রোশীর সর্বশ্রেণীর সমন্বয় প্রয়াসী নূতন এক মতের প্রচারক, জ্ঞানী, ভক্ত ও সাধু বলিয়া শ্রদ্ধার পাত্র এবং নিম্নশ্রেণীর সমাজের সকলের কাছে তিনি তাহাদের উদ্ধারের জন্য ধর্মঠাকুরের অবতার পুরুষ বলিয়া পূজিত। জিজ্ঞাসুরূপে ভদ্রশ্রেণীর কেহ কেহ দীনদয়াল ঠাকুরের আশ্রমে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে যে কয়জন এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িত তাহাদের কথা কিছু বলা হইতেছে।

প্রথমে বলিতে হয় শ্যামানাথ, শেখর ও রাধারাণীর কথা।

শ্যামানাথ পঞ্চক্রোশীর ছোট তরফের রাধানাথের পুত্র। কানা ঠাকুরের প্রসঙ্গে রাধানাথের উল্লেখ করা হইয়াছে। রাধানাথ পরাক্রান্ত, ন্যায়বিচারক, ধর্মভীরু জমিদার ছিলেন। পুত্রকে তিনি উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু তাহার ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাইবার প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিলেন। বাধা দিবার কারণ বড় তরফের দেবনাথের পরিণতি।

দেবনাথ ব্যারিষ্টারি পড়িতে গিয়া কুচরিত্র ও মদ্যাসক্ত হইয়া ফিরিয়াছিল, স্ত্রী থাকিতেও বিলাতে লুকাইয়া এক ইংরাজ পরিচারিকা শ্রেণীর স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া পশার হইবার আগেই অতিরিক্ত পানাসক্তির ফলে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সে মারা গিয়াছে। দেবনাথের স্ত্রী রাধারাণী অতি তেজস্বিনী মহিলা। স্বামীর মেম বিবাহ করিবার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তিনি স্বামীকে ত্যাগ করিয়া পঞ্চক্রোশী চলিয়া আসিয়াছিলেন।

রাধারাণীর এক কন্যা ছিল। তাহার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তিনি শ্বশুরের-গৃহে ছিলেন। কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি অতিরিক্ত কর্তৃত্বপরায়ণ ভাশুর হেমাঙ্গনাথের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পণ্ডিতপাড়ায় তাঁহার পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা তখনও জীবিত। পিতার সেবা ও গৃহদেবতা

গোপালের পূজা অর্চনায় তাঁহার সময় কাটিত। স্বামী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন রাধারাণী শ্বশুরের গৃহ হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ভাশুরের কাছে সম্পত্তিতে স্বামীর অংশের জন্য অর্থ চাহিলেন। রাধানাথের মধ্যস্থতায় একটা আপোষ হইল, কিন্তু জ্ঞাতিশত্রু রাধানাথের সাহায্য চাওয়াতে হেমাঙ্গনাথ ভ্রাতৃবধুর উপর জাতক্রোধ হইয়া রহিলেন।

রাধারাণী শুনিলেন দীনদয়াল ঠাকুর নামে একজন সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে পঞ্চক্রোশীতে। কেহ কেহ বলিল তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ, আবার কেহ কেহ বলিল তিনি এক নূতন মত প্রচার করিয়া ছোট জাতদের খেপাইতেছেন।

হিন্দু সমাজের একদিকে যেমন সংকীর্ণতা অন্যদিকে তেমনি বিস্ময়কর উদারতা। সমাজের অধিকারীরা একমুখে বলেন বেদপাঠে অব্রাহ্মণের অধিকার নাই, অন্যমুখে বলেন ভগবানের আবির্ভাব জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে হইতে পারে। ভগবানের কৃপা পাইয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিলে শুধু অন্ত্যজ কেন বিধর্মীর পায়ে মাথা লুটাইতে অতি আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণেরও কুণ্ঠা বোধ হয় না।

ধর্মপিপাসু রাধারাণী যখন শুনিলেন দীনদয়াল ঠাকুর একজন সিদ্ধপুরুষ, পঞ্চক্রোশীর রাজবাড়ীর বধূ হইয়াও তিনি দীনদয়াল ঠাকুরের আশ্রমে যাইতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। দীনদয়ালকে দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া রাধারাণীর শ্রদ্ধা হইল।

রাধারাণীর মুখে দীনদয়াল ঠাকুরের প্রশংসা শুনিয়া শ্যামানাথ ও শেখর একদিন তাঁহার আশ্রমে যাইবে স্থির করিল।

শেখর শ্যামানাথের আত্মীয় ও বন্ধু এবং হেমাঙ্গনাথ ও পরলোকগত দেবনাথের ভগ্নীর পুত্র। তাহার পিতা কৃষ্ণকুমার অতি সুপুরুষ, দরিদ্র কুলীনবংশীয় ছিলেন। হেমাঙ্গনাথের পিতা তাঁহার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ঘরজামাই রাখিয়াছিলেন। শ্বশুরের আগ্রহে ও ব্যয়ে কৃষ্ণকুমার বি এ. পাস করিয়া আইন পড়িতেছিলেন, এমন সময় শ্বশুরের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর আগে তিনি জামাতাকে আলাদা বাড়ী, তালুক ও বহু খাস জমি লিখিয়া দিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে এই খাস জমিগুলি লইয়া হেমাঙ্গনাথের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ বাধিল। রাগ করিয়া জমি ফিরাইয়া দিয়া তিনি পঞ্চক্রোশী ত্যাগ করিলেন। আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়া শহরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ওকালতিতে যখন তাঁহার পশার খুব জমিয়া উঠিল একটি পুত্র রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী মারা গেলেন। কৃষ্ণকুমার পুত্র

শেখরকে মানুষ করিয়া তুলিলেন। বড় হইয়া পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য সে ওকালতি পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিল। কৃষ্ণকুমার ভাবিলেন পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই ছেলেকে কাজ শিখাইতে আরম্ভ করিবেন। তাহার বিবাহ দিবার জন্য তিনি মেয়ে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ পরলোকের ডাক আসায় দুইটি কাজই অসম্পূর্ণ রাখিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল।

যথাসময়ে শেখরের পাশ করিবার খবর বাহির হইল। পিতার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ জানিতে পারিয়া সে ভাবিল টাকা ত যথেষ্ট রহিয়াছে, আর টাকা রোজগার করিয়া কি হইবে? বরং এম. এ. টা পড়িয়া অন্য কিছু করা যাইবে। বিলাতী ডিগ্রি লাভের ইচ্ছাও একটু ছিল। তাহার পড়িবার নেশা ছিল। এম এ ক্লাসে ভর্তি হইয়া পাঠ্যের বদলে অপাঠ্য সাহিত্য লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। টলষ্টয় বার্টাণ্ড রাসেল ও বার্ণাড শ লইয়া আরম্ভ করিয়া মার্ক্সে যাইয়া ঠেকিল। মার্ক্সের থিওরী আয়ত্ত করিবার জন্য সোশিয়ালিজমের ইতিহাস গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হইল। রুশ বিপ্লব ও কম্যুনিজমে আসিয়া যখন সে পৌঁছিয়াছে তখন এম এ. পরীক্ষার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। দেখা গেল তাহার পার্সেণ্টেজ সর্ট এবং ইংরাজিতে এম এ. পরীক্ষা দিবে বলিয়া যে বইগুলি সে কিনিয়াছিল তাহার একখানিও পাওয়া যাইতেছে না। ভাবিল ইংরাজি ছাড়িয়া দিয়া নূতন করিয়া ইকনমিকস্ ক্লাসে ভর্তি হইবে। নূতন সেশনের অপেক্ষায় হোষ্টেল ছাড়িয়া বাড়ী চলিয়া আসিবে কি না ভাবিতেছে ইতিমধ্যে এক হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িয়া মাস কয়েক সিগারেট টানিয়া ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িয়া কাটাইল। তারপর হঠাৎ একদিন নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্তূপীকৃত বই প্যাকিং বাক্সে ভরিতে লাগিল। স্থির করিল এগুলি দেশের বাড়ীতে পাঠাইয়া বেড়াইতে বাহির হইবে।

এই সময়ে শ্যামানাথ কোন কার্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিল। পথে শেখরের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। শ্যামানাথ শেখরের কিছু বড়। উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা থাকিলেও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। পথে দেখা হইতে শেখর শ্যামানাথকে নিজের হোষ্টেলে লইয়া গেল। বলিল, যে ক'দিন কলিকাতা আছ এখানে থাক।

কয়েকদিন একসঙ্গে বাস করিবার ফলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। শেখরের মানসিক অস্থিরতা দেখিয়া ও সে কোথাও বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প

করিয়াছে শুনিয়া শ্যামানাথ শেখরকে তাহার সঙ্গে পঞ্চক্রোশীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল।

তাহার পিতা শ্যালকদের উপর রাগ করিয়া পঞ্চক্রোশী ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পঞ্চক্রোশীর সম্বন্ধে শেখরের মনে কিছু বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। শ্যামানাথের প্রস্তাবে সে বলিল, তোমাদের ফিউড্যাল বিওশিয়ার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই।

শ্যামানাথ বলিল—ফিউড্যাল বিওশিয়া মানে ?

শেখর—The B‍otians were famed for their dull wit. (বিয়োশিয়ার অধিবাসীরা বুদ্ধিহীনতার জন্য প্রসিদ্ধ)। ফিউড্যাল মানে নিশ্চয় জানো।

শ্যামানাথ হাসিয়া বলিল, পঞ্চক্রোশীওয়ালাদের গাধা বলে গাল দাও আপত্তি নেই তবে ঋষিবাক্যটি ভুলো না শেখরনাথ। চার্বাক মুনি বলেছেন নরানাং মাতুলক্রম।

শেখর--চার্বাক বলেছেন নাকি একথা ? কোথা পেলে এ খবর ?

শ্যামানাথ—যে মুনিই বলে থাকুন পঞ্চক্রোশীকে গাল দেবার সময় কথাটার মানে স্মরণ রেখ।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেখর যাইতে রাজি হইল। বলিল, আমাদের বাড়ীটা আছে, না মামাবাবুরা মেরে দিয়েছেন ?

শ্যামনাথ—বাড়ী ঠিক আছে, কেউ মেরে দেয় নি। তবে যে লোকটার ওপরে দেখবার ভার ছিল সে মারা যাবার পর বন্ধ রয়েছে। মেরামৎ আবশ্যক।

শেখর—তুমি গিয়ে সেই ব্যবস্থা করো। মেরামৎ হলে লিখো, আমি যাব।

শ্যামনাথ এই প্রস্তাবে রাজি হইল না। বলিল, ক'দিন থাকবে যে বাড়ী মেরামৎ করে তবে যেতে চাও ? অবশ্য মেরামৎ করে রাখা ভাল। ওখানে গিয়ে নিজে দেখে শুনে করো।

শেখর বলিল, পঞ্চক্রোশীওয়ালাদের কথা যা শুনেছি তাতে ভরসা পাইনে। বড় তরফের ভাগ্নে হয়ে ছোট তরফে উঠব, তাই নিয়ে শরিকে শরিকে লাঠালাঠি লেগে যাবে।

তাহার কথা শুনিয়া শ্যামানাথ হাসিল। বলিল, তোমার ধারণা পঞ্চক্রোশী "লষ্ট ওয়ার্লডে"র মত দেশ হয়ে রয়েছে, ট্রিয়াসিক যুগের ডাইনোশোর ও টিরেনোশোর এখনও সেখানে চরে বেড়াচ্ছে ? গিয়ে দেখবে পঞ্চক্রোশী মডার্ণ হয়েছে।

নিজের মনে কি মতলব স্থির করিয়া শেখর বইগুলি পঞ্চক্রোশীর ঠিকানায় পাঠাইল। শ্যামানাথ শেখরের বাড়ীতে মিস্ত্রী লাগাইবার জন্য নিজের কর্মচারীকে লিখিল।

কয়েকদিন পরে উভয়ে রওনা হইল।

শেখর ছেলেবেলায় বার কয়েক পঞ্চক্রোশী আসিয়াছিল, সব কথা তাহার বিশেষ মনে ছিল না। নিজের বাড়ী দেখিয়া সে খুশী হইল। নিজের বাড়ীতে উঠিল সে। মেরামতের কাজও চলিতে লাগিল।

কিছুদিন আগে রাধারাণীর পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, তিনি শ্বশুরের গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। শেখরের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল।

প্রথম আলাপেই শেখর রাধারাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। পঞ্চক্রোশীর জমিদার বাড়ীর কোন বৌ এমন শিক্ষিতা, তেজস্বিনী, স্বাধীনচেতা হইতে পারেন ইহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই আগে। রাধারাণীও এই রূপবান, শিক্ষিত, সদালাপী ভাগ্নেটির সঙ্গে আলাপ করিয়া প্রীত হইলেন, আন্তরিক স্নেহের সঙ্গে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। কয়েকবার শেখরের সঙ্গে আলাপ করিবার পর তাঁহার মনে হইল শেখর মানুষটি খাঁটি, সে যথেষ্ট পড়া শোনা করিয়াছে এই বয়সে বিত্তশালী হইলেও তাহার স্বভাবে, মনে বা ব্যবহারে কোথাও ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নাই।

শেখর শ্যামানাথের কাছে রাধারাণীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে সে হাসিয়া বলিল, ফিউড্যাল রেওয়াশিয়ায় তা হলে প্রশংসা করবার মত কিছু দেখতে পেলে? কয়েকদিন যাক, আরও দেখতে পাবে।

বাড়ী মেরামৎ চলিতে লাগিল, ইতিমধ্যে তাহার বই গুলি আসিয়া পড়িল। সেগুলি গুছাইয়া লইয়া শেখর পড়াশোনা করিতে আরম্ভ করিল। জায়গাটা তাহার ভালই লাগিতেছিল। বাড়ীর সম্মুখে ও পিছনে এককালে বাগান ছিল, এখন আগাছার জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সে উদ্যান চর্চা আরম্ভ করিল। কলিকাতা হইতে নানারকম ফুল গাছের চারা আসিল। রাধারাণী কোন কোন দিন সকালের দিকে আসিয়া তাহার জন্য দুই চারি পদ মাছ তরকারী রান্না করিয়া দিতেন। সন্ধ্যার দিকে তিনি আসিলে গল্প আরম্ভ হইত, তর্ক বিতর্ক লাগিয়া যাইত। শ্যামানাথ দুই বেলাই আসিত। রাধারাণী যে দিন রান্না করিতেন তাহার আহারের ব্যবস্থা শেখরের বাড়ীতেই হইত।

এইভাবে কিছুদিন কাটিল।

একদিন শ্যামানাথ বলিল, দেখে তো মনে হচ্ছে ফিউড্যাল বিওশিয়া ভালই লাগছে। পরীক্ষাটা তো দিলে না। এখন কি করবে, ওকালতি করবে না আবার পড়বে?

শেখর বলিল, সে সব কথা এখনও ভাবিনি, সময়মত ভাবা যাবে। কতকগুলো বই এনেছি এগ্রিকালচার ও ইনডাষ্ট্রিয়ালাইজেশন সম্বন্ধে। আপাততঃ সেই গুলো পড়ব।

তারং'ব বলিল, ভাল কথা মনে পড়ল। তোমাদের গাঁয়ে নাকি এক অবতারের আবির্ভাব হয়েছে রাঙামামীমা বললেন। ওঁর ভারী ভক্তি দেখলাম লোকটির ওপর। অনেক কথা বললেন তাঁর সম্বন্ধে। বললেন লোকটি পরম বৈষ্ণব ও সাত্বিক প্রকৃতিব। এ মুলুকের ছোট জাতেরা তাঁর শিষ্য হয়েছে কিন্তু শিষ্যরা নাকি মিলিটাণ্ট, বাবু শ্রেণীর ওপর তাদের ভয়ানক রাগ। আরও একটা ইণ্টারেষ্টিং খবব দিলেন রাঙামামীমা। মুসলমানরাও নাকি এই মহাপ্রভুর কাছে যাতায়াত করে। আই ফীল ইন্ট্রিগ্‌ড। যাবে নাকি একদিন অবতার সন্দর্শনে? না পঞ্চক্রোশীর এবিষ্টোক্রেটিক কোডে বাধবে?

শ্যামানাথ বলিল, দীনদয়াল ঠাকুবের কথা আমিও শুনেছি। হি হ্যাজ এন ইণ্টারেষ্টিং হিষ্ট্রি। রাঙাকাকীমা তাঁর আশ্রমে যান শুনে বড কাকাবাবু, মানে রায় বাহাদুব হেমাঙ্গনাথ খেপচুবিয়াস হয়ে আছেন। বলেন দেবনাথ ছিল অকাল কুষ্মাণ্ড আর তাব ছোটলোকের মেয়ে বৌ হয়েছে আত্মসম্মান জ্ঞানবর্জিত। পঞ্চক্রোশীর বাবুদের মাথা হেঁট করল সকলের কাছে।

বিকালে উভয়ে দীনদয়াল ঠাকুরের আশ্রমে যাইবে স্থির কবিয়া শ্যামানাথ বাডী গেল। দুপুব হইতে বৃষ্টি সুরু হইল, বিকালেও বৃষ্টি ছাড়িল না। দুর্যোগেব জন্য সেদিন আশ্রমে যাওয়া হইল না।

পরদিন সকালে শহব হইতে শেখর এক চিঠি পাইল। যে উকিল তাহার পিতার জুনিয়ার হইয়া কাজ করিতেন তিনি চিঠি লিখিয়াছেন স্থানীয় আরব্যান লোন ব্যাঙ্কেব অবস্থা ভাল নয়। সেখানে তাহার পিতা কিছু টাকা রাখিয়াছিলেন। টাকাটা শেখরের নামে জমা আছে। পত্রপাঠ শেখর চলিয়া আসিলে টাকা তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন তিনি। বিলম্ব করিলে টাকাটা মারা যাইতে পারে। অংশীদারদের সভা ডাক হইয়াছে দিন সাতেক পরে। এই সভায় ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিবে কিনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। আমানতকারীরা যাহাতে কিছু না জানিতে পারে এজন্য গোপনে সব ব্যবস্থা হইতেছে।

পত্র পাইয়া শেখর শহরে রওনা হইয়া গেল।

বারো আনা টাকা আদায় হইল, বাকীটা দিবার জন্ম ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দুইদিন সময় চাহিলেন। নির্দিষ্ট দিনে টাকা আনিতে গিয়া শেখর দেখিল ব্যাঙ্ক বন্ধ, নোটিশ ঝুলিতেছে দরজার গায়ে।

দশ বারো দিন নানা গোলমালে কাটিয়া গেল। শেষ পর্যন্ত চারি বৎসরের কিস্তীতে বাকী টাকা পরিশোধ করা হইবে এই আশ্বাস পাইয়া শেখরকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। তাহার পিতৃবন্ধু উকিলরা একে একে আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে ও পৈতৃক ব্যবসায় আরম্ভ করিতে উপদেশ দিলেন। কেহ কেহ সুপাত্রীর সন্ধান আনিয়া মেয়ে দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সংসারী হইবার জন্য শেখরের নিজের তাগিদ ছিল না। হিতৈষীদের তাগিদ হইতে পরিত্রাণ লাভের অন্য কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া সে আদায়ী টাকার একটা ব্যবস্থা করিয়া পঞ্চক্রোশী রওনা হইল। সে অনুভব করিল জায়গাটার উপর মনটা যেন তাহার কেমন যেন টান পড়িয়াছে একটু।

রওনা হইবার আগে সে উকিল মহলে পাঞ্জাবের ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইতেছে শুনিল।

দেশের পোলিটিক্স সম্বন্ধে শেখরের কোনদিন বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সে মনে করিত পাঁচশত বৎসর মুসলমান ও দুইশত বৎসর ইংরাজের গোলামি করিতেছি আমরা, গোলামের আবার পোলিটিক্স কি? গোলামের একমাত্র পোলিটিক্স হইতে পারে বিদেশী শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা, কিন্তু আমাদের পোলিটিক্সওয়ালারা চাহিতেছে দুই চারিটা বেশী চাকুরি, ও এক ফোঁটা বেশী স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। এ ধরণের পোলিটিক্স বা পোলিটিক্যাল এজিটেশন মাথা ঘামাইবার যোগ্য বস্তু নয়।

তখন হান্টার কমিটির কাছে সাক্ষ্যের বিবরণ বাহির হইতেছিল কাগজে। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে আগ্রহশূন্য শেখর দিনের পর দিন এই বিবরণ পড়িয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

শ্যামানাথের সঙ্গে এ সম্বন্ধে তাহার অনেক কথাবার্তা হইত।

একদিন রাধারাণী স্বয়ং দীনদয়াল ঠাকুরের আশ্রমে যাইবার প্রস্তাব করিলেন শেখরের কাছে। বলিলেন, আশ্রমে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে শুনলাম। তোমরা একবার ঘুরে এস ওখান থেকে, তারপর কথা হবে।

দুই

কয়েক মাস পরে।

অসহযোগের জোয়ার লাগিয়াছে দেশে। এ জোয়ারে অনেকেই ভাসিল। বার্টাণ্ড রাসেল, মার্কস ও ক্রোপ্টকিনের পাঠক শেখর ভাসিল। শ্যামানাথ, রাধা-রাণী ও পঞ্চক্রোশীর অনেকগুলি ছেলেছোকরাকে সঙ্গে লইয়া সে ভাসিল।

দীনদয়াল ঠাকুরের আশ্রমের সঙ্গে শেখরের দলের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই সংযোগের সূত্র সহানুভূতি, দুই দলের কাজ পৃথক খাতে চলিতেছিল। ছেলেরা আরম্ভ করিয়াছিল স্কুল বয়কট, হাটে ও বাজারে বিলাতী জিনিসের দোকানে পিকেটিং। রাধারাণী চরকা ও খদ্দর প্রচারের ভার লইয়াছিলেন। শ্যামানাথ কখন ছেলেদের সঙ্গে, কখন রাধারাণীর সঙ্গে থাকিত, মাঝে মাঝে সে কোন কাজ না করিয়া শেখরের সঙ্গে ঘুরিত বা তর্ক-বিতর্ক করিত। শেখর দীনদয়াল ঠাকুরের আশ্রমের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছিল। তাহাকে মাঝে মাঝে অসহযোগ নীতি ও আন্দোলনের নেতাদের কাজের ধারা ব্যাখ্যা করিতে হইত আশ্রমে ও ছেলেদের কাছে।

শেখর লক্ষ্য করিল দীনদয়ালের অনুচরগণের মধ্যে শুধু যে এক নূতন উদ্দীপনা আসিয়াছে তাহা নয়, তাঁহার আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া পঞ্চক্রোশী ও আশপাশের অঞ্চলের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জাতিগুলির মধ্যে এই উদ্দীপনা দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হইতেছে।

দীনদয়াল তাঁহার শিষ্যদিগকে যে উপদেশ দিতেন তাহাতে চরকা ও খদ্দর অপেক্ষা কায়িক ও মানসিক আত্মশুদ্ধি, ভগবানে বিশ্বাস, সৎপথে নির্ভয়ে চলা, সত্যের অনুসরণ, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস অর্জন, অহিংসা ও শান্তির কথা থাকিত। শেখর ভাবিত উপদেশ তো সাধু ও জ্ঞানী লোকেরা চিরকাল দিয়া আসিতেছেন কিন্তু অসংখ্য লোক বিপুল উৎসাহে সন্তবাণী নিজেদের জীবনে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন দৃশ্য বড় দেখা যায় না।

শেখরের মনে সন্দেহ ছিল না যে দীনদয়াল একজন শক্তিশালী পুরুষ। কিন্তু চারিদিকে জাগরণের যে বিস্ময়কর লক্ষণ দেখা যাইতেছে, যাহারা নিরক্ষর,

অজ্ঞ, উপেক্ষিত, উৎপীড়িত, যাহারা ধর্মের নামে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত, যাহারা দারিদ্র্য ও অশিক্ষার ফলে অনুদার ও কু-আচার পরায়ণ. আজ যে তাহারা হঠাৎ জাগিয়া উঠিতেছে এ কি শুধু দীনদয়ালের উপদেশের ফল? না দীনদয়াল ইহার নিমিত্ত মাত্র? অহিংস অসহযোগের সূক্ষ্মনীতি, দীনদয়ালের তত্ত্বকথা ইহারা বুদ্ধি দিয়া কতখানি গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে শেখরের সন্দেহ ছিল, কিন্তু গান্ধীজীর নবজাগরণের বাণীকে তাহারা যে বিপুল আশা ও উৎসাহের সঙ্গে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহের অবসর ছিল না।

সেদিন সন্ধ্যার পর অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে শেখর গৃহে ফিরিতেছিল। তাড়ি, গাঁজা, আফিং, ভাং বর্জনের আন্দোলন খুব জোরে চলিতেছিল। বাগ্‌দী, হাড়ি, কেওট, বাউরী, ডোম, বুনোরা বেতাই চণ্ডী দেবীর নামে শপথ করিয়া মাদক বর্জন করিয়াছিল। দুই চারিজন বৃদ্ধ ও কিছু সংখ্যক কু চরিত্রের লোক লুকাইয়া আফিং ও গাঁজার দোকানে যাইত। আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকরা এইজন্য দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছিল। দোকানী গোপনে জমিদার হেমাঙ্গনাথের কাছে নালিশ করিয়াছিল। দোকানটি তাঁহার জমিতে। হেমাঙ্গনাথ পুলিশে খবর পাঠাইয়াছিলেন। চুরি ডাকাতির খবর পাইলে পুলিশ আসিতে বিলম্ব করিতে পারে কিন্তু সরকারী আবগারী বিভাগের আয় বন্ধ হইতেছে খবর পাইয়া আসিতে তাহারা বিলম্ব করিতে পারিল না। পুলিশ সদলে আসিয়া পড়িল। স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল পুলিশের অতিরিক্ত গরম মেজাজ দেখাইবার ফলে। সময়মত আশ্রমে খবর পৌছিতে উত্তেজিত স্বেচ্ছাসেবকদের অনেক আয়াসে ঠাণ্ডা করা সম্ভব হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে শেখর তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে পৌছাইয়া দিয়া বাড়ী রওনা হইল।

বারান্দায় উঠিতে শেখর ঘরের মধ্যে শ্যামানাথের গলা ও চরকার শব্দ শুনিতে পাইল। সে ভাবিল অসহযোগব্রতী শ্যামানাথ বোধহয় তাহার প্রাত্যহিক সূত্রযজ্ঞ তাহার বাড়ীতে বসিয়া সম্পন্ন করিতেছে।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত হইয়া সে দেখিল দুইটি অপরিচিতা তরুণী তাহার চরকা লইয়া ব্যস্ত, একজন সূতা কাটা শিখিতেছেন, অপরে শিখাইতেছেন। শ্যামানাথ একখানি চেয়ারে বসিয়া বক্তৃতা করিতেছে, মেঝেতে বসিয়া রাধারাণী হাসি মুখে তাহা শুনিতেছেন।

শেখর ঘরে ঢুকিতে উভয় তরুণী চরকা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও একপাশে

সরিয়া গেল। রাধারাণী তাহাব দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে শেখর, আগে হাত মুখ ধুয়ে সুস্থ হও, তারপর কথা হবে।

শ্যামানাথ বক্তৃতা বন্ধ করিয়া বলিল, আজই সেকেণ্ড দি মোশন।

তারপর নিজেব হাত তুলিয়া বলিল, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

শেখর একটু হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

হাত মুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া শেখর ফিরিল। দেখিল মেঝেতে আসন পাতিয়া জায়গা কবা হইয়াছে ও একটি মেয়ে খাবারেব থালা হাতে আসনের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া থালাটি আসনেব সম্মুখে সন্তর্পণে নামাইয়া সে হাসি মুখে বলিল, আসুন, খেতে বসুন।

এক পা আগাইয়া আসিয়া সে আবাব বলিল, একটু দাঁড়ান।

নত হইয়া সে শেখরকে প্রণাম কবিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে ঘরের চাবিদিকে চাহিয়া বলিল, তাবা পালিযেছে আপনি খেতে বসুন।

শেখব আসনে বসিয়া রাধাবাণীব দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। বাধারাণী তাহার প্রশ্ন বুঝিয়া বলিলেন, এটি আমাব মেযে নাণ্টি, শ্বশুববাড়ী থেকে কাল এসেছে।

নাণ্টি প্রতিবাদ করিয়া বলিল, আমার নাম বেলাবাণী, নাণ্টি ছেলেবেলার বাতিল নাম।

রাধারাণী হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমার ভুল হয়েছে। যেটি পালিয়েছে তার নাম সন্ধ্যাতাবা, সবাই তারা বলে ডাকে, আমাব মেযের ননদ। সম্পর্কে শ্যামানাথের শালী।

শ্যামানাথ গলা বাডাইয়া বলিল, ইযেস, এণ্ড ইট ইজ এ গ্রেট মিসফরচুন: সম্পর্কটা অন্যবিধ হওয়া উচিত ছিল। আমার বিয়েব সময় ও যদি আর একটু বড় হত! তারু, যেখানেই পালিয়ে থাক আমাব কথাটা কান পেতে শুনো।

নাণ্টি বলিল, আপনি ঐ সব যা তা বলেন তাই তো তারা আপনাব সামনে বেরোতে চায় না। কাকীমার সামনে আপনি তো বেশ মুখ বুঁজে থাকেন।

শেখর খাইতে খাইতে ইহাদের রহস্যলাপ শুনিতে লাগিল।

খাওয়া শেষ হইলে শেখর একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ স্কুলে পিকেটারদেব মারধোর করেছে পুলিশ? ওদিক-কার খবর কি?

শেখর বলিল, গাঁজার দোকানে পিকেটিং নিয়ে গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিল। রায়বাহাদুর পুলিশ ডেকে এনে খারাপ কাজ করলেন।

রাধারাণী—ওঁর কোন কাজটা ভাল হয়ে থাকে? একটা গুজব কানে এসেছে, তোমাদের বলে রাখি। কাগজপত্র দেখে নাকি সাব্যস্ত হয়েছে ঠাকুরের আশ্রমের জমিটা বড় তরফের খাস জমি। ওঁর মাথায় কি মতলব আছে ভগবান জানেন।

শ্যামানাথ—শয়তান জানে বলুন কাকীমা।

শেখর বলিল, খবরটা ভাল নয়।

শ্যামনাথ—ভাল নয় বলছ কেন? খাস জমি বলে দখল নেবার চেষ্টা করবেন ভাবছ? গাঁয়ের সকলে সাক্ষ্য দেবে বেতাই চণ্ডীর জঙ্গল আবহমান কাল বাগ্‌দী জাতিদের দেবস্থান, কোন দিন জমিদার সরকারের দখলে ছিল না।

শেখর—ও সব কথা এখন থাক। আন্দোলনের গতি কোন দিকে ঘুরবে বলা কঠিন, কিন্তু এ পর্যন্ত আমি যা লক্ষ্য করেছি আপনাদের খুলে বলছি। দীনদয়াল ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে এক দল আছে যাদের বলা যায় অন্ধ ভক্ত। এরা বলে সি. আর. দাশ, মহাত্মা গান্ধী কেউ কিছু নয়, ঠাকুরই সব। তাঁর অলৌকিক শক্তি, ইচ্ছে করলে তিনি সব করতে পারেন। এরা কেউ বলে বেতাই চণ্ডী দেবীর শক্তি ঠাকুরের মধ্যে আর্বিভূত হয়েছে, কেউ বলে ঠাকুর ধর্মঠাকুরের অবতার, ভক্তদের মঙ্গল সাধন করবার জন্য জন্ম নিয়েছেন। ঠাকুরের উপদেশমত সমাজ সংস্কার ও ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষ ত্রুটি সংশোধন করবার জন্য এরা উঠে পড়ে লেগেছে।

আর একটা দল আছে যারা মনে করে ঠাকুর কল্কি অবতার, এ যুগ উল্টে দিয়ে নূতন যুগ আনবেন দেশে। উঁচু জাতের লোকেরা এত দিন যা ইচ্ছে করে এসেছে, এবার ছোট জাতের লোক ওপরে উঠবে। সমাজের কর্তা হবে তারা। এত দিনের অত্যাচার, অবিচার তারা বন্ধ করে দেবে। এরা মনে করে ঠাকুরের হাত দিয়ে এই কাজ হবে।

তৃতীয় একটা দল গড়ে উঠছে। উচ্চ জাতের বিরুদ্ধে, যারা সাক্ষাৎভাবে এতদিন তাদের ওপর অন্যায় ও অবিচার করেছে তাদের ওপরে, এই দলের বিরুদ্ধভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সমাজের সকল উৎপীড়িত নিগৃহীত লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এরা বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মানে যারা ব্যবস্থার রক্ষক, তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা মনে পোষণ করে। রাজনৈতিক

আন্দোলন বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা নিয়ে এরা মোটে মাথা ঘামাতে চায় না। এরা অসহযোগ বলতে বোঝে বাবুদের সঙ্গে অসহযোগ, তাদের দাবিয়ে রাখবার যন্ত্র যারা তাদের সঙ্গে অসহযোগ।

আমি শুনেছি এই দলের মাতব্বররা নমঃশূদ্র, কৈবর্ত ও মুসলমানচাষীদের মধ্যে উচ্চতর শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করছে। মুসলমান চাষীদের এক মাতব্বরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে আশ্রমে। তার নাম পিরু হাজী। নিরক্ষর বললেই হয় কিন্তু এমন ধূর্ত লোক আমি কম দেখেছি। এদিকে মহা ধার্মিক লোক, কথায় কথায় হাদিশ, সরিয়ত, ইমান, বুদপরস্ত, রসুলের উল্লেখ করে। ফ্যানটিকের জোশ লাগিয়ে কথা বলে। কি অভিপ্রায়ে হাজি আশ্রমে যাতায়াত করছে এখনও তার কথা থেকে বুঝতে পারিনি, তবে অনুমান করছি।

রাধারাণী বলিলেন, এদের কোন দলের হাতে অহিংস অসহযোগের বিপদের সম্ভাবনা বেশী?

শেখর কি ভাবিতেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল—বিপদের সম্ভাবনার কথা আমি ভাবছিনে, আমি ভাবছি সম্ভাবনার কথা।

শ্যামনাথ বলিল, তোমার কথা বুঝলাম না।

শেখর—না বোঝবার মত কথা বলিনি। দীনদয়াল ঠাকুরের শিষ্যদের সম্পর্কে যা বলেছি সেটা ছেড়ে দাও। চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছ মহাত্মার বাণী দেশে একটা আলোড়ন এনেছে। আমার ধারণা এই আলোড়নের কারণ অহিংস অসহযোগ নীতির উচ্চ আদর্শ নয়, এর কারণ এই নীতির দুঃসাহসিকতা।

—তোমাদের গভর্ণমেণ্ট শয়তানের গভর্ণমেণ্ট, এই গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমরা কোন প্রকার সহযোগিতা করব না,—প্রবল প্রতাপশালী গভর্ণমেণ্টের মুখের ওপর এই কথা বলবার সাহস গোটা জাতকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। যে আলোড়ন দেখা দিয়েছে তার প্রধান কারণ এই, অন্য কারণও অবশ্য আছে। দীনদয়াল ঠাকুরের শিষ্যসমাজ ও পঞ্চক্রোশীর ভদ্রসমাজের দিকে চাইলে বুঝতে পারবে যে আলোড়ন বেশী প্রবল হয়েছে সমাজের নিম্নস্তরে। অসহযোগ আন্দোলন সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যে যে energy release করেছে সেটা কোন দিকে মোড় নেবে সেইটে হল ভাবনার কথা। সম্ভাবনার কথা আমি যা বলেছি তার মানে হচ্ছে এই।

শ্যামনাথ কি বলিতে যাইতেছিল তাহাকে বাধা দিয়া শেখর বলিল, পিরু হাজীর কথা বলেছি। আরেকটি ইণ্টারেস্টিং ক্যারেক্টার দেখলাম আশ্রমে।

নাম কালিন্দী, জাতে নমঃশূদ্র। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের বিধবা। শুনলাম তার স্বামী সম্প্রতি মারা গেছে ও রায়বাহাদুর হেমাঙ্গনাথ তার জমিজমা সব খাস করে নিয়েছেন। দীনদয়াল ঠাকুরের শিষ্যবর্গের ওপর, স্বয়ং ঠাকুরের ওপর ওর খুব প্রভাব। শুনলাম বেতাই চণ্ডী দেবীর ভর হয় তার ওপরে। ভর হলে ঠাকুরের আসনে বসে সে উপদেশ দেয়। ওকে দেখে আমার মনে হল she bears herself like a Joan of Arc.

রাধারাণী বলিলেন, কালিন্দী? ওকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। খুব কালো কিন্তু গড়ন একেবারে নিখুঁত।

শেখর হাসিয়া বলিল, কালোর ও রকম জলুস বড় দেখা যায় না। লোকে কিন্তু—। পাশের ঘর হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিল—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলোরে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলোরে।
যদি কেউ কথা না কয়,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়···

গলা নামাইয়া শেখর বলিল, কে গাইছে রাঙামামীমা?

রাধারাণী বলিলেন, তারা। ওর গলা ভারী মিষ্টি। মীরার ভজন ও বড় সুন্দর গায়। ডাকব ওকে, শুনবে?

শ্যামানাথ বাধা দিয়া বলিল, ও কাজ করবেন না কাকীমা। ডাকলে সন্ধ্যা-তারা লজ্জাবতী লতার মত গুটিয়ে যাবে। নিজের মনে গাইতে দিন।

শেখর চুপ করিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ গান শুনিল। গান তখনও চলিতেছিল, হঠাৎ সে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাধারাণী একটু বিস্মিত ভাবে তাহার গমন পথের দিকে চাহিলেন। তার পর শ্যামানাথের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, শেখর এমন করে চলে গেল যে?

শ্যামানাথ গলা নীচু করিয়া বলিল, পালালো।

রাধারাণী—সে কি? হঠাৎ পালাবার কি কারণ ঘটল?

শ্যামানাথ—শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে না, তবে আমার অনুমান ও গান শুনে পালালো।

রাধারাণী কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে শ্যামানাথের দিকে চাহিলেন।

শ্যামানাথ চেয়ার ছাড়িয়া রাধারাণীর কাছে আসিয়া মেঝেতে বসিল। নিম্নস্বরে বলিল, শেখর গান ভয়ানক ভালবাসে, কিন্তু বলে ভাল গান ও সহ্য করতে পারে না।

রাধারাণী—গান খুব ভালবাসে অথচ গান সহ্য করতে পারে না, এর মানে আমি বুঝলাম না।

শ্যামানাথ—এ সম্বন্ধে শেখরের একটা থিওরী আছে। সে বলে ভাল গান নাকি ওর মনের ওপর মাদকের মত কাজ করে। সাময়িক ভাবে ওর মন দুর্বল হয় ভাল গান শুনলে। ও বলে ওর মনের কোথায় একটা দুর্বল জায়গা আছে, ভাল গান সেই দুর্বল জায়গায় আঘাত করে। আমি সব কথা জানিনে, তবে শুনেছি এই গানের ব্যাপার নিয়ে ও কোন একটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, বিয়ের কথাও উঠেছিল। হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে শেখর সরে পড়ল।

রাধারাণী বেগড়াবার কারণ কি ?

শ্যামানাথ—ঠিক জানিনে। তবে মনে আছে শেখর একবার বলেছিল তার হৃদয়কে না জাগিয়ে মনের বিশেষ একটা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে তার ঘরে আসতে চায় তার হাতে নিজের সুখ দুঃখের ভার দিতে ও ভয় পায়। হয়ত এই ভয়ের জন্য ও সরে পড়েছিল।

রাধারাণী আর কোন প্রশ্ন করিলেন না, চুপ করিয়া শেখরের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

গান বন্ধ হইয়াছিল, নান্টি ও তারা ঘরে আসিল। নান্টি বলিল রাত হল, এবার চলো মা। শেখরদা কোথায় গেলেন ? ওঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপ পরিচয় হল না তোমাদের অসহযোগের কচকচির জ্বালায়।

রাধারাণী বলিলেন, শেখর আসছে, তোরা বোস একটু।

শেখর বাহিরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছিল, একটু পরে ফিরিয়া আসিল। তাহার কাছে বিদায় লইয়া রাধারাণী গৃহে ফিরিবার জন্য উঠিলেন।

শেখর একবার নান্টি একবার তারার দিকে চাহিয়া বলিল, আর একটু বসবেন না ?

রাধারাণী—আজ রাত হয়েছে। তুমিও ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছ। আজ যাই।

যাইবার সময় নান্টি বলিল—শেখর দা, আপনার বাগান খুব সুন্দর হয়েছে, আজ ভাল করে দেখা হল না।

শেখর—যখন খুশী এসে দেখো।

নান্টি—যদি কাল সকালে খুশী হয়, আসবো?

শেখর হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়।

নান্টি—যদি বাগান দেখতে দেখতে খিদে পেয়ে যায়?

রাধারাণী হাসিয়া মেয়েকে ধমক দিলেন। মেয়ে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, খিদে পেলে বাড়ী গিয়ে খেতে বলবেন তো?

শেখর হাসিয়া বলিল, যদি এখানে খেতে বলি?

নান্টি এবার নিজে হাসিল। বলিল, সেই কথাই তো শুনতে চাইছি আপনার মুখ থেকে। বেশ, কাল আমার আর তারার নেমন্তন্ন রইল এখানে। কিন্তু আপনার ঠাকুরটা ছাই রাঁধে, শেখর দা। আমরা দু'জনে এসে রান্নাবান্না করে নেমন্তন্ন খাবো। এই ঠিক রইল তো? শেখর বলিল, তা রইল। তবে নিজেরা যখন রাঁধবে একটু সকাল করে এসে বাজারে লোক পাঠিয়ো।

নান্টি বলিল, তা পাঠাবো বই কি। আচ্ছা, আজ চলি, মা মনে মনে আমাকে বকছেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন বলে।

পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের পর গভর্ণমেণ্ট কিছুদিন হাত গুটাইয়া অবস্থা দেখিতে লাগিল। ইংরাজের লজ্জা না থাকুক চক্ষুলজ্জাটুকু আছে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন ক্রমে এমন বেয়াড়া হইয়া উঠিতে লাগিল যে দেশের লোকের শেষ সম্বল ইংরাজের চক্ষুলজ্জাটুকুও ঘুচিয়া গেল।

ঘুচিবার কথা। সেই সিপাহী বিদ্রোহের পরে হিন্দু মুসলমান মিলিয়া এদেশে আর কোন আন্দোলন করে নাই। তারপর এত বড় ব্যাপক আন্দোলনও আগে আর হয় নাই। কংগ্রেস ও লীগের আন্দোলন ছিল বাবুদের আন্দোলন, শহুরে আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িয়াছে দেশের চাষী-মজুরদের মধ্যে, ছড়াইয়া পড়িয়াছে গ্রামে গ্রামে। তারপর কংগ্রেস ও লীগের আন্দোলন ছিল গরম গরম লেখা ও কথার কাগুচে ও বাঙ্ময় আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন কাজের আন্দোলন। স্কুল কলেজ ছাড়, আইনসভা ছাড়, আদালত ছাড়, মাদক বর্জন কর, বিদেশী জিনিস বর্জন কর, খেতাব বর্জন কর। লোকে বলিতেছে, খেতাব বর্জনে কিছু যায় আসে না। ইংরাজ সরকারের প্রদত্ত

সম্মান প্রত্যাখ্যান করা সেই সরকারের প্রেষ্টিজের উপর কত বড় আঘাত ইংরাজ ছাড়া সে কথা আর কে বুঝিবে? গান্ধী সরকারের এত বড় প্রেষ্টিজ ধুলায় লুটাইয়া দিয়াছেন, চাষা-ভুষা-কুলির কাছে পর্যন্ত সরকারকে বেইজ্জত করিয়াছেন, রাজভক্তির উৎসমুখে পাথর ফেলিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গান্ধী অসহযোগের সঙ্গে "অহিংস" কথাটি জুড়িয়াছেন সরকারের হাত আটকাইবার জন্য। ভাবিয়াছেন এই অহিংসার অজুহাত দেখাইয়া তিনি কাজ গুছাইতে থাকিবেন আর সরকার হাত গুটাইয়া চাহিয়া দেখিবে।

ষ্টীলফ্রেমের বাহকদের উপর চালাও আদেশ হইল আন্দোলন ঠাণ্ডা কর যে কোন উপায়ে সম্ভব।

ছোটবড় সকল স্থানীয় শাসক ও পুলিশ আইন, লাঠি ও রাইফেল লইয়া আবার কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল। পিকেটিং, সভা, শোভাযাত্রা, হরতাল, প্রভাতফেরি, চরকা, খদ্দর, গান্ধীটুপী, নেতাদের চিত্র, সংবাদপত্র, পোষ্টার, অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিটি আঙ্গিকের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হইল।

যেমন অন্যত্র তেমনি পঞ্চক্রোশীতেও সরকারী অভিযানের প্রচণ্ডতা আত্মপ্রকাশ করিল।

দীনদয়াল ঠাকুরের আশ্রম তল্লাস হইল, কীর্তন ও প্রার্থনা সভা নিষিদ্ধ করিয়া পুলিশ নোটিশ জারি করিল। স্কুলের খেলার মাঠে স্বেচ্ছাসেবকদের জমায়েত বন্ধ হইল। আশ্রমের যে সকল স্বেচ্ছাসেবক মাদক বর্জন আন্দোলন চালাইতেছিল তাহাদের অনেকে গ্রেপ্তার হইল।

কর্তারা মনে করিলেন উৎপীড়নের সাহায্যে তাঁহারা আন্দোলন দমন করিবেন। তাঁহারা ভাবিলেন না যে আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে চলিতেছিল এমন আপ্রাণ চেষ্টায় খোঁচাইলে তাহা বিপথে যাইতে পারে। সর্বদেশে সর্বকালে দণ্ডধারীরা বিশ্বাস করে দণ্ড সংবরণ করা দুর্বলতার পরিচায়ক।

অন্য অনেক জায়গায় যেমন ঘটিতেছিল পঞ্চক্রোশীতেও তেমনি সরকারী দমননীতিতে ইন্ধন যোগাইবার জন্য লোক আগাইয়া আসিল।

বড় তরফের রায় বাহাদুর হেমাঙ্গনাথ গর্বিত, কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তি। ভ্রাতৃবধূ রাধারাণী যে দিন তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন সেই দিন হইতে তিনি তাঁহার উপর বিরক্ত। এই বিরক্তি নানা ঘটনায় বাড়িয়া উঠিতেছিল। তিনি বাস্তবিক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন যেদিন সংবাদ পাইলেন রাধারাণী বাগ্‌দী দীনদয়ালের আড্ডায় গিয়াছিলেন। আগেকার দিন হইলে

এই স্বেচ্ছাচারিণী বিধবা ভ্রাতৃবধূকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনে তিনি অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার জ্ঞাতিশত্রু রাধানাথের পুত্র শ্যামানাথ ছিল রাধারাণীর সহায়। এই দলে আসিয়া জুটিয়াছে তাঁহার ভগ্নীর গুণধর পুত্রটি। লেখাপড়া শিখিয়াছে, ওকালতিতে বসিবে, পশার প্রতিপত্তি জমাইয়া মানুষের মত মানুষ হইবে, তাহা নয়, বাপের অগাধ পয়সা ভাঙ্গিয়া খাইতেছে ও বাউণ্ডুলি করিতেছে। এই সব ক'টাই বাগদীটার আড্ডায় ঘোরাফেরা করে।

শুনিয়া হাসি পায় এই বাগ্‌দীটা নাকি আশ্রম বানাইয়াছে, ঠাকুর হইয়াছে। আশ্রম বটে? যত বদমাইস ছোটলোকের তাড়ি গাঁজার আড্ডা। গান্ধী আন্দোলন এই ছোটলোকদের মাথা বিগড়াইয়াছে।

সেদিন পুলিশ ইনসপেক্টর দেখা করিতে আসিয়া যে খবরটি তাঁহাকে দিয়াছে সেই খবরের কথা মনে পড়িল তাঁহার। বাগ্‌দীটার আড্ডায় পুলিশের চর ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই চর বলিয়াছে দুইজন লোক নাকি তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করিতেছে: দুইজনের একটি কালিন্দী নামে একটা নষ্ট মেয়ে মানুষ, অপরটি ফকিরপুরের সেরা পাজি প্রজা সিরু হাজী। পুলিশের চর বলিয়াছে যাহাদের জমিজমা তিনি খাজনার দায়ে খাস করিয়াছেন তাহারা আইন আদালত না করিয়া নিজেরা প্রতিবিধান করিবে বলিয়া শাসাইতেছে।

এই কথা শুনিবার পর হইতে দীনদয়াল বাগ্‌দীর গাঁজার আড্ডা তিনি ভাঙ্গিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সরকারের সাহায্যে কৌশলে এই কাজ করিতে হইবে।

সেরেস্তার কাগজ হইতে জানা গেল বেতাই চণ্ডীর জঙ্গল বলিয়া পরিচিত জায়গাটি অনেকদিন আগে লাখেরাজ দেওয়া হইয়াছিল এক বাগ্‌দী সর্দারকে। এই সর্দার বেতাই চণ্ডীর থানের প্রতিষ্ঠাতা। সে বাগ্‌দীর বংশ ফৌত হইয়াছে। সুতরাং জমি সরকারী খাস বটে। শুধু অবহেলা করিয়া দখল লওয়া হয় নাই। ফলে লোকের ধারণা হইয়াছে এই জায়গাটা বাগ্‌দীদের নিষ্কর দেবস্থান।

এই তথ্য অবিষ্কার করিয়া তিনি উচ্ছেদের নালিশ করিলেন দীনদয়ালের নামে।

মোকদ্দমার আর্জি পেশ হইবার খবর প্রকাশ হইয়া পড়িতে উত্তেজনার সৃষ্টি হইল গ্রামে। হেমাঙ্গনাথ দেখিলেন ছোটলোকদের আস্পর্ধা অসহ্য হইয়া

উঠিয়াছে। পুলিশের হাতে বেধড়ক মার খাইয়াও তাহারা ঠাণ্ডা হইতেছে না। দীনদয়াল বাগ্‌দী হইয়াছে ছোট গান্ধী। তাহার বদমাইস চেলারা প্রথমে বলে মহাত্মা গান্ধীকি জয়! তারপর বলে দীনদয়াল ঠাকুর কি জয়! ছোটলোকদের কাঁধে চড়িয়া বড় ও ছোট দুই গান্ধী নাচিতেছেন। ছোট গান্ধীর আলি ভাই হইয়াছে ফকিরপুরের পিরু হাজী। বেটা বিধবা ভাইবৌকে, নাবালক ভাইপোদের ঠকাইয়া খাইতেছিল। তাহাতে দোষ নাই, দোষ হইয়াছে জমিদার তাহার জবরদখল করা জমি কাড়িয়া লইলে।

দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবার সম্ভাবনায় পঞ্চক্রোশী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল।

প্রিন্স অব ওয়েলস বোম্বাইতে নামিবেন ১৭ই ডিসেম্বর, কলিকাতায় আসিবেন ২৪শে ডিসেম্বর। কংগ্রেস হরতাল ঘোষণা করিয়াছে। দেশের লোক বুঝিল এই হরতাল লইয়া কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্ট, এই দুই পক্ষের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হইবে। শ্যামানাথ পঞ্চক্রোশী গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, শেখর সেক্রেটারী। রাধারাণী হইয়াছেন সহকারী সভাপতি। জেলা কংগ্রেস কমিটি নির্দেশ পাঠাইয়াছে ১৭ই ও ২৪শে উভয় দিন হরতাল পালন করিতে হইবে। শেখর শ্যামানাথ ও রাধারাণী পরামর্শ করিতে লাগিলেন পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া কিভাবে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত হাটে বাজারে প্রত্যেককে জানাইয়া দেওয়া যায়।

শেখর বলিল, দু'টো তারিখের কথা দোকানী ও ফড়িয়াদের জানিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। আশ্রম থেকে কয়েকজন বৈরাগী ও ফকির স্বেচ্ছাসেবক বের করা যাক. পুলিশ টের পাবে না।

দীনদয়াল ঠাকুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

দিন কয়েক পরে সারাদিন ঘোরাফেরা ও কাজ কর্মের পর শেখর বাড়ী ফিরিয়া হাত পা ছড়াইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল। সে ভাবিল হরতাল বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস কমিটিগুলিকে ঘায়েল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর কয় দিন জেলের বাহিরে থাকা যাইবে জানি না, আরামটুকু ছাড়ি কেন। কিছুক্ষণ পরে সে হাত বাড়াইয়া টেবিলের উপর হইতে একখানি সংবাদপত্র টানিয়া লইল। সংবাদের হেডিংয়ের উপর দৃষ্টি চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দৃষ্টি আবদ্ধ হইল। সে পড়িতে লাগিল: 'রায় বেরিলীর ঘটনাসমূহ মি. গান্ধী ও তাঁহার অনুচরগণ যে সত্যযুগের প্রবর্তন করিতে চাহেন তাহার নমুনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভ্রাম্যমান প্রচারকগণ অজ্ঞ

কৃষকদিগকে বুঝাইয়াছে যে শীঘ্রই শুধু তালুকদার কেন ব্রিটিশ সরকার পর্যন্ত লোপ পাইবে এবং গান্ধীরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। গান্ধীরাজ হইলে সত্যযুগ আসিবে। তাহাদের সুখসম্পদের সীমা থাকিবে না। তাহারা তখন চারি আনায় একগজ কাপড ও ঐরূপ সস্তাদরে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিতে পারিবে। আসন্ন স্বরাজের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়া অজ্ঞ ও উগ্রপন্থী জনতা লুটতরাজ করিতে ও সম্পত্তি ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। গুদাম ভাঙ্গিয়া তাহারা মালপত্র লুট করিতে লাগিল। হয়ত জমিদারগণের বিরুদ্ধে প্রজাদের ন্যায্য অভিযোগের কিছু কারণ আছে, এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা অনাবশ্যক। যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাহা এই যে মি গান্ধী যে ধরণের প্রচারকার্যের সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা বোলশেভিজমের প্রকার ভেদ। পলমল গেজেট অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া এই আন্দোলনের তুলনা করিয়াছে রুশিয়ার বিপ্লববাদীদের রাজনৈতিক খেলায় লক্ষ লক্ষ কৃষককে ক্রীডনক হিসাবে ব্যবহার করিবার আন্দোলনের সঙ্গে। লেনিনের মত মি গান্ধীও পরীক্ষামূলকভাবে এক আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছেন, এই আন্দোলনে একটির পর একটি করিয়া বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হইতেছে। কখনো জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হইতেছে, কখনো ছাত্রবিদ্রোহ সৃষ্টি করা হইতেছে। সমগ্র পন্থাটি বৈপ্লবিক। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদীদের সন্ত্রাসবাদ সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। রুশিয়ার কুসংস্কারপ্রবণ অজ্ঞ শ্রেণীর লোক হইয়াছিল বোলশেভিক প্রচারকার্যের বাহন, ভারতবর্ষেও সেই শ্রেণীকে ব্যবহার করা হইতেছে সন্ত্রাসবাদের যন্ত্র হিসাবে। শান্তি ও শৃঙ্খলার শত্রুগণ জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য গোপনে যে কার্যপ্রণালীর অনুসরণ করিতেছে রায়বেরিলীর ঘটনাসমূহ তাহার নমুনা।"

বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া শেখর কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া চাহিল। রাধারাণী ও শ্যামানাথ ঘরে প্রবেশ করিল।

এতরাত্রে তাঁহাদিগকে দেখিয়া শেখর বিস্মিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কি ব্যাপার বাঙামামীমা ?

রাধারাণী আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, কথা আছে। দোরটা বন্ধ করে দাও মনে হল আমরা আসবার সময় কেউ পেছু নিয়েছিল।

শেখর দরজা বন্ধ করিতে রাধারাণী বলিলেন, তারা কোথায় ? দেখতো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কি না।

শেখর বলিল, এত রাত্রে ওকে এনেছেন কেন ?

রাধারাণী—আমি এনেছি নাকি ? জোর করে এসেছে।

শেখর বারান্দায় গেল। সেখানে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া ফিরিতেছে, পাশের অন্ধকার ঘরে খসখস শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে ম্যাচবাক্স বাহির করিয়া জ্বালিতে দেখিল তারা তাড়াতাড়ি যে ঘরে রাধারাণী ছিলেন সেই ঘরে ঢুকিয়া গেল।

শেখর ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া তারা হাসিয়া বলিল, যান, এবার দোর বন্ধ করুন।

রাধারাণী অসময়ে আসিবার কারণ জানাইলেন। দীনদয়াল ঠাকুরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় রায়বাহাদুরের নাকি জয় হইয়াছে। বোধহয় এবার তিনি আশ্রমের জমি দখল লইবার চেষ্টা করিবেন। এই খবর এখনও বাহিরের কেহ জানিতে পারে নাই, ঠাকুরও জানেন না। খবর আশ্রমে পৌঁছিলে সেখানেও "সাজ সাজ" রব উঠিবে বোধহয়।

শ্যামানাথ বলিল, অন্য খবরও ভাল নয়। জেলা কংগ্রেস কমিটি লোকের হাতে গোপনীয় সার্কুলার পাঠিয়েছে শীঘ্রই দেশময় গ্রেপ্তার আরম্ভ হবে যাতে হরতাল না হতে পারে। কংগ্রেস কমিটির কাজ বন্ধ না হয় সে ব্যবস্থা করবার জন্য কমিটির সর্বময় ক্ষমতা একজনের হাতে দিয়ে ডিক্টেটর নির্বাচিত করবার প্রস্তাব আলোচিত হচ্ছে। এ সম্বন্ধে শীঘ্রই নির্দেশ দেওয়া হবে।

শেখর আরাম চেয়ারে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া কথা শুনিতেছিল। শ্যামানাথের কথা শেষ হইলে সে চোখ বুজিয়া তেমনি পড়িয়া রহিল কিছুক্ষণ। ঘরের মধ্যে তিনজন প্রাণী স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে সে কি বলে শুনিবার জন্য।

কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া তারার দিকে চাহিয়া শেখর বলিল, একটা গান গাইতে পারবে তারা ?

আমাদের যাত্রা হল স্থুরু, এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস উঠুক তুফান ছুটুক
ফিরবো নাক আর।...

গাও তো।

তারা হঠাৎ আজ শেখরের মুখ হইতে নাম ধরিয়া তাহাকে সম্বোধন ও গান

করিবার অনুরোধ শুনিয়া বিস্মিত হইল বোধহয় একটু লজ্জাও হইল তাহার। তাহার মনে হইল, এই কি গান গাহিবার মত সময় ও অবস্থা?

একটু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল এখন সে গাহিতে পারিবে না।

শেখর আর দ্বিতীয় বার অনুরোধ না করিয়া রাধারাণীর দিকে চাহিয়া বলিল, রায় বাহাদুর হেমাঙ্গনাথ পুলিশের সাহায্য নিয়ে আশ্রম দখল করবার চেষ্টা করবেন। পুলিশ সাহায্য করবার জন্য পা বাড়িয়ে আছে। বড়লাট এবং মহাত্মা গান্ধী ও সি আর. দাশের মধ্যে আপোষের কথা উঠেছে, এটা হরতাল বন্ধ করবার চাল। আপোষের কথা ভেঙ্গে গেলেই গ্রেপ্তার সুরু হবে, এলোপাতাড়ি গ্রেপ্তার চলবে। দু'পক্ষই প্রস্তুত হচ্ছেন।

রাধারাণী বলিলেন, আমাদের কংগ্রেস কমিটির ব্যবস্থা কি করা যায়?

শেখর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে শ্যামানাথের দিকে চাহিয়া বলিল, শ্যামানাথ, কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। রেহাই পাবে কিনা সন্দেহ তবে প্রথম কিস্তীতে তোমার শ্রীঘরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। দি ফার্ষ্ট ডিক্টেটর উইল বী শ্রীমতী কালিন্দী। কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদে তার নির্বাচন দু'এক দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। তাকে জেলে পুরতে পারলে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই।

তারা উঠিয়া দাঁড়াইল। শেখরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, আমাকে কংগ্রেস কমিটিতে নিন।

শেখর কোন উত্তর দিল না।

তারা আবার বলিল, আমার নাম কেন দেবেন না কমিটিতে?

শেখর বলিল, জেলে যাবার জন্য যদি ব্যস্ত হয়ে থাক পুলিশ হয়ত তোমাকে নিরাশ করবে না। বেড়াজাল যখন ফেলবে গায়ে যাদের একটু গন্ধ আছে তারা কেউ বাদ যাবে না।

তারা আর কোন কথা বলিল না। মুখ ভার করিয়া আসনে গিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল, বুঝেছি। আমি গাইলাম না, তাই আমাকে বাদ দিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া শ্যামানাথ উচ্চ হাস্য করিল। বলিল, কথাটা ঠিক হল না তারা। আসল কারণটা কি এখনও বুঝলে না? তুমি জেলে যাবে আমি বাড়ী বসে হা-হুতাশ করব। তাই শেখর ভেবে চিন্তে ব্যবস্থা করেছে। তুমি যাই বলো শেখর একজন হৃদয়বান, সমজদার মানুষ।

তাহার কথা শুনিয়া তারা হাসিল, শেখরও হাসিল। বলিল, থ্যাঙ্ক ইউ শ্যামনাথ।

রাধারাণী বলিলেন, এবার ওঠা যাক। আশ্রমে খবরটা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে কাল।

শেখর বলিল, খবর আজই যাবে। রাত্রে কতবার লোক আসবে এখানে ঠিক আছে? অবস্থা দেখে ঠাকুর একটু দমে গেছেন মনে হয়। তাই যখন তখন লোক পাঠান আমার কাছে। কালিন্দীকে ঠাকুর বড় ভয় করেন, ওকে আমারও ভয়। একেবারে ফায়ার-ঈটিং গরগন। গোলমাল বাধাবে ঐ মেয়েটি, দলের প্রত্যেকটি লোক ওর হাতের মুঠোয়। তাই ভেবে চিন্তে ওকে ডিক্টেটর করবার মতলব করেছি।

শ্যামানাথ—গোলমাল বাধাবে রায় বাহাদুর ও পুলিশ। ও নিয়ে ভেবে কি হবে?

শ্যামানাথ, রাধারাণী ও তারা উঠিয়া বারান্দায় আসিল। বাহিরে ঘোর অন্ধকার।

শেখর কানাইকে ডাকিয়া লণ্ঠন লইয়া সঙ্গে যাইতে আদেশ করিল। শ্যামানাথ বলিল, টর্চ রয়েছে, আবার লণ্ঠন?

শেখর বলিল, কানাই যাক, বড্ড আঁধার। রাতও হয়েছে।

কানাই লণ্ঠন লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইল। শ্যামানাথ ও রাধারাণী বাগানে নামিলেন, পিছনে তারা।

শেখর নিম্নস্বরে বলিল, তারা গান তো গাইলে না। যাবার সময় একটু হেসেও গেলে না? তারা বলিল, আমি তো হেসেছি, অন্ধকারে আপনি দেখতে পান নি।

শ্যামানাথ ডাকিয়া বলিল, টর্চ জ্বালব নাকি হাসি দেখবার জন্য?

শেখর হাসিল। বলিল, দরকার হবে না।

অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত তিন জন আগাইয়া চলিল।

তিন

কলিকাতা (১৯২১)

হরিশঙ্কর প্র্যাকটিস ছাড়িয়া দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার কাজের আর অন্ত নাই। দিনরাত সমানে লোকের ভিড লাগিয়া আছে বাড়ীতে। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করা তাঁহার অভ্যাস। তিনি শয্যাত্যাগ করিবার আগেই লোক আসিয়া বসিয়া থাকিত। কত কাজের জন্য কত রকমের লোক আসিত। কেহ আসিত সভা সমিতিতে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য। কেহ আসিত দলেব মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদে সালিশী করিবার জন্য বলিতে। কেহ আসিত বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাব মতামত জানিতে। কেহ আসিত সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ তাঁহার বিবৃতি লইবার জন্য। কেহ আসিত কংগ্রেসের কাজ সম্বন্ধে পরামর্শের জন্য। কেহ আসিত বিরুদ্ধ পক্ষের নেতা ও সংবাদপত্রকে অপদস্থ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য। অনেকে আসিত অর্থ সাহায্যের আবেদন লইয়া। কেহ কেহ আবার আসিত এতবড় স্বার্থত্যাগী দেশনেতার শুধু দর্শনপ্রার্থী হইয়া। ছাত্রকর্মী, এক্স-রিভোল্যুশনারী কর্মী, বডবাজারের গান্ধীভক্ত বিলাতী কাপড ও জাপানী খদ্দর বিক্রেতা মাবোয়াড়ী, ভাটিয়া ব্যবসায়ী কর্মী, প্র্যাকটিস-ত্যাগী ব্যারিষ্টার, উকিল কর্মী, ছাত্র ধর্মঘটের ফলে বন্ধ হইয়া যাওয়া স্কুল কলেজের শিক্ষক কর্মী—কত রকমের কর্মী আসি তাঁহার কাছে নানা অভিপ্রায় লইয়া।

সারাদিন দর্শন-প্রার্থীর জনসমুদ্রে হাবুডুবু খান হরিশঙ্কর, কিন্তু তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, তিনি জানেন নেতৃত্বের সাধনা বড কঠোর সাধনা। অহোরাত্রের এই শুষ্ক পরিশ্রমের অন্তরালে বালুকরাশির গভীর তলদেশে প্রবাহিত সুমিষ্ট সলিল ধারার মত একটি সুগুপ্ত রস তাঁহাকে সঞ্জীবিত রাখে। এই রসধারা পদ্মিনীর সহিত তাঁহার সুমধুর সম্পর্ক। তাঁহার কঠোর সাধনার শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করে এই রসধারা।

অসহযোগের জোয়ারের প্রবল আঘাতে স্কুল কলেজের অধিকাংশ বন্ধ হইয়াছে। হাজার হাজার ছেলে সারাদিন হৈ হৈ করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছে,

পার্কগুলিতে জটলা করিতেছে, সভা সমিতি, শোভাযাত্রা করিতেছে, পুলিশের লাঠি ও সার্জেণ্টের বেটনের গুঁতা খাইয়া মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনি দিতেছে। গ্রামে গ্রামে গিয়া কাজ করিবার পরামর্শ দিতেছেন নেতারা। মেঠো কাজ করিয়া উত্তম ব্যয় করিতে তাহারা গররাজি। মাঝে মাঝে তাহারা দল বাঁধিয়া নেতাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি পালন করিবার জন্য তাগিদ দিতেছে, কাজ ও খাদ্যের দাবি করিতেছে। এই অসহযোগী ছাত্রদল হইয়াছে হরিশঙ্করের বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ।

উৎকণ্ঠার কারণ আরও আছে। পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রী অসহযোগের প্রোগ্রাম লইয়া নাগপুরে যে কলহ আরম্ভ করিয়াছিলেন এখনও তাঁহার কাগজে সেই কলহ চালাইতেছেন। ইতিমধ্যে নিজের একটি আলাদা দল দাঁড় করাইয়াছেন তিনি। তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া বিপিন চন্দ্র পাল spiritual democracy built upon the great truth of the ancient theosophy of the upanishads (উপনিষদের প্রাচীনতত্ত্বের মহান সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত স্পিরিচুয়েল ডিমোক্রেসী) প্রচার করিতেছেন। তারপর আছেন এককড়িবাবু। মত পরিবর্তনে এককড়িবাবুর সহজ দক্ষতা শুধু তাঁহার অর্থ মোক্ষণের উদ্ভাবনী বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। অর্থ পাইতে বিলম্ব হইলেই তিনি হরি-শঙ্করের উপর 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার' খড়্গ উদ্যত করেন। বলাই সরকার তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, এই দক্ষিণ হস্তই আবার নির্ভরের সর্বাপেক্ষা অযোগ্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্স-রিভোল্যুশনারী নেতা ফণী সিংহ তাঁহার বাম হস্ত। দলবলকে খাওয়াইবার জন্য তাহার বিরতিহীন অর্থ সাহায্যের দাবিতে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। বিরক্তি প্রকাশ করিলে ফণী শুধু তাহার নিজের দলবল নয়, একপাল স্কুল কলেজের অসহযোগী ছেলে আনিয়া তাহার ঘরে ছাড়িয়া দিবার ভয় দেখায়।

মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিতেছেন। এই সম্পর্কে জরুরী পরামর্শের জন্য দাশ সাহেবের বাড়ী যাইবেন বলিয়া হরিশঙ্কর নীচে নামিয়া আসিয়াছেন, ফণী আসিয়া তাঁহার পথে দাঁড়াইল, তাহার পিছনে নন্দী-ভৃঙ্গীর দল।

ফণী বলিল, কাল বলেছিলেন কিছু দেবেন স্যর। আমি আর চালাতে পারছিনে।

হরিশঙ্করের হাতে কিছু নাই। যাহা ছিল আজ সকালে স্ত্রীর হাতে দিয়াছেন সংসারখরচ বাবদ। তিনি কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন ফণী বলিল, আপনি

না দেন আমরা ওপরে মার কাছে যাচ্ছি। তাঁর ছেলেরা খেতে পাচ্ছে না শুনলে তিনি স্থির থাকতে পারবেন না।

হরিশঙ্কর জানিতেন উপরে গেলে কপট কান্না শুনাইয়া, পেট বাজাইয়া সরলা দেবীর হাতের সংসারখরচের টাকা কয়টি বাহির করিয়া লওয়া ফণীর পক্ষে অসাধ্য নয়। তিনি বলিলেন, ওঁর হাতে কিছু নেই ফণী, মাত্র গুটিকয়েক টাকা বাজার খরচের জন্য আছে। আমি দেখছি। বলাই কোথায়? তাকে একবার ডাকো।

ফণীর দলের একজন বলিল, তিনি বেরুবেন বলে গাড়ীতে বসে আছেন। হরিশঙ্কর বলিলেন, ফণী, বলাইকে নিয়ে আমার বসবার ঘরে এস।

ফণী বাহিরে আসিয়া দেখিল বলাই চলিয়া গিয়াছে।

খবর শুনিয়া হরিশঙ্কর বলিলেন, তুমি সন্ধ্যার পরে একবার এসো ফণী, আমি যেখান থেকে পারি কিছু যোগাড় করে রাখব।

ফণীকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন।

মহাত্মা গান্ধী আসিযাছেন, কলিকাতার উত্তেজনার অবধি নাই। রবিবারে মির্জাপুর পার্কে সভা হইল। পার্ক, পাশ্ববর্তী রাস্তা ও গলিতে, বাড়ীর ছাদে, বারান্দায়, জানালায়, গাছের উপর মানুষ, পার্কের রেলিংয়ের উপর মানুষ, ঘোড়ার গাড়ীর ছাদে বসিয়া মানুষ। এ রকম বিরাট জনসমাবেশ কোন সভায় আগে দেখা যায় নাই। সুদীর্ঘ বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধী জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, পাশ্চাত্যকে তোমরা প্রত্যেকে বয়কট কর, স্বরাজ তোমাদের হাতের মুঠায় আসিবে।

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা এতদিন নেতাদের অনুরোধে কর্ণপাত করে নাই। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার পর দিন তাহারা সকলে কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল। কলিকাতার ছাত্রসমাজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে পাঞ্জাবের ঘটনার জন্য দায়ী লর্ড চেমসফোর্ডের হাত হইতে ডিপ্লোমা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল।

বলাই সরকারের গৃহে ফণী ও তাহার দলের কয়েকজন ও বলাইয়ের মধ্যে আলোচনা হইতেছিল। ফণী আসিয়াছিল কিছু টাকার চেষ্টায়। হরিশঙ্কর সামান্যই দিয়াছিলেন। তাহাতে আর কয় দিন পেট চলে? অনেকগুলি বেকার ছাত্র তাহার কাঁধে চাপিয়াছে। তাহাদের ত আর তাড়াইয়া দিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে আবার অহিংস অসহযোগের সমালোচক আছে। দু'টো খাইতে

দিয়া ইহাদের মুখ বন্ধ না করিলে ছাত্রদের মোরেল নষ্ট করিয়া দিতে পারে ইহারা।

বলাই বলিল, সমালোচক মানে ?

ফণী - সমালোচক মানে ক্রিটিক। এরা বলে মহাত্মা গান্ধীর প্রোগ্রামও কাজে পরিণত হবে না, নয় মাসের মধ্যে স্বরাজও আসবে না। সি. আর. দাশ, জে. এম. সেনগুপ্ত, হরিশঙ্কর বাবুর মত ক'জন ব্যারিষ্টার প্র্যাকটিস ছেড়েছেন এ পর্যন্ত ? শুধু ছেলেরা স্কুল কলেজ ছাড়লে কি স্বরাজ মিলবে ? কেবল ধাপ্পা।

বলাই—ভারী ডেঁপো ছেলে তো।

ফণী - আপনি তো বাড়ী বসে ডেঁপো বলে দিলেন। তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তর্ক করে তাদের বোঝাতে পারতেন তবে বুঝতাম। এক এক জন তর্কের হাওয়াই জাহাজ মশাই। বলে স্বরাজের মানে কি তাই নেতারা বলেন না, এদিকে মুখে বলেন ন' মাসের মধ্যে স্বরাজ হবে। আসল কথা ধাপ্পা দিয়ে ইংরাজের কাছে কতটুকু পাওয়া যায় তাই তাঁরা দেখতে চান। বোমা মেরে ইংরাজের কাছে কিছু আদায় হয় না, এঁরা নিত্যানন্দ প্রভু সেজে মার খেয়ে স্বরাজ আদায় করবেন !

বলাই—এ সব তোমার বানানো কথা ফণী। আমাদের ছেলেদের নামে বদনাম দিয়ো না।

ফণী হাসিয়া বলিল, তা না হয় দিলাম না। (পকেট হইতে একখানা সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া) এই দেখুন এই কাগজখানা কি লিখছে—"অসহযোগের নীতির সমর্থকগণ বিলক্ষণ জানেন যে তাঁহাদের চেষ্টার ফলে বর্তমান শাসনব্যবস্থা কখনই অচল হইবে না। তাঁহাদের বড় বড় কথার একমাত্র তাৎপর্য গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিয়া খুদকুঁড়া কিছু আদায়"—

বলাই বাধা দিয়া বলিল, গভর্ণমেণ্টের টাকা খেয়ে লিখেছে। ও সব কাগজ ছেলেদের পড়তে দিয়ো না। ভাল কথা, এককড়ি বাবুর কাণ্ড দেখেছ ?

ফণী—কি কাণ্ড ?

বলাই—মাঝখানে কিছুদিন বাংলার বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের নিন্দা করেছিলেন। তারপর মত ঘুরে গেল, অসহযোগ আন্দোলন ও অসহযোগী নেতাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। কয়েকদিন হল আবার দেখছি অসহযোগের সম্পর্কে বাঙালীদের গালাগালি করে বিহারী, ওড়িয়া,

মারোয়াড়ীদের প্রশংসা করছেন। বলছেন, কলিকাতার পশ্চিমা ও ওড়িয়া মুটে মজুররা বাবু অসহযোগীদের চাইতে মহাত্মাজীর বেশী ভক্ত।

ফণী হাসিয়া বলিল, বালাচাঁদ বোধহয় কিছু টাকা দিয়েছে। বালাচাঁদ এখন মহাত্মীর বড় ভক্ত। সে প্রচার করছে মহাত্মাজী স্বয়ং ভগবানের অবতার, অলৌকিক শক্তির অধিকারী। শুনলাম সে নিমাই শাস্ত্রীকে মাইনে দিয়ে রেখেছে তার বাড়ীতে গীতা ব্যাখ্যা করবার জন্য।

বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় মোটরের হর্ণের শব্দ হইল। একটু পরে পদ্মিনী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলাইয়ের দিকে চাহিয়া সে বলিল, দাদা, সাহেব তোমার খোঁজ করছেন, কি জরুরী কথা আছে।

ফণী একবার ভগ্নী একবার ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিল।

পদ্মিনী পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ফণী বলিল, আমরা উঠি। যাহোক কিছু দিন এখন, নইলে আমি গরীব মানুষ, চালাই কি করে?

ফণীকে [illegible] দিয়া বলাই চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। হরিশঙ্কর এখন দেশবিখ্যাত মস্ত বড় নেতা, বলাই তাহার দক্ষিণ হস্ত। এই দক্ষিণ হস্ত-গিরি লইয়াই কি সে সন্তুষ্ট থাকিবে? নিজেই সে এই প্রশ্নের উত্তর দিল, আর কিছু দিন যাক।

পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রীর গৃহে মৌলভী নুরুল হকের সঙ্গে তাঁহার কথা হইতেছিল তুর্কী ও মিত্রশক্তির মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব সম্বন্ধে। তুর্কীর পক্ষ হইতে বেকির শামী বে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আরবের উল্লেখ নাই। নিমাই শাস্ত্রী মৌলভী সাহেবকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে তুর্কী গভর্ণমেণ্ট নিজে যখন আরব লইয়া মাথা ঘামাইতেছে না তখন এদেশে খিলাফৎ আন্দোলন লইয়া মুসলমান নেতারা মাথা ঘামাইতেছেন কেন? তাঁহারা কেন পুরাপুরি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দিতেছেন না?

মৌলভী সাহেব বলিলেন, আরবের প্রভুত্ব খলিফার হাতে থাকা চাই। সরিফ হুসেন ইংরাজের হাতের অস্ত্র. তিনি ইসলামের শত্রু। সরিফ হুসেনের অধীনে আরবীরা স্বাধীনতা ভোগ করছে কোন মুসলমান একথা স্বীকার করবে না।

নিমাইশাস্ত্রী—এটা কেমন কথা হল হক সাহেব? আরবীরা বলছে সরিফ হুসেন আমাদের রাজা, বিদেশী বিজেতা তুর্কীদের হাত থেকে তিনি আমাদের মুক্ত করেছেন—

মৌলভী সাহেব—আপনারা হিন্দুরা স্বাধীন জাতের রাষ্ট্রনীতি বুঝতে পারেন না। আরবে তুর্কীর সুলতানের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অবশ্য চাই। তুর্কী নেশনালিষ্টরা ভয়ে আরবের কথা না তুললেও আমরা তুলব। তুর্কীর প্রস্তাব মিত্রশক্তি মেনে নিলেও খিলাফৎ আন্দোলন বন্ধ হবে না। The Sultan must be reinstated in his Arabian Empire and we shall achieve this object through our Khilafat agitation. (সুলতানকে আবার তাঁহার আরব সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। খিলাফত আন্দোলনের দ্বারা আমরা এই উদ্দেশ্য সাধন করিব।)

নিমাই শাস্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

তারপর বলিলেন, তুর্কীরা আরব দেশ জয় করে আরবীদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। নিজেদের রাজার অধীনে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। আপনারা আরবীদের স্বাধীনতার বিপক্ষে। কি অদ্ভুত নীতি এই ভারতবর্ষের মুসলমানদের! এদিকে তুর্কীর সামাজ্য রক্ষার জন্য আপনাদের যত আগ্রহ নিজের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তার সিকি আগ্রহও নাই।

মৌলভী সাহেব নিমাই শাস্ত্রীব কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তরফে মওলাত (অসহযোগ) আমাদের শরিয়তের বিধান। The present thraldom is more galling to the self-respect of the Mussalmans than we think to any other community of India. (বর্তমান দাসত্ব ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা মুসলমান সম্প্রদায়েব নিকট অধিকতর তিক্ত বলিয়া আমরা মনে করি।) মুসলমানরা রাজার জাত, স্বাধীনতার নেশা তাদের খুনে রয়েছে।

নিমাই শাস্ত্রী কোন উত্তর দিলেন না। মৌলভী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ফরাসী ও ইটালী গভর্ণমেণ্ট সেভার্স সন্ধির বিরুদ্ধে লেগেছেন। মি. লয়েড জর্জ এর ফলে বেকায়দায় পড়েছেন। এর শেষ ফল কি হয় দেখবার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

নিমাই শাস্ত্রী কোন কথা বলিলেন না। মৌলভী সাহেব বলিলেন, আপনি বড় অন্যমনস্ক হয়েছেন শাস্ত্রী মশাই, কি ভাবছেন?

নিমাই শাস্ত্রী বলিলেন, ভাবছি অনেক কথা। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করবার জন্য খিলাফৎ কমিটির তাড়া ছিল কংগ্রেসের চাইতে বেশী। অনেকে তখন বলেছিলেন কংগ্রেস খিলাফৎ কমিটির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, আমি

ভাইরা মহাত্মাকে পকেটে পুরেছেন ইত্যাদি। কয়েকটা মাস যেতে না যেতে লোকের মনে সন্দেহ ঢুকেছে তুর্কীর সঙ্গে সন্ধি আলোচনার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেলে আন্দোলন থেকে মুসলমানরা সরে দাঁড়াবে।

মৌলভী সাহেব উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, It is a libel on the patriotism and sincerity of the Mussalmans. (মুসলমানদিগের স্বদেশপ্রেম ও আন্তরিকতার পক্ষে একথা মানহানিকর।) আমাদের শরিয়তের আদেশ—

রাস্তায় একটা হট্টগোল উঠিল। কয়েকবার মহাত্মা গান্ধী কি জয়! সি. আর. দাশ কি জয়! ধ্বনি শোনা গেল। একটু পরেই একদল লোক হুড়মুড় করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

মৌলভী সাহেব তাঁহার বিরাট বপু লইয়া কয়েকটি লাফ দিয়া পাশের ঘরে ঢুকিলেন। নিমাই শাস্ত্রী আসন হইতে উঠিয়া আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে মশাই?

জনতার মধ্যে একজন বলিল, পুলিশ কয়েকজন পিকেটারকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার কয়েকজন লোক তাদের দেখে মহাত্মা গান্ধী কি জয়! বলাতে পুলিশ লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল।

নিমাই শাস্ত্রী বলিলেন, পুলিশ লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে আর অমনি পালিয়ে এলেন?

জনতার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, পালাব না তো কি দাঁড়িয়ে মার খাব আপনাদের মত?

নিমাই শাস্ত্রী কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, পুলিশ চলে গিয়েছে, এবার আপনারা যান।

সকলে চলিয়া গেলে মৌলভী সাহেব পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পুলিশের যষ্টি চালনার কথা শুনিয়া নিমাই শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি বলিলেন, আর বসব না। বালাচাঁদের আসবার কথা ছিল, এখনও এল না। হাতে অনেক কাজ আছে। আজ যাই।

দরজা পর্যন্ত গিয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, কাউকে একখানা গাড়ী ডাকতে বলুন শাস্ত্রী মশাই। পুলিশ বেটাদের কথা বলা যায় না। রাস্তায় বেরুলেই হয়ত এক ঘা বসিয়ে দেবে।

গাড়ী আসিলে তিনি চলিয়া গেলেন।

অসহযোগ আন্দোলন দমন করিবার জন্য পুলিশ তখন পূর্ণ বিক্রম প্রকটিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৪৪ ধারার প্রয়োগ ক্ষেত্র ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। দেশের যে কোন জায়গায় কোন বক্তা বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিলেই এই ধারার প্রয়োগ হইত। রাজনৈতিক সভা হইতে ক্রমে ধর্মসভার সম্পর্কে, রামায়ণ, মহাভারত পাঠের সম্পর্কে এই ধারার প্রয়োগ হইতে লাগিল। সার্কুলার জারি করিয়া সরকারী কর্মচারীদিগকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বর্জন করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। চরকা, খদ্দর, ও গান্ধী টুপীকে পুলিশ বিদ্রোহের নিশান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, এবং যেখানে উহা দেখিত সেখানে আক্রমণ করিত। বিলাতী কাপড়ের দোকানে ও আবগারী দোকানের পিকেটারদের উপর যষ্টি চালনা তাহাদের অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। অসহযোগী-দিগকে গ্রেপ্তার ও তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাব সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিহারে সীতামারি, হাজিপুরে মাদক বর্জনের আন্দোলন প্রবল হওয়াতে আবগারী বিভাগেব আয় কমিয়া গেল। গভর্ণমেণ্ট মাদক দ্রব্যের গুণ বর্ণনা করিয়া ইস্তাহাব বিলি করিল—'Wine was valuable both as a food and drink and some of the greatest men of the world were wine drinkers,' (মদ খাদ্য ও পানীয় হিসাবে প্রয়োজনীয এবং পৃথিবী কোন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মদ্যপায়ী দিলেন।)

একদিকে সরকারী দমন-নীতি অন্যদিকে বস্ত্র ও অন্নের দুর্মূল্যতা। স্থানে স্থানে হাঙ্গামার লক্ষণ দেখা দিল।

চম্পারণে, রায় বেরিলীতে, গিরিডিতে গোলযোগ ঘটিল। গিরিডির গোলযোগ সম্বন্ধে একখানি কাগজ সংবাদ দিল—"গিরিডির অধিবাসীদেব মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা বেশী। আদিবাসী ছাড়া ধাঙ্গড়, কাহার, কুর্মীও আছে। ইহাদের প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের প্রধান ও পঞ্চায়েৎ আছে। প্রধান ও পঞ্চায়েতের আদেশ ইহারা বিনা প্রতিবাদে মানিয়া চলে। ইহাদের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছে। এই আন্দোলনের প্রভাবে ইহারা কয়েকটি শপথ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা কেহ ইংরাজের চাকুরি করিবে না। তাহারা দেশীয় লোকের অধীনে চাকুরি করিবে যদি পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্দিষ্ট বেতন তাহাদিগকে দেওয়া হয় এবং যদি তাহাদের চাকুরিদাতারা ইংরাজের অনুকরণ না করিয়া সম্পূর্ণ দেশীমতে চলেন। এতদিন তাহারা এই সকল শপথ মানিয়া

চলিতেছিল। এখন তাহারা আবার নূতন একটা শপথ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহ জেলে গেলে সকলে মিলিয়া জেলে যাইবে। গিরিডির কাছে জঙ্গলে মহাত্মা গান্ধীর একজন সন্ন্যাসী শিষ্য বাস করেন। এই সন্ন্যাসী যে আদেশ করেন গুরুর আদেশ বলিয়া গিরিডির অধিকাংশ লোক তাহা পালন করে। শোনা যায় এই সন্ন্যাসী তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন সরকার কোন অসহযোগীকে জেলে পাঠাইলে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সকলে জেলে যাইবে অথবা জেল হইতে অসহযোগীকে উদ্ধার করিতে হইবে।

অবস্থা বর্ণনা করিয়া একখানি কাগজ লিখিল—"বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন-প্রণালীতে আন্দোলন চলিতেছে। কোন জায়গায় অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে দুর্মূল্যতার প্রতিকারের জন্য, কোন জায়গায় চলিতেছে ধর্মীয় আন্দোলন রূপে। অত্যন্ত নিরীহ ভারতবাসী দুর্দমনীয় হইয়া উঠে তাহার মধ্যে ধর্মের উন্মাদনা আসিলে। যুক্তপ্রদেশে, বিহারের অনেক জায়গায়, এমন কি বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশেও এইরূপ হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলন শুধু কৃষকের মধ্যে আর আবদ্ধ নাই। পুলিশবাহিনী ও সৈন্যদলের মধ্যেও ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছে। আমাদের ধারণা গভর্ণমেণ্টের প্রতি কর্তব্য ইহার সব সময়ে যথাযথ পালন করে না। এই অবস্থায় দমন নীতি অনুসরণ করিলে তাহা অগ্নিতে ইন্ধনের কাজ করিবে। মহাত্মা গান্ধীকে বহুলোক দেবতার অবতার বলিয়া মনে করে। তাঁহার নামের গুণে অসম্ভবও এখন সম্ভব হইতেছে"।

হরিশঙ্কর বরিশাল প্রাদেশিক কনফারেন্স হইতে ফিরিয়াছেন। কলিকাতা হইতে যাঁহারা বরিশাল গিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরিবার পরে সভাপতি বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা ও আচরণ লইয়া বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে মসীযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কনফারেন্স প্যাণ্ডেলে সভাপতি ক্রুদ্ধ প্রতিনিধিদের বলিলেন, You wanted magic, I tried to give you logic. (তোমরা ম্যাজিক চাহিয়াছিলে, আমি লজিক দিবার চেষ্টা করিয়াছি।) তাঁহার স্বরাজের ব্যাখ্যায় আপত্তি উঠিলে তিনি বলিলেন, I have never tried to lead the people in faith blindfolded. (চোখে অন্ধবিশ্বাসের ঠুলি পরাইয়া জনসমাজকে চালনা করিবার চেষ্টা আমি কোন দিন করি নাই।)

স্বরাজের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিতর্ক বাধিল। নিমাই শাস্ত্রীর কাগজ লিখিল, স্বরাজের শাসনতন্ত্রের কথা পরে হইবে, আগে আমরা

স্বরাজ চাই। এককড়িবাবুর কাগজ লিখিল, ব্যারিষ্টার হরিশঙ্কর বলিতেছেন, Swaraj is not a from of Government. He who will discover the real truth of a thing will get Swaraj. That is real Swaraj. (স্বরাজ কোন একটি বিশেষ প্রকারের শাসনতন্ত্র নয়। যিনি কোন বিষয়ের প্রকৃত সত্য নির্ণয় করিতে সক্ষম তিনি স্বরাজ পাইবেন। উহাই প্রকৃত স্বরাজ।) ইহার অর্থ কি?

বেজওয়াদা অধিবেশনে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ৩০শে জুনের পূর্বে তিলক স্বরাজ্য তহবিলের জন্য এক কোটি টাকা তুলিবার প্রস্তাব করিল। ঐ সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা এক কোটি করিবার ও কুড়ি লক্ষ চরকা দেশে প্রবর্তন করিবার প্রস্তাবও পাশ হইল। বেজওয়াদা প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া কংগ্রেসের সমালোচকরা বলিল অসহযোগ আন্দোলনের দম ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাহা বুঝিয়া অসহযোগীরা পন্থা পরিবর্তনের কথা চিন্তা করিতেছে।

বরিশাল হইতে ফিরিবার মাস দুই পরে গুরুতর পরিশ্রমের ফলে হরিশঙ্কর অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। দেশ বিখ্যাত নেতার অসুখ। সংবাদপত্রে প্রতিদিন তাঁহার চিকিৎসকদের স্বাক্ষরিত বুলেটিন প্রকাশিত হইতে লাগিল। দেশের নানা স্থান হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানিবার জন্য টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল। টেলিগ্রামের জবাব দিতে সরলা দেবীর বহু সময় ব্যয় হয়। তারপর আছে দর্শনপ্রার্থীদের সামলাইবার সমস্যা। বড় বড় নেতারা আসেন, রোগীর শয্যাপার্শে দুই মিনিট, পাঁচ মিনিট বসিয়া থাকেন, মাথা নত করিয়া রোগীর কানের কাছে মুখ নামাইয়া গোপনীয় পরামর্শ করেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরলা দেবীকে উপদেশ দেন, তারপর বিদায় লন। বিপদ বাধে অসংখ্য সাধারণ ভক্তকে লইয়া। তাহাদের প্রত্যেকের দাবি উপরে উঠিয়া দেশবরেণ্য শয্যাশায়ী নেতাকে একবার দেখিবে। ডাক্তারের নিষেধের কথা ইহারা কানে তোলে না, রোগী আজ একটু ভাল আছেন, চিন্তার কারণ নাই বলিলে ইহাদের আশঙ্কা আরও যেন বাড়িয়া উঠে। উপরে উঠিবার সিঁড়ির নীচে দ্বাররক্ষক ফণীর করজোড়ে প্রার্থনা শুনিয়া ইহারা চটিয়া যায়, তাহাকে গালাগালি করিতে থাকে। সরলা দেবী এই সব আনুষাঙ্গিক গোলমালে আরও দিশাহারা হইয়া যান। অবশেষে ফণী সদর ফটকে গুর্খা দারোয়ান বসাইল, ঘরে ঢুকিবার দরজায় দলের কয়েকজনকে পাহারা দিবার জন্য বসাইল।

হরিশঙ্করের অসুখের বাড়াবাড়ির সময় বলাই কয়েক দিন তাঁহাকে দেখিতে আসিবার সময় পাইল না। দল পরিচালনার সূত্র যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে জানাইতে লাগিল ভগবান না করুন ব্যারিষ্টার সাহেবের যদি কিছু হইয়া যায় তাঁহার সকল কর্তব্যের ভার তাহার উপরেই আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। সময়ের অভাব ছাড়া অন্য একটি কারণ ছিল। হরিশঙ্কর তাহাকে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য করিয়াছিলেন, প্রাদেশিক কমিটির সহকারী সম্পাদকও করিয়াছিলেন। বলাই চাহিয়াছিল সম্পাদক হইতে। হরিশঙ্কর বলিয়াছিলেন এবার তাহা সম্ভব নয়, পরে দেখা যাইবে। হরিশঙ্করকে সে ইতিমধ্যে বহু টাকা ঋণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং আশাভঙ্গে তাহার অসন্তুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। অসন্তুষ্ট হইয়া হরিশঙ্করের অসুখের বাড়াবাড়ির সময়ে নিজে সরিয়া রহিল, পদ্মিনীকে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল। তর্কাতর্কি করিয়া একদিন সে রাগের মাথায় পদ্মিনীকে প্রহারও করিল। ক্ষিপ্ত হইয়া পদ্মিনী অগ্রজের হাত এমন গভীরভাবে কামড়াইয়া দিল যে এখনও হাতের ঘা শুকায় নাই। হাত ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিতে হইয়াছে। ইহার পর কোন ফাঁকে পদ্মিনী বাড়ী হইতে পলাইয়াছে। বলাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার কোন খোঁজ খবর লয় নাই। অবশ্য সে অনুমান করিয়াছিল পদ্মিনী পলাইয়া হরিশঙ্করের গৃহে গিয়াছে।

কয়েকদিন পরে সংবাদপত্র পড়িয়া বলাই জানিতে পারিল হরিশঙ্কর অন্নপথ্য করিয়াছেন। শেষ বুলেটিনে ডাক্তাররা আশা প্রকাশ করিয়াছেন আর সপ্তাহ দুই পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া তিনি কাজকর্ম করিতে পারিবেন।

হাতের ব্যাণ্ডেজের উপর আর একটা ব্যাণ্ডেজ চাপাইয়া বলাই হরিশঙ্করের গৃহাভিমুখে রওনা হইল। স্থির করিল অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ দিবে হঠাৎ হাত কাটিয়া সেপ্‌টিক হইয়াছিল।

চার

হরিশঙ্কর গিয়াছিলেন লাটভবনে লর্ড রোনাল্ডশের নিমন্ত্রণে। লর্ড কুর্জনের জীবনী ও "হার্ট অব আর্যাবর্তের" লেখক এই পণ্ডিত ভদ্রলোক বাংলায় গান্ধী মুভমেণ্ট দমন করিবার ভার পাইয়াছিলেন। দমননীতি কার্যকরী করিবার ভার ছিল স্টীল ফ্রেমের উপর এবং সে কার্য উত্তমরূপে চলিতেছিল। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত ভদ্রলোকটি এই মানসিক অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন যে, এ পর্যন্ত গান্ধী মুভমেণ্টের তাৎপর্য তিনি সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে না পারায়, ইহা বোলশেভিক ইনস্পায়ার্ড এণ্টি বৃটিশ মুভমেণ্ট না ইণ্ডিয়ার ব্যাকওয়ার্ড পিপলসের সেমি-রিলিজিয়াস, সেমি-পোলিটিকেল মুভমেণ্ট এ সম্বন্ধে তিনি মত স্থির করিতে পারেন নাই। মুসলমান নেতাদের কথা বুঝিতে তাঁহার তেমন অসুবিধা হইত না কিন্তু তাঁহার ধারণা হইয়াছিল গান্ধীবাদী হিন্দুনেতারা যে কি চাহেন হয় তাঁহারা নিজেরাই তাহা জানেন না, নয় গোপন করিয়া যান। সে যাহা হউক, মাঝে মাঝে বিশিষ্ট নেতাদের লাটভবনে ডাকিয়া আলাপ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল।

লাটভবন হইতে বাহির হইয়া হরিশঙ্কর রসা রোডে দাশ সাহেবের গৃহে গেলেন। লাট সাহেবের সহিত আলোচনার মর্ম তাঁহাকে জানাইয়া ও অন্যান্য কথাবর্তা শেষ করিয়া আধঘণ্টা পরে সেখান হইতে বাহির হইলেন।

তাঁহার গাড়ী বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইতে হরিশঙ্কর দেখিলেন বালাচাঁদ নিজের গাড়ীতে উঠিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া বালাচাঁদ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্য মুখে বলিল, রাম রাম ব্যারিষ্টার সাহাব। আপনাকে না পেয়ে আমি তো চলে যাইচ্ছিলাম। জরুরী কামের জন্য ডেকেছিলেন, বৈঠিবার ইচ্ছা ছিল লেকিন মৌলভী সাহাবকে লিয়ে ফণীবাবু যা হল্লা লাগিয়েছেন—

হরিশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, হল্লা কি নিয়ে বালাচাঁদজী ?

বালাচাঁদ—উ সব আমি ভাল বুঝিনা। মওলানা মহম্মদ আলির একঠো ইস্পীচ নিয়ে সুরু হল। এক তরফে মৌলভী সাহাব আউর পণ্ডিতজী দুসরা তরফে ফণী বাবু আউর এককোড়িবাবু।

হরিশঙ্কর—এককড়িবাবু এসেছেন নাকি ?

বালাচাঁদ গূঢ় হাস্য করিয়া বলিলেন, হঁ্যা, হঁ্যা, এককড়িবাবুতো সব ঘাটমে পানি পীনেবালা। কাহে নেহি আবেগা ? আজ আপনাকে কামড়াবে কাল আপনাকে সুহাগ দেখলাবে। ও বিচ্ছু আছে একটা।

হরিশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, আপনি আসুন, কাজের কথাটা সেরেনি। লাট সাহেবের বাড়িতে একটু দেরি হয়ে গেল—

বালাচাঁদ ব্যগ্রভাবে বলিলেন—সাহেবের কোঠি থেকে আসছেন ? লাট সাহেব কেমন আছেন ? কি বললেন আপনাকে ? বড়বাজারে পিকেটিংয়ের কথা কুছু হল ? ব্লডশেডের কথা কুছু বললেন ?

হরিশঙ্কর নিজের মনে হাসিলেন বালাচাঁদের কথা শুনিয়া। মহাত্মা গান্ধীর পরমভক্ত বালাচাঁদ। মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিলে বালাচাঁদ এক ডেপুটেশনে গিয়াছিলেন তাঁহার কাছে বড়বাজার হইতে পিকেটিং তুলিয়া লইবার দরবার করিতে। ডেপুটেশনে সুবিধা হইল না। তখন হইতে সরকার পক্ষের বুলি, পিকেটিং মে লীড টু ভায়োলেন্স এণ্ড ব্লডশেড, বালাচাদ সর্বত্র প্রচার করিতেছেন। কিন্তু মহাত্মা তাঁহাকে নিরাশ করিলেও তাঁহার প্রতি ভক্তি অটুট রহিয়াছে। কথায় কথায় বলেন মহাত্মা ও পরমাত্মা তাঁহার কাছে এক। মহাত্মাজীর আন্দোলন সফল করিবার জন্য বালাচাঁদ, মগনচাঁদ, ছগনলাল কারবার তো সামান্য কথা, প্রাণ পর্যন্ত তেয়াগ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু একটা কথা, আন্দোলন যদি অহিংস না থাকে ? সেই তো তাঁহার ভয়। বাংলার ছোকরা বাবুরা পিকেটিং করিতেছে। উহাদের অহিংসার কথায় কি বিশোয়াস করা যায় ?

হরিশঙ্কর বলিলেন, আসুন ঘরে যাই, কাজের কথাটা হয়ে যাক।

বালাচাঁদ—উ ঘরে আর যাব না ব্যারিষ্টার সাহাব, ঝুটমুট ঝামেলায় পড়ব।

হরিশঙ্কর—ঝামেলা হবে না। খাস কামরায় আসুন।

এদিকে মৌলভী নুরুল হক সাহেব, পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রী, এককড়িবাবু ও ফণীর মধ্যে তর্কযুদ্ধ সমানে চলিতেছিল।

কথা আরম্ভ হইয়াছিল সেভার্স সন্ধির পরিবর্তনের প্রসঙ্গ লইয়া। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কিছু অশান্তি চলিতেছিল। ইতিমধ্যে শোনা গেল রুশিয়া, আফগানিস্থান ও পারস্যের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

কাগজে বলিতে লাগিল তুর্কীর অনুকূলে সেভার্স সন্ধি পরিবর্তনের জন্য চাপ দিবার উদ্দেশ্যে এই সন্ধি হইয়াছে। কাবুলে তুর্কী মিলিটারি মিশনের নেতা জামাল পাশা ও বোলশেভিকরা আফগান ও পাঠানদিগকে সামরিক শিক্ষা দিতেছে, তুর্ক ও বোলশেভিকদের অভিপ্রায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে। স্যর হেনরী ডবসের মিশন ব্যর্থমনোরথ হইয়া কাবুল হইতে ফিরিতেছে। মিশন ফিরিয়া আসিলে গোলমাল শুরু হইবে।

এদিকে কেমাল পাশা এঙ্গোরা দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। ইংরাজের প্ররোচনায় সুলতান তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেমাল পাশা স্মার্না ও থ্রেসে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সিরিয়া ও হেজাজে গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল। ইংরাজের ভয় হইল এশিয়া মাইনরের অশান্তি তুর্কীর হাত হইতে কাড়িয়া লওয়ায় অন্যান্য অঞ্চলে ছড়াইয়া না পড়ে। কোন কোন কাগজ বলিতে লাগিল মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি ও বোলশেভিকদের ভয়ে লর্ড রলিনসন ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে আফগান আক্রমণের ধুয়া তুলিয়াছেন, আসলে আফ্রিদীরা তাহাদের বরাবরের অভ্যাস মত ছোটখাট দুই একটা হামলা করিয়াছে।

কিন্তু আফগান আক্রমণের সম্ভাবনার কথা দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কাবুলী গুপ্তচরগণ দেশের নেতাদের সঙ্গে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করিতেছে এমন গুজবও রটিল। গভর্ণমেণ্ট যাহাই বলুন এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যেও আক্রমণের ভয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক ইংরাজ ভদ্রলোকের পুত্রকন্যা দার্জিলিংয়ে স্কুলে পড়িত। তাঁহার এক ভারতীয় বন্ধুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলমাল আরম্ভ হইলে দার্জিলিংয়ের মত জায়গাতেও বিপদের সম্ভাবনা আছে?

মুসলমান কাগজগুলি আফগান আক্রমণের সম্ভাবনাকে উড়াইয়া দিতে চাহিল। কিন্তু মাদ্রাজে মৌলনা মহম্মদ আলী এক বক্তৃতায় বলিলেন, আফগানরা যদি সত্যই ভারতবর্ষ আক্রমণ করে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইবে ইসলামের শত্রু ইংরাজকে ধ্বংস করিবার জন্য আমীরকে সাহায্য করা। এই এক বক্তৃতার ফলে সারা দেশের জল ঘোলা হইয়া উঠিল। হিন্দু কাগজগুলি জিজ্ঞাসা করিল এই বক্তৃতার অর্থ কি? মুসলমানদের প্রকৃত মনোভাব কি? একখানি মুসলমান কাগজ বক্তৃতার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিল, আমীর সত্যই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে হিন্দু ও মুসলমান অসহযোগীরা

নিশ্চয় গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অসহযোগের নীতি লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন না। ইহাতে আমীরের সাহায্য করা হইবে। কিন্তু উপায় কি? যে গভর্ণমেণ্টকে আমরা শয়তানী গভর্ণমেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করা অসহযোগের নীতিতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির কর্তব্য নয়। মৌলনা মহম্মদ আলী আমীরকে সাহায্য করিবেন বলিয়া এমন কিছু অন্যায় করেন নাই।

অধিকাংশ হিন্দু কাগজ এই ব্যাখ্যায় ভুলিল না। তাহারা বলিতে লাগিল, আলি ভাইরা আমীরকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজ শাসনের স্থানে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। কোন কোন কাগজ লিখিল, অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে এই বিশ্বাসঘাতকতার বীজ লুক্কায়িত থাকিলে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য।

বালাচাঁদকে বিদায় করিতে সময় লাগিল। বলাই কিছুদিন হইতে হাত গুটাইয়াছে, টাকা সংগ্রহ করিতে অসুবিধা হইতেছে, হয়ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবার ভয়েই সে গা ঢাকা দিয়াছে। আর কোন মতলব আছে কিনা তাহার মাথায় হরিশঙ্কর জানেন না। বোনটিকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য খোশামোদ করিতে আসিয়াছিল, পদ্মিনী যায় নাই। কে জানে সেই জন্য চটিয়াছে কিনা। তিনি তো পদ্মিনীকে যাইতে বলিয়াছিলেন, সে গেল না। সে নিজের ইচ্ছায় না গেলে তিনি কি করিবেন? টাকার টানাটানি দেখিয়া ফণী বলিয়াছিল বালাচাঁদকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখুন কিছু খসায় কিনা। বড় শক্ত পাল্লা। বালাচাঁদ টাকা খসাইতে রাজি কিন্তু টাকার বদলে কাজ চায়। কাজ মানে বড়বাজারে পিকেটিং বন্ধ করিতে হইবে ও জাপানী খদ্দর লইয়া গোলমাল করা চলিবে না। অনেক কষ্টে আগাম কিছু দিতে রাজি হইয়াছে। বলে পণ্ডিতজীকে দিতে হয়, এককড়িবাবুর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য দিতে হয়, ফণীবাবুকে কিছু দিতে হয় মাঝে মাঝে, পিকেটার বাবুদের জন্য মিঠাই সরবৎ বাবদ খরচ হয়, কত দিকে আর দেব? হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন পণ্ডিতজীকে টাকা দেন কেন?

বালাচাঁদ বলিলেন, পণ্ডিতজী বড় ধার্মিক মানুষ। তাঁর বাড়ীতে গীতার ব্যাখ্যা করেন। আপনারা তো কেবল গালমন্দ করেন, এক পণ্ডিতজী তাঁর কাগজে আমাদের পক্ষে দু'টো ভাল কথা বলেন। তাঁকে না খাওয়ালে বলবেন কেন?

বালাচাঁদকে বিদায় দিয়া হরিশঙ্কর যখন বাহিরের ঘরে আসিলেন তর্কযুদ্ধ তখনও চলিতেছে।

এককড়ি বাবু বলিতেছিলেন, মৌলভী সাহেব, আপনার কথাগুলো শুনতে ভাল তবে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। এখানে বসে আফগান আক্রমণের কথা আপনি গুজব বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কলকাতায় ও মফস্বলের নানা জায়গায় যে সব উদু' বিজ্ঞাপন বিলি হচ্ছে আফগানরা হিন্দুস্থান আক্রমণ করবার জন্য আসছে, কেমাল পাশা রাওয়ালপিণ্ডি পর্যন্ত এসে পড়েছেন, সে গুলোকে কি বলে উড়িয়ে দেবেন? আফগানরা আসবে বলে কলকাতায় মুসলমান ইতরসাধারণের মধ্যে যে উল্লাস দেখা যাচ্ছে সেটা কি যুক্তিতে উড়িয়ে দেবেন?

মৌলভী সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আপনি ইনকরিজিব্লি কম্যুন্যাল-মাইণ্ডেড লোক, আপনাকে কিছু বলা বৃথা।

ফণী মৌলভী সাহেবের কথায় উত্তেজিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল হরিশঙ্কর তাহাকে বাধা দিলেন। বলিলেন, বাজে তর্ক থাক ফণী। ওহে হক্, তুর্কী আফগানের কথা অনেক হয়েছে, নিজের দেশের খবর রাখ?

মৌলভী সাহেব শান্ত হইয়া বলিলেন, কোন খবরের কথা বলছ?

হরিশঙ্কর—দিনাজপুরে, টাঙ্গাইলে, বরিশালে, কুমিল্লা ও চাটগাঁয়ে মুসলমান চাষীরা নাকি জমিদারদের বিরুদ্ধে দল বাঁধছে? দাশ সাহেব পূর্ববঙ্গ সফর করে এলেন। তিনি বললেন সব জায়গায় একটা চাপা উত্তেজনার ভাব দেখলেন চাষীদের মধ্যে।

এককড়ি বাবু—আফগান ও পাঠানরা আসবার সংবাদে এরা হিন্দুদের ধ্বংস করবার জন্য তৈরী হচ্ছে।

মৌলভী সাহেব—হিন্দুদের ধ্বংস করবার জন্য নয় এককড়ি বাবু, অত্যাচারী জমিদারদের ধ্বংস—

নিমাই শাস্ত্রী—আপনি যে বোলশেভিকদের মত কথা বলছেন।

তাঁহাকে বোলশেভিক বলাতে চটিয়া গিয়া মৌলভী সাহেব কী বলিতে যাইতেছিলেন হরিশঙ্কর বাধা দিয়া বলিলেন, চটো না হক্। তোমাকে কেউ বোলশেভিক বলে ভুলেও মনে করবে না। সে কথা যাক্, তুমি বোধহয় বলতে চাইছিলে অসহযোগ আন্দোলন এদিকে বোলশেভিজম আসবার পথ করে দিচ্ছে। কথাটা এদেশের কেউ কেউ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের গোড়া থেকে বলে আসছেন

আজ লর্ড রোনাল্ডশে কথাটা তুললেন। পূর্ববঙ্গে মুসলমান কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনার খবর তাঁর কাছেও পৌঁছেছে। বেরিলী, গিরিডির কথা উল্লেখ করলেন, কুমায়ুনের কথাও বললেন। কুমায়ুনে বেগ'র প্রথার বিরুদ্ধে চাষী ও সাধারণ লোকের মধ্যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। তারপর মালেগাঁও গোলমালের কথা, হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস, বাড়ীঘর লুট ও জীবন নাশের কথা বললেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পুলিশকে তোমরা গালাগাল করছ, ধরো আমরা যদি পুলিশ সরিয়ে নিই, how do you expect to fare placed between the Moslems excited by rumours of Afghan invasion and eager for plunder, and peasants and labourers incited by your non-cooperation volunteers, against landlords, money-lenders and Goverment? (একদিকে আফগান আক্রমণের গুজবের ফলে উত্তেজিত ও লুটের আশায় উদগ্রীব মুসলমান, অন্যদিকে তোমাদের অসহযোগ আন্দোলনের ভলান্টিয়ারদের প্ররোচনায় জমিদার, মহাজন ও সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত চাষা ও মজুর শ্রেণীর সম্মুখীন হইয়া তোমাদের কি হাল হইবে মনে কর?) জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি চাও। Chaos and anarchy, না orderly progress? (বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা, না সুনিয়ন্ত্রিত প্রগতি?)

ফণী বলিল—আপনি কি উত্তর দিলেন স্যর?

হরিশঙ্কর কোন উত্তর দিলেন না, একটু হাসিলেন।

এককড়িবাবু বলিলেন, বাজারে একটা গুজব রটেছে মহাত্মা গান্ধী নাকি বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবেন।

হরিশঙ্কর—বাজারের গুজবের কথা আমি কি বলব?

নিমাই শাস্ত্রী কি বলিতে যাইতেছিলেন তিন চার জন লোক, পোষাক দেখিয়া মনে হয় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক, ঘরে ঢুকিল। তাহাদের উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর?

একজন স্বেচ্ছাসেবক বলিল, হৃষিকেশ পার্কে মহিলাদের সভা পুলিশ ভেঙ্গে দিয়ে কুড়ি পঁচিশ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে ভ্যানে তুলে নিয়ে গেল।

দ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবক ফণীর কানে কানে কি বলিল। ফণী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বেচ্ছাসেবকদের বলিল, তোমরা এখানে না এসে ভ্যানের সঙ্গে গেলেনা কেন? ভ্যান গেল কোথায়? লাল বাজারে?

প্রথম স্বেচ্ছাসেবক বলিল, দু'জন গিয়েছে ভ্যানের পিছুপিছু। তারা ফিরলে সব জানা যাবে। একজন বলাই বাবুর বাড়ীতে গিয়েছে।

ফণী বলিল, চল ঐ ঘরে, ভাল করে শুনি সব কথা।

হরিশঙ্কর বলিলেন—কি হয়েছে ফণী? বলাইয়ের বাড়ীতে গেল কেন?

ফণী যাইতে যাইতে বলিল, বলাই বাবুর ভগ্নী গ্রেপ্তার হয়েছেন, সেই খবর জানাতে গিয়েছে।

হরিশঙ্কর পদ্মিনীর গ্রেপ্তারেব খবর শুনিয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন হঠাৎ পদ্মিনী কেন পুলিশের হাতে ধরা দিতে গেল? সভা ও শোভাযাত্রায় তাহাকে যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তিনি। প্রকাশ্যে তিনি এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিলেন না।

এককড়িবাবু হবিশঙ্করেব দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অনুসরণ কবিয়া মৌলভী সাহেব ও নিমাই শাস্ত্রীও উঠিলেন।

তাঁহারা বিদায় লইয়া যাইবার পরে হরিশঙ্কব চিন্তিতভাবে খাসকামরায় ঢুকিতেছেন এককড়িবাবু আবার ফিরিয়া আসিলেন।

হবিশঙ্কর বলিলেন, কোন কথা বুঝি হঠাৎ মনে পড়ে গেল এককডিবাবু?

এককডিবাবু—বলাইকে এখানে দেখলাম না, তাব কাছে একটু বিশেষ দরকার ছিল।

হবিশঙ্কর হাসি গোপন করিয়া বলিলেন—বলাইয়ের সেপটিক জ্বব হয়েছিল। সে খুব সাবধানে থাকে আজ কাল, বাইবে বড বেবোয় না।

এককড়িবাবু—আমার বড অনাটন চলেছে আজকাল। স্ত্রীর সাংঘাতিক অসুখ নিয়ে—

হরিশঙ্কর—আপনার স্ত্রী নাকি গত হয়েছেন শুনেছিলাম।

এককডিবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, গত হবার উপক্রম করেছিলেন কিন্তু মনস্থির না করতে পেরে রয়ে গিয়েছেন।

হবিশঙ্কব এককডিবাবুর উত্তর শুনিয়া হাসিলেন। বলিলেন, বেশ, আপনি বলাইয়ের কাছে যান। আমারও অত্যন্ত অনাটন চলছে। আয় বন্ধ, বুঝতেই তো পারছেন।

এককড়িবাবু একটু হতাশ হইয়া বলিলেন, বেশ, আমি বলাইয়ের কাছে যাচ্ছি, তবে যে খবর শুনলাম তারপরে—

হরিশঙ্কর—গিয়ে কিছু সুবিধে হবে কিনা সন্দেহ? বোধহয় ঠিক অনুমান করেছেন। আপনার কলম বড় বেয়াড়া চলছে এককড়িবাবু। ভোল ফেরান, নইলে কোথাও সুবিধে হওয়া কঠিন। আচ্ছা, নমস্কার।

এককড়িবাবু চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে পথে নামিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন কি ব্যাপার বোঝা গেল না। পদ্মিনীকে নিয়ে বলাই সরকারের সঙ্গে ব্যারিষ্টার সাহেবের গোলমাল হয়েছে শুনেছিলাম। পদ্মিনীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল শুনে উনি এক ফোঁটা চাঞ্চল্য দেখালেন না। তবে কি পদ্মিনীতে অরুচি হয়েছে, নূতন লীলাসঙ্গিনীর সন্ধানে আছেন? ইহাই কি বলাই সরকারের সঙ্গে গোলমালের কারণ? ফণী সিংহের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখবেন কোন আলোক পাওয়া যায় কিনা? কিন্তু ফণীকে ঘাঁটাবার বিপদ আছে। ব্যারিষ্টার সাহেবের পোষা কুকুর সে। বেফাঁস কথা শুনলে হয়ত খ্যাঁক করে কামড়াতে আসবে।

বলাই সরকারের বাড়ী যাইবার পথ ধরিলেন এককড়িবাবু। কিছু দূর গিয়া আবার অন্যপথ ধরিলেন। ভাবিলেন এখন গিয়ে কোন লাভ হবে না। হয়ত মেজাজ খারাপ করে রয়েছে বলাই। কিছুদিন ধরে অসহযোগ আন্দোলনের শুধু নিন্দা করেছেন তিনি, সি, আর, দাশের দল, হরিশঙ্করের দল চটে আছে। এই সব বড় বড় ব্যারিষ্টাররা নির্বোধ কম নয়। তাঁরা কি জানেন না হাতে কিছু গুঁজে দিলেই এককড়ির সুর পাল্টায়? এ বেলা সে কা কা করছে, ও বেলা কুহু কুহু করবে? সকলে বলে এককড়িবাবুর কোন প্রিন্সিপল নাই। তোমাদের কার প্রিন্সিপল আছে বাপু? যাক সে সব কথা। একটু ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে বলাইয়ের কাছে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের পরম স্নেহভাজন বলাই সরকারের মহান আত্মত্যাগ, গভীর দেশপ্রীতি, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও বিচক্ষণ নেতৃত্বশক্তির প্রশংসা করে গোটা দুই আর্টিকেল আগে বার করতে হবে। টাকার বড় প্রয়োজন। শুধু অভাবের কথা বলাতে কেহ যখন দিবে না তখন—

একখানি গাড়ী অন্যমনস্ক এককড়ি বাবুর প্রায় ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। চালকের তৎপরতায় এককড়ি বাবু বাঁচিয়া গেলেন এ যাত্রা। সতর্ক হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন তিনি।

চট্টগ্রামে ১৪৪ ধারার আদেশের প্রতিবাদে জে, এম, সেন গুপ্তের নেতৃত্বে হরতাল ঘোষণা করা হইয়াছিল। চট্টগ্রামের হরতালের সংবাদ প্রকাশিত হইলে দেশের লোক চমৎকৃত হইল। "বর্মা যাত্রী এস, এস লঙ্কার দেশীয় লস্কর

জাহাজ হইতে নামিয়া গেল। সরকারী ডাক বহন করিবার লোক নাই। মাল নামাইবার উঠাইবার জন্য জেটিতে একজন কুলিও উপস্থিত নাই। দোকানপাট বন্ধ, যানবাহন বন্ধ, য়ুরোপীয়ানদের খানসামা, বাবুর্চি, বয় সকলে ধর্মঘট করিয়াছে, বিলাতী ও দেশী ফার্মগুলির কাজকারবার বন্ধ। আদালত বন্ধ, বার লাইব্রেরীর সভ্যগণ ধর্মঘট করিয়াছেন। মুনিসিপালিটির জলের কল বন্ধ। কক্সবাজার ও বর্মা যাত্রী সকল নৌকা, ষ্টীমার বন্ধ। পাহাড়তলীর রেলওয়ে কারখানা বন্ধ, জেটি, বন্দর, রেলওয়ে আফিসের দেশীয় কর্মচারীরা ধর্মঘট করিয়াছে। আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে ধর্মঘট, চট্টগ্রাম হইতে তিনসুকিয়া পর্যন্ত সকল গাড়ী বন্ধ। জেলা কংগ্রেস কমিটির হিন্দু ও মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকরা জেনারেল হাসপাতালের রোগীদের জন্য লাল দীঘি হইতে বালতি করিয়া জল বহিয়া দিতেছে। স্বামী বিশ্বানন্দ, নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিমচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে বিরাট শোভাযাত্রা ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া শহর প্রদক্ষিণ করিল। ১৪৩ ও ১৮৮ ধারা মতে নেতাদিগের উপর শমন জারি হইল, কেহই শমন গ্রাহ্য করিল না। নোটিশ জারি করিবার পাঁচ মিনিট পরে সরকারী উকিল ও একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কংগ্রেস অফিসে গিয়া জানাইলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নেতাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা আরও জানাইলেন সকল বেআইনী আদেশ প্রত্যাহার করা হইবে। রেলওয়ের এজেন্ট, বিলাতী ফার্মগুলির প্রধানগণ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পরামর্শ সভায় যোগ দিলেন। বেলা ৮টার সময় সকল বেআইনী আদেশ প্রত্যাহার করা হইল। নেতারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করিলেন।”

চট্টগ্রামের শ্রমিক ধর্মঘট ও হরতালের সাফল্য অসহযোগীদের মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ বহিল। যাঁহারা অসহযোগীদের সঙ্গে যোগ দেন নাই তাঁহারা বলিতে লাগিলেন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের আদর্শ দেশবাসীর মন হইতে ভয় দূর করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ জাগাইয়াছে, তাহাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। অসহযোগের আদর্শ দেশের ইতর সাধারণের মধ্যে নূতন উৎসাহ, নূতন জীবন সঞ্চারিত করিয়াছে।

অসহযোগ আন্দোলনের সমালোচকদের স্বর ক্রমে কর্কশ হইয়া উঠিতেছিল। মিসেস আনি বেশান্ত মালাবার কনফারেন্সে অসহযোগের কথায় বলিলেন, “The whole thing is bluff and gigantic failure” (সমস্ত জিনিসটা একটা ধাপ্পা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা)। একখানি কাগজ লিখিল, “গভর্ণমেণ্টের শত্রুরা এখন হাটে মাঠে ঘাটে প্রকাশ্যে আপনাদের মত প্রচার করিতেছে।

প্রেস ও প্লাটফরম হইতে বিষবাষ্প ছড়ান হইতেছে।" অন্য একখানি কাগজ লিখিল, "যখন আমরা দেখি কোন কোন নেতার আদেশমাত্রে হাট বাজার, কাজ কারবার বন্ধ হইতেছে, যখন আমরা দেখি কল কারখানার মজুররা হঠাৎ ধর্মঘট করিয়া বসিতেছে তখন বুঝিতে কষ্ট হয় না অসহযোগ আন্দোলন মুমূর্ষু নহে, বরং উহা বিপজ্জনক জীবনীশক্তির পরিচয় দিতেছে।" অন্য একখানি দেশী কাগজ লিখিল, "অসহযোগ ঠগীদের কার্য, সতীদাহ, শিশুহত্যা, নরবলি বা ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে কোন জঘন্যতম ব্যাপার অপেক্ষাও জঘন্য। উহা দমন করিবার জন্য যে কোন উপায় সমর্থনযোগ্য।"

মির্জাপুর পার্কে সভা হইতেছিল। পার্কে তিল ধরণের স্থান ছিল না, পার্শ্ববর্তী মির্জাপুর ষ্ট্রীট ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে লোকের ভিড়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আগামী কয়েক মাসে অসহযোগীদের কার্যক্রম সম্বন্ধে নেতারা বক্তৃতা করিতেছিলেন। পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রী বক্তৃতা করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে যাহারা জানিতে পারিল পণ্ডিতজী কাঁদিতেছেন তাহারা অত্যন্ত বিচলিত হইল। তাঁহার পরে হরিশঙ্কর বক্তৃতা করিলেন। ঘন ঘন করতালির শব্দে তাঁহাকে মাঝে মাঝে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। এই রকম এক ফাঁকে একজন স্বেচ্ছাসেবক আগাইয়া আসিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিল। তিনি মাথা নাড়িয়া হাত দিয়া স্বেচ্ছাসেবককে সরাইয়া দিলেন। আরও মিনিট দুই বলিবার পরে তিনি অন্য একজন নেতাকে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত করিলেন। বক্তৃতা চলিতে লাগিল, হরিশঙ্কর সভাক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

স্বেচ্ছাসেবকটি হরিশঙ্করকে জানাইয়াছিল যে সিমলা হইতে জরুরী তার আসিয়াছে, দাশ সাহেব এখনই হরিশঙ্করকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিয়াছেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় লর্ড রেডিংয়ের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর পর পর দুইদিন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ কালে কি আলোচনা হইয়াছিল লোকে জানিতে পারিল না কিন্তু আলোচনা যে ফলপ্রসূ হয় নাই তাহা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। সাক্ষাতের পর সিমলায় এক জনসভায় মহাত্মা গান্ধী শ্রোতাদের বলিলেন, নানকানায় যাঁহারা নিহত হইয়াছেন আপনারা তাঁহাদের মত আচরণ করিবেন। স্বাধীনতার জন্য আপনাদের নিজের রক্তপাত করিতে হইবে, অন্যের রক্তপাত করিবেন না।" লালা লজপত রায় এই সভায়

বলিলেন, অসহযোগের মৌলিক দাবিগুলি গ্রাহ্য না হইলে কোন আপোষের প্রস্তাব গ্রাহ্য করা হইবে না।

বড়লাটের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাতের ব্যাপার লইয়া কিছু বিরূপ সমালোচনা চলিল। একখানি কাগজ লিখিল, আপোষপন্থী পণ্ডিত মালবীয়ের উদ্যোগে এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সুতরাং আপোষের প্রস্তাব যে আলোচিত হয় নাই আমরা তাহা মনে করিতে পারি না। বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার মর্ম গোপন করিয়া মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীকে আদার বেপারীর ন্যায় মনে করিয়াছেন।

অসহযোগের সমালোচকদলের কাগজগুলি সহজে এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহিল না।

পাঁচ

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবার পরে হরিশঙ্করের ব্যক্তিগত অভ্যাসে ও প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটিতেছিল। পোষাকের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল প্রথমে। বাড়ীতে বিলাতী কায়দায় বেশভূষা করিলেও মিটিংকা কাপড়া হইয়াছিল খদ্দর। খদ্দরের কাপড়, জামা ও গান্ধী টুপী না পরিলে নেতা হইবার উপায় ছিল না, সভায় বক্তৃতামঞ্চে স্থান পাইবার উপায় ছিল না। ক্রমে বক্তৃতামঞ্চ হইতে সামাজিক সম্মেলনের ক্ষেত্রে ও তারপর গৃহেও খদ্দরের প্রচলন হইল।

ব্যক্তিগত সজ্জার পরিবর্তনের পরে গৃহ সজ্জার কিছু কিছু পরিবর্তন হইল। ড্রইং রুম হইতে বিলাতী আসবাব বিদায় লইল ও তাহার জায়গায় আসিল দেশী ফরাস। সহকর্মী নেতারা আসিলে ঢালা ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া হরিশঙ্কর তাঁহাদের সঙ্গে উচ্চস্তরের রাজনৈতিক আলোচনা করিতেন। বিদেশী সিগার ও সিগারেট বর্জিত হইল, গড়গড়া ও বর্মা চুরুটের প্রচলন হইল। আলোচনার সময়ে কোন কোন নেতা সুদৃশ্য রূপার কেস হইতে বিশুদ্ধ স্বদেশী বিড়ি বাহির করিয়া গভীর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ধূমপানের প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিতেন।

নেতাদের মধ্যে উচ্চস্তরের রাজনৈতিক আলোচনার আনুষঙ্গিক আর একটি বস্তুর অভাব হইয়াছিল। সকলের কথা বলা কঠিন কিন্তু হরিশঙ্করের সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে তাঁহার গৃহে বিলাতী পানীয়ের প্রকাশ্য ও গোপন ব্যবহার বন্ধ হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণের জন্য তিনি সাহেবী হোটেলে প্রবেশ করিতেন কিনা ও সেখানে অভ্যস্ত পানীয় গ্রহণ করিতেন কিনা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু গৃহে বিলাতী পানীয়ের প্রবেশ বন্ধ হইয়াছিল সরলা দেবী জানিতেন।

স্বামীর পুরাতন অভ্যাসের পরিবর্তনে সরলা দেবী আনন্দিত হইলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশের কোন লাভ হউক বা না হউক স্বামীর এই পরিবর্তনকে তিনি নিজের বড় লাভ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি আরও

মনে করিতেন তাঁহার লাভ ষোল আনা পুরিত যদি পদ্মিনী বিদায় লইত। কিন্তু পদ্মিনীর বিদায় লইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। জেল হইতে ছাড়া-পাইয়া হরিশঙ্করের কনফিডেন্সিয়াল এসিষ্টাণ্টরূপে সে এই বাড়িতে আস্তানা গাড়িয়াছে। সে গোপনীয় চিঠিপত্রের ডিক্টেশন লয়, কপি করে। সংবাদপত্রে পাঠাইবার জন্য বিবৃতির কপি করিয়া রিপোর্টারদের দেয়। তাহাকে এই কাজে সাহায্য করিবার অন্য লোক ছিল। হরিশঙ্কর নিজেও তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। হরিশঙ্করের খাস কামরায় তাহার জন্য আলাদা চেয়ার টেবিল হইয়াছে।

পদ্মিনী হরিশঙ্করের গৃহে থাকে কিন্তু তাহার দেশবিখ্যাত ভ্রাতা বলাই সরকার আজকাল সে গৃহে পদার্পণ করে না। এ সম্বন্ধে নানা প্রকার গুজব বাজারে প্রচারিত হইয়াছিল। একটি গুজবমতে ফণী সিংহের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া তাহাব চাকুরি খাইবার পরে কড়েয়া অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গিনী গণিকাদের পাড়ায় বলাইয়ের গাড়ী আটকাইয়া ফণী সিংহের দল নাকি মারিয়া তাহাব একখানি ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ফণী অন্য পাটিও ভাঙ্গিয়া দেয় এই ভয়ে সে নাকি হরিশঙ্করের বাড়ীমুখো হয় না। এই গুজবের মূলে হয়ত কোন সত্য নাই। বলাই আজকাল একটু খোঁড়াইয়া হাঁটে বটে, কিন্তু তাহার কারণ কি অন্যবিধ হইতে পারে না?

হরিশঙ্করের এসব দিকে মন দিবার অবসর নাই। তিনি ভয়ানক ব্যস্ত। চাঁদপুরে চা বাগানের কুলীদের লইয়া হাঙ্গামা বাধিয়াছে। ঘন ঘন পরামর্শ সভা বসিতেছে নেতাদের মধ্যে।

অসহযোগ আন্দোলন এদেশে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে নূতন উত্তেজনা আনিয়াছে, নূতন প্রাণ আনিয়াছে, সমালোচকগণের এই অভিযোগ মিথ্যা নয়। অসহযোগী কুলি মজুররা দেশেব নানা জায়গায় নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে নেতাদের ব্যতিব্যস্ত করিবার জন্য। অন্য জায়গার কথা কি, এই কলিকাতা শহরেই দলবদ্ধ অসহযোগী ওড়িয়া ও বিহারী কুলি মজুররা ক্লাইভ-ষ্ট্রীটে ও বড় বাজারে কাজকর্ম এক রকম অচল করিয়া তুলিয়াছে। এই সব ওড়িয়া ও বিহারী কুলি মজুররা কংগ্রেস ও খিলাফৎ ভলেণ্টিয়ারদের কথায় উঠে বসে। ব্যবসায়ীসমাজ আজ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে কংগ্রেসের শক্তির মূল উৎস কোথায়।

আসামের চা বাগানের কুলিরা পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বিদেশী চা-করদের

অত্যাচার সহ্য করিতেছিল। স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার, স্যর হেনরী কটন ও দেশী কাগজগুলি বহুবার সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়া কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। এতদিন পরে আজ তাহারা ধর্মঘট করিয়া দলে দলে আসামের দূর দূরান্তরের চা বাগানগুলি ত্যাগ করিয়া নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া যাইবার জন্য চাঁদপুরে জমায়েৎ হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাহাদিগকে রেলের টিকিট বিক্রয় করা বন্ধ হইল। রেলওয়ে প্লাটফরমে, ষ্টেশনের আশেপাশে খোলা মাঠে রৌদ্র ও বৃষ্টি মাথায় করিয়া পড়িয়া রহিল তাহারা। তাহাদের খাদ্য সংগ্রহে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইল। অনেকের সামান্য সম্বল শেষ হইয়া গেল। অনাহারক্লিষ্ট ধর্মঘটী কুলিদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিয়া পরিত্যক্ত চা বাগানগুলিতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিবার জন্য চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ও তাঁহার অধস্তন কর্মচারীরা চাপ দিতে লাগিলেন। সরকারী খরচায় কুলিদিগকে নিজেদের বাসস্থানে পাঠান হউক নেতাদের এই প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিলেন। এদিকে মহামারীর আকারে কলেরা, আমাশয় আরম্ভ হইল তাহাদের মধ্যে। ইতিমধ্যে ধর্মঘটীদের উপর গুর্খাবাহিনীর আক্রমণের সংবাদে দেশের লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিল! সি. এফ্‌ এণ্ড্রুজ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ করিলেন। গুর্খা আক্রমণের জন্য দায়ী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইবার পর তিনি লিখিলেন, "The Government not only of Bengal but of India, by its actions, has come more and more to side with the vested interests, with the capitalists, with the rich, with the powerful against the poor and the oppressed. (বাংলা সরকার ও ভারত সরকার আপনাদিগের কাজের দ্বারা কায়েমী স্বার্থ, বণিক ও বিত্তবানদিগের পক্ষ লইয়া দরিদ্র, অত্যাচারিত শ্রেণীগুলির বিপক্ষে অগ্রসর হইতেছে।) তিনি প্রকাশ করিলেন চা বাগানের মজুরদের দৈনিক ছয় পয়সা মজুরী দেওয়া হইত। কুলিদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে চাঁদপুরে দিনের পর দিন হরতাল চলিতে লাগিল।

আসামের চা বাগানের কুলিদের ধর্মঘটের পরে গোয়ালন্দ-চাঁদপুর ষ্টীমার সার্ভিস ও আসাম-বেঙ্গল রেলের কর্মীদের ধর্মঘট আরম্ভ হইল।

কুলিদের সাহায্য করিবার উপায় সম্বন্ধে কলিকাতায় নেতাদের মধ্যে

ঘন ঘন পরামর্শ সভা হইতেছিল। জে. এম. সেনগুপ্ত দলবল লইয়া চাঁদপুরে রওনা হইয়া গেলেন। চাঁদা তুলিয়া ষ্টীমার ভাড়া করিয়া কুলিদিগকে চাঁদপুর হইতে আনিয়া বাসস্থানে পাঠাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এংলো-ইণ্ডিয়ানসমাজের মুখপত্রগুলি চা বাগানের কুলিদের ধর্মঘট ও পূর্ববঙ্গে ষ্টীমার ও রেলের ধর্মঘটের জন্য বোলশেভিক প্রভাবিত অসহযোগ আন্দোলনকে দায়ী করিয়া গভর্ণমেণ্টকে ব্যাপক দমননীতি প্রয়োগের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। রাজশাহীর জেল ভাঙ্গিয়া ৬০০ কয়েদীর পলায়ন করিবার সংবাদে ইহারা আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

বলাই সরকারের গৃহে সভা বসিয়াছিল। মৌলভী নুরুল হক, বালাচাঁদ ও এককড়িবাবু আসিয়াছিলেন। বালাচাঁদ আসিয়াছিলেন তাঁহার গৃহে গীতা ব্যাখ্যায় সভগ্নী বলাইকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য। সে খবর পাইয়াছিল বালাচাঁদ হরিশঙ্করের গৃহে আজকাল প্রায়ই যায় ও হরিশঙ্কর তাহার সঙ্গে পদ্মিনীর আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। সভগ্নী তাহাকে নিমন্ত্রণ করাতে বলাইয়ের উর্বর মস্তিষ্কে নূতন একে মতলবের অঙ্কুর সহসা গজাইয়া উঠিল। সে ভাবিল বালাচাঁদকে হাত করিয়া অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া ফণীর দল ও তাহাদের মুরুব্বী হরিশঙ্করকে কাহিল করা যায় কিনা দেখিতে হইবে। বালাচাঁদ আজকাল উদারভাবে হরিশঙ্করকে অর্থ সাহায্য করিতেছে সে খবরও পাইয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলাইয়ের অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না পদ্মিনীর সঙ্গে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ করিবার আকাঙ্ক্ষা হরিশঙ্করের প্রতি বালাচাঁদের উদারতার হেতু। মৌলভী সাহেব আসিয়াছিলেন কেমাল পাশার আঙ্গোরা গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য যে আঙ্গোরা ফাণ্ড ও আঙ্গোরা লিজিয়ন তুলিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য বলাইয়ের সাহায্য লাভ করিবার আশায়। এককড়িবাবু আসিয়াছিলেন তাঁহার কাগজের পর পর কয়েকটি সংখ্যায় হরিশঙ্করকে গালাগালি ও দলীয় ষড়যন্ত্রের ফলে অদ্ভুত সংগঠনী-প্রতিভাশালী শ্রীমান বলাই সরকারের নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত বাংলার দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে খেদ প্রকাশ করিবার পর অসুস্থা স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বলাইয়ের সক্রিয় সাহায্য লাভের আশায়।

আঙ্গোরা ফাণ্ড তুলিবার প্রস্তাব শুনিয়া এককড়িবাবু সাগ্রহে বলিলেন, মৌলভী সাহেব, আপনি মুসলিম বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। আপনার মত লোক এই কাজের ভার নিলে আমি প্রচারের ভার নিতে রাজি আছি।

মৌলভী সাহেব একটি 'ঘোঁৎ' শব্দ করিয়া বলিলেন—তা তো রাজি আছেন, এককড়িবাবু, কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস কি মশায়? আপনি হামেশা খিলাফৎ আন্দোলনের নিন্দা করেন, সেদিন করাচী প্রস্তাবের নিন্দা করেছেন। আপনাদের অসহযোগ আন্দোলনের মর্ম আমরা বুঝে নিয়েছি। সোজা কথা এই যে মোছলমানদের দাবিয়ে রেখে আপনারা সব সুযোগ সুবিধে ভোগ করতে—

বালাচাঁদ বাধা দিয়া বলিলেন, করাচী রেজোল্যুশানে মওলানা মহম্মদ আলি সাহেব সিডিসান করেছেন তাই না বোলাই বাবু? ব্যারিষ্টার সাহেব বললেন সরকার তাঁকে গেরেপ্তার করবেন।

এককড়ি বাবু মৌলভী সাহেবের কথায় চটিয়াছিলেন। ক্রোধ দমন করিয়া তিনি বলিলেন, এশিয়ার তুর্কীসাম্রাজ্য ধ্বংস করবার সাহায্য করেছে ভারতবর্ষের মুসলমান সৈন্য। আজ ইংরাজকে ভয় দেখাবার জন্য আপনাদের নেতারা করাচীতে বসে প্রস্তাব পাশ করছেন, মুসলমান ভাইসব, ইংরাজের ফৌজে যোগ দিয়ো না। ভেবেছেন গোদা পায়ের এই লাথির ভয়ে ইংরাজরা—

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া মৌলভী সাহেব কি বলিতে যাইতেছিলেন, এককড়ি বাবু অমায়িকভাবে হাসিয়া বলিলেন, অত চটছেন কেন হক সাহেব? করাচী প্রস্তাব যেতে দিন, আঙ্গোরা ফাণ্ডের কথা হচ্ছিল, তাই হোক। কংগ্রেস তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডে এক কোটি টাকা তুলছে, খিলাফৎ কমিটি একটা ফাণ্ড না খুললে, বলাই কি বলো?

বলাই কোন উত্তর দিবার আগে বালাচাঁদ বলিলেন, বাংলা থেকে পঁচিশ লাখ রূপেয়া তো উঠে গেল মোশায়, মহাৎমাজীর শক্তি কত দেখেন। আহ্-হ্ পঁচিশ লাখ!

গান্ধী বাবানে চরকা চলায় দিয়ো রে
গান্ধী বাবানে বন্দর ভগায় দিয়ো রে
গান্ধী বাবানে তিলক ফণ্ড বনায় দিয়ো রে।

বালাচাঁদের অভিনব গান্ধীস্তোত্র শুনিয়া ঘরের সকলে হাসিতে লাগিলেন, এককড়ি বাবু বলিলেন, বালাচাঁদজী, এ গান কি আপনি বানিয়েছেন?

বালাচাঁদ বিনীত হাস্যে বলিলেন, নেহি জী; দেহাতি লোক এই গান বনাইছে। আমি তিলক ফণ্ডটা জুড়ে দেইছি। ভালো হইছে না?

ঘরের এককোণে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বলাই উঠিয়া টেলিফোন ধরিল। কিছুক্ষণ পরে টেলিফোন রাখিয়া সে বলিল, খুব জরুরী

কাজে আমাকে এখুনি বেরুতে হচ্ছে। আপনারা এসেছেন, কথা বার্তা হল না ভাল করে।

বালাচাঁদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বোলাইবাবু আমার নিমন্ত্রোণ ভুলবেন না। জরুরী কাজ থাকে দশ মিনুট পঁদেরো মিনুট শুনে চলে আসবেন। দু'জনে যাবেন।

যাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া বলাই তাঁহাকে বিদায় করিল। আজ অনেক দিন পরে হরিশঙ্কর স্বয়ং তাহাকে ডাকিয়াছেন। কি জন্য ডাকিয়াছেন না শুনিয়া বালাচাঁদের কাছে মতলব ফাঁস করা ঠিক হইবে না। কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখা ভাল।

মৌলভী সাহেব উঠিলেন। বলিলেন, আঙ্গোরা ফাণ্ড সম্বন্ধে আমার আরজটা মনে রাখবেন বলাইবাবু। আপনি অন্য নেতাদের মত কম্যুন্যাল-মাইণ্ডেড নন তাই আপনার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছি।

বলাই বলিল, কাল সকলের খবরের কাগজ পড়ে যদি মত না বদলায় কয়েকদিন পরে আসবেন। মৌলভী সাহেব সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না বলাইবাবু। কাল খবরের কাগজে কি খবর পড়ে মত বদলাবে?

বলাই বলিল, আগে শুনে কি লাভ? আচ্ছা, সেলাম।

মৌলভী সাহেবের সন্দিগ্ধভাব গেল না। কি চিন্তা করিতেঁ করিতে তিনি বিদায় লইলেন।

এককড়িবাবুর দিকে চাহিয়া বলাই বলিল, আজ আসুন এককড়িবাবু, আমি বেরুব।

এককড়িবাবু বলিলেন, বালাচাঁদ কি উপলক্ষে তোমাকে নিমন্ত্রণ করল বলাই? দু'জনের যাবার কথা বলল সে। দু'জন কে কে?

বলাই সংক্ষেপে বলিল, তা শুনে আপনার কি লাভ?

এককড়িবাবু—লাভের কথা হচ্ছে না, শুধু জানতে চাইছিলাম। হককে কি খবরের কথা বলে ভাগালে বলাই?

বলাই—সে খবর আপনার কাগজের অফিসে এসে গেছে এতক্ষণ। অফিসে যান, জানতে পারবেন।

এককড়িবাবু—তা যাচ্ছি। কিন্তু আমাকে কিছু না দিলে নয় বলাই। আমার কাগজের সম্প্রতিকার লেখাগুলো দেখেছ কি?

বলাই ড্রয়ার হইতে তিনখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, সম্প্রতিকার লেখা দেখেছি কিন্তু আজ হাতে বিশেষ কিছু নাই, এই নিয়ে যান। কয়েকদিন না দেখে আর ও রকম লেখা ছাড়বেন না। আজ আমাকে ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ী যেতে হবে। কথা বুঝলেন ?

এককড়িবাবু নোটগুলি কোঁচার খুটে বাঁধিয়া কোমরে গুঁজিলেন। বলিলেন কিছুটা বুঝলাম। সবটা বুঝতে পারা তো তোমার হাতে বলাই।

বলাই হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, আজ আসুন।

বলাই যে খবরের কথা বলিয়াছিল পরদিন তাহার কিছু সকলে জানিতে পারিল। ক্রমে আরও জানিতে পারিল।

সে খবর মালাবারে মোপলা হাঙ্গামার খবর।

আফগান আক্রমণের গুজব ও খিলাফৎ আন্দোলন মিলিয়া দেশের মুসলমান সমাজের এক অংশের মধ্যে যে মনোভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাই প্রতিফলিত হইল মালাবারের মোপলা হাঙ্গামায়।

খিলাফৎ আন্দোলন মালাবারের ধর্মান্ধ মোপলাদিগকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিল। উত্তেজনা যখন চরমে উঠিল তখন দলবদ্ধ সশস্ত্র মোপলারা প্রথমে সরকারী অফিস, আদালত, ইংরাজ ও দেশীয় সরকারী কর্মচারী এবং রেলওয়ে ও অন্যান্য সংযোগ-ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চালাইল। সমগ্র মোপলা অধ্যুষিত অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইল, প্রশাসনব্যবস্থা লোপ পাইল। তারপর জেহাদ আরম্ভ হইল হিন্দুদের বিরুদ্ধে। লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যা, নারীহরণ, দেবস্থান অপবিত্রকরণ ও বলপূর্বক ধর্মান্তর আরম্ভ হইল। বাধা দিবার কেহ ছিল না, সংখ্যালঘিষ্ঠ, বিচ্ছিন্ন হিন্দুদের বাধা দিবার শক্তিও ছিল না। কিছুকাল মোপলা গাজীদিগের অপ্রতিহত শাসন চলিল। তারপর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ফৌজ রওনা হইল, সংযোগ-ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার আরম্ভ হইল।

হাঙ্গামার বিস্তারিত বিবরণ ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সরকারী কর্মচারীরা অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনকে হাঙ্গামার জন্য দায়ী বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। অসহযোগী নেতারা মোপলাদিগের হিংসাত্মক কার্যের নিন্দা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন, হিন্দুদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের উল্লেখ করা বিশেষ কারণে সম্ভব হইল না। কোন কোন হিন্দু মুসলমান জাতীয়তাবাদী কাগজ "নিরীহ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিবার জন্য" সৈন্য পাঠাইবার নিন্দা করিল। পরে হিংসাত্মক কার্যের বিরুদ্ধে মামুলী নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নেতারা

মোপলা হাঙ্গামার বিস্তারিত বিবরণের উপর যবনিকা টানিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। এই চেষ্টা যে সম্পূর্ণ সফল হইল না তাহা হরিশঙ্করের গৃহে পরামর্শ সভায় কয়েকদিন পরে প্রকাশ পাইল। হরিশঙ্কর বলাইকে জরুরী আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহার মারফৎ সংবাদপত্রগুলিকে সতর্ক করিবার জন্য। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে দুইজন বিরূপ মত প্রকাশ করিলেন। এককড়িবাবুর কাগজে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

এদিকে দেশের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছিল। টাউন হলে প্রিন্স অব ওয়েলসকে অভ্যর্থনা জানাইবার প্রস্তাব আলোচিত হইতেছিল। মৌলভী নুরুল হকের বক্তৃতার সময় গোলমাল আরম্ভ হইল। বক্তৃতায় বাধা পাইয়া মৌলভী সাহেব ক্ষিপ্ত হইয়া বাধাদানকারীদের বলিলেন, India is ashamed of you shameless fellows. কয়েকজন বাধাদানকারী তাঁহার দিকে বেগে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া পিছনে সরিতে গিয়া মৌলভী সাহেব সেরিফের ঘাড়ে পড়িতেছিলেন। সেরিফ রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু সরিয়া দাঁড়াইতে তিনি ভূপতিত হইলেন। ফণী সিংহের নেতৃত্বে একদল রিভোল্যুশনারীদল ও ছাত্ররা সভা ভাঙ্গিয়া দিল।

করাচী প্রস্তাব সম্পর্কে আলি ভ্রাতৃদ্বয় গ্রেপ্তার হইলেন। দেশেব লোক বুঝিল এবার দমননীতির চাকা ঘুরিবে। আন্দোলনের নেতারাও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রস্তুতিব প্রথম ধাপ হিসাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্যক্তিগত আইন অমান্যের প্রস্তাব গ্রহণ কবিল।

হরিশঙ্করের গৃহে কয়েকজন নেতা মিলিত হইয়াছিলেন দিল্লীতে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য। পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রীও আসিয়াছিলেন। তাঁহার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা মাড়োয়ারী মহলে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিল। তিনি ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর আলোচিত সর্তগুলি, বিশেষ করিয়া আইন অমান্যকারীব চরকায় সূতা কাটিবার সর্ত সমর্থন করিয়া বলিতেছিলেন।

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া একজন বিশিষ্ট নেতা অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, আপনার ব্যাখ্যা রাখুন শাস্ত্রী মহাশয়। একবার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হলে ও সব সর্তে হালে পানি পাওয়া যাবে না। ট্যাক্স বন্ধ করবার কথা

একবার চাষাভুষার কানে পৌঁছলে হয়। The cult of non-payment of taxes will soon spread throughout the length and breadth of the country as the order of Gandhi Maharaj. (ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন গান্ধী মহারাজের হুকুম বলিয়া দেশের সর্বত্র প্রসারিত হইবে।) তারপর দেখবেন মহাত্মাজীর ছাপ্পান্ন রকমের ব্রেকের অবস্থা কি হয়।

নিমাই শাস্ত্রী বলিলেন, আপনি কি মনে করেন ওয়ার্কিং কমিটি সব দিক বিবেচনা না করে মন স্থির করেছন? আপনি কি মনে করেন দেশের লোক আইন অমান্য আন্দোলন চায় না? জানেন আপনি—

হরিশঙ্কর নিমাই শাস্ত্রীকে বাধা দিয়া বলিলেন, প্রশ্ন দেশবাসী আইন অমান্য আন্দোলন চায় কিনা নয়, প্রশ্ন দেশবাসী আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তৈয়ারী হয়েছে কিনা। Is the country fully prepared for civil disobedience? ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিনা কম্পালশনে কিছু করেনি কোনো দিন। Physical force-এর compulsion যখন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তখন তার অনুরূপ অন্য প্রকার compul·ion ব্যবহার করা, অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টকে অচল করবার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনা করতে হবে এই চেষ্টা করবার মত অবস্থা দেশের হয়েছে কি?

বিশিষ্ট নেতা বলিলেন হয়নি। মহাত্মাজী নিজেও তা জানেন, তাই নানা রকম brakes-এর আমদানি করে আন্দোলনকে পঙ্গু করে দিতে চান, যাতে আন্দোলন আর এগুতে না পারে।

নিমাই শাস্ত্রী উত্তেজিতভাবে বললেন, আপনার কথার তাৎপর্য?

—তাৎপর্য প্রাঞ্জল। Individual civil disobedier.·· with so many brakes is a stunt. আমরা আসলে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স চাই না সেই কথাটা ঢাকবার জন্য—

হরিশঙ্কর বাধা দিয়া বলিলেন, That is going too far. আইন অমান্য আন্দোলন আমরা অবশ্য চাই, তবে উপযুক্ত সময়ে চাই।

বিশিষ্ট নেতা বলিলেন—দিল্লীতে আমি ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করব।

নিমাই শাস্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, দেখা যাবে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে গিয়ে আপনি ক'টা ভোট—

হরিশঙ্করের বসিবার ঘরে যখন এই আলোচনা চলিতেছিল বাহিরের ঘরে তখন ফণী সিংহের দলের কয়েকজনের মধ্যে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

তর্ক আরম্ভ হইয়াছিল অসহযোগীদের উপর পুলিশের উৎপীড়ন লইয়া। খদ্দর হইয়াছিল রাজদ্রোহের প্রতীক। খদ্দর বিক্রয় করিতে যে সকল স্বেচ্ছাসেবক রাস্তায় বাহির হইত পুলিশের সার্জেণ্টের সম্মুখে পড়িলে তাহাদের লাঞ্ছনার ও উৎপীডনের একশেষ হইত। খদ্দর কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইবার পথে কেহ পুলিশের সম্মুখে পড়িলে তাহার খদ্দর যাইত, দেহও অক্ষত থাকিত না। খদ্দর উৎপাদনের মূলে আঘাত করিবার জন্য সব স্থানে পুলিশ তুলার চলাচল বন্ধ করিবার ও চরকা ধ্বংস করিবার ব্রত লইয়াছিল। খদ্দরের মত গান্ধী টুপীর বিরুদ্ধেও পুলিশ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের মাথা হইতে গান্ধী টুপী কাড়িয়া পায়ে মাড়াইয়া দেওয়া গোরা সার্জেণ্টদের কাছে একটি খেলা হইয়াছিল। অহিংস পিকেটার ও স্বেচ্ছাসেবীদের উপর বেটন ও লাঠি চার্জ নিত্য ঘটনায় দাঁড়াইয়াছিল। বিচারের প্রহসনের পরে দলে দলে পিকেটার ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে জেলে পাঠান হইতেছিল। অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও ফকির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া মফস্বলে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের একবার ধরিতে পারিলে পুলিশ সরাসরি হাজতে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইত। পুলিশ শারদা পীঠের জগদগুরু শংকরাচার্যকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠাইয়াছিল। পঞ্চাশ হাজারের উপর ছাত্র পড়া ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কাঁথীতে ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। Repression Advisory Committee বিবরণীতে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের প্রত্যেকটি জেলা, খুলনা, যশোহর, নদীয়া ও মেদিনীপুরে অসহযোগীদের উপর পুলিশের অত্যাচারের কথা প্রকাশ পাইল।

দেশের অবস্থা দেখিয়া একখানি কাগজ লিখিল, "সর্বাত্মক হরতাল ও স্বরাজ তহবিলে মোটা দান হইতে বুঝা যায় সে ব্যবসায়ী ও মহাজনরা আন্দোলনে যোগ দিলেন। আন্দোলনের সম্পর্কে বিশেষ বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে নেপালী, ভোট প্রভৃতি জাতির মধ্যে নব জাগরণ ঘটিয়াছে। দরিদ্র মজুর শ্রেণীর মধ্যেও যে ভাবে আত্মসম্মানজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা বিশেষ আনন্দের কথা। এতদিন অস্পৃশ্য বলিয়া উপেক্ষিত ব্যক্তিগণ আজ প্রচুর আত্মত্যাগ স্বীকারের প্রমাণ দিতেছে। পার্লামেণ্টের সভায় স্যর

জয়েনস্‌ন হিকস্‌ বলিলেন, The non-co. movement is the biggest rebellion in India next to the Sepoy Mutiny.

ফণীর দলের মধ্যে তর্ক হইতেছিল বিনা প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে স্বেচ্ছা-সেবকদের পুলিশের হাতে মার খাওয়া লইয়া। একদল বলিতেছিল, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রত্যেকে হয়েছেন প্রভু নিত্যানন্দের অবতার। পুলিশ পাঁজরায় বেটনের গুঁতো মারে আর তাঁরা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে গুঁতোর সুখ অনুভব করেন।

অন্য একজন প্রতিবাদ করিয়া বলিল, পুলিশের গায়ে হাত তুললে গুলি চালিয়ে এতদিন আন্দোলন ঠাণ্ডা করে দিত। আন্দোলন সব জায়গায় ছাড়িয়ে পড়ছে কেন ভেবে দেখ। ভেবে দেখ কোথায় এই আন্দোলনের শক্তি।

দিল্লী অধিবেশনে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি আইনঅমান্যের সংস্কার সাধন করিল। হরিশঙ্কর আইনঅমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মহাত্মার প্রস্তাবিত সর্তসমূহের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তৃতা করিলেন। বলাই ও ফণী সিংহের তদ্বিরের ফলে অল্প বয়স্ক সভ্যদিগের অনেকে তাঁহার সমর্থন করিলেন কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া ছাড়া মহাত্মাজী আর বেশী দূর যাইতে রাজী হইলেন না।

অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের প্রাক্কালে একখানি মডারেট কাগজ বিলাপ করিয়া লিখিল, "Disobedience in any form is opposed to the tradition of India. And it will be distressing if Mahatma Gandhi who appears to be a zealous supporter of Indian traditions sets the seal upon a course of action which is foreign to the spirit of the country and the temper of the people." (সর্বপ্রকারের অবাধ্যতা ভারতের ঐতিহ্যের বিরোধী। ইহা পরিতাপের বিষয় হইবে যদি ভারতীয় ঐতিহ্যের উৎসাহী সমর্থকরূপে পরিচিত মহাত্মা গান্ধী এমন একটি কার্যক্রম অনুমোদন করেন যাহা দেশের ঐতিহ্যধারার পক্ষে এবং দেশবাসীর মনোভাবের পক্ষে বিজাতীয়)। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি প্রস্তাবিত সর্তসমূহের প্রশংসা করিয়াছিল। প্রস্তাব গৃহীত হওয়াতে দুঃখ করিয়া "মহাত্মা গান্ধীর আত্মসমর্পণ" শিরোনামা দিয়া একখানি কাগজ সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিল, "For the dispassionate observer of human affairs

a dramatic struggle seems to be waged in Mr. Gandhi's mind. Will the old integrity of the South African days assert itself or will he yield to expediency, the craving for mob leadership, his lower self ?" (মানুষের কর্মচাঞ্চল্যের নিরপেক্ষ দর্শকের মনে হইবে মিঃ গান্ধীর মনে এক নাটকীয় সংঘাত চলিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাস জীবনের পুরাতন সততা জয়লাভ করিবে, না সুবিধাবাদের, জননায়কত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁহার নিম্নতর মনের দাবির নিকট নতি স্বীকার করিবে ?)

দিল্লীতে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পরে মথুরা কনফারেন্সে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে এক প্রস্তাব গৃহীত হইল যে আগামী অধিবেশনে কংগ্রেস should declare to the world the Indian people's inalienable right and ultimate will to indepedent sovereignty excluding all relations with foreign Powers and nations including Great Britain. (গ্রেট ব্রিটেনসহ বিদেশী শক্তি ও জাতিসমূহে রসঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক বাদে স্বাধীন রাজশক্তি লাভ করিবার ভারতের অধিবাসীদিগের অবিচ্ছেদ্য অধিকার ও চূড়ান্ত অভিপ্রায়ের কথা পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করিবে)। মডারেটরা মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, কংগ্রেস বিদ্রোহীদের হাতে গিয়াছে ; আজ আমাদের প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস complete independence এর কথা বলিতেছে। তারপর বলিল, The proposition is ludicrous and absurd" (এই প্রস্তাব পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলিতেছে, ইহা হাস্যকর ও অযৌক্তিক)।

হরিশঙ্কর দিল্লী হইতে ফিরিয়া প্রিন্স অব ওয়েলসের অভ্যর্থনা বর্জন সম্বন্ধে বর্ত্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুই তিনটি বক্তৃতার পর ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সভা করা বন্ধ করিয়া দিল গভর্ণমেণ্ট। দেশের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে সভা সমিতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। দেশের লোক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিত বুঝিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইতেছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিস কতকটা সরকারী দপ্তরখানার মত কর্মব্যস্ত, প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের সাধারণ লোকের মনোভাব বর্ণনা করিয়া একখানি কাগজ লিখিল, "কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটির প্রভাব এরূপ হইয়াছে যে কোন দেশীয় কাগজের পক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে একটি কথা বলা অসম্ভব। সিপাহী বিদ্রোহের পরে দেশবাসীর মনে এখনকার মত প্রবল

অসন্তোষ ও ইংরাজবিদ্বেষ বোধহয় আর দেখা দেয় নাই। প্রতি শহরে ও গ্রামে শক্তিশালী ইংরাজ-বিরোধী দল গড়িয়া উঠিতেছে। তাহারা প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ প্রচার করিতেছে। সামান্য গোলমাল ও হাঙ্গামা ঘটিলেই পুলিশ গুলি চালাইতেছে। অনেক জায়গায় পুলিশ যেন ইচ্ছা করিয়াই হাঙ্গামার সৃষ্টি করিতেছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে দেশের সর্বত্র গুরুতর হাঙ্গামা ঘটিবে এবং রক্তপাত হইবে।" অন্য একখানি কাগজ অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিল, গভর্ণমেণ্ট, অনেক সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা মনে করেন ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করিবার আশা শীঘ্রই কুয়াশার মত মিলাইয়া যাইবে। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করে না। তাহারা কোন যুক্তিতর্কে কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত নয়। তাহারা বিরোধীদিগকে ভয় দেখায়। তাহাদের উৎপীড়ন অসহ্য হইয়াছে। জনসাধারণের নেতারা প্রকাশ্যভাবে বলে, এখন লড়াইয়ের সময়, আমাদের আদেশ মানিতে হইবে। সম্প্রতিকার ট্রাম ধর্মঘটের ভিতরের কথা কি গভর্ণমেণ্ট জানেন না? টাম ধর্মঘটের ফল পুলিশ কনষ্টেবলদিগের ধর্মঘট। পুলিশ কনষ্টেবলদের মধ্যে দুই দল হইয়াছে। একদল বলিতেছে তাহারা চাকুরি ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া ক্ষেতি করিবে, অন্যদল বলিতেছে তাহারা চাকুরি করিবে, কিন্তু সবকারী আদেশ ভঙ্গ করিয়া তাহারা নিষ্ক্রিয় থাকিবে। বেলঘরিয়ার হাঙ্গামার সময়ে ট্রাকভর্তি কনষ্টেবল মহাত্মা গান্ধীর ধ্বনি জয় ধ্বনি দিতে দিতে চলিয়া গেল। বড় বাজারে খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবকরা শান্তিরক্ষা করিতেছে ও ট্রাফিক পুলিশ প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে শিখাইতেছে কি ভাবে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। এই সব দেখিয়াও কি সরকার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন না? কলিকাতায় এই অবস্থা, মফস্বলে শাসনব্যবস্থা একপ্রকার লোপ পাইয়াছে।

১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলসের বোম্বাই বন্দরে অবতরণ উপলক্ষে সর্বত্র হরতাল পালিত হইল।

কলিকাতার মত শহরে যে ভাবে হরতাল পালিত হইল তাহা হইতে আন্দোলনের শক্তির সম্বন্ধে এই প্রথম পরিচয় পাইলেন সরকার।

এককড়িবাবু কয়েকদিন হইতে তাঁহার কাগজে রাজপুত্রের অভ্যর্থনা বর্জন করিবার প্রস্তাবের নিন্দা করিয়া শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া ভারতবাসীর রাজভক্তির সনাতন ঐতিহ্য সম্বন্ধে দেশবাসীকে উপদেশ দিতেছিলেন।

তাঁহার অনুরোধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহার অফিসের সম্মুখে শাদা পোশাক পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছিল পাড়ার স্বেচ্ছাসেবক ও বখাটে ছেলেদের সম্ভাবিত উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য। হরতালের পরদিন তাঁহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সুর একেবারে বদলাইয়া গেল। তিনি লিখিলেন, "গতকাল যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা ভুলিব না। যানবাহন ও বিচিত্র প্রকারের কোলাহলমুখর এত বড় কলিকাতা শহর একবারে নিস্তব্ধ, নিথর। যানবাহন বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ, রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য। বড় রাস্তাগুলির মোড়ে মোড়ে কনষ্টেবল ও সার্জেণ্ট দাঁড়াইয়া আছে। দুই চারিজন কৌতূহলী পথচারী পথে জমিতে খিলাফতী ও কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকরা তাহাদিগকে সরাইয়া দিতেছে। সকাল হইতে এই স্বেচ্ছাসেবকগণ পুলিশের কর্তব্য করিতেছে। তাহাদের প্রশংসা করিবার ভাষা নাই। হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাহারা অসুস্থ, শিশু ও স্ত্রীলোক যাত্রীদিগের সর্বপ্রকার যত্ন হইতেছে; যান সংগ্রহ করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিতেছে। যানের বাহিরে কাগজের পোষ্টার - For National Service. স্বেচ্ছাসেবকগণের শান্ত, সংযত আচরণ, কর্তব্যপালনে সাগ্রহ তৎপরতার সঙ্গে কনেষ্টবল ও সার্জেণ্টদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় আমলাতন্ত্র কেন আজ দেশবাসীর বিশ্বাস হারাইয়াছে। জয় মহাত্মা গান্ধীকী জয়!" অন্য একখানি কাগজ লিখিল, "গতকল্য যাহা ঘটিয়াছে এদেশের ইতিহাসে তাহা একেবারে অভূতপূর্ব। শহরের সকল দোকান বন্ধ, করপোরেশনের ধাঙ্গড়গণ কাজে অনুপস্থিত। ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের পরিচালিত কাজ কারবারের অফিসগুলি বন্ধ, সরকারী অফিসগুলিতে অতি অল্প সংখ্যক কর্মচারী উপস্থিত। কলিকাতা পরিত্যক্ত নগরীর মত দেখাইতেছিল। ১৭ই নভেম্বর ভারতের ইতিহাসে বহুদিন স্মরণ থাকিবে।"

এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ লিখিল—"The hartal observed in Calcutta by the order of Mr. Gandhi was a great and dramatic success. A more than sabbath-like silence reigned in the city. No vehicles were to be seen in the streets. No horse gharry was on hire, the taxicars were at rest. All Indian shops were closed and the New Market was deserted by customers. There was little evidence of British rule. Here and there constables were to be

seen or European officers on horseback but they were useless to counteract the effects of the insidious poison gas which had been allowed to spread over the city and to paralyse the will and courage of a large part of the community. To be perfectly frank, it must be admitted that the Indian city of Calcutta spent yesterday under the Gandhiraj. The scenes and events that took place in Calcutta on Thursday are a disgrace to the Government." (মি গান্ধীর আদেশে কলিকাতায় বিশিষ্ট ও নাটকীয় সফলতার সঙ্গে হরতাল পালিত হইয়াছে। সমগ্র শহরে বিশ্রামের দিন অপেক্ষা অধিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। পথগুলিতে যানবাহনের অভাব, ঘোড়ার গাড়ীগুলি ও ট্যাক্সি ভাড়া খাটা বন্ধ করিয়াছিল। ভারতীয় দোকানগুলি সব বন্ধ এবং ক্রেতারা নিউ মার্কেট বর্জন করিয়াছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিশেষ পরিচয় প্রকট ছিল না। এখানে ওখানে কনষ্টেবল বা অশ্বারোহী ব্রিটিশ অফিসার ছিল, কিন্তু সমগ্র শহরের উপরে যে বিষাক্ত গ্যাস ছড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার ক্রিয়াব ফলে সমাজের একটি বৃহৎ অংশের ইচ্ছা ও সাহস পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল, সেই ক্রিয়া প্রতিরোধ করিবাব কোন শক্তি ছিল না তাহাদের। স্পষ্ট কথা এই যে, ভারতীয় কলিকাতা শহব কাল গান্ধীবাজের অধীনে ছিল। বৃহস্পতিবাবে কলিকাতায় যে সকল দৃশ্য দেখা গিয়াছে ও যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কলঙ্কেব কথা)।

কলিকাতার শান্তিতে হরতাল পালিত হইলেও বোম্বাইতে হাঙ্গামা ঘটিল। বোম্বাইয়ের য়ুরোপীয়, এংলো ইণ্ডিয়ান ও পার্শীবা উত্তেজিত হইয়া জনতার বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা গান্ধী জনতাকে শান্ত করিবার জন্য আবেদনের পর আবেদন প্রচার করিতে লাগিলেন। আবেদন ব্যর্থ হইলে তিনি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর শান্তি আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া একখানা এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ লিখিল, "We reg--d his latest appeal as adding insult to injury. One would imagine from its tone of patronage and protection that Europeans, Parsees and Anglo-Indians are living in this country on sufferance,

under the benign guardianship of Mr. Gandhi whose prayers and fastings are to secure our safety. We live in India by our inalienable right and by the sufferance of no man or association." (তাঁহার সর্বশেষ আবেদনকে আমরা কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা বলিয়া মনে করি। এই আবেদনে যে আশ্রিতবাৎসল্য ও বরাভয় বাণীর সুর পরিস্ফুট তাহা হইতে মনে হয় যে য়ুরোপীয়, পার্শী ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়গুলি এ দেশে কৃপার্থীর মত বাস করিতেছে মি. গান্ধীর অভিভাবকত্বে, তাঁহার প্রার্থনা ও অনশনের দ্বারা আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমরা আমাদের নিজস্ব অধিকারবলে, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সংস্থার অনুগ্রহ-প্রার্থীরূপে, ভারতে বাস করি না।)

বোম্বাইতে হাঙ্গামা তখনও শান্ত হয় নাই। দাশ সাহেবের গৃহে জরুরী পরামর্শ সভা ছিল। বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে প্রিন্স অব ওয়েলসের কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে হরতাল সম্পর্কে। সভায় নানা প্রকার আলোচনার পর সকলেই এক মত হইলেন যে ২৪শে তারিখের হরতাল বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সর্ব শক্তি প্রয়োগ করিবেন। হয়ত নেতারা সকলেই গ্রেপ্তার হইবেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে কংগ্রেসের কাজ বন্ধ না হয় এজন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সভা শেষ হইলে হরিশঙ্কর যখন গৃহে ফিরিলেন তখন মধ্য রাত্র অতীত হইয়াছে।

গৃহে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন ফণী, বলাই সরকার এবং খিলাফৎ ও কংগ্রেস অফিসের কয়েকজন কর্মী তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

এই সকল কর্মীর সঙ্গে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ক্লান্ত হইলেও কাজ শেষ না করিয়া তিনি বিশ্রাম গ্রহণের কথা ভাবিতে পারিলেন না।

একজন খিলাফৎ কর্মীর প্রশ্নের উত্তরে কি বলিতে গিয়া হরিশঙ্করের দৃষ্টি একটু তির্যকভাবে বলাইয়ের উপর পড়িল। দাশ সাহেবের গৃহে বলাই সম্পর্কে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনার মর্ম এই যে আন্দোলনের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কোন গোপনীয় কথা বলাই সরকারের কানে গেলে তাহা নাকি রহস্যজনক উপায়ে লালবাজারে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পৌছিয়া যায়। বলাইকে বিশ্বাস করিলেও হরিশঙ্কর ভাবিলেন সাবধান হওয়া ভাল।

খিলাফৎ কর্মীর প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া তিনি বলাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলাই, কলকাতায় মার্শাল ল জারি হবে কোথাও এ কথা শুনেছ ?

বলাই বলিল, ও একটা বাজার গুজব। এমন গুজবও শুনেছি যে গভর্ণমেণ্ট বিহারী পুলিশকে বিশ্বাস করিতে পারছে না বলে কুড়ি হাজার আফ্রিকান আমদানি করছে পুলিশের কাজ করবার জন্য।

যে খিলাফৎ কর্মী প্রশ্ন করিয়াছিল সে বলিল, পুলিশকে বিশ্বাস করতে পারছে না গভর্ণমেণ্ট এ কথা কে বলল? বেস্পতিবারে হরতাল হল, শুক্রবার সারা রাত পুলিশ কংগ্রেসে ও খিলাফৎ অফিসে হানা দিয়ে যে কাণ্ড করেছে, জানেন? কংগ্রেস ও খিলফিৎ ফ্লাগ ছিঁড়ে পা দিয়ে মাড়িয়েছে, অফিসের আলমারী, বাক্স সব ভেঙ্গে তছনছ করেছে। খদ্দরের জামাকাপড়, বিছানার চাদর যা পেয়েছে ছিঁড়ে দিয়েছে। এর পর শনিবার শেষ রাতেও আবার হানা দিয়েছে।

হরিশঙ্কর বলিলেন, ভেবো না, কাল কংগ্রেস ও খিলাফৎ ভলাণ্টিয়ারদল বে-আইনী ঘোষণা করে নোটিশ বেরুবে।

ফণী বলিল, এংলো-ইণ্ডিয়ানদের যে ডিফেন্স পার্টি করেছে খয়ের খাঁর দল, যে সিভিক গার্ড, পীস এণ্ড অর্ডার লীগ করেছে সে গুলো বেআইনী ঘোষণা করা হবে না?

হরিশঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিলেন।

একটু পরে বলাইয়ের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, বলাই, ওপরে গিয়ে একটু দেখে এস উনি এখনও খাবার নিয়ে বসে আছেন কিনা। বলবে আমি কিছু খাব না।

বলাই একটু অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়া উঠিল। সে বাহিরে যাইতে হরিশঙ্কর একজন কংগ্রেস কর্মীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বেল ও অশথ পাতার ব্যাপারটা কি খুলে বলো তো?

কংগ্রেস কর্মী বলিল, কলকাতা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত অঞ্চলের হিন্দুস্থানী দারোয়ান, কুলিমজুর, গাড়োয়ান ও ওড়িয়া কুলিমজুরদের মধ্যে শুকনো বেল ও অশথ পাতার ওপর সাঙ্কেতিক লেখন চালাচালি হচ্ছে। এই সাঙ্কেতিক লেখন হচ্ছে পঞ্চায়েতের আদেশ। বিহারী কনেষ্টবলদের মধ্যেও এই শুকনো পাতা পৌঁছাচ্ছে।

হরিশঙ্কর বলিলেন, তা হলে খবরটা ঠিক. ২৫শে তারিখের জন্য এরা তৈরী হচ্ছে খবর পাঠিয়েছে। ভলাণ্টিয়ারদল বে-আইনী ঘোষণা করে আদেশ সহি হয়েছে, কাল সেটা জারি হবে। কোন শোভাযাত্রা এবার হবে না, শুধু পোষ্টারগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

খিলাফৎ কর্মী বলিল, পোষ্টার ঠিক জায়গায় পাঠানো হয়েছে স্যর। পরশু সব লাগানো হয়ে যাবে। একটা গুজব রটেছে যে ফিরিঙ্গীদের ঢালাও বন্দুকের লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে। তারা নাকি বলে বেড়াচ্ছে ২৪শে তারিখে কোন দোকান বন্ধ দেখলে তারা জোর করে খুলবে। হগ বাজারে দোকানীদের ভয় দেখানো হচ্ছে দোকান বন্ধ রাখলে লাইসেন্স বাতিল করা হবে। ওরা জোর জবরদস্তি করলে আমাদের লোকদের সামলে রাখা কঠিন হবে।

হরিশঙ্কর—গুজবে কান দিয়ো না। লাজপৎ রায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। সব নেতাদের জেলে পুরবে ২৪শে তারিখে—

পায়ের শব্দ পাইয়া হরিশঙ্কর চুপ করিলেন। বলাই ফিরিয়া আসিল।

হরিশঙ্কর বলিলেন, তোমাদেব মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। কাল সন্ধ্যার পর একবার খবর দেবে। একজন কি দু'জন আসবে। বেশী লোক আসবার দরকার নেই।

আরও কিছুক্ষণ ২৪শে তারিখের হরতালেব প্রস্তুতি সম্বন্ধে কথাবার্তাব পরে ফণী ছাড়া সকলে বিদায় লইল।

সকলে চলিয়া গেলে হরিশঙ্কর বলিলেন, ফণী, তুমি একটু বসো, কতকগুলো কাজ সেরে রাখতে হবে। আমি এখুনি আসছি।

হরিশঙ্কর খাস কামরায় ঢুকিলেন। পদ্মিনী বসিয়া কি একটা লেখা নকল করিতেছিল। তাহাকে কর্মব্যস্ত দেখিয়া হরিশঙ্কর বলিলেন, তুমি এখনও কাজ করছ? আজ থাক। কাল সকালে শেষ করো। এবার তুমি যাও।

পদ্মিনী মুখ তুলিয়া চাহিল। হরিশঙ্কর বলিলেন, তোমাব মুখ শুকনো দেখাচ্ছে পদ্মিনী, কিছু খাওয়া হয়েছে তো?

পদ্মিনী মাথা নাড়িল।

হরিশঙ্কর অগ্রসর হইয়া তাহার মাথায় হাত রাখিলেন। সস্নেহে বলিলেন, বড্ড খাটুনি পড়েছে তোমার। যাও, শুতে যাও।

পদ্মিনী বলিল, আর একটু বাকী আছে, শেষ করে উঠছি।

হরিশঙ্কর বলিলেন, না, না, আজ আর নয়। ফণীকে ধরে রেখেছি। তার সঙ্গে বসে অনেকগুলো কাজ শেষ করে রাখতে হবে।

পদ্মিনী উঠিল। সে দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইতে হরিশঙ্কর বলিল, একটা কথা। তোমার দাদার সঙ্গে মিটমাট প্রায় হয়ে গিয়েছে। সে বলছিল তোমার

বাড়ী যাবার কথা। যাবে নাকি? পদ্মিনী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভেবে বলব।

ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

হরিশঙ্কর একটু চিন্তিতভাবে তাঁহার ঘরের টেবিলে গিয়া বসিলেন।

হরিশঙ্করের চিন্তিত ভাব দেখিয়া ফণী বলিল, কি ভাবছেন স্যর?

হরিশঙ্কর দেহের একটু ঝাঁকুনি দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন, কংগ্রেসের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে নিজের কথা ভাববার অবসর নেই। হঠাৎ একটা কথা মনে হল। বলাই কি একটা মতলবে চলছে বুঝতে পারছিনে he wants his sister to go back to him. তার যাবার ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না। গেলে মন্দ হত না। কিন্তু সে যখন যাবে না তখন কিছু করা উচিত মেয়েটার জন্য। ধরো যদি মেয়েটাকে কিছু টাকা দিয়ে দেয়া যেত, ও নিজের ইচ্ছে মত স্বাধীনভাবে থাকতে পারত। কিন্তু টাকা তো আমার হাতে নেই এখন। মনে হচ্ছে আর বড় জোর দিন দু'হ বাইরে আছি, এর মধ্যে—

হরিশঙ্করের কথা শুনিয়া ফণী নিজের মনে একটু হাসিল। ভাবিল পদ্মিনী একঘেয়ে হইয়াছে, বোধহয় স্বাদ বদলাইতে চাহেন। ব্যারিষ্টার সাহেবের কথা শুনিয়া তাহার একটু দুঃখ বোধ হইল। বলাই সরকারের ভগ্নী হইলেও মেয়েটি বড় ভাল। কে জানে মেয়েটিকে ব্যারিষ্টার সাহেব ভুলাইলেন কি করিয়া। গোপনে বিয়ে করেন নাই তো? প্রকাশ্যে সে বলিল, এর পর যা ভাল মনে হয় করবেন।

হরিশঙ্কর যেন এতক্ষণে একটা পথ দেখিতে পাইলেন এমনভাবে বলিলেন, হাঁ, এর পরে করা যাবে, ঠিক বলেছ। এসো এবার হাতের কাজ শেষ করা যাক।

ড্রয়ার হইতে কতকগুলি চিঠি ও কাগজপত্র বাহির করিয়া তিনি টেবিলে রাখিলেন। ফণী চেয়ার টানিয়া লইয়া সরিয়া বসিল।

সভা শোভাযাত্রা বন্ধ হইয়াছিল, ভলান্টিয়ারদল বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল। কলিকাতায় ও মফস্বলে গান্ধী টুপী ও খদ্দরের বিরুদ্ধে পুলিশী জেহাদ আরও উগ্র হইয়া উঠিল। খদ্দর ও গান্ধী টুপী শুধু পুলিশের কাছে প্রহারযোগ্য অপরাধ নয়, আদালতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া পরিগণিত

হইল। গোরা সার্জেণ্টের সঙ্গে সিভিল গার্ডের দল হাতে খেঁটে লইয়া কলিকাতার রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহাত্মা গান্ধী কি জয়! ধ্বনি শুনিলেই তাহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া খেঁটে উঠাইয়া লোকের পিছনে ছুটিত। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলির চিঠিপত্রের ঘরগুলি অত্যন্ত বিদ্বেষ ও উত্তেজনাপূর্ণ চিঠিতে পূর্ণ থাকিত ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গভর্ণমেণ্টকে আরও উগ্র দমননীতি প্রয়োগ করিবার জন্য উসকানি থাকিত। এই উসকানি যে কার্যকরী হইতেছে লর্ড রেডিং ও লর্ড রোনাল্ডশের বক্তৃতা হইতে লোকে বুঝিতে পারিল।

এদিকে ২৪শে তারিখের হরতাল সম্বন্ধে নানা গুজব ছড়াইতে লাগিল শহরে। লোকে বলিতে লাগিল পুলিশ গুলি চালাইয়া শহরে রক্তের নদী বহাইবে, লুটপাট হইবে। গোরা, গুর্খা ও ডোগরা সৈন্য আসিতে লাগিল কলিকাতায়, রাস্তায় বিহারী পুলিশের স্থান অধিকার করিল মিলিটারী পুলিশ। ভয় পাইয়া সকলের আগে মারোয়াড়ীরা কলিকাতা হইতে পলাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে লর্ড রেডিং কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার চেহারা হইয়াছিল সামরিক আইনে শাসিত শহরের ন্যায়।

ক্রমে অবস্থা দেখিয়া মনে হইল গভর্ণমেণ্টের উগ্র দমননীতি লোকের উৎসাহ দমন করিবার শক্তি হারাইয়াছে। কংগ্রেস ও খিলাফৎ ভলাণ্টিয়ারদল বে-আইনী ঘোষিত হইলে বাংলার আন্দোলনের নেতারা নেশনাল ভলাণ্টিয়ার কোর নামে নূতন এক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়াছিলেন। এই দলও বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটি চিত্তরঞ্জন দাশকে বাংলার আন্দোলনের ডিক্টেটর নির্বাচিত করিল। তিনি বাংলায় কাজ করিবার জন্য দশ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিবার এক আবেদন প্রচার করিলেন। পিকেটিং করিবার ও খদ্দর ফেরি করিবার জন্য দলে দলে যুবকরা আগাইয়া আসিতে লাগিল। কয়েদীর গাড়ী ভর্তি করিয়া মহাত্মা গান্ধীর জয় ধ্বনি দিতে দিতে একদল চলিয়া যায়, নূতন একদল আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে। লোকে বলিতে লাগিল ২৪শে তারিখে হরতাল বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যে ক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাইতে বিলম্ব হইল না। বড়বাজারে খদ্দর ফেরি করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের সহধর্মিনী বাসন্তী দেবী, দাশ পরিবারের অন্য কয়েকজন মহিলা, হরিশঙ্করের সহধর্মিনী সরলা দেবী, তাঁহার সঙ্গে পদ্মিনী ও আরও কয়েকজন মহিলা। পুলিশ বেড়াজালে ইহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিল।

এই গ্রেপ্তারের ফলে শহরে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হইল ও সকল মহল হইতে এমন প্রতিবাদের ঝড় উঠিল যে লর্ড রোনাল্ডশে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন।

ইতিমধ্যে লর্ড রোনাল্ডশে একদিন চিত্তরঞ্জন দাশকে লাটভবনে আহ্বান করিলেন তাঁহার পরামর্শ লইবার নাম করিয়া। লাট ভবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি হরিশঙ্করকে খবর পাঠাইলেন, প্রস্তুত হও।

তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। গোরা সার্জেণ্ট সঙ্গে লইয়া পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রসা রোডে চিত্তরঞ্জনের গৃহে হানা দিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। জেলের ফটকে পুলিশের গাড়ীতে আরূঢ় হরিশঙ্করের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

পরদিন এই গ্রেপ্তারের কথায় একখানা কাগজ লিখিল, "A great struggle has commenced between the rulers and the non-co-operators. Government have decided to crush the non-co-operation movement and the rising aspirations of the people by the most terrible instruments of repression."

দমননীতির মাত্রা আরও বাড়িয়া চলিল। শহরের রাস্তায় মিলিটারী পুলিশ ও গোরা সার্জেণ্টদের হাতে পথচারীদের লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। জেলখানাগুলি দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক কয়েদীতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কয়েদী গাড়ী বোঝাই করিয়া বালক স্বেচ্ছাসেবকদিগকে লইয়া পুলিশ শহর হইতে দূরে ডায়মণ্ড হারবার রোডে নামাইয়া দিয়া আসিতে লাগিল, জেলে তাহাদের জন্য স্থানের অভাব।

বেপরোয়া দমননীতি প্রত্যক্ষ করিয়া লয়ালিষ্ঠ কাগজগুলি পর্যন্ত কংগ্রেসী কাগজগুলির সঙ্গে সুর মিলাইয়া প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। নেশনাল লিবারেল লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দমননীতির প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিল।

এদিকে উর্দু, হিন্দী ও ওড়িয়া ভাষায় লিখিত বেনামী ইস্তাহার প্রচারিত হইতে লাগিল কলিকাতার নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলে—মহাত্মা গান্ধীর আদেশ ২৪শে তারিখে হরতাল করিয়ো না।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় আপোষের প্রস্তাব উঠাইলেন।

গভর্ণমেণ্ট ঘন ঘন ঘোষণা, নোটিশ, ইস্তাহার জারি করিতে লাগিলেন

পুলিশের সাহায্যে দোকানপাট খোলা রাখিবেন, বলিলেন। শহরে শান্তি রক্ষা করিবার দৃঢ় সংকল্প নানাভাবে বার বার প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শহরবাসীর উদ্দেশ্যে আশ্বাসবাণী দিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য শহরের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে লাগিল। কলিকাতার নাগরিকরা অনেকে পরিবার বাহিরে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন, অনেকে মফস্বলে চলিয়া গেলেন। হরতালের আগেই শহরের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া আসিল।

২৪শে ডিসেম্বর তারিখে আবার ১৭ই নভেম্বরের দৃশ্যের অবতারণা হইল পুলিশ ও মিলিটারী শাসিত কলিকাতায়।

ছয়

রাজনগর (১৯২১)

উমানন্দ, যোগেন্দ্র ও হিমাংশু মিলিয়া নূতন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার নাম দিয়াছে "মুক্তি সেনা"। কায়, মন ও বাক্যে অহিংস সংগ্রাম চালাইয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে ৩০শে ডিসেম্বর মধ্যে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবে, বাহিনীতে ভর্তি হইবার সময়ে প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর বা টিপ সহি করিতে হইয়াছে। খদ্দর ও গান্ধীটুপী পরিহিত ভদ্র, ইতর এবং নানা রকমের লোকের সমবায়ে গঠিত মুক্তি সেনাদল যখন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মহাত্মা গান্ধীর জয় ধ্বনি দিতে দিতে পথ দিয়া মার্চ করিয়া চলিয়া যাইত তাহাদের দিকে চাহিয়া রাজনগরের চিরকালের সংশয়-বাদী বৃদ্ধেরদলের অনেকের চিত্ত দুলিয়া উঠিত। তাঁহারা ভাবিতেন ইহাদের দেখিয়া মনে হয় নূতন একটা শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে দেশে। লাঠিধারী পুলিশ, দারোগা, হাকিম কাহাকেও দেখিয়া ভয় করে না, কাহারও কাছে ইহারা নতি স্বীকার করে না। গালাগালি খাইয়া, প্রহৃত হইয়া ইহারা হটে না, কাতর হয় না, ভ্রূকুটি করে না, আত্মরক্ষা বা প্রতিআক্রমণ করিবার জন্য হাত উঠায় না। কেহ গম্ভীরভাবে, কেহ হাসিমুখে যে যাহার জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকে। পুলিশের আসন্ন আক্রমণের মুখে ইহারা শুধু সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুলে— মহাত্মা গান্ধী কি জয়! সি. আর, দাশ কি জয়! দেখিয়া শুনিয়া সংশয়বাদীরা ভাবেন স্বরাজ কেমন জানা নাই, স্বরাজ আসিবে কি না জানা নাই, কিন্তু স্বরাজ যদি কখনও আসে এই যে নূতন মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে দেশে, মহাত্মা গান্ধী নামে পরিচিত মহান শক্তির আবির্ভাবের অনুসরণ করিয়া, ইহারাই তো স্বরাজ আনিবার যোগ্যপাত্র।

একদিকে রাজনগরের মুক্তি সেনা অপরদিকে নদীর ওপারে উলিপুরের খেলাফতী ফৌজ। সোনাউল্লা ফরাজি এই খেলাফতী ফৌজ গড়িয়াছে। উলিপুরকে কেন্দ্র করিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতে চাষীঘরের জোয়ান ছেলেরা এই ফৌজে যোগ দিয়াছে, বিলান অঞ্চলের কিছু লোকও ঢুকিয়াছে ফৌজে।

আলি ভাই কি জয়! আল্লা হো আকবর! ধ্বনি দিয়া খিলাফৎ ফৌজ জুম্মাঘরের সম্মুখের মাঠে কুচকাওয়াজ করে।

মুক্তি সেনা ও খিলাফতী ফৌজ হাত মিলাইয়াছে উমানন্দ ও যোগেন্দ্রের চেষ্টায় ও সোনাউল্লার সম্মতিতে। দুই দলের মিলন হইবার পরে রাজনগরের কংগ্রেস কমিটির অফিস উঠিয়া আসিল বাজারের মধ্যে একখানি চালায়। আগেই সেখানে খিলাফতী ফৌজের অফিস বসিয়াছিল। দুই দলের পৃথক নিশান উড়িতে লাগিল ঘরের চালায়।

কংগ্রেস কমিটির আফস ছিল ইন্দ্রের সেবকাশ্রমের একটি ঘরে। উমানন্দ ইন্দ্রের ·কাছে খিলাফতী ফৌজের জন্য একটি ঘর চাহিলে ইন্দ্র সম্মত হইল না। উমানন্দকে সে খোলাখুলি বলিল গ্রামের ভিতরে নানা জায়গায় অচেনা লোক লইয়া গঠিত খিলাফতী ফৌজের আড্ডা করিবার জন্য সে সেবকাশ্রমের ঘর দিতে পারিবে না।

উমানন্দ রুষ্ট হইয়া বলিল, আপনি খিলাফতী ফৌজকে বিশ্বাস করেন না? আপনি হিন্দু-মুসলমান একতার বিরোধী?

ইন্দ্র বলিল, আমার আপত্তির প্রকৃত কারণ যদি তুমি না বুঝে থাক আমি চেষ্টা করে বোঝাতে চাইনে। সেবকাশ্রমে মেয়েদের স্কুল হয়, তার কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে এমনি, আরও ব্যাঘাত হতে দেব না।

উমানন্দ—আপনার স্কুলের অর্ধেক মেয়ে তো স্কুল ছেড়েছেঁ। স্কুল আমরা একেবারে বন্ধ করে দেব।

ইন্দ্র—তা দিয়ো, তবু তুমি যে জন্য ঘর চাইছ সে জন্য ঘর আমি দিতে পারব না।

উমানন্দ বলিল, আপনার সেবকাশ্রম থেকে আমরা কংগ্রেস অফিস সরিয়ে নেব।

ইন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, নিয়ো।

ইন্দ্রের হাসিতে মুক্তি সেনার নেতা উমানন্দ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিল। কয়েক পা গিয়া দরজার কাছ হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, আপনি একজন একস-রিভোল্যুশনারী। একস-রিভোল্যুশনারীরা অহিংস নীতিতে অবিশ্বাসী, তারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। এরপর আপনাদের দল সরকারের সঙ্গে মিলে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন জানি।

সে চলিয়া গেল। ইন্দ্র সেদিনকার ছেলে উমানন্দের কথাগুলি শুনিয়া

স্তম্ভিত হইল, কোন উত্তর দিবার সামর্থ্য রহিল না তাহার। অনেকক্ষণ লাগিল সে ভাব কাটিতে।

দুই দিন পরে মুক্তি সেনার দল সত্যই সেবকাশ্রম হইতে কংগ্রেস অফিসের কাগজপত্র লইয়া চলিয়া গেল।

দেবানন্দ তারাপুর হইতে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে এক শোকাচ্ছন্ন ভগ্ন-পরিবারের ভগ্নাবশেষ।

ব্রজনাথের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ত্রিনয়নী তারাপুরে গিয়াছিলেন। মেয়ের কাছে থাকিয়া যথাসাধ্য তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া একটু সুস্থ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিষয়সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করা শেষ হইতে দেবানন্দ সরস্বতী, মিঠু, পুষ্প ও ত্রিনয়নীকে লইয়া রাজনগরে রওনা হইল। গোবিন্দজীর পূজার জন্য একজন দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়ের থাকিবার ব্যবস্থা হইল বাড়ীতে। বাড়ীঘর আগলাইবার জন্য কানু ও বিশু রহিল।

নূতন করিয়া কাঁদাকাটিতে কয়েকদিন চলিয়া গেল। তারপর একদিন বিকালের দিকে টোলপাড়ায় পিত্রালয় হইতে পুষ্পকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মী গৃহে ফিরিল। স্বামীর সঙ্গে তাহার কিছু আলোচনা করিবার ছিল। সংবাদ লইয়া জানিল বৈঠকখানায় বাবুরা আসিয়াছেন, কথাবার্তা হইতেছে। সে বুঝিল বৈঠকখানার সভা না ভাঙ্গা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

বৈঠকখানায় আলোচনা হইতেছিল ইন্দ্র, শরৎপণ্ডিত ও আরও জন দুই ভদ্রলোকের মধ্যে। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন নবাগত। তাঁহার নাম বিনোদবাবু। বিনোদবাবু যোগেন্দ্রের ভগ্নীপতি, বাড়ী যোগেন্দ্রদের গ্রাম গোবিন্দপুরে। তিনি সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করিতেন, বছর দুই হইল অবসর লইয়াছেন। যোগেন্দ্রকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য তিনি তাহার বৃদ্ধা মাতার অনুরোধে রাজনগরে আসিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র ইন্দ্রের সঙ্গে বিনোদবাবুর পরিচয় করিয়া দিবার সময়ে আড়ালে তাঁহাকে জানাইয়াছিল তাহার ভগ্নীপতি মহাত্মা গান্ধীর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত, তবে কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে তিনি থাকিতে চাহেন না। নিজের গৃহে সম্প্রতি তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নিজের গুরুদেবের নামানু-সারে উহার নাম রাখিয়াছেন মহানন্দ আশ্রম। আশ্রমে তিনি স্বয়ং শাস্ত্রপাঠ করেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পাঠ করেন, পূজার্চনা করেন।

সেবকাশ্রমে শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা অনেক হইয়াছে, ইন্দ্রের উহাতে

বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবু পরিচয় হইবার পরে ভিন্ন গ্রামের এই ভদ্রলোককে সে কর্তব্যবোধে সাদর আহ্বান জানাইল স্বগৃহে। বলিল, অসুবিধে না হলে আপনি যে ক'দিন এখানে আছেন আসবেন অনুগ্রহ করে। সন্ধ্যার দিকে গ্রামের আরও দু'চারজন ভদ্রলোক আসেন এখানে, নানারকম আলাপ আলোচনা হয়। সকলের সঙ্গে পরিচয় হবে।

তারপর বলিল, যোগেন্দ্রকে কি নিয়ে যেতে পারবেন মনে হয়? ও তো এখানে কাজে মেতে আছে, একজন লীডরও বটে।

বিনোদবাবু বলিলেন, দু'দিনের মধ্যে তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলবার অবকাশ হয় নি, সে সর্বদা বাইরে থাকে। বাড়ীতে যে সময়টুকু থাকে তখনও লোকের ভিড়। আর দিন দুই দেখি।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল, দেখুন। যে ক'দিন আছেন আসবেন এখানে।

ভদ্রলোক আজ আসিয়াছেন। শরৎ পণ্ডিত ও উপস্থিত অন্য সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া ইন্দ্র বলিল, যদি কিছু মনে না করেন বিনোদবাবু, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। আমি শুনেছি আপনি মহাত্মাজীর একজন বিশেষ ভক্ত, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে আপনি যোগ দিতে ইচ্ছুক নন। কেন বলবেন?

বিনোদবাবু হাসিয়া বলিলেন, আপনি কি মহাত্মাজীর ভক্ত নন?

ইন্দ্র এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রশ্ন শুনিয়া শরৎ পণ্ডিত মৃদু হাসিতে লাগিলেন। একটু ভাবিয়া ইন্দ্র বলিল, আমার কথা বা আমাদের কথা ওঠালে আপনার বক্তব্য শোনবার ব্যাঘাত হবে। আপনাকে জেরা করবার জন্য আমি প্রশ্ন করিনি, আপনি প্রবীণ, জ্ঞানী ব্যক্তি, অনেক ভেবে চিন্তে নিজের পথ বেছে নিয়েছেন। আপনার এই ভাবনা চিন্তার একটু পরিচয় আমি পেতে চাই।

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আমি মহাত্মাজীর ভক্ত। আমি মহাত্মাজীর ভক্ত এই জন্য যে বিদেশীর হাত থেকে শাসনশক্তি দখল করবার জন্য, দেশের স্বাধীনতা লাভ করবার জন্য নূতন যে অভিযান আরম্ভ হয়েছে তিনি তার প্রধান সেনাপতি; আমি তাঁর ভক্ত, কারণ পুরনো, দেউলে রাজনীতিক আন্দোলনের পথ ছেড়ে তিনি নূতন পথ ধরেছেন, কারণ দেশের অবহেলিত, উৎপীড়িত ও ঘুমন্ত জনশক্তিকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন—

বিনোদবাবু হাত জোড় করিয়া বলিলেন, মাফ করবেন ; যদি তাই হয় তাহলে মহাত্মাজীর আন্দোলন থেকে আপনি সরে রয়েছেন কেন ? বাস্তবিক সরে রয়েছেন কিনা জানিনে, যোগেন্দ্র সেই অভিযোগ করছিল তাই কথাটা বলছি। আমার ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন।

শরৎ পণ্ডিত বলিলেন, আপনি সরে রয়েছেন কেন বিনোদবাবু ?

ইন্দ্র বলিল, আমার কথাটা আগে হয়ে যাক, ওঁকে রেহাই দেয়া হবে না সরে থাকবার কথা বলছিলেন না ? দেশে এ পর্যন্ত যে সকল আন্দোলন হয়েছে তাতে জনসংখ্যার কত অংশ সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছে ? যারা সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে অসমর্থ কিন্তু যাদের সহানুভূতির অভাব নেই, যারা কোন রকম বাধা সৃষ্টি করতে চায় না, তারা কি মহাত্মাজীর চোখে অপরাধী ?

বিনোদবাবু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার প্রশ্ন করা বাহুল্য হয়েছে স্বীকার করছি। উত্তর পেয়েও আমি উত্তর পেলাম না। আমাকে রেহাই দেবেন না বলছিলেন। আমি নিজে থেকেই অপরাধ স্বীকার করছি। আমি মাষ্টার মানুষ, রাজনীতিক আন্দোলন বুঝি না, ওতে আমার মনে কোন উত্তেজনা বা উৎসাহ আসে না। আমি আঁকড়ে ধরেছি মহাত্মাজীর অহিংস ধর্মের কথা, প্রেমের দ্বারা শত্রুর হৃদয় জয় করবার কথা। আমি বুঝেছি এই অহিংসা ও প্রেম আমাদের সনাতন ধর্মের বাণী, বেদে, মহাকাব্যে, পুরাণে এই বাণী বারবার ঘোষিত হয়েছে, বুদ্ধদেব, জীমূতবাহন, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, আরও কত সাধুসন্ত জীবনে এই বাণীর অনুসরণ করেছেন। আমাদের প্রাচীন জাতির রক্তে রয়েছে এই বাণী। আজ মহাত্মাজী ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্র ছেড়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই বাণীর অমোঘ শক্তি—

দেবানন্দ মিঠুর হাত ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, তাহাদের দিকে চাহিয়া বিনোদবাবু কথা শেষ না করিয়া চুপ করিলেন।

দেবানন্দের সঙ্গে বিনোদবাবুর পরিচয় করিয়া দিয়া ইন্দ্র বলিল, আপনার কথা শেষ করুন বিনোদবাবু। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই বাণীর অমোঘ শক্তি—

বিনোদবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, বুড়ো স্কুল মাষ্টারকে ক্ষমা করবেন ইন্দ্রবাবু। মহাত্মাজীর মত বিরাট পুরুষের সামান্য যেটুকু বুদ্ধির দ্বারা ধরতে পেরেছি সেইটুকুর অনুশীলন করা আমার জীবনের কাজ। এর বেশী কিছু আমার আয়ত্ত নয়, সাধ্যও নয়। আমি আর কি বলব ?

দেবানন্দ বলিল, মিঠু ওর মাসীর কাছে যাবে, আমি দিয়ে আসছি।

ইন্দ্র বলিল, তুমি বলো দেবুদা, ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তাহার আহ্বানে একজন ভৃত্য আসিলে মিঠু তাহার সঙ্গে অন্দরে চলিয়া গেল।

দেবানন্দ বসিয়া বলিল, আপনাদের বেশ আলাপ চলছিল, চলুক না কেন।

বিনোদবাবু বলিলেন, মহাত্মাজীর প্রসঙ্গ চলছিল, শেষ হয়েছে। আমি বিদেশী লোক হলেও আপনার খ্যাতিব কথা কিছু জানি। আপনাব মুখেব দু'একটা কথা শুনতে চাই।

দেবানন্দ বলিল, আপনি তো গোবিন্দপুরের লোক, পঞ্চক্রোশীর কথা কিছু বলতে পারেন? তারাপুব থেকে আসতে পথে দীনদযাল বাবার আশ্রমেব কথা শুনলাম। লোকে বলাবলি করছে তিনি পঞ্চক্রোশীব গান্ধী।

বিনোদবাবু বলিলেন, বাবা যথার্থই শক্তিশালী পুরুষ। শুধু পঞ্চক্রোশী কেন ও অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীব লোকদের ওপর তাঁর অসাধাবণ প্রভাব, তাঁকে দেবতার মত মানে। তাবা বলে তিনি ধর্মঠাকুবেব অবতার, দেশে সত্য যুগ আনবেন। তবে শুনেছি কতকগুলি লোক ধর্মাচার্যেব আসন থেকে নামিয়ে তাঁকে রাজনীতিক নেতাব আসনে বসাবার চেষ্টা কবছেন। এব ফলে সংঘাত বাধতে পাবে। কোন স্থাযী, সত্যিকাবেব কাজ যাঁরা কবতে চান সংঘাতেব সম্ভাবনা এড়িয়ে চলা তাঁদেব কর্তব্য নয় কি?

দেবানন্দ—তা জানিনে। তবে একটা সংঘাতেব ক্ষেত্রে আমাকে শীঘ্রই এগিযে যেতে হচ্ছে। চাঁদপুবে ধর্মঘটে কুলিদেব ওপব গুর্খা লেলিযে দিযে সবকার মজা দেখছে। চট্টগ্রামে জে, এম, সেনগুপ্ত সদলে গ্রেপ্তার হযেছেন। ইন্দ্র, কাল আমি চলে যাচ্ছি।

বিনোদবাবু হাতজোড করিয়া বলিলেন, আমাব ধৃষ্টতা মাফ কববেন, সেখানে গিয়ে আপনি কি কবতে পারবেন?

দেবানন্দ নীরস কণ্ঠে বলিল, কিছু না করতে পারি তামাসা দেখতে পাবব।

বিনোদবাবু আবাব হাত জোড করিয়া বলিলেন, আপনি অসন্তুষ্ট হযেছেন দেবানন্দবাবু, আমি কথাটা অন্যভাবে বলেছি। শুনেছি চা বাগানের কুলিদের ধর্মঘট, আসাম বেঙ্গল রেলে ধর্মঘট, এ সব ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর নাকি তেমন সমর্থন নাই। মহাত্মাজীর সমর্থন যদি না থাকে—

দেবানন্দ বলিল, সে খবর তো আমি রাখিনে বিনোদবাবু।

শরৎ পণ্ডিত মাথা দোলাইয়া মৃদু হাস্ত করিতে লাগিলেন।

বিনোদবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি বলিতে যাইতেছেন, মিঠু আসিয়া বলিল বড় মামা, মাসীমা ডাকছেন।

দেবানন্দ উঠিল। বিনোদবাবুকে নমস্কার করিয়া বলিল, আমার কথায় কিছু মনে করবেন না বিনোদবাবু। নারকেল ছিবড়ে পাকিয়ে পাকিয়ে আর ঘানি টেনে টেনে আমি সভ্য সমাজে মেশবার মত হতে পারিনি এখনও।

বিনোদবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, সে কি কথা? আমারই অপরাধ হয়েছে। আপনি বাংলার অগ্নিযুগের একজন—

দেবানন্দ আবার নমস্কার করিয়া বলিল, আচ্ছা, আসি।

সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। বিনোদবাবু একটু ইতস্তত করিয়া ইন্দ্রের দিকে ফিরিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, দেবানন্দ ডাকিয়া বলিল, ইন্দ্র, তোরও ডাক পড়েছে।

শরৎ পণ্ডিত বলিলেন, বিনোদবাবু, আপনি বসুন। ওদের যেতে দিন। আমরা দুই প্রবীণ লোক বসে প্রাণখুলে একটু আলাপ করি। মহাভারত থেকে আপনার অহিংসা ধর্মের তত্ত্ব উদ্ধার করার কথা আমি শুনেছি। আমি এককালে সব শাস্ত্র থেকে অহিংসা ধর্মের তত্ত্ব উদ্ধার করেছি। আজ আপনার কথা শুনব।

ইন্দ্র বলিল, আপনি বসুন, আমি আসছি।

বিনোদবাবু বসিলেন। শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে আলাপ জমিয়া উঠিল।

লক্ষ্মী পুষ্পকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল কিছুদিন তাহাকে নিজের কাছে রাখিবে বলিয়া। তাহার স্বামী ও দাদার মত পাইবার আগে সে পুষ্পকে তাহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই।

তাহার পিতৃগৃহে অশান্তি জমিয়া উঠিতেছিল। এই অশান্তির প্রধান কারণ উমানন্দের ব্যবহার। সে কাহারও সম্মান রাখিয়া কথা বলে না। সংসারের অবস্থার কথা ভাবে না, বয়জ্যেষ্ঠরা পরামর্শ বা উপদেশ দিলে অসহিষ্ণু ও রূঢ় হইয়া উঠে। মাতা ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার সঙ্গে কথা বলা প্রায় বন্ধ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সে এড়াইয়া চলে, সেও তাহার সম্পর্কে মৌন, উদাসীন থাকে ব্রজনাথের পীড়া ও মৃত্যুর জন্য কিছুদিন অশান্তি চাপা ছিল। দেবানন্দ সবাইকে লইয়া তারাপুর হইতে ফিরিবার পরে কয়েকটা দিন কাটিতে না কাটিতে উমানন্দের ব্যবহারে আবার অশান্তি দেখা দিল। পুষ্পকে সে বিদ্রূপ করিয়া

কি বলিয়াছিল, আর বলিয়াছিল মাতার সম্মুখে। ত্রিনয়নী পুষ্পের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট না হইলেও পুত্রের আচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে ভৎ'সনা করিলেন। জবাব পাইলেন একেবারে অপ্রত্যাশিত।

উমানন্দ বলিল, বাবা বিষয় সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দিয়েছেন তাই আমার ওপর চোখ রাঙাচ্ছ? দেখব কি করে এবার জোত ব্রহ্মোত্তরের এক মুঠো ধান ঘরে আনতে পার। সব চাষা আমার হাতের মধ্যে।

ত্রিনয়নী আর কোন কথা বলিলেন না। অশান্তি বাড়িবার আশঙ্কায় জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছেও এই অপমানের কথা চাপিয়া গেলেন। বিকালের দিকে সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল লক্ষ্মী। তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া তিনি ঘটনার কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন, মা, ছেলে মেয়ে বড হয়ে ওঠবার পব থেকে কেবল দুঃখ পাচ্ছি সংসারে। এক তোর দিকে চেয়ে যা একটু ভরসা পাই প্রাণে।

লক্ষ্মী বাড়ী ফিরিবার সময় পুষ্পকে সঙ্গে লইল। মাতাকে বলিল, ও দু'একদিন আমার কাছে থাকবে মা? তোমার আপত্তি নেই তো?

মাতা আপত্তি করিলেন না।

দেবানন্দ ও ইন্দ্র অন্দরে আসিলে লক্ষ্মী সংক্ষেপে পুষ্পকে কয়েকদিন রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পিতৃগৃহের অশান্তির কথা উল্লেখ করিল না। ইন্দ্র অনুমান কবিল ভিতরে এমন কোন কথা আছে যাহা লক্ষ্মী এখন প্রকাশ করিল না, হয়ত পরে করিবে।

দেবানন্দ বলিল, পুষ্পকে ক'দিন তুই রাখতে পারবি জানিনে। হয়ত কিছুদিন পরে ও উমানন্দের দলে ভিড়বে। চারদিকের হাওয়া বড্ড গরম হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। সে যাহোক, আমি কাল চাঁদপুরের দিকে যাচ্ছি। ফিরে এসে ওর সম্বন্ধে একটা পাকা ব্যবস্থা করতে হবে। সরীর সম্বন্ধেও করতে হবে। একটু থামিয়া হাসিয়া বলিল, বোধহয় নিজের সম্বন্ধেও করতে হবে।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, তার অর্থ?

উত্তরে দেবানন্দ একটু হাসিল, কোন কথা বলিল না।

লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, আর কোন কথা আছে নাকি লক্ষ্মী? না শুধু পুষ্পের কথা বলতে ডেকেছিলি?

লক্ষ্মী কোন উত্তর দিবার আগে মিঠু ও তিন বছরের ভ্রাতার হাত ধরিয়া

মিনু ঘরে আসিল। দেবানন্দকে দেখিয়া কলরব করিয়া সে বলিল, জানো বড় মামা. ভাই মিঠুকে কি বলেছে ? বলেছে, আদা। ভাই দাদা বলতে পারে না।

ভ্রাতা দিদির সমর্থন করিয়া বলিল, আদা।

মিনু হাত তালি দিয়া বলিল, ঠিক বলেছি না ? দেখলে তো ?

দেবানন্দ লক্ষ্মীকে বলিল, একবার পুষ্পকে ডাক দেখি।

মাতার আদেশে মিনু পুষ্পকে ডাকিয়া আনিল।

দেবানন্দ বলিল, পুষ্প, লক্ষ্মীর ইচ্ছে কয়েকটা দিন তার কাছে থাক। আমি বলি তাই থাক।

পুষ্প মাথা নামাইয়া বলিল, আচ্ছা।

দেবানন্দ বলিল, আর একটা কথা। যদি কোন সময় আন্দোলনের মধ্যে যেতে ইচ্ছে হয় ইন্দ্রের পরামর্শ শুনে চলবে। কেমন ?

পুষ্প মৃদুস্বরে বলিল, আচ্ছা।

পরদিন দেবানন্দ চলিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে সংবাদপত্র হইতে ইন্দ্র জানিতে পারিল দেবানন্দ গ্রেপ্তার হইয়া বিচারের পরে কয়েক মাসের কারাদণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছে।

৩য় খণ্ড

এক

পঞ্চক্রোশী (১৯২১-২২)

প্রথমে দীনদয়াল ঠাকুরের আশ্রমে তারপর নিজের গৃহে সভার কাজ শেষ করিয়া ক্লান্ত শেখর যখন শুইতে গেল তখন রাত দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বিছানায় শুইবার আগে ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল কিন্তু বিছানায় শুইবার পর ঘুম আসিতেছিল না, সে এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। গত কয়েকদিন ধরিয়া যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, যে সকল আলোচনা চলিয়াছে এলোমেলো ভাবে তাহারই কোন কোন অংশ মনে পড়িতে লাগিল।

২৪শে ডিসেম্বর হরতালের দিন জমিদার ও পুলিশের আশ্বাসে বাজারের দুইজন দোকানদার দোকান খোলা রাখিয়াছিল, আর কেহ দোকান খুলিতে সাহস করে নাই। দুধ, মাছ তরিতরকারী বিক্রয় করিবার জন্য একটি লোকও সেদিন বাজারে আসে নাই। রাত্রে ঐ দুইখানি দোকান ঘরে কেমন করিয়া আগুন লাগিল। আগুন নিভাইতে যাহারা অগ্রসর হইল পুলিশ তাহাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিল আগুন লাগাইবার অভিযোগে। পরের দিন রাত্রে একজন দোকানী পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া দীনদয়াল ঠাকুরের আশ্রমে পলাইয়া আসিয়া কাঁদিতে কাদিতে জমিদারের লোকের ও পুলিশের নামে আগুন লাগাইবার অভিযোগ করিল। বলিল, ঠাকুরের আদেশ না মেনে আমাদের এই শাস্তি, আমাদের সর্বস্ব গেল। কালিন্দী কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিয়া দোকানীর গায়ে থুথু দিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, বেইমান, বজ্জাত, বেশ করেছে পুলিশ। যা তোর পুলিশ বাবার কাছে, এখানে এসেছিস কেন?

পরের দিন গুজব রটিল পুলিশ ও জমিদারের লোক নিজেরা আগুন লাগাইয়াছিল দোকানে বেপরোয়া মারধোর ও গ্রেপ্তার করিবার অজুহাত সৃষ্টি করিবার জন্য। একদিকে কালিন্দী অন্যদিকে পিরু হাজীর দল চারিদিকে

এই গুজব ছড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে উত্তেজনা শান্ত করিবার জন্য দীনদয়াল ঠাকুর ও শেখরকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল।

কিন্তু কতদিন এইসব উত্তেজিত লোককে শান্ত রাখা যাইবে? দীনদয়াল ঠাকুরের সঙ্গে সেই কথাই হইতেছিল। মোকদ্দমা জিতিবার পর জমিদার হেমাঙ্গনাথ আশ্রমের দখল লইবার জন্য পুলিশের সাহায্য চাহিয়াছেন এ খবর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আশপাশের অঞ্চল হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল আশ্রমে। রাধারাণী বড় তরফের এষ্টেটের অংশীদার। দীনদয়াল ঠাকুরের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে পক্ষভুক্ত করিয়া তিনি নূতন মোকদ্দমার আরজি দাখিল করিলেন বেতাই চণ্ডীর থান দেবীর সেবাইতদের লাখেরাজ, কোন কালে উহা খাস দখলে ছিল না। উকিলের কাছে এই আরজির কথা শুনিয়া হেমাঙ্গনাথ একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ তাঁহার সহায়। পুলিশের সাহায্যে তিনি জোর করিয়া জমির দখল লইবেন প্রকাশ করিলেন। তারপর যাহা হইবার হইবে।

ইহার পর আসিল আমেদাবাদ কংগ্রেসের সংবাদ। চারিদিকে রটিয়া গেল মহাত্মা গান্ধী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। আশ্রমে সভার পর সভা হইতে লাগিল, যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। দীনদয়াল ঠাকুর শেখরকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, শেখরবাবু, এরা আপনাকে, শ্যামানাথবাবুকে, মাতা রাধারাণীকে আর বিশ্বাস করতে চাইছে না। আমি আশ্রম ত্যাগ করে কোথাও চলে যাব। ভগবানের কৃপায় যে ভাল কাজটুকু করব ভেবেছিলাম তা বুঝি আর শেষ করতে পারলাম না। তাঁর ইচ্ছার জয় হোক।

আবার বলিলেন, মহাত্মাজীর রাজনীতি তো আমাদের জন্য নয়। তাঁর উপদেশের যেটুকু অংশ আমাদের জন্য আমি সেইটুকু পালন করতে চেষ্টা করি। কিন্তু ঘটনাচক্রে লোকের মতিগতি যে অন্যদিকে যাবে, শত শত বৎসরের অভিযোগ একদিনে দূর করবার জন্য এরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে সেটা মহাত্মাজী অনুমান করতে পেরেছেন কিনা বলতে পারিনে, আমি তো কিছু আগে পর্যন্ত পারিনি।

একটু হাসিয়া বলিলেন, কালিন্দী এখন বেতাই চণ্ডী দেবীর সাক্ষাৎ অবতার হয়েছে। তাকে বাধা দিতে গেলে—

কথাটা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না, কে একজন আসিয়া পড়াতে চুপ করিয়া গেলেন।

কালিন্দীর বিশেষ অনুগত দলের মধ্যে কয়েকজন ও পিরু হাজীকে শেখর নিজের গৃহে আনিয়াছিল। অনেক তর্ক বিতর্ক, বক্তৃতার পরে তাহারা স্বীকার করিয়া গেল ঠাকুরের আদেশ না পাইলে তাহারা গায়ে পড়িয়া পুলিশ ও জমিদারের লোকের সঙ্গে গোলমাল বাধাইবে না।

তাহাদের স্বীকৃতি পাইবার পরেও কিছুক্ষণ মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগের আদর্শের কথা, দীনদয়াল ঠাকুরের মহাত্মাজীর প্রতি ভক্তির কথা ব্যাখ্যা করিয়া শেখর তাহাদের বিদায় দিল।

তাহার মনে পড়িল তাহার ব্যাখ্যা চলিবার সময়ে পিরু হাজী মাঝে মাঝে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল, আলি ভাইরা কি কন?

শেখরকে বলিতে হইল আলি ভাইরা মহাত্মা গান্ধীর পরম অনুগত শিষ্য, মহাত্মাজীর উপদেশ তাঁহারা নিজেরা মানিয়া চলেন, সকলকে মানিয়া চলিতে বলেন।

পিরু হাজী বলে, কাগজে কি একথা বেরুইছে?

শেখর বলে, হ্যাঁ, ইংরাজী, বাংলা সব কাগজেই বেরিয়েছে।

পিরু হাজী চুপ করিয়া যায়।

পিরু হাজীর কথা মনে পড়িতে শেখর নিজের মনে কিছুক্ষণ হাসিল।

দীনদয়াল ঠাকুরের আশ্রম ছাড়িয়া আবার আমেদাবাদ কংগ্রেসের কথা মনে হইল। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রোগ্রাম দেখিয়া একখানা কাগজ মন্তব্য করিয়াছিল The non-Cooperation movement of Mahatma Gandhi is going to be a religious cult. We are not in favour of a politicl Pope." আবার লিখিয়াছিল "The Bolshevik spirit is strongly present in the present agitation". নিজের মনেই শেখর প্রশ্ন করিল, তোমরা পোলিটিক্যাল পোপ চাও না, আবার godless Bolshevism ও চাও না, তবে তোমরা কি চাও?

অন্ধকার ঘরের কোথায় হইতে একটা টিকটিকি টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া উঠিল।

শেখর বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আলো জ্বালিল, কুঁজা হইতে এক গ্লাসে জল গড়াইয়া খাইল, চোখ মুখে জলের ঝাপটা দিল। হাতমুখ মুছিয়া আবার সে শুইয়া পড়িল।

শীতল জলের স্পর্শ পাইয়া উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। ধীরে ধীরে একটা স্নিগ্ধ, নির্লিপ্তভাব শেখরের দেহ ও মনকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। কতক্ষণ সে ঘুমাইয়াছে জানে না হঠাৎ যেন আলগোছে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করিল কিসের একটা মৃদু, সুমিষ্ট গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে।

এই মৃদু, সুমিষ্ট গন্ধের অনুভূতিতে শেখর আপনার দেহ ও মন এলাইয়া দিয়া রহিল। কিসের গন্ধ, কোথায় হইতে গন্ধ আসিতেছে জানিবার জন্য সামান্য কৌতূহলও হইল না। কিছুক্ষণ পরে গায়ের কাপড়খানা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে গিয়া হঠাৎ কথাটা তাহার মনে হইতে সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। কিসের গন্ধ এটা?

গন্ধের অনুভূতিটা তাহার তন্দ্রাগ্রস্ত মনের একটা বিলাস এই সিদ্ধান্ত করিয়া শেখর ভাল করিয়া গা ঢাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে তন্দ্রা আসিতে লাগিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন শেখর অনুভব করিল আবার সেই মৃদু, সুমিষ্ট গন্ধ সে পাইতেছে। তাহার মনে হইল তাহার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া গন্ধ তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে। স্পষ্ট এই অনুভূতি হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে গায়ের কাপড় ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বালিসের নীচে হইতে টর্চ লইয়া জ্বালাইল। শয্যার ডাহিনে ও বামে আলো ফেলিয়া শেষে শিয়রের দিকে টর্চ ঘুরাইল।

খাটের অনতিদূরে দেয়ালের পাশে টিপয়ের উপর একটি পিতলের ডাসে বৃহৎ একটি গোলাপের স্তবক। অর্ধপ্রস্ফুটিত, ফিকে হলুদ রঙের মার্শাল নীলের এই গুচ্ছটির উপর টর্চের তীব্র আলো পড়িতে গন্ধ সমস্যার সমাধান হইল। মার্শাল নীলের মৃদু গন্ধ পাইয়াছিল সে, এতক্ষণ ধরিতে পারে নাই। মার্শাল নীলের গন্ধ বড় মৃদু, মনে হয় গন্ধের আভাসমাত্র দেয় সে, মনে হয় আভাসটুকু ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাসের মত বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া সে বলে, ওগো, আমার সম্পদ বড়ই সামান্য।

মার্শাল নীলের বড় দুইটি ঝাড় আছে তাহার বাগানে। অজস্র ফুল ফোটে ঝড়ে দুইটিতে। নিপুণ উদ্যান-শিল্পীর মত ডাটাশুদ্ধ এই আধ-ফোটা কুঁড়িগুলি কাটিয়া ভাসে সাজাইয়া রাখিল কে? কে জানিল যে তাহার বাগানের বিভিন্ন জাতির গোলাপের মধ্যে মার্শাল নীল তাহার বিশেষ প্রিয়?

টর্চ নিভাইয়া বালিশের নীচে রাখিতে গিয়া তাহার হাতে নরম কি একটা ঠেকিল। সেটি হাতে লইয়া অনুভবে সে বুঝিল মার্শাল নীলের বড় একটা

কুঁড়ি। বাহিরে গোটা কয়েক পাখী এক সঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। শেখর চাহিয়া দেখিল খোলা খড়খড়ির মধ্য দিয়ে আবছা আলোর রেখা আসিতেছে। রাত শেষ হইয়া আসিল তাহা হইলে। সূর্য উঠিতে না উঠিতে আবার কর্মব্যস্ততা, উদ্বেগ দুশ্চিন্তা আরম্ভ হইবে। হাতের মধ্যে ফুলের কুঁড়িটি চাপিয়া ধরিয়া গায়ের কাপড টানিয়া লইয়া সে আবার শুইয়া পড়িল।

কে ফুল রাখিয়াছে ভাসে? কে ফুল রাখিয়াছে তাহার বালিশের নীচে? বালিশের নীচে ফুল, হঠাৎ সে নিজের মনে চমকিয়া উঠিল। সন্ধ্যাতারা আসিয়াছে না কি? সে ছাড়া আর কে তাহার শয়ন কক্ষে এই পৌষ্পিক অভিযান করিতে পারে? কিন্তু সন্ধ্যাতারা তো নান্টির সঙ্গে মাস দুই আগে চলিয়া গিয়াছিল। আবার সে আসিয়াছে কি? তাহার আসিবার কোন খবর সে তো পায় নাই। সে ফিরিলই বা কেন? রাঙা মাসীমা বলিয়াছিলেন তারার বিবাহের চেষ্টা হইতেছে। শুনিয়া সে হাসিয়া সন্ধ্যাতারাকে বলিয়াছিল, তারা, তোমার অসহযোগ পাঠের ইতি হল বোধ হয়। শ্বশুরঘরে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীকে না হোক মহাত্মা শেখরনাথকে নিশ্চয় ভুলে যাবে।

কেন সে একথা বলিয়াছিল সে জানে না। তারা তাহার কথার উত্তর দেয় নাই, নান্টি বলিয়াছিল, শেখর দা, এটা কি উচ্ছ্বাস? কোন জাতীয় উচ্ছ্বাস? শেখর বলিয়াছিল ধরে নে এটা বিদায়োচ্ছ্বাস।

তারা মুখ ঘুরাইয়া বলিয়াছিল, আর উচ্ছ্বাসে কাজ নেই।

শেখর বলিয়াছিল, তোমার কথা শিরোধার্য। তবে একটা অনুমতি চাইছি। খেতে বসে কখন সখন তোমার কথা মনে পড়লে দোষ নিও না তারা। তোমার রান্নার হাতখানি বড পরিপাটি, বড় সুন্দর। নান্টির রান্না—

নান্টি খপ করিয়া বলিয়াছিল, বড্ড বিশ্রী।

শেখর—নান্টি, ঐ তো তোর দোষ। যেমন রান্নায় তেমনি কথাবার্তায় তুই অপরিপক্ক। কোন কথায় কি ফোড়ন দিতে হয় জানিস নে। দুটো ভাল কথা বলতে চাইছি তারাকে যাবার আগে যাতে ওর কঠিন মন নরম হয় আর তুই বাগড়া দিচ্ছিস। ননদ কিনা?

তাহার কথা শেষ না হইতে তারা শেখরের দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

যাইবার দিন প্রণাম করিতে আসিয়াছিল তারা। শেখর যখন আশীর্বাদ করিল, সুখী হও, তারা একটু হাসিয়া তখনই গম্ভীর হইয়া গেল, কি বলিতে

গিয়া আর বলিল না। তাহার দিকে একবার চাহিয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

এই মাস দুই তারার কথা অনেকবার মনে পড়িয়াছে শেখরের। মেয়েটি বাস্তবিক ভাল, দোষের মধ্যে একটু সিরীয়াস প্রকৃতির, নাণ্টির মত হাসিখুশী নয়। সিরীয়াস প্রকৃতির মেয়েকে শেখর ভয় করে। জীবনের খেলা, হাসিখুশীর উপরে আষাঢের মেঘের মত তাহারা চাপিয়া থাকে।

শেখর ভাবিতে লাগিল। সন্ধ্যাতারা যদি সত্যই আসিয়া থাকে তবে আসিয়াই সে তাহাকে এমনভাবে আক্রমণ করিল কেন? দিস ইজ হিটিং বিলো দি বেল্ট। মার্শাল নীল গোলাপ তাহার একটা দুর্বলতা, যেমন আর একটা দুর্বলতা গান। গান এড়াইয়া গন্ধকে আশ্রয় করিয়া এই আক্রমণ—

বাহিরে পাখীর কলরব বাড়িয়া উঠিল। খড়খড়ির মধ্য দিয়া আসা আলো আরও স্পষ্ট হইয়াছে। শেখর ভাবিল এইবার উঠিতে হইবে। হঠাৎ তাহার মনে উষ্ণ শয্যা ত্যাগ করিবার প্রবল অনিচ্ছার উদয় হইল। গায়ের কাপড় টানিয়া লইয়া সে আবার চোখ বুজিল।

চোখ বুঁজিয়া সে আরও কিছুক্ষণ মার্শাল নীল গোলাপ ও সন্ধ্যাতারার কথা ভাবিতে চাহিল কিন্তু সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন দিনের কাজের কথা আসিয়া তাহার মনের কোণে উঁকি দিতে লাগিল। শুইয়া শুইয়া সে আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, এক হাতে কালিন্দী অন্য হাতে পিরু হাজীকে ঠেকাইবার চেষ্টা করিতে করিতে তুমি গলদঘর্ম হইয়া পড়িয়াছ শেখরনাথ। তুমি তাহাদের বুঝাইতে চাহ মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য করিতে বলিয়াছেন, হিংসার আশ্রয় লইতে নিষেধ করিয়াছেন, আমাদের আন্দোলন অহিংস আন্দোলন। বৃথা চেষ্টা তোমার শেখরনাথ।

এই কথাটাই বার বার ঘুরিতে লাগিল তাহার মাথায়। দীনদয়াল ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে আজ যাহারা বিশেষ কর্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের নেতা কালিন্দী ও পিরু হাজী। ঠাকুর চরকা, খদ্দর, অস্পৃশ্যতা দূর, সমাজের কুপ্রথা দূর, মাদক বর্জন, হিন্দু মুসলমান একতার বাণী প্রচার করিতেছেন, কালিন্দী ও পিরু হাজী দিতেছে জমিদারের অন্যায় ও অবিচার দূর করিবার আশ্বাস, আর্থিক দুর্গতি দূর করিবার আশ্বাস। তাহারা বলিতেছে গান্ধী মহারাজের হুকুমে খাজানা, টেকস কমিবে, কাপড়ের দাম, লবণের দাম, জিনিসপত্রের দাম কমিবে, ধানের দর, পাটের দর বাড়িবে,

যাহাদের জমি নাই তাহারা জমি পাইবে। উচ্চ নৈতিক আদর্শমূলক কর্মপন্থা লইয়া যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল কালিন্দী ও পিরু হাজীর হাতে তাহা পরিবর্তিত হইয়াছে প্রধানত অর্থনৈতিক ও ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে। রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য ইহারা একটুও ব্যগ্র নয়।

সে জানে কালিন্দী ও পিরু হাজী উভয়েই মনে করে জমিদার তাহাদের উপর অন্যায় অবিচার করিয়াছেন। জমিদারের বিরুদ্ধে তাহাদের আক্রোশের অন্ত নাই। অসহযোগ আন্দোলনকে নেতাদের নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে সরাইয়া তাহারা ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করিবার কাজে লাগাইতে চাহে। কিন্তু অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে ইহারা ব্যক্তিগত সংগ্রামকে শ্রেণী সংগ্রামের পর্যায়ে তুলিয়াছে। নেতা হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি ইহারা। মুসলমান চাষীদের মধ্যে নূতন চাঞ্চল্যের কথা তাহার মনে পড়িল। কংগ্রেস মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার অগ্রাহ্য করিয়াছে, কিন্তু সে লক্ষ্য করিয়াছে এই শাসন সংস্কার বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান চাষী ও জোতদার শ্রেণীর মধ্যে নূতন একটা রাজনৈতিক চেতনা আনিয়াছে। ইহার ফলে মুসলমান চাষী জোতদার শ্রেণীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ও শ্রেণীগত চেতনার বিকাশ হইয়াছে। পিরু হাজী অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, এই নূতন রাজনৈতিক চেতনার সুযোগ লইতে ত্রুটি করে নাই।

তাহার মনে হইল দীনদয়াল ঠাকুর সংস্কারক, তিনি ত্বরিৎ, বৈপ্লবিক পন্থা অনুসরণ করিবার পক্ষপাতী নহেন। শিষ্যদের তিনি বুঝাইতেছেন দ্রুত, উগ্র পন্থা অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবে। কালিন্দী ও পিরু হাজী মনে করে ঠাকুর ভয় পাইয়াছেন, দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির কথা তাহারা জানে, কাজেই তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহারা নিজের পথে চলিতে চাহে, যদিও তাঁহাকে আর পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। শেখর নিজে জানে, ঠাকুরও একদিন বলিয়াছিলেন পিরু হাজী তাহাকে, শ্যামনাথকে ও রাঙামামীমাকে আর বিশ্বাস করে না, নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তির উপর তাহাদের বড় ভরসা।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে শেখর চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখিল ঘরের মধ্যে আলো আসিয়া পড়িয়াছে। বাহিরে কে ডাকিতেছে না? শেখর শুনিল কানাই দরজা খুলিয়া কাহাকে বলিতেছে, বাবু এখনও ওঠেননি, এইবার ওঠবেন।

শেখর শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া হাতমুখ ধুইতে গেল।

হাতমুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া সে দেখিল সনাতন বাউরী বারান্দায় বসিয়া আছে।

সনাতন দীনদয়াল ঠাকুরের একজন প্রিয় শিষ্য। সনাতনকে প্রথমে দেখিয়া মনে হইয়াছিল সোয়া ছয় ফুট লম্বা এক দৈত্যের ঘাড়ে বালকের মত অপবিণত একখানি মুখ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আলাপ পরিচয় হইবাব পরে তাহার ধারণা হইয়াছিল ঠাকুরের শিক্ষার আদর্শ মূর্তিমান হইয়াছে প্রাক্তন ডাকাত সনাতন বাউরীর সাধু সনাতনে রূপান্তরে। ঠাকুরের হাতে সে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, ঠাকুব তাহাকে একেবারে নূতন করিয়া গডিয়াছেন।

সনাতনকে দেখিয়া শেখর বলিল, কি সাধু, এত সকালে এসেছ? কোন খবর আছে?

নত হইযা নমস্কাব করিয়া সনাতন বলিল, বাবা ঠাকুর পাঠালেন। কইলেন বাবুকে বলবা বাবু য্যান সকালেই একবার আসতি আজ্ঞা করেন। খবব আইছে পুলুশ আসতেছে, মানে লতুন দল আসতেছে। আশ্রমে বড গোল সুরু হইছে, নাঠি সডকি নিয়্যা মেলাই মানুষ জমা হতিছে। মনে লয় কাজিয়া বাধাবি ওরা। তাই বাবাঠাকুব আমায় পাঠালেন আপুনিরে খবর দিতে।

সনাতনের কথা শুনিয়া শেখর চিন্তিত হইল। বলিল, নূতন পুলিশ আসছে কেন ঠাকুব মশাই জানেন?

সনাতন, তা তো কইতে পারিনে। সকলে কইছে ও তরফের কর্তা আশ্রম দখল করব্যান।

শুনিয়া শেখর মনে মনে বলিল, হুঁ, রায়বাহাদুর হেমাঙ্গনাথ ওয়ান্টস্ টু ট্রাই হিজ স্ট্রেংথ।

প্রকাশ্যে বলিল, তুমি যাও সনাতন। আমি একটু পরে যাচ্ছি ঠাকুর মশাইকে বলবে।

সনাতন চলিয়া গেল। পুলিশ সত্যই যদি আশ্রম দখল করিবার চেষ্টা করে তাহার ফলাফল কি হইতে পা'ব শেখর চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিল রায়বাহাদুর হেমাঙ্গনাথ মারমুখী হইয়া আছেন, নহিলে অবস্থা বুঝাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিত।

ভৃত্য চা আনিল। বারান্দায় একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া চা খাইতে খাইতে দেখিল দুইজন ভদ্রমহিলা ও সঙ্গে কয়েকজন লোক তাহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে।

চা পান শেষ করিয়া খালি কাপ হাতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বিস্মিত হইয়া দেখিল তাহার রাঙামামী রাধারাণী, তাঁহার পিছনে সন্ধ্যাতারা ও তাঁহাদের উভয়ের পিছনে তিনজন লাঠিধারী লোক আসিতেছে।

রাধারাণী ও সন্ধ্যাতারা বারান্দায় উঠিয়া আসিল, পিছনে পিছনে লোকগুলি ফটক অতিক্রম করিয়া সম্মুখের বাগানে ঢুকিল।

রাধারাণীর দিকে ফিরিয়া শেখর বলিল, কি ব্যাপার রাঙামামীমা? শরীররক্ষী নিয়ে বেরিয়েছেন কেন?

রাধারাণী বলিলেন, শরীররক্ষী নয়, রায়বাহাদুরের পাহারাদার বরকন্দাজ। ভেতরে চল, কথা আছে।

শেখর বিস্মিতভাবে বলিল, পাহারাদার? আচ্ছা, ভেতরে যান আমি আসছি।

সে বাগানে নামিয়া লাঠিধারী লোক তিনটির দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল, কার হুকুমে বাগানের ভেতরে ঢুকেছ তোমরা? বাইরে যাও।

লোকগুলি একটু ইতস্তত করিয়া ফটকের বাহিরে গেল

শেখর বলিল, ফের ভেতরে ঢুকলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব বন্দুকের গুলিতে। বুঝেছ?

কানাইকে ডাকিয়া বারান্দায় বসিয়া লোকগুলির দিকে নজর রাখিতে বলিয়া সে ভেতরে আসিল।

রাধারাণী বলিলেন, শ্যামানাথ আজ সকালে গ্রেপ্তার হয়েছে।

তারপর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়া বলিলেন, আমি যে মোকদ্দমা দায়ের করেছিলাম তা নাকি খারিজ হয়েছে। পুলিশ এসেছে রায়বাহাদুরকে আশ্রমের দখল নিতে সাহায্য করার জন্য। শ্যামানাথ বাধা দিতে পারে ভেবে ম্যাজিষ্ট্রেটের কানভারী করে শান্তিভঙ্গের প্ররোচনা দিবায় অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করানো হয়েছে। আমার ঘরের বাইরে লেঠেল বরকন্দাজ বসিয়েছেন যাতে আমি বেরুতে না পারি। আশঙ্কা হচ্ছে তোমাকেও ধরবে। তোমরা দু'জন না থাকলে ঠাকুর একা কতদিক সামলাবেন বুঝতে পারছিনে।

বাহিরে একটা গোলমালের শব্দ শোনা গেল। শেখর বারান্দায় আসিয়া দেখিল হিন্দু মুসলমানের একটি মিশ্র দল ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাধারাণীর তিনজন পাহারাদার তাহাদের আসিতে দেখিয়া পলাইয়াছে।

শেখরকে দেখিয়া দলের একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল, বাবু, পুলুশ বড় তরফের কাছারী বাড়ী থেকে রওনা হইছে আপনাকে ধরাব জন্তি। কালিন্দী মায়ী আর হাজী সায়েব পাঠালেন আপনারে আনবার জন্তি।

শেখর বলিল, তোমরা এখানে গোলমাল করো না, আশ্রমে যাও। আমি যাচ্ছি আশ্রমে।

লোকটি বলিল, পুলুশ আইস্যা পড়লি যাবান ক্যামনে? এখানেই তো ফাটাফাটি নেগে যাবি।

শেখর বলিল, তোমবা এখনই চলে যাও, আমি আসছি।

সে ভিতরে চলিয়া গেল। দলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল সকলে এখানে থাকিবে, বাবুকে পুলিশেব হাতে পড়িতে দেওয়া হইবে না।

ভিতরে আসিয়া শেখর বাধারাণীকে বলিল, আপনারা এবার বাড়ী যান। কানাই সঙ্গে যাবে। যা অবস্থা দেখছি গোলমাল ঠেকানো যাবে মনে হয় না। আমি আশ্রমে চললাম।

কানাইকে ডাকিয়া উপদেশ দিয়া একটা জামা গায়ে দিয়া শেখর দরজার দিকে অগ্রসব হইল। তাবা আসিয়া তাহাব সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, আমিও যাব।

শেখর তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল। দেখিল, সামান্য ব্যাপারেই মুখে চোখে একবাশ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে সে, লুকাইবার, সংযত হইবার একটুও চেষ্টা নাই।

একটু হাসিয়া বলিল, তুমি বরং আমার মার্শাল নীল ঝাড় দু'টোর ওপরে দৃষ্টি রেখো। আশ্রম ইজ নাউ নো প্লেস ফর ইউ ইয়ং লেডি।

তারপর বলিল, আসি রাঙামামীমা, আসি তারা।

শেখরকে লইয়া দলটি নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

রাধারাণী বলিলেন, শেখর না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানে থাকতে চাই, তারা। চল, তোকে বাড়ী রেখে আসি।

তারা একখানা চেয়ারে চাপিয়া বসিল। বলিল, আপনাকে নিয়ে বাড়ী

যাব মাসীমা। আপনি বসুন, আমি দেখে আসি কানাই আমার জন্য এক কাপ চা রেখেছে কি না।

তারা কানাইকে লইয়া চা তৈয়ারী করিবার আয়োজনে ব্যস্ত, রাধারাণী বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। শেখরকে গ্রেপ্তার করা লইয়া একটা সংঘাত বাধিবে হয়ত। শেখর ঠাকুরের ডান হাত। শ্যামানাথ ছিল বাম হাত। বাম হাত গিয়াছে, ডান হাতকে কি ঠাকুর এই বিপদের সময়ে সহজে ছাড়িতে চাহিবেন? অহিংস অসহযোগ দাঁড়াইয়াছে আইন অমান্য আন্দোলনে, আইন অমান্য আন্দোলন দাঁড়াইয়াছে সক্রিয় প্রতিরোধে। প্রতিরোধ কি নিরুপদ্রব থাকিবে? ঠাকুরের শিষ্যরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে জমিদার আশ্রম দখল করিবেন শুনিয়া, প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে বহুদিনের অবিচার, অন্যায় ও উৎপীড়নের প্রতিশোধ লইবার জন্য। কোন কোন গ্রামে নাকি প্রজারা খাজনা দিবে না বলিয়া তহশীলদারদের হাঁকাইয়া দিতেছে। তাহারা রব তুলিয়াছে লাঙ্গল যার জমি তার। কত জায়গার কত রকমের জিনিস যে আসিয়া পড়িয়াছে মহাত্মাজীর আন্দোলনের মধ্যে তাহার ইয়ত্তা নাই। নদী নালা, খাল বিলের জল একাকার করিয়া এ যেন বন্যার স্রোত—

বাহিরে পদ শব্দ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে কে ডাকিল,—শেখরনাথবাবু বাড়ী আছেন?

রাধারাণী কানাইকে ডাকলেন। বলিলেন, দেখ তো বাইরে কে ডাকছে; বলবি বাবু বাড়ী নাই। কানাই বাহিরে গিয়া বলিল, বাবু বাড়ী নাই।

যে ডাকিয়াছিল সে বলিল, আমি দারোগা, বাবুকে চাই।

কানাই বলিল, বাবু চা খেয়ে বেড়াতে গেলেন, বাড়ীতে নাই।

কোথায় বেড়াতে গেলেন? বাড়ীতে কে আছে?

বড়তরফের মা'ঠান আছেন, দিদিমণি আছেন।

তাঁদের বলো আমি বাড়ী তলাস করব।

বাবু বাড়ী নাই, তলাস করে বাবুকে পাবান নাকি?

দারোগাবাবু কানাইকে ধমক দিয়া বলিল, মা ঠাকরুণদের বলো তাঁরা এক ঘরে যান, আমি বাড়ী তলাস করব। যাও।

রাধারাণী সব শুনিতেছিলেন। কানাইকে বলিলেন, দারোগাবাবুকে বলো আমরা ভেতরের বাগানে গিয়ে বসছি উনি বাড়ী তলাস করুন। লোকজন আনবার দরকার নেই।

কানাই শিক্ষামত জানাইলে দারোগাবাবু প্রতি ঘরে ঢুকিয়া অনুসন্ধান করিল। আসামীকে কোথাও না পাইয়া বারান্দায় আসিয়া কানাইকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু আশ্রমে গিয়াছেন জানো ?

কানাই বলিল, তা জানিনা, বেড়াতে গেলেন কইলেন।

মাঠাকরুণরা এখানে এসেছেন কেন ?

কানাই সংক্ষেপে বলিল, ওনাদের নেমন্তন করেছেন বাবু।

দারোগা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। তাহাকে সদলবলে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কানাই একটু মুচকিয়া হাসিল। ভিতরে গিয়া রাধারাণীকে বলিল, চলে গেল মা'ঠান। ব্যাটা শুদ্ধলো মা'ঠানরা এখানে ক্যান ? আমি কলাম বাবু ওনাদের খাবার নেমন্তন করেছেন। তা এবার ঠাকুরকে বাজারে পাঠান।

রাধারাণী ও তারা কানাইয়ের কথা শুনিয়া হাসিল। তারা বলিল, কানাই তোমার খুব বুদ্ধি তো।

নিজের প্রশংসা শুনিয়া কানাই বিনীতভাবে হাস্য করিল।

শেখর আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিল অভূতপূর্ব ব্যাপার। উত্তেজনায় সারা আশ্রম চঞ্চল, লোকে লোকারণ্য। আশ্রমের পিছনে কেউটিয়া নদী। অন্য তিন দিকে দুই সারি রক্ষাব্যূহ রচিত হইয়াছে হিন্দু মুসলমানের মিশ্র জনতার দ্বারা। পিরু হাজী জানাইল নদীর দুই পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে পাঁচখানা গ্রামের জোয়ানরা লাঠি লইয়া লুকাইয়া আছে, পুলিশ অগ্রসর হইলে তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িবে পুলিশের উপর। কালিন্দীকে শেখর যেন নূতন করিয়া দেখিল। তাহার নিকষ কালো রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে। মূর্তিমতী প্রেরণার মত সে লোক মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কালিন্দী পূর্ণ যুবতী, কিন্তু যেখানে সে যায় সাক্ষাৎ বেতাই চণ্ডী দেবী মনে করিয়া লোকে সম্ভ্রমে মাথা নত করে, চোখ তুলিয়া কেহ তাহার দিকে চাহিতে সাহস করে না।

দীনদয়াল ঠাকুর গম্ভীরভাবে বেতাই চণ্ডী দেবীর মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। শেখর আসিতে কালিন্দী, পিরু হাজী ও আরও কয়েকজন প্রধানকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিলে পরামর্শ সভা বসিল।

কথা উঠিল পুলিশের সম্বন্ধে। জয়কালী বাড়ার সম্মুখে মাঠে পুলিশের তাঁবু পড়িয়াছে, বহু নূতন পুলিশ আসিয়াছে। পুলিশ কি চায় ? আশ্রম ভাঙিয়া

দিতে চায়, না আশ্রমের লোকজনকে গ্রেপ্তার করিতে চায়, না গ্রামে গ্রামে ঢুকিয়া তাহারা মানুষকে পিটাইতে চায়?

তারপব কথা উঠিল, বড তরফেব বডবাবু কেন আশ্রমের বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন। তিনি কি জানেন না জমির মালিক যিনিই হউন বেতাই চণ্ডীব থান দেবোত্তব? তাহা ছাডা বেতাই চণ্ডীব বনেব মত তাঁহার কত দশ বিশ বিঘা জমি মহালে মহালে অনাবাদী পডিয়া বাহয়াছে, এই সামান্য জমিটুকুর উপর তাঁহার এত লোভ কেন?

শেখব বলিল পুলিশ শ্যামানাথকে গ্রেপ্তাব কবিযাছে, তাহাকেও গ্রেপ্তার করিবাব জন্য আশ্রমে আসিবে। দাবোগা আসিলে সে ধবা দিবে। হয়ত তাহা হইলে পুলিশ আর কাহাকেও এখনই গ্রেপ্তার না করিতে পারে।

দীনদযাল ঠাকুব বলিলেন ধরা দিতে হইলে তাঁহাকে আগে ধবা দিতে হইবে।

কালিন্দী ও পিরু হাজী দৃঢভাবে জানাইল পুলিশেব হাতে কাহারও ধবা দেওযা হইবে না। অন্য প্রধানবা তাহাদিগকে সমর্থন কবিল।

কালিন্দী ও পিরু হাজীব দিকে চাহিযা দীনদয়াল ঠাকুব বলিলেন, তোমাদের কথা শুনলাম। আমাব কথা এই যে হুট করে একটা গোলমাল বাধিয়ো না বাছাবা। তোমাদের মত দু'জন মাথা গবম মানুষ নিয়ে আমার বেশী ভয। আগে দেখো পুলিশ কি কবে। একটু থামিযা তিনি বলিলেন, ওগো হাজীসায়েব, আমার কথাটা শুনলে বাবা?

পিরু হাজী মাথা নাড়িল।

দুপুর গডাইতে জয়কালী বাডীব সম্মুখেব বড মাঠের তাঁবু হইতে বাহির হইযা লাঠিধারী পুলিশদল আশ্রমের দিকে অগ্রসব হইতে আবম্ভ কবিল।

বিহারী পুলিশ নয, গুর্খাও নয়। বাংলাব বিভিন্ন জেলা হইতে কুডানো পাঁচমিশালী চেহারার নীল কুর্তা পবা কনষ্টেবল।

শেখর শুনিল আশ্রমেব কোন স্থান হইতে শাঁখের শব্দ হইল, কেউটিযা নদীর দিক হইতে কয়েকবার শিঙার শব্দ শোনা গেল। আশ্রমের তিন দিকের রক্ষাব্যূহ সজাগ হইয়া উঠিল সে শব্দ শুনিয়া ও কাহার নির্দেশে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলিল। শত শত কণ্ঠ হইতে ধ্বনি উঠিল,

মহাত্মা গান্ধী কি জয়! ঠাকুব দীনদয়াল কি জয়!

কি ভাবিয়া পুলিশবাহিনী হঠাৎ গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পুলিশের

তাঁবুগুলির ওপারে, জয়কালী বাড়ীর নাটমন্দিরের দিক হইতে, কেউটিয়া নদীর ধারে কালী বাড়ীর ঘাটের দিক হইতে, জয়কালী বাড়ীর পিছনের বাঁধের ওপারে জঙ্গলের দিক হইতে দলে দলে লোক আসিতেছে। নাটমন্দির পিছনে রাখিয়া মাঠের মধ্যে তাহারা জমা হইতেছে, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

সম্মুখের জনতা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে আগাইতেছে, পিছনের জনতা আগাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পুলিশদল কিছুক্ষণ রুদ্ধগতি অবস্থায় থাকিয়া পশ্চাতে হটিয়া তাঁবুর দিকে ফিরিল। শত শত কণ্ঠ হইতে আবার ধ্বনি উঠিল,

মহাত্মা গান্ধী কি জয়! ঠাকুর দীনদয়াল কি জয়!

দুই

রাধারাণী ও তারা শেখরের গৃহে রহিয়া গিয়াছে। তারা বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। তাহার দিদির বাড়ীতে যাইতে বলিলে বলে দিদির ধারণা তাহাদের জন্যই জামাইবাবু গ্রেপ্তার হইয়াছেন, রায়বাহাদুর হেমাঙ্গনাথের চক্রান্তের কথা সে জানে না। দিদির কাছে গিয়া দাঁড়াইতে তাহার ভরসা হয় না। তারপরে বলে, আবার পাহারা বসবে তো? ওরে বাব্বা।

রাধারাণী বুঝেন এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে তার অনিচ্ছার আসল কারণ কি। শেখরশূন্য শেখরের বাড়ীর আকর্ষণ আরও দশগুণ বাড়িযাছে তারার মনে। তিনি ভাবেন আরও দুই একদিন যাক্, তারপর যাইবেন।

দুই একদিনের জায়গায় আরও কয়েকটি দিন কাটিয়া গেল। অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে। কানাই মধ্যে মধ্যে গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া আসিয়া রাধারাণীকে খবর দেয়, রাধারাণী ও তারা তাহা লইয়া আলোচনা করে।

পুলিশের তাঁবুগুলি শত শত লোক ঘিরিয়া রাখিযাছে দিন রাত। পুলিশ তাঁবু হইতে বাহির হইযা বেশী দূর যাইতে সাহস পায না। বড় তরফের বাড়ীর সম্মুখে, পিছনে দিন রাত লাঠি হাতে বহুলোক দাঁড়াইয়া থাকে। তাহারা কাহাকেও বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেয় না, হাটবাজারে পর্যন্ত যাইতে দেয না। রাযবাহাদুর নিজের বাড়ীতে বন্দী হইয়া আছেন। মহালে মহালে প্রজারা বিদ্রোহ করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। থানায় যাইবার পথে, শহরে যাইবার পথে পাহারা বসিয়াছে। পঞ্চাক্রোশী গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এখন দীনদয়াল ঠাকুরের শিষ্যদের হাতে। লোকে বলিতেছে এখানে গান্ধীরাজ হইয়াছে, ইংরাজের রাজ শেষ হইয়াছে। জমিদার শরীকরা, বাবুরা লুটপাটের ভয়ে বাড়ীতে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন, লোকে সোনাদানা যাহার যাহা আছে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতেছে।

রাধারাণী কানাইকে জিজ্ঞাসা করেন, কিরে কোথাও ডাকাতি হয়েছে শুনলি?

কানাই বলে, ডাকাতি তো ভাল, ছ্যাচড়া চোরেরা পর্যন্ত ব্যবসা বন্ধ করেছে মা'ঠান, গাঁধি রাজার বড় কড়া হুকুম।

রাধারাণী, তবে লোকের এত ভয় কেন ?

কানাই, যেনাদের মেলাই আছে ভয় তো তেনাদের মা'ঠান, আর সকলে দিব্যি বুক টান করে বেড়াচ্ছে। কত লোকের মাথায় যে গাঁধি বাজার টুপী আর পরণে গাঁধি রাজার চট তা যদি দেখতেন মা'ঠান। বাবুরা চট পরে টুপী মাথায় দিয়ে গাঁধি রাজার চেলা হচ্ছেন আর ছোটলোকদের সঙ্গে সেধে সেধে আলাপ করছেন।

কানাইয়ের কথা শুনিয়া রাধারাণী মনে মনে হাসেন, প্রকাশ্যে কোন কথা বলেন না।

সেদিন কানাই বাজার করিয়া ডাক লইয়া ফিরিল। তারার নামে একখানা চিঠি, লেখা দেখিয়া রাধারাণী বুঝিলেন নাপ্টি লিখিয়াছে। চিঠিখানা তারার হাতে দিতে বলিয়া তিনি খবরের কাগজ খুলিলেন। ডাকের গোলমালের জন্য তিনদিনের কাগজ একসঙ্গে আসিয়াছে।

প্রথম কাগজখানি খুলিয়া দেখিলেন কলমে কলমে অসহযোগীদের উপর পুলিশের উৎপীড়নের সংবাদ। ফরিদপুরে জেলে অসহযোগীদের উপর বেত্রদণ্ড, বরিশালের অসহযোগীদের উপর পুলিশের গুলি। ঢাকায় কুর্জন পার্কে লাঠি-চার্জ, কলকাতায় সার্জেণ্ট ও সিভিল গার্ডদের উৎপীড়ন। সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছে, আমরা শুনিতেছি শীঘ্রই সকল প্রদেশে কংগ্রেস ও খিলাফৎ প্রতিষ্ঠানগুলি বে-আইনী ঘোষিত হইবে, অনেকগুলি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহকর্মীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে, কতকগুলি স্থানে সামরিক আইন জারি হইবে।

পরের দিনের সংবাদপত্রে সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা হাটে পুলিশের গুলি চালনার সংবাদ দিয়াছে। লিখিয়াছে, পুলিশ ইটপাটকেলের উত্তরে বুলেট ছড়াইতেছে আজকাল। মাদ্রাজ, সিন্ধু, ধারওয়ার, নাসিক, রায়বেরিলী, টিটাগড ও আরও বহু স্থানে এই ব্যাপার আমরা দেখিতেছি। লিখিয়াছে, ইংলিশম্যান বলিতেছে কংগ্রেস ও খিলাফৎ ভলাণ্টিয়ারদের শারীরিক দণ্ড না দিলে তাহারা সিধা হইবে না। বিলাতের মর্ণিংপোষ্ট চিত্তরঞ্জন দাশকে বলিতেছে "The Director General of the Terrorist movement in Bengal". Times of India মহাত্মা গান্ধীকে বলিয়াছে "The arch enemy of peace in India."

শেষ সংবাদপত্র খানিতে বড় বড় অক্ষরে শিরোনামা "যুদ্ধঘোষণার পূর্বে

রাজপ্রতিনিধির নিকট মহাত্মা গান্ধীর শেষ পত্র"। বর্দোলী হইতে রাজপ্রতিনিধির নিকট লিখিত এই পত্রে মহাত্মা গান্ধী জানাইয়াছেন এক সপ্তাহের মধ্যে অসহযোগীদের উপর কঠোর উৎপীড়নের নীতির পরিবর্তন না করিলে সমষ্টিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে।

রাধারাণী মনোযোগ দিয়া সংবাদটি পড়িলেন। তারপর নান্টির চিঠিতে সেদিনকার কোন সংবাদ দিয়াছে কিনা জানিবার জন্য তারাকে ডাকিলেন। তাহার কোন সাড়া না পাইয়া তিনি উঠিলেন।

এঘর ওঘর খুঁজিয়া ভিতরে দালানে আসিয়া দেখিলেন বাগানে একটি গোলাপের ঝাড়ের কাছে মোড়া পাতিয়া বসিয়া বাঁ হাতের উপর গাল রাখিয়া তারা তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছে।

রাধারাণীর ডাকে সে চমকিয়া উঠিল। রাধারাণী তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন, কি ভাবছিস এত? নান্টি কি লিখেছে? ওখানে সবাই কেমন আছে?

তারা উঠিয়া দাঁড়াইল, ঢোক গিলিয়া বলিল, লিখেছে সবাই ভাল আছেন।

আর কি লিখেছে?

লিখেছে আমি জামাইবাবুর সঙ্গে জিদ করে চলে আসায় মা, দাদা, রাগ করেছেন।

ওখানকার অবস্থার কথা কি লিখেছে?

অবস্থার কথা? হাঁ, লিখেছে খুব গোলমাল চলছে, ধরপাকড় হচ্ছে।

আর?

আর? আর কিছু তো লেখেনি। শুধু লিখেছে—মানে আমাকে সাবধান করেছে।

রাধারাণী বিস্মিত কণ্ঠে ব'ললেন, সাবধান করেছে?

তারপর নিজেই কি অনুমান করিয়া লইলেন। কি সাবধান করেছে আমাকে বলবি?

তারা কোন উত্তর না দিয়া নান্টির চিঠিখানি রাধারাণীর হাতে দিল। তারপর বলিল, আপনি বসুন মাসীমা আমি আসছি।

রাধারাণী মোড়ায় বসিয়া নান্টির চিঠি পড়িতে লাগিলেন। চিঠির শেষের দিকে নান্টি লিখিয়াছে—তারু, শেখরদাকে তুই কতখানি বুঝেছিস জানিনে,

কিন্তু আমি যতখানি বুঝেছি তাতে তোর জন্য আমার দুঃখ হয়। শেখরদা অতি সচ্চরিত্র লোক, খাঁটি লোক, তাঁর কাছে বিপদের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু ওঁর মত ভেতরে কঠিন মানুষ আমি আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ওঁর শুধু বাহিরটা নরম, তাই মনে হয় খুব আমুদে। শেখরদা খেয়ালী মানুষ, তবে ওপরে ওপরে খেয়ালের পেছনে ভারি ঠাণ্ডা, সতর্ক, বুদ্ধিওয়ালা মানুষ তিনি। বোধহয় একটু স্বার্থপরও। মানে নিজের সুখ দুঃখের দায়িত্ব পরের হাতে তুলে দিতে ভরসা পান না। তাই কর্তব্য বলে যা মনে করেন তা ছাড়া সব ব্যাপারেই তাঁর আলগা ভাব, বুদ্ধি দিয়ে যা বিশ্লেষণ বা গ্রহণ করা যায় তা ছাড়া আর সব কিছু তিনি হালকা করে দেখেন, কোন কিছুতে মনে দাগ বসতে দিতে রাজি নন। ওঁর মত মানুষকে বাঁধা ভারি শক্ত কাজ। ওঁর বাইবের সুন্দর রূপ দেখে, সংযত, মার্জিত ব্যবহার দেখে, অসাধারণ কাজের শক্তি দেখে, সকলের প্রতি উদাব সহানুভূতি দেখে তুই আত্মহারা হয়েছিস। নইলে অমন করে কাকাবাবুর সঙ্গে চলে যেতিস না। যদি তোর ফেরবার শক্তি থাকে আমি বলব ফিরে আয় তারু, আর এগোস না মরীচিকা দেখে। কিছু মনে করিস না, বড় ভালবাসি তাই যা আমার মন বলছে লিখে জানালাম। আমাব কথা মিথ্যা প্রমাণিত হলে আমার চাইতে সুখী আর কেউ হবে না, অবশ্য তুই ছাড়া।

মেয়ের এই চিঠি খানি মন দিয়া পড়িয়া রাধারাণী নিজের মনে হাসিলেন। নাণ্টি তাহা হইলে পুরুষ চরিত্রের পাকা জহুরী হইয়াছে এই বয়সে।

তিনি তারাকে ডাকিলেন। বলিলেন একটা মোড়া নিয়ে আমার কাছে বোস, দু'একটা কথা আছে।

তারা মোড়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিল। তাহার মাথার উপর দুইখানি গোলাপের ডাল মৃদু বাতাসে দুলিতেছিল। দেখিতে দেখিতে একটি শুষ্ক ফুল হইতে ঝরিয়া কতগুলি পাপড়ি তাহার মাথায়, গায়ে পড়িল। পাপড়িগুলি ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া তারা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাধারাণী তাহার ঈষৎ ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেবতা তোকে আশীর্বাদ করলেন তারু।

তারার কোলের উপর দুইটি পাপড়ি পড়িয়াছিল। সে দিকে চাহিয়া সে ঈষৎ হাসিল রাধারাণীর কথা শুনিয়া।

রাধারাণী বলিলেন, নান্টির নিজের যা মনে হয়েছে তাই লিখেছে, তাই বলে ওর কথা অভ্রান্ত বলে মেনে নিবি কেন তারু? তুই নিজের মনে যদি কোন আশ্বাস পেয়ে থাকিস সেইটে বড় কথা। নান্টি না চাইতে পেয়েছে, সে ওর ভাগ্য। কষ্ট করে আদায় করে নেবার সুখ ও দুঃখ কি ও জানে না। কেন মিছে ভাবছিস?

একটু থামিয়া বলিলেন, শেখর বড্ড চাপা স্বভাবের ছেলে। ও মেয়ে ক্যাংলা জাতের ছেলে নয়, অল্পে সন্তুষ্ট হবার ছেলেও নয়। হয়ত দুঃখ পাবি কিছু, তবে—

হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া তারা ও রাধারাণী চমকিয়া উঠিলেন। মনে হইল দূরে একসঙ্গে অনেকগুলি বন্দুকের আওয়াজ হইল।

রাধারাণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কানাইকে ডাকিলেন। রান্নাঘর হইতে পাচক বাহিরে আসিল। বলিল, কানাই কি আনতে বাইরে গেল। কি কাজ আছে মা?

রাধারাণী বলিলেন, তুমি কোন শব্দ শুনতে পেয়েছ ঠাকুর?

পাচক জানাইল সে কাজে ব্যস্ত ছিল, কোন শব্দ শুনে নাই।

রাধারাণী—তুমি বাইরে গিয়ে একটু দেখে এস তো, কারো কাছে কোন খবর পাও কিনা। দাঁড়াও, খিড়কী দোরটা বন্ধ কর আগে, ঘরের মধ্যে দিয়ে যাও। আমি দোর বন্ধ করে রাখব ফিরে এসে ডাকবে।

পাচক চলিয়া গেল। রাধারাণী তারাকে ডাকিয়া বলিলেন, ঘরে আয় তারু। বাইরের দিকে জানালাগুলো সব বন্ধ করে দে, দোরটা আমি বন্ধ করছি। মনে হচ্ছে গোলমাল বেধেছে, ঘরে চলে আয়।

ভিতরের ও বাহিরের সব দরজা বন্ধ করিয়া তারা ও রাধারাণী ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বার দুই দূরে একটা হৈ চৈ শোনা গেল। একবার বাড়ীর পাশ দিয়া একদল লোক উত্তেজিত স্বরে কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল বুঝা গেল, কিন্তু কোন কথা কানে আসিল না।

তারা বলিল, আশ্রমের দিক থেকে গুলির শব্দ এল না মাসীমা?

রাধারাণী বলিলেন, হাটতলার দিক থেকে হতে পারে, ঠিক বোঝা গেল না।

উভয়ে নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন রহিলেন, আর কোন কথা হইল না।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে বাহিরে কানাইয়ের গলা শুনিয়া রাধারাণী উঠিয়া দরজা খুলিলেন। কানাই ও পাচক ঘরে ঢুকিল।

কানাই বলিল, পুলিশ গুলি চালাল মা'ঠান, অনেক মানুষ নাকি খুন জখম হয়েছে।

রাধারাণী—কোথায় গুলি চলল?

কানাই—শুনলাম জয় কালীর বাড়ীর মাঠে। সেদিকে যেতে ভরসা পেলাম না। লোকজন পালাচ্ছে।

রাধারাণী—কি কি শুনলি বল তো?

কানাই বিভিন্ন লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছিল বলিতে লাগিল। বাজারের একজন দোকানী পুলিশের কাছে জিনিষ বিক্রয় করিতে অস্বীকার করায় পুলিশের লোক তাহার জিনিস কাড়িয়া লয়। ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া বাজারের লোকজন পুলিশের ছোট দলটিকে বেষ্টন করিয়া মারিতে আরম্ভ করে, দুইজন কনেষ্টবল কোন ক্রমে পলাইয়া গিয়া পুলিশের তাঁবুতে খবর দেয়। পুলিশকে লাঠি ও বন্দুক লইয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দুইদিক হইতে জনতা তাহাদের তাড়া করে। ইট ও মাটির ঢেলা পড়িতে থাকে, তীর ও সড়কির আঘাতে পাঁচজন পুলিশ জখম হয়। তখন পুলিশ গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। বিশ পঁচিশ জন লোক ঘায়েল হইলে জনতা সরিয়া যায়। ছয়জন মানুষ নাকি মরিয়াছে তবে তাহাদের লাশ কেহ দেখে নাই।

রাধারাণী—বাজারের পুলিশের কি হল?

কানাই—দু'জন পালিয়েছিল, বাকীগুলোকে আধমরা করে রেখে বাজারের লোকজন পালিয়েছে।

আশ্রমের কোন খবর পেলি?

আশ্রমের পথে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে, কাউকে যেতে দিচ্ছে না। কেবল নদীর দিকের পথ খোলা আছে, শোনলাম আশ্রমে নাকি বড় সভা হচ্ছে। হাড়ি বাগ্দীরা বলছে ঠাকুর মন্তর পড়ে সব পুলিশ সাফ করে দেবেন। মাঠে পুলিশের গুলিতে যারা মরেছিল ঠাকুর মন্তর পড়ে তাদের নাকি বাঁচিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা আশ্রমে রয়েছে।

পরদিন নূতন একদল সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে পৌছিল। জয়কালীর বাড়ীর মাঠে নূতন তাঁবু পড়িল তাহাদের জন্য।

সেদিন বিকালের দিকে আবার গোলমাল আরম্ভ হইল। কানাই খবর আনিল পুলিশ হাট লুট করিয়াছে তাহাদের কাছে জিনিষ বিক্রয় করিতে

অস্বীকার করায়। একচোট মারপিটের পরে পুলিশ গুলি চালাইতে আরম্ভ করিলে জিনিষপত্র ফেলিয়া হাটের লোক পালাইয়াছে।

খবর শুনিয়া রাধারাণী দেবী ভাবিলেন লঙ্কাকাণ্ডের শুরু হইল।

তাঁহার অনুমান মিথ্যা হইল না। মধ্যরাত্রে ভীষণ হল্লা শোনা গেল। বার বার বন্দুকের শব্দ হইল, কয়েকটি জায়গায় আগুন লাগিয়াছে বোঝা গেল। রাধারাণী দেবী সন্ধ্যাতারাকে লইয়া জাগিয়া বসিয়া আছেন, পাশের ঘরে কানাই ও পাচক তিনকড়ি ঘরের কোণে রক্ষিত দুই গাছা লাঠি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধারাণী দেবী শুনিলেন বারান্দায় উঠিয়া কে ডাকিতেছে, মা'ঠান, আছেন ?

কানাই মেঝেতে লাঠি ঠুকিয়া বলিল, কে বাইরে ? কে কথা বলছ ?

যে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল সে বলিল, আমরা ঠাকুরের লোক। বাবু পাঠালেন পওরা দিতি। খুব গোলমাল বাধিছে।

সন্ধ্যাতারাকে পাশের ঘরে যাইতে বলিয়া রাধারাণী কানাইকে দরজা খুলিতে বলিলেন। কানাই একটু ইতস্তত করিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রাধারাণী বলিলেন, তোমার নাম কি বাছা ?

আজ্ঞে তীর্থপতি সর্দার।

আগুন লেগেছে কোথায় তীর্থপতি ?

শোনলাম ইস্কুল বাড়ী আর হাটতলায় পুলুশের তাঁবুতে আগুন নেগেছে। পুলুশ ক্যাবোল হাওয়ায় গুলি ছাড়তিছে।

একটু থামিয়া বলিল, শোনলাম আরো একঠাঁই আগুন নাগবি।

কোথায় আগুন লাগবে ?

এখন বলতি মানা মা'ঠান, কাল বিয়ানে সব শোনবেন। সকলে কইছে রাম রাবণের লড়াই বাধবি।

ঠাকুর মশাই কেমন আছেন ? বাবু কি করছেন ?

শোনলাম ঠাকুর মশাই আজ কয়দিন উপোস দিয়া আছেন, একটা করি তুলসীর পাতা খান, দিনরাত পূজায় আছেন, বেতাইচণ্ডী মার কাছে মন্তর আদায় করিছেন। সেই মন্তর আওড়ালি পুলুশের হাতের বেবাক বন্দুক পাট কাঠি হয়্যা যাবি।

আর শেখরবাবু ?

তিনি যার বরে কালকেতু সেনাপতি। তেনার হুকুমে সব চলতিছে। কাল পিরু হাজীকে ধমক দিল্যান। তার দলের নোকেরা নাকি লুটতরাজ সুরু করিছে। পিরু হাজী, কালিন্দী ঠাকরাণ, রায়বাহাদুরের কাছারী বাড়ীতে আগুন নাগাতে চাইছে, বাবু কল্যান আগে পুলুশেরে হটাও। দুইজনের ভারী রাগ বাবুর ওপরে, তয় মুখে কিছু কইতে ডরায়। ঠাকুর তেনার পক্ষে কিনা।

আরও দুই চারিটা কথার পরে তীর্থপতি বলিল, মেলাই রাত হল, দরজা বন্ধ করি আপনি নিশ্চিন্দে ঘুমান মা'ঠান। আমরা পাঁচজন রইলাম, কোন ভয় নাই।

সারারাত ধরিয়া মাঝে মাঝে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। রাধারাণী জাগিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন দুপুরে কানাই খবর আনিল। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আশ্রমের দিকে রওনা হইয়াছিল। পুলিশকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আশ্রমরক্ষীরা অর্ধবৃত্তাকারে আগাইতে ল..িল। মশালের আলো ও শিঙার ঘন ঘন শব্দে পুলিশ পিছনে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল জয়কালী বাড়ীর বাঁধের দিক হইতে অসংখ্য লোক লাঠি হাতে অগ্রসর হইতেছে। লক্ষ্যহীন ভাবে কিছুক্ষণ বন্দুক চালাইয়া বেষ্টিত হইবার আশঙ্কায় পুলিশ বাহিনী পিছনে হটিয়া তাঁবুর দিকে ফিরিল। রাত্রে কি ভাবে এই তাঁবুতে আগুন লাগিয়াছিল।

তীর্থপতির দল শেখরের গৃহে দুপুরের খাওয়া শেষ করিয়াছে, একজন বৈরাগী আসিয়া তাহাদের ডাকিল। তাহার কাছে কি খবর জানিয়া তীর্থপতি সদলে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল সাঁজেব বেলা আমরা আ· ।

রাধারাণী আবার কানাইকে বাহিরে পাঠাইলেন।

সন্ধ্যার আগে কানাই শুষ্কমুখে ক্লান্তদেহে ফিরিয়া আসিল। রাধারাণী শুনিলেন আশ্রমে নাকি গোলমাল লাগিয়াছে। দীনদয়াল ঠাকুর গোপনে পুলিশের কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তিনি ধরা দিবেন পুলিশ যদি আর গুলি না চালায় ও আশ্রমের লোকজনকে কিছু না বলে। খবরটা কি ভাবে বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িলে শেখরের সঙ্গে কালিন্দী ও পিরু হাজীর বাগবিতণ্ডা হয়। তাহারা অভিযোগ করে শেখরের পরামর্শে ঠাকুর পুলিশের হাতে ধরা দিতে রাজ হইয়াছেন। তাহারা আরও বলে পুলিশ ঠা.ুরকে গ্রেপ্তার করিয়া আশ্রম পোড়াইয়া দিবে ও আশ্রমের সবাইকে গ্রেপ্তার করিবে। হাজী ও কালিন্দীর দল ঠাকুর ও শেখরকে মন্দিরে অবরুদ্ধ করিয়া নিজেদের হাতে সব ভার লইয়াছে।

ঠাকুরের প্রেরিত লোকের কাছে খবর পাইয়া একদল পুলিশ আশ্রমের দিকে রওনা হইয়াছিল ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য। আশ্রমের কাছে পৌঁছিলে হঠাৎ দলে দলে লাঠিধারী আশ্রমরক্ষী দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে। দশ পনের জন বন্দুকের গুলিতে ঘায়েল হইলেও তাহারা সিপাহীদের বন্দুকগুলি কাড়িয়া লয় ও কয়েকজনকে বন্দী করিয়া আশ্রমে লইয়া যায়।

কানাই আরও জানাইল কেউটিয়া নদীর ওপারে গঞ্জের পুলিশের চৌকি পোড়াইয়া দিয়াছে। গঞ্জের আড়ত লুট হইয়াছে। গুজব রটিয়াছে হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান লাঠি সড়কি লইয়া পঞ্চক্রোশীর দিকে আসিতেছে জমিদার বাড়ী লুট করিয়া পোড়াইয়া দিবে। সব গৃহস্থ লোক ভয়ে কাঁপিতেছে। শহরের দিকে কেহ কেহ পালাইতেছে।

কানাইয়ের বিবরণ অতিরঞ্জিত নয়। দীনদয়াল ঠাকুর তাঁহার শিষ্যদের হাতে বন্দী, শেখরও বন্দী। কালিন্দী ও পিরু দলবলকে উসকাইতেছে পুলিশের ও জমিদারের উপরে প্রতিশোধ লইবার জন্য। তাহাদের বিদ্রোহ ঘোষণার সংবাদ লইয়া দূতরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিতেছে। জমিদার ও পুলিশকে ধ্বংস করিয়া গান্ধীরাজ কায়েম করিতে হইবে সকলের মুখে এই কথা। কেউটিয়া নদীর পথ ধরিয়া দলে দলে নূতন লোক আশ্রমে আসিতেছে। তাহাদের হাতে লাঠি, কাঁধের ঝোলায় চাল ও চিড়া। দীনদয়াল ঠাকুর বন্দী কিন্তু আশ্রমে ধ্বনি উঠিতেছে দীনদয়াল ঠাকুর কি জয়! মহাত্মা গান্ধী কি জয়!

ঘন ঘন মন্ত্রণা সভা বসিতেছিল আশ্রমে। গঞ্জের পুলিশের চৌকি গিয়াছে, এবার থানা পোড়াইতে হইবে। এ মুলুকে যেখানে যত পুলিশের ঘাঁটি আছে সব পোড়াইতে হইবে, রায়বাহাদুরের কাচারী পোড়াইতে হইবে, সেরেস্তার কাগজপত্র ছারখার করিয়া দিতে হইবে, রায়বাহাদুরকে গলায় গামছা দিয়া ধরিয়া আনিতে হইবে, গরীব প্রজার জমি খাইবার লোভ ঘুচাইতে হইবে।

আশ্রমে সমবেত হাজার হাজার লোকের মধ্যে কালিন্দী আগুনের ফুলকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পিরু হাজী ঘন ঘন নমাজে বসিতেছে আর নমাজ অন্তে বক্তৃতা দিতেছে। তাহার বক্তৃতার পরে হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠিতেছে—

আল্লা হো আকবর! দীনদয়াল ঠাকুর কি জয়! মহাত্মা গান্ধী কি জয়!

মন্ত্রণা সভায় স্থির হয় কে কোন কাজের ভার পাইবে, কোন গ্রামের লোক কোন কাজে যাইবে। তারপর আশ্রমের পিছনে কেউটিয়া নদীর পাড়ে

গিয়া কেহ ডিঙিতে উঠিয়া, কেহ পায়ে হাঁটিয়া সংবাদবাহীরা নানা দিকে রওনা হইয়া যায়।

পুলিশ আর অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিতে সাহস পায় না। এত লোক চারদিক হইতে জড় হইতেছে, কয়টা বন্দুকই বা তাহাদের আছে। সদরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে, মহকুমায়, থানায় অবস্থার সংবাদ গিয়াছে। প্রতি মুহূর্তে তাহারা নূতন সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতেছে। শীঘ্র সাহায্য আসিয়া না পৌঁছিলে তাহাদের আত্মরক্ষা করা কঠিন হইবে এত লোকের আক্রমণের মুখে।

চারিদিকে থমথমে ভাব। একপক্ষ আয়োজনে, অপরপক্ষ আশঙ্কায় কাটাইতেছে। আশ্রম হইতে এক একবার ধ্বনি উঠে, পুলিশ ব্যূহ রচনা করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, ভাবে কখন ক্রুদ্ধ জনতা ঝড়ের মত ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহাদের উপরে।

আশ্রমে পিরু হাজী ও কালিন্দী যুগপৎ পুলিশের তাঁবু, জমিদারের কাচারী ও পোষ্ট অফিস আক্রমণ করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছে। সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য কয়েকটি দল প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। শেষ রাত্রের দিকে একদল গুর্খা সিপাহী লইয়া স্বয়ং জেলা হাকিম গ্রামে পৌঁছিলেন। চরের মুখে এই সংবাদ পাইয়া কালিন্দী ও পিরু হাজী অভিযানের পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন করিল। স্থির হইল পুলিশ আশ্রম আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে কয়েকটি দল আশ্রম হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্য স্থানগুলিতে হানা দিবে।

রাত্রে গুর্খা বাহিনী আশ্রম আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল না। সকালে উঠিয়া সন্ত্রস্ত গ্রামের লোক সবিস্ময়ে দেখিল বড় বড় পোষ্টার ঝুলিতেছে বাড়ীর দেয়ালে, গাছের গায়ে।

মহাত্মা গান্ধীর আদেশে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ

চৌরিচরার বীভৎস হত্যাকাণ্ডে মহাত্মার হৃদয় ব্যথিত

বার্দৌলিতে মহাত্মাজীর প্রয়োপবেশন

মহাত্মাজীর মহান আদেশ আপনারা শিরোধার্য করুন।

বন্দুক ঘাড়ে গুর্খা সিপাহী বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া হ্যাণ্ডবিল দিতেছে,

বেলা দশটায় স্কুল বাড়ীর মাঠে বিরাট সভা

স্বয়ং জেলা হাকিম মহাত্মা গান্ধীর আদেশের ব্যাখ্যা করিবেন, কেন

মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিলেন আপনাদের বুঝাইয়া বলিবেন।

দলে দলে সভায় আসুন

মহাত্মা গান্ধীর আদেশ পালন করুন।

ঢোল, কাঁসি ও হ্যাণ্ডবিল লইয়া, বাঁশের সঙ্গে পোষ্টার ঝুলাইয়া কয়েকটি দল গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিল, ঢোলসহরতে বার্দৌলি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিতে লাগিল। একটি দল জয়কালীর বাড়ীর মাঠে নামিয়া ঢোল ও কাঁসি বাজাইতে বাজাইতে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইল এবং উচ্চৈস্বরে মহাত্মা-গান্ধীর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিতে লাগিল। যাহার হাতে হ্যাণ্ডবিল ছিল সে আশ্রমের সম্মুখভাগের রক্ষীদলের একজনের হাতে একগোছা হ্যাণ্ডবিল ও কতকগুলি পোষ্টার দিয়া ফিরিয়া গেল।

হ্যাণ্ডবিল ও পোষ্টারের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইল না।

নেতাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া একদল লোক স্কুলবাড়ীর মাঠের সভায় উপস্থিত হইল জেলা হাকিমের মুখে মহাত্মা গান্ধীর আদেশের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য।

তাহারা যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহাদের মনে আশ্রম ত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল। উত্তরে তাহারা বলিল, গাঁধিরাজ তো হয়্যা গেল। জেলা হাকিম নিজে গাঁধি-রাজের পক্ষে। পুলিশ সিপাহী সব এখন গাঁধিরাজের পক্ষে। বড় তরফের রায়বাহাদুরও সভায় আইছিলেন। তিনিও গাঁধিরাজার দলে। লড়ায়ের আর কাম কি? যে যার ঘরে ফিরে এখন কাজকর্ম করাই তো ভাল।

হ্যাণ্ডবিল ও পোষ্টার দীনদয়াল ঠাকুর ও শেখরের হাতেও পৌছিল। পড়িয়া শেখর স্তব্ধ হইয়া রহিল অনেকক্ষণ। তারপর দীনদয়াল ঠাকুরকে বলিল, ঠাকুর মশাই, সব শেষ।

দীনদয়াল ঠাকুর বলিলেন, সব শেষ বলছেন কেন?

আশ্রমের একখানা টিনও বাঁচাতে পারবেন না, শেখর উত্তর দিল।

দীনদয়াল ঠাকুর বলিলেন, মহাত্মাজী আন্দোলন বন্ধ করলেন, তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কেউ যাবে না। আমি জেলা হাকিমের কাছে আত্মসমর্পণ করব। যদি সরকার মনে করেন মহাত্মাজীর আদেশ মেনে চললেও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন সে শাস্তি ভোগ করব। আমি এখনই লোক পাঠাচ্ছি। সনাতন, ও সনাতন—

শেখর হাসিয়া বলিল, লোক পাঠাতে হবে না ঠাকুর মশাই, ওরা সদলে এসে পড়বে শীঘ্রই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওদের মাথার ওপরে খড়্গ ঝুলছিল এতদিন। খড়্গখানা সরিয়ে নিলেন মহাত্মাজী। ওদের ভয় ঘুচেছে, এবার ওরা নির্ভয়ে এগিয়ে আসবে, মাটি রক্তে লাল হয়ে উঠবে দেখবেন।

দীনদয়াল ঠাকুর শেখরের কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিলেন না বোধহয়, উত্তর না দিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শেখর বলিল, আগুন নিয়ে খেলা করিতে নেমে এত ভয়? ইংরাজের শাসন ওলটাতে নেমে পিরু হাজী ও কালিন্দীকে মাথা তুলতে দেখে এত ভয়? কারো গায়ে আঁচড়টি লাগবে না আর ইংরাজ অমনি তোমার দাবি মেনে নেবে? ঠাকুর, বলতে পারেন এটা ভয়, না ভাঁওতা?

উত্তর না পাইয়া শেখর মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল সে একা, দীনদয়াল ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন।

ঘণ্টা ২২ পরে অন্যমনস্কভাবে পায়চারি কবিতে কবিতে বেতাইচণ্ডীর মন্দিরের পাশ দিয়া যাইতেছিল শেখর। লোকজন এখনও রহিয়াছে আশ্রমে কিন্তু তাহার মনে হইল আশ্রম বারো আনা ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। কোথায় সে উৎসাহ, কোথায় সে উত্তেজনা? যাহার দিকে শেখর চাহে তাহারই মুখে একটা মুষড়েপড়া ভাব। শেখরের চোখে পড়িল কে একজন দেবীর আসনের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। কয়েক পা আগাইয়া গিয়া দেখিল একজন স্ত্রীলোক, বোধহয় কালিন্দী। দেখিয়া শেখব ভাবিল তাহা হইলে কালিন্দীও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে? তাই কি সে দেবীব কাছে কাতর আবেদন জানাইতেছে? পিরু হাজী কোথায় গেল? সেও কি নমাজে বসিয়াছে কোন একটা গাছের নীচে?

দীনদয়াল ঠাকুর কোথায় গেলেন? ধরা দিতে গিয়াছেন নাকি? তিনি কি ভাবিয়াছেন তিনি ধরা দিলে তাঁহার শিষ্যরা রক্ষা পাইবে, তাঁহার আশ্রম রক্ষা পাইবে?

সে দেখিল কিছুদূরে সনাতন মাথা নত করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছে। শেখর তাহাকে ডাকিল, বলিল, ঠাকুর মশাই কোথা গেলেন সনাতন?

শেখরের মুখের দিকে চাহিয়া সনাতন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিস্মিত হইয়া শেখর বলিল, কি হয়েছে সনাতন?

কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সনাতন যাহা বলিল তাহা হইতে শেখর বুঝিল দীনদয়াল ঠাকুর একা জেলা হাকিমের তাঁবুতে গিয়াছেন আত্মসমর্পণ করিতে, সঙ্গে তিনি কাহাকেও যাইতে দেন নাই। সনাতন ঠাকুরের পা ধরিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিয়াছিল সঙ্গে যাইবার জন্য, ঠাকুর তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন।

সনাতন আরও কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময়ে আশ্রমে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। আশ্রমের সম্মুখের দিক হইতে বহুলোক আশ্রমের পিছনে কেউটিয়া নদীর বাঁধের পথে দৌড়াইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একটা দারুণ বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা দিল আশ্রমে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাপার বুঝা গেল। দীনদয়াল ঠাকুরকে সম্মুখে রাখিয়া সশস্ত্র গুর্খা ও কনষ্টেবল বাহিনী পরিচালনা করিয়া জেলা হাকিম আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। আশ্রম হইতে বাহির হইবার সবগুলি পথে গুর্খা সিপাহী দাঁড়াইয়া গেল। জেলা হাকিম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে তল্লাসীর ফলে বন্দুক তো দূরের কথা লাঠি সড়কির মত অস্ত্রও পাওয়া গেল না। স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া প্রায় দুইশত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া গুর্খা বাহিনী লইয়া জেলা হাকিম নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কনেষ্টবল বাহিনী রহিয়া গেল অবশিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবার জন্য।

সন্ধ্যার আগে জয়কালীর বাড়ীর মাঠে পুলিশের তাঁবু হইতে বন্দী দীনদয়াল ঠাকুর দেখিলেন আশ্রমের আম, কাঁঠাল, জাম গাছের মাথার উপর দিয়া আগুনের হলকা উঠিতেছে। দুই চোখ বুঁজিয়া তিনি বেতাইচণ্ডী দেবীকে মনে মনে ডাকিলেন, বলিলেন, মা, তোর মন্দিরও এরা রেহাই দিল না।

শেখর পাশে দাঁড়াইয়াছিল। দীনদয়াল ঠাকুরের নির্বাক প্রার্থনা শেষ হইলে সে বলিল, ঠাকুরমশাই, কালিন্দী ও পাকু হাজীকে ওরা খুঁজে পায়নি, তারা পালিয়েছে।

দীনদয়াল ঠাকুর বলিলেন, ওরা ধরা দিলে ভাল হত শেখরবাবু, অনেক পাপ করেছি আমরা, প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

উত্তর শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া শেখর সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে বন্দীদলের রওনা হইবার আদেশ আসিল। গুর্খা বাহিনীর পাহারায় কোমরে দড়ি পরিয়া রওনা হইল তাহারা।

বন্দীদের পথ বড় তরফের কাচারী বাড়ির সম্মুখ দিয়া গিয়াছে। তখন সন্ধ্যা

হয় হয়। চলিতে চলিতে বন্দীরা চাহিয়া দেখিল কাচারী বাড়ীতে আলোক সজ্জা হইতেছে, নহবৎ খানায় নহবৎ বাদ্য হইতেছে।

তারা শেখরের পড়িবার ঘরের এককোণে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছিল। কানাই লণ্ঠন জ্বালাইয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া তাহাকে দেখিয়া লণ্ঠনটি দরজার পাশে রাখিয়া চলিয়া গেল, ঘরে ঢুকিল না। কিছুক্ষণ পরে রাধারাণী ঘরে আসিলেন।

তারা তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

তাহার কাছে আসিয়া রাধারাণী মাথায় হাত বুলাইয়া বুকের কাছে তাহাকে টানিয়া লইলেন, বলিলেন, কাঁদছিস কেন তারু? জেলে যাওয়া তো কিছু অগৌরবের ব্যাপার নয়। আজ পনের বছর ধরে দেখছি জেল, নির্বাসন, দ্বীপান্তর, ফাঁসী, দেশের ভাল ছেলেদের এর কোন একটা বেছে নিতে হয়, রেহাই তাদের কারো নাই। হাজার হাজার ছেলে জেলে গিয়েছে, যাচ্ছে, যাবে। তোরা এ যুগের মেয়ে, তোরা কেন দুর্বল হবি, প্রিয়জন জেলে গেল বলে তোরা কেন কাঁদবি?

রুদ্ধস্বরে তারা বলিল, একবার দেখাও হল না মাসীমা!

রাধারাণী আর কোন কথা বলিলেন না, তারার মাথাটি নিজের বুকের উপরে টানিয়া লইলেন। ভাবিলেন কাঁদতে চায়, কিছুক্ষণ কেঁদে নিক।

তিন

রাজনগর (১৯২১-২২)

লক্ষ্মী সেই যে পুষ্পকে কয়েকদিনের জন্য তাহার কাছে আনিয়াছিল তারপর পুরাতন বৎসর শেষ হইয়া নূতন বৎসর পড়িয়াছে কিন্তু পুষ্প আর টোল পাড়ায় ফিরিতে পারে নাই। পর পর দুইটি ঘটনায় তাহার ফেরা সম্ভব হয় নাই।

দেবানন্দ তখনও জেলে। ইন্দ্র মুক্তিসেনা ও খিলাফতী ফৌজের কার্যকলাপে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের কথাবার্তা যেমন ক্রমশঃ উদ্ধত, কার্যাবলীও তেমনি উৎপীড়নমূলক হইয়া উঠিতেছিল। ইহার ফল এই হইয়াছে যে আন্দোলনের সমর্থক দলেব এক অংশ পিছাইয়া আসিয়াছে। জমিদাব ও অবস্থাপন্ন জোতদার শ্রেণীর লোক, চাকুরীয়া শ্রেণীর লোক ও ব্যবসায়ী এবং মহাজন শ্রেণীর লোক যাহারা প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর বাণী, সি. আর দাশের ত্যাগ, চরকা ও খদ্দব লইয়া মাতিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে। অন্যদিকে চাষী, মজুব, দারিদ্র্য ও সামাজিক ব্যবস্থায় উৎপীড়িত নিম্নশ্রেণীর লোক মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাবা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের কার্যক্রম অনুসরণ করে না, শুধু মহাত্মা গান্ধীর নামটি আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।

ইন্দ্রের সঙ্গে মুক্তিসেনা বা খিলাফতী ফৌজের কোন সংস্রব না থাকিলেও রাজনগরের লোক মনে করিত তাহার সমর্থন রহিয়াছে ইহাদের পিছনে। যাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল তাহাদের কেহ কেহ অভিযোগ জানাইবার জন্য তাহার কাছে আসিত।

ইহাদের উদ্বেগ কি বলিয়া দূর করিবে ইন্দ্র নিজেই জানিত না। মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত অস্পৃশ্যতা দূর, মাদক বর্জন, চরকা, খদ্দর, অহিংসা ব্রত প্রভৃতি লইয়া যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহার গভীর তলদেশ হইতে যেন স্পষ্ট শ্রেণী-বিদ্বেষের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইত এই বিদ্বেষের ভিত্তি সম্ভবত অর্থনৈতিক বৈষম্য। ভদ্রশ্রেণীর

যুবকেরা এ পর্যন্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছে, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা দিয়াছে সেই উৎসাহ ও উত্তেজনাকে তাহারা কাজে লাগাইতে ব্যগ্র। কিন্তু ইহাদিগকে তুষ্ট করিবার কোন প্রোগ্রাম এই ভদ্র-শ্রেণীর নেতাদের সম্মুখে নাই। চারিদিকে হট্টগোলের মধ্যে কোনদিকে তাহারা অগ্রসর হইতেছে বোধহয় তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। এদিকে তাহাদের বিপক্ষদল নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য গভর্ণমেন্টকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। অবস্থা দেখিয়া ইন্দ্র নিজে স্থির করিতে পারিতেছিল না যে কোন পথে তাহার যাওয়া উচিত।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের এই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে নিজের কর্তব্য স্থির করিবার ভাবনায় যখন ইন্দ্র বিব্রত তখন পারিবারিক জীবনে দুইটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় সে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মৃন্ময়ীর স্বামী হঠাৎ সন্ন্যাস রোগের অক্রমণে দেহ ত্যাগ করিলেন। এই আঘাত সামালাইতে না সামলাইতে তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী চিন্ময়ীর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ আসিল।

চিন্ময়ীর মৃত্যু সংবাদে ইন্দ্র ও লক্ষ্মী দুইজনেই ভাঙ্গিয়া পড়িল।

চিন্ময়ী ছিল লক্ষ্মীর বাল্যসখী, তাহার বিবাহের ঘটক। কত পুরাতন কথা তাহার মনে পাড়তে লাগিল। চিন্ময়ীর ভালবাসার তাহার মধুর, শান্ত স্বভাবের, তাহার দেবী প্রতিমার মত রূপের, তাহার বিবাহিত জীবনে অনাদর ও উপেক্ষার কথা বারবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। স্বামী যে কতখানি আঘাত পাইয়াছেন আদরের ছোট বোনটির অকাল মৃত্যুতে নিজের মন দিয়া লক্ষ্মী তাহা বুঝিতে পারিল।

লক্ষ্মী আসন্নপ্রসবা। তাহার দিকে চাহিয়া আপনার শোককাতর হৃদয় লইয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে হইল ইন্দ্রকে। পুষ্প চিন্ময়ীকে দুই একবার দেখিয়াছে মাত্র, তাহার কথা কিছু জানে না। তবু নিজের এইটুকু ব'সে গভীর ব্যথা পাইয়াছে সে। একান্ত সমবেদনাতুর মন লইরা সে লক্ষ্মীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার সেবা শুশ্রূষার দক্ষতা দেখিয়া ইন্দ্র মুগ্ধ হইল, এই অল্পবাক্, সেবাপরায়ণা মেয়েটিব প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করিল। পুষ্পের পলায়নের পর হইতে ত্রিনয়নীর মনে যে বিরূপ ভাব জমিয়াছিল এতদিনেও তাহা দূর হয় নাই। নিজের চোখে তাহার সেবাপরায়ণতা দেখিয়া, ইন্দ্রের মুখে তাহার অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনিয়া ধীরে ধীরে তাহা দূর হইতে লাগিল।

মাসখানেক পরে লক্ষ্মীর দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ইহার কয়েকদিন পরে দেবানন্দ জেল হইতে মুক্তি পাইয়া রাজনগরে ফিরিয়া আসিল।

জেলের বাহিরে আসিয়া আমেদাবাদ কংগ্রেসে গান্ধীজীর ডিক্টেটর নির্বাচিত হইবার সংবাদ শুনিল। ১৭ই নভেম্বর তারিখে হরতালের কথা, বিভিন্ন প্রদেশে অসহযোগী নেতাদের গ্রেপ্তারের কথা সে জেলে থাকিতে শুনিয়াছিল।

আমেদাবাদ কংগ্রেসের খবর মন দিয়া পড়িয়া সে ভাবিল কংগ্রেস তাহা হইলে সত্যই গভর্ণমেণ্টের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিল? অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলনে পরিবর্তন করিতে মহাত্মাজীর আর দ্বিধা নাই তাহা হইলে? কিন্তু লড়াই হইবে, না শুধু মক ব্যাটেল হইবে? আর্মড রেভোল্যুশন যাঁহারা সম্ভব নয় মনে করেন আনআর্মড রেভোল্যুশনের জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছেন তাহা হইলে?

দেবানন্দ দেখিল রাজনগরে সে যে অবস্থা দেখিয়া গিয়াছিল তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বিপ্লবেব আভাস যেন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে। দারোগা, পুলিশ হাকিম, থানা, আদালত—ইংরেজ শাসনের কাঠামো বজায় আছে কিন্তু এই কাঠামোকে অতিক্রম করিয়া আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে মুক্তিসেনা ও খেলাফতী ফৌজ।

কয়েকমাস জেলের সুখাদ্য খাইয়া দেবানন্দের আমাশয় ধরিয়াছিল। শরীব একটু ভাল হইতে সে ভাবিতে লাগিল দেশের এই অবস্থায় তাহাঁর কর্তব্য কি।

দেবানন্দ ফিরিয়া আসিলে ইন্দ্রের মনে হইল সে যেন অকুলে কুল পাইল। শোকের আঘাতের ক্ষত ভাল করিয়া শুকাইতে না শুকাইতে দেশের অবস্থা আবার তাহার মনকে বাহিরের দিকে আকর্ষণ কবিতেছিল।

আমেদাবাদ কংগ্রেসের পরে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া মহাত্মা গান্ধী তখন ত্বরিৎগতিতে স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন ও বক্তৃতা দিতেছেন।

ইন্দ্র দেবানন্দকে বলিল মহাত্মাগান্ধী কংগ্রেসের একনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবত আসন্ন সংকটের জন্য দেশবাসীকে তৈয়ারী করা তাঁহার উদ্দেশ্য। মনে হয় অতি শীঘ্র অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটিবে। দেবানন্দ যদি নায়কত্ব গ্রহণ করে তাহা হইলে বিনা দ্বিধায় সে আন্দোলনে যোগ দিবে। উমানন্দ ও যোগেন্দ্র উত্তেজিত জনতাকে লইয়া খেলিতেছে, তাহাদের নায়কত্বে সে আন্দোলনে যোগ দিতে ভরসা পায় না।

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিয়া দেবানন্দ অনেকক্ষণ কি ভাবিল। তারপর বলিল, আন্দোলনের একটা রূপ আমি চাঁদপুরে দেখে এসেছি, ইন্দ্র। সে কথা পরে হবে। অসহযোগ আন্দোলন বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের চাইতে bigger, stronger ও more fundamental movement. চরকা খদ্দরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা , স্বরাজের আদর্শের দার্শনিক ব্যাখ্যা, অহিংসা ধর্মের শাস্ত্রীয় তত্ত্ব উদ্ঘাটন, মহাত্মা গান্ধীর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস—এই সব জিনিস ও ভাষ্যকারদের হেঁয়ালি সৃষ্টির চেষ্টার কথা ছেড়ে দিয়ে চারদিকে ভাল করে চাইলে দেখা যাবে, যে কারণেই হোক নিম্নশ্রেণীর বা মাসের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন এনেছে এই আন্দোলন। এই আলোড়নের স্বরূপ যখন নেতারা ভাল করে বুঝতে পারবেন তখন আসবে আন্দোলনের পরীক্ষার সময়। আমরা একটা বিপ্লবের দিকে এগুচ্ছি সন্দেহ নেই, কিন্তু ইচ্ছে করে বা প্ল্যান করে নয়। এইখানেই আমার ভয়। নেতাদের প্রকৃত মতিগতির কথা আমি জানিনে, কতদূর এগুতে তাঁরা প্রস্তুত তাও জানিনে। সত্যই তাঁরা বিপ্লব চান না উত্তেজিত জনতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রাষ্ট্রীয় অধিকারের খুদকুঁড়ো পাবার জন্য গভর্ণমেণ্টের ওপর চাপ দিতে চান, শীঘ্রই বোধহয় সেটা প্রকাশ হবে।

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, নন-ভায়োলেন্স ও সোল-ফোর্স নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, ইন্দ্র। আর্মড রাইজিংয়ের চেষ্টা সফল হয়নি; কিন্তু এই আইডিয়াটাকেই এখন অস্পৃশ্য করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। The leaders will have to choose between armed violence and mob violence. অথবা পিছনে হটতে হবে।

ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে বলিল, আমার কথাটা বোধহয় তোর ভাল লাগল না ?

ইন্দ্র বলিল, তুমি হাসছ কেন জানিনে। তোমার মত বোঝবার শক্তি আমার নেই তবু সত্যি কথাই বলব, আমার মনেও সংশয় আছে। কিন্তু ভেবে দেখ দেবুদা, যে উপায়েই হোক দেশময় এমন একটা আলোড়ন আনা তো সোজা শক্তির কাজ নয়। আলোড়ন যখন এসেছে তার পুরোপুরি সুযোগ কেন নেওয়া হবে না ? তুমি দেশকর্মী, কেন তুমি সে সুযোগ হারাবে ? তুমি আন্দোলনে যোগ দিলে আমি তোমার পেছনে যাব একথা আবার তোমাকে জানাচ্ছি।

দেবানন্দ বলিল, দেখ ভাই, নানা রকম ঘা খেয়ে খেয়ে আমার প্রকৃতি বড়

এনালিটিকেল হয়ে গিয়েছে। সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টার গোড়ায় দেখেছিলাম নেতারা প্রত্যেক পরাধীন জাতির যা অবশ্য কর্তব্য সেই বিদ্রোহের কথা বলতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার ফানুস ওড়াতে সুরু করলেন। কথায় কথায় চণ্ডী চামুণ্ডার স্তব, কথায় কথায় মা, মা ডাক, প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণা, যোগ-সাধনার উপদেশ। দেশপ্রেমিক ভাষ্যকাররা বললেন এদেশ আধ্যাত্মিকতার দেশ, ধর্মের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বাংলার বিপ্লববাদ বিপ্লবাদের ইতিহাসে একেবারে নূতন জিনিস। আজ আবার গান্ধীজীর আন্দোলন সম্পর্কে দেখছি আধ্যাত্মিক হেঁয়ালি, অধ্যাত্মসাধনের সূক্ষ্ম উপদেশ, সাধারণ মানুষের অবোধ্য কথার হাউইবাজি। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে জাগরণের যে সকল লক্ষণ দেখছি জনতার মধ্যে—ভীলদের মধ্যে, যুক্ত প্রদেশের চাষীদের মধ্যে ঐক্য আন্দেলন, আসামের চা বাগানে কুলিদের ধর্মঘট, রেলকর্মীদের ধর্মঘট, খনি অঞ্চলে মজুরদের মধ্যে আন্দোলন, এই সব আন্দোলনের কথা ভেবে দেখ জনতা কি চায়। রাজনৈতিক মুক্তি তাদের মন থেকে অনেক দূরে রয়েছে ভাই, তারা চায় খাওয়া পরার, বাঁচবার অধিকার। এদের দাবি কোথায় গিয়ে আঘাত করবে ভেবে দেখেছিস কি? মহাত্মা গান্ধী যে চট্টগ্রামের হরতালের, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ধর্মঘটি কর্মীদের নিন্দে করেছিলেন সে কথা আমি ভুলিনি।

ইন্দ্র কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। দেবানন্দ তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, আমাকে আন্দোলনে যোগ দিতে বলছিস ইন্দ্র, কিন্তু আমার বাধা কোথায় বুঝেছিস কি? অবশ্য অহিংস অসহযোগ ও অহিংস আইন অমান্যের মধ্যে তফাৎ আছে। আইন অমান্যের, মানে আইন অমান্যের যা আসল কথা সেই টেক্স বন্ধের আঘাত সত্যি কোথায় পড়বে ভেবে দেখেছিস? শুধু কি গভর্ণমেণ্ট এই আঘাতের লক্ষ্য হবে? গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের একাংশের ওপর যখন আঘাত পড়বে—

ইন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া একদল শোভাযাত্রা যাইতেছিল। ইন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া শোভা যাত্রা ঘন ঘন ধ্বনি তুলিল,

মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়! ভারত মাতাকি জয়! হিন্দু-মুসলমান একতা কি জয়!

ধ্বনি শুনিয়া মিনু দৌড়াইয়া বাহিরে আসিল, পশ্চাতে তাহার ভ্রাতা। কাচারী বাড়ী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া মিনু বলিল, মহাত্মা গান্ধী কি জয়!

শোভাযাত্রা তখন চলিয়া যাইতেছে। মিনু ডাকিয়া বলিল, ও মহাত্মা গান্ধী, আমাকে নিয়ে যাও। আমি যাবো।

ভ্রাতা তখন দিদির কাছে যাইবার জন্ম দৌড়াইতেছে। দৌড়াইতে গিয়া হোঁচট লাগিয়া সে পড়িয়া গেল ও কাঁদিতে লাগিল।

মিনু ভ্রাতার কান্না শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া উঠাইল। সান্ত্বনার বদলে শাসনের কণ্ঠে বলিল, দিলি না তো যেতে ? দৌড়োতে পারিস না দৌড়োলি কেন ?

মিনু ভ্রাতার হাত ধরিয়া ফিরিয়া আসিল। পিতাকে বলিল, ভাইটি পড়ে গেল বাবা। ও মহাত্মা গান্ধী বলতে পারে না। বলে মোত্তা গাঁই। ছেলে মানুষ কিনা।

ভ্রাতার ছেলেমানুষির পরিচয় দিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর ভ্রাতার হাত ধরিয়া অন্দরে চলিয়া গেল।

শরৎ পণ্ডিত মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিলেন।

দেবানন্দ বলিল, কোন নূতন খবর আছে পণ্ডিত মশাই ?

হাতের নস্যটুকু নাসিকায় প্রবিষ্ট করিয়া শরৎ পণ্ডিত আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অভ্যাস মত ছড়া কাটিয়া বলিলেন,

নূতন খবর গরম গরম
আসছে কত রকম রকম।

রাজনগরের হাটখোলায় জ্বালাময়ী বক্তৃতার শিখা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে আর ওদিকে বিনপুরের গঞ্জ লুণ্ঠিত হয়েছে।

ইন্দ্র—বিনপুরের গঞ্জ লুট হয়েছে ? কোথায় খবর পেলেন আ ' নে ?

শরৎ পণ্ডিত—ভগ্নদূত এসেছে। ভগ্নদূত আরও খবর দিল বিনপুরের সংবাদ শুনে সোনাউল্লা বাদশার রসনা নাকি লোলুপ হয়ে উঠেছে।

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, পণ্ডিত মহাশয় স্বকোপলকল্পিত সংবাদ।

শরৎ পণ্ডিত, বটে বটে ? স্বকোপলকল্পিত সংবাদ ?

সত্য নাহি রহে চাপা
খনার বচন শুন বাপা।

গতকল্য প্রকাশ্য দিবালোকে বিনপুর গঞ্জের হাট লুট হয়েছে, তাজপুর, কাজিপুর, কাটাখালির খেলাফতী ফৌজদল নাকি গরম হয়ে উঠেছে। উলিপুরেও ঘন ঘন সভা হচ্ছে। আমরা খবর পাবার আগে পুলিশের কাছে এ খবর

পৌঁছেছে, উমানন্দ, যোগেন্দ্র, সোনাউল্লা জানে না তাদের দলের মধ্যে কত গুপ্তচর গান্ধী টুপী পরে ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করছে। শুনছি আরও পুলিশ আসছে সদর থেকে।

ইন্দ্র বলিল, এখানকার সভার কথা কি শুনলেন ?

শরৎপণ্ডিত—নেতারা আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করবেন। শয়তান গভর্নমেণ্টের ধ্বজাধারী জমিদারদের বেগার, আবওয়াব ও সেলামী আদায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বক্তৃতা হচ্ছে। সভা সমিতি বন্ধ করে নোটিশ হয়েছে শুনি। কিন্তু বন্ধ করবে কে ? পোষ্টাফিসের সম্মুখে পুলিশের তাঁবুতে মবলগে দশজন কনষ্টেবল থাকে। চারদিককার গাঁগুলো থেকে হাজার দু' হাজার লোক এসেছে বক্তৃতা শুনতে। এত লোক দেখে কনষ্টেবলরা তাঁবুতে বসে গাঁজা টানছে, তাঁবু থেকে বেরোতে ভরসা করে না।

একটু থামিয়া গলার স্বর নামাইয়া আবার বলিলেন, রহস্যের কথা যাক ইন্দ্র, আবহাওয়া যেন কেমন কেমন লাগছে। এত লোক জড় হচ্ছে, খেপে উঠে কিছু করে বসলে ঠেকাবে কে ? ইংরাজ রাজত্বে যে এমন হতে পারে কে ভাবতে পেরেছিল ? তোমরা তো হাটবাজারে বেরোও না। বেরোলে বুঝতে পারতে মুক্তিসেনা ও খেলাফতী ফৌজের প্রতাপ কত। গভর্ণমেণ্ট না কি ভলাণ্টিয়ার দল বে-আইনী করেছে। গভর্ণমেণ্টের আদেশ মানছে কে ?

দেবানন্দ—পণ্ডিতমশাই, ভয় পেয়েছেন ?

একেবারে অস্বীকার করিনে। দেশের লোক বেগড়ালে গভর্ণমেণ্টের শাসন যে কত আলগা হয়ে যায় চোখের ওপর দেখছি। শুনছি, কাগজেও পড়ছি, অনেক জায়গাতে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

আরও কিছুক্ষণ স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইল।

ইন্দ্র বলিল, পণ্ডিত মশাই, আমরা যদি আন্দোলনে যোগ দিই তাহলে—

শরৎ পণ্ডিত—উমানন্দ, সোনাউল্লার সুরে সুর মেলাতে পারবে ? এ মুলুকের কর্তা তো তারা। তোমাদের সন্দেহ করে ওরা। যোগ দিলেও বন্যার গতি কি ঠেকাতে পারবে ? মনে তো হয় না।

শরৎ পণ্ডিত বিদায় লইলেন কিছুক্ষণ পরে।

কিছুক্ষণ পারিবারিক কথাবার্তা চলিল ইন্দ্র ও দেবানন্দের মধ্যে। বাড়ীতে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। দেবানন্দ বলিতেছিল উমানন্দ আজকাল মস্ত বড় নেতা হইয়াছে। বাহিরে সে যে সম্মান পাইতেছে তাহার ফলে

সে অত্যন্ত স্ফীতমস্তক হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতেও তাহার হালচাল নেতার মতই। মুখে সর্বদা বড় কথার খৈ ফুটিতেছে। এক্স-রিভোল্যুশনারী বলিয়া উমানন্দ তাহাকে রীতিমত কৃপার চোখে দেখে। মাকে অসম্মানজনক কথা বলিতে তাহার মুখে আটকায় না। সরস্বতী শোকাতাপা বোন, তাহাকে কটু কথা বলিতে উমানন্দের বাধে না। মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগের বাণী যে এমন অকালকুষ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারে নিজের চোখে না দেখিলে সে বিশ্বাস করিত না।

সে আবার বলিল, মার আত্মসম্মানবোধ প্রবল, চিরকাল তিনি অল্প কথা বলেন। মাঝে মাঝে তিনি যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেন বুঝতে পারি। ছ'একবার মনে হয়েছে ছোকরার ঘাড় ধরে মার কাছে ক্ষমা চাওয়াই, কিন্তু মা নিজে সেটা কিভাবে নেবেন বুঝতে না পেরে চুপ করে যাই।

ইন্দ্র বলিল, দেবুদা, চল আমরা দু'জন কিছু দিনের জন্য কোথাও যাই। লোকজন বিশেষ যায় না এমন কোন তীর্থস্থানে গিয়ে কিছুদিন থাকা যেতে পারে। যাবে? চিনি মারা যাবার পর থেকে আমার মনটা ভেতরে ভেতরে কেমন যেন বিকল হয়ে রয়েছে। কোন কাজে মন দিতে পারছিনে। ভাবনা, চিন্তা, সতর্কতা, অসতর্কতা দূরে রেখে মহাত্মাজীর আন্দোলনে যদি যোগ দিতে পারতাম সে এক রকম মন্দ হত না।

দেবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিল, তা দে না কেন?

ইন্দ্র বলিল, আমি তো বলেছি তোমাকে, তুমি যোগ দিলে আমি তোমায় অনুসরণ করব।

দেবানন্দ হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

ইন্দ্র বলিল, আমার কোথাও বেড়িয়ে আসবার প্রস্তাবটাও কি হেসে উড়িয়ে দিতে চাও?

দেবানন্দ—তুই ছেলে মানুষের মত প্রস্তাব করলি তাই হাসছি। তুই এখন যাবি কোথায়? বাড়ীতে দ্বিতীয় অভিবাবক কেউ নেই। ছোট বাচ্চাটার বয়স দু'মাসও বোধহয় হয়নি। এই অবস্থায় লক্ষ্মীকে একা ফেলে রেখে যেতে চাস?

ইন্দ্র নিরুত্তর রহিল। বাহিরে যাইবার প্রস্তাব তাহার মনের ইচ্ছার প্রকাশমাত্র, প্রকৃত অভিপ্রায়ের ভিত্তি নাই তাহাতে।

দেবানন্দ বলিল, ভাল কথা মনে পড়ল। কাল রাজনগরের নেতা চতুষ্টয়ের অন্যতম হিমাংশুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল মানে সে বক্তা আমি

শ্রোতা। আমাদের ধাড়ি অসহযোগী তো ভাল বাচ্চা অসহযোগীরাও অপরের কথা বলা ধৃষ্টতা মনে করে। এসব কথা যাক। হিমাংশু বলছিল পুষ্প নাকি তাকে জানিয়েছে সে আন্দোলনে যোগ দিতে চায়। তারপর বলল, আমরা তাকে দু'টো খেতে দিই এই দাবিতে তাকে তার বিবেকের অনুসরণ করতে বাধা দিচ্ছি। আমি বললাম, পুষ্প এই কথা বলেছে? হিমাংশু উত্তর দিল, দিদি কি কোন কথা বলে? কথা বললে কি আপনারা এমন স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন?

শুনিয়া ইন্দ্র হাসিল।

দেবানন্দ বলিল, হাসছিস যে বড? এদের কথা বলার ভঙ্গী এইরকম। তুচ্ছতম কথাতেও জলদগর্জন।

দেবানন্দের কথা শুনিয়া ইন্দ্র উচ্চহাস্য কবিল। তারপরে হাসি থামাইয়া বলিল, পুষ্প আন্দোলনে যোগ দিতে চায় কিন্তু আমাদের জন্য পারছে না এ কথা সত্য হলে আমাদের অন্যায় হয়েছে। আমি পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করব। আন্দোলন যে পর্যায়ে এসেছে ও কিভাবে কাজ করবে বুঝতে পারছিনে।

দেবানন্দ—সে নিজেই তা বুঝবে। তবে হিমাংশুর কথা আমি বিশ্বাস করিনে। অন্য দলের লোকের বিরুদ্ধে অমূলক অভিযোগ করা অহিংসাব্রতীদের একটা প্রচারকৌশল হয়েছে দেখছি।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পব দেবানন্দ উঠিল। বলিল, তুই হট করে পুষ্পকে কিছু বলিসনে। ও নিজে থেকে কিছু বলে কিনা অপেক্ষা করে দেখ। লক্ষ্মীর কাছে ও ভালই আছে। আমাদের বাড়ীতে ও শান্তি পায় না।

ইন্দ্র বলিল, আচ্ছা।

পরের দিন শরৎ পণ্ডিত খবব আনিলেন বিনপুরে গুলি চলিয়াছে।

গঞ্জ লুটের সম্পর্কে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। সন্ধ্যার দিকে প্রায় পাঁচশত লোকের একটি জনতা বিনপুরের পুলিশের চৌকি আক্রমণ করিয়া কয়েদীদের ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে ও চৌকিতে আগুন লাগাইয়া দেয়। আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ গুলি চালাইলে কয়েকজন আক্রমণকারী জখম হয় ও জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে।

ঘটনার বিবরণ দিয়া শরৎ পণ্ডিত বলিলেন গুরুদাসপুরের হাট নাকি লুট করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

গুজব হাটে ইজারাদারের লোকের তোলা উঠান লইয়া কয়েকজন দোকানীর সঙ্গে গোলমাল সুরু হয়। ইজারাদারের লোকেরা পুলিশ ডাকিয়া আনাতে হাটের লোক উত্তেজিত হইয়া উঠে ও দোকানীরা একযোগে তোলা উঠাইতে অস্বীকার করে। এই গোলমালে কয়েকজন বদমাইস লোক লুটতরাজ আরম্ভ করে। পুলিশ তাহাদিগকে কোন বাধা না দিয়া চলিয়া যায়। ভলান্টিয়ার ও হাটের লোকজনের চেষ্টায় লুট বন্ধ হয়। পুলিশকে ইজারাদারের লোকেদের লুটের উৎসাহদাতা মনে করিয়া ও অঞ্চলের লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে ও স্থির কারয়াছে ইহার পর হাটে তোলা উঠাইতে দেওয়া হইবে না।

সংবাদ শুনিয়া ইন্দ্র ভাবিল আইন অমান্য আন্দোলন ও অরাজকতা হাত ধরাধরি করিযা আসিবে না কি? উহার শেষ পরিণতি কি হইবে?

চার

ত্রিনয়নীর দিন বড় অশান্তিতে কাটিতেছিল।

বড় ছেলে এই সেদিন কয়েক মাস জেল খাটিয়া ফিরিয়া আসিল রোগজীর্ণ দেহ লইয়া। ইহার মধ্যেই সে আবার উসখুস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেমন যেন বিমনা হইয়া থাকে।

ছোট ছেলে উমানন্দ, বয়সে সে সরস্বতীরও ছোট, নাক টিপিলে যাহার দুধ বাহির হয়, জ্যেঠামিতে সে হইয়াছে অদ্বিতীয়। বুড়ো মাকে দিনরাত উপদেশ দিতেছে, অত বড় দাদাকে উপদেশ দিতেছে, শোকাতাপা বিধবা ভগ্নীকে উপদেশ দিতেছে, উপদেশের দানসত্র খুলিয়া বসিয়াছে ছেলে। মহাত্মা গান্ধীর চেলা? মহাত্মা গান্ধী কি তাঁহার মা, বড় ভাইয়ের গালে উপদেশের চাঁটি ঠাস ঠাস করিয়া মারিতেন? না তাঁহার বাপ স্ত্রীকে বিষয় সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছেন বলিয়া দিনরাত মাকে গঞ্জনা দিতেন? স্বভাব তো এই, এদিকে ছেলে সারাদিন বড বড় তত্ত্বকথার ঢেকুর তুলিতেছে!

ছোট মেয়ে সরস্বতী এই বয়সে সংসারের সব সাধ আহ্লাদ ঘুচাইয়া বসিয়াছে। কি যে কপাল করিয়া আসিয়াছিল মেয়েটা। চোখের উপর শ্বশুরের সংসার ছন্নছাড়া হইয়া গেল। প্রদীপের সলিতার মত একরত্তি ছেলেটাকে লইয়া মায়ের কাছে আসিয়াছে একটু জুড়াইতে। ঐটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া সারাজীবন কাটাইতে হইবে, আর দ্বিতীয় সম্বল নাই। কে রক্ষা করে বিষয় সম্পত্তি, কে আগলায় বাড়ী ঘর? মায়ের কাছে আসিয়াও কি বাছার শান্তি আছে? আর শান্তি থাকিবেই বা কি করিয়া? স্বর্গীয় শ্বশুরের আমলের কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর আর তাঁহার স্বামীর কেনা গোটা দুই ছোট তালুক, এতগুলি প্রাণীর ইহার উপর নির্ভর। দুই ছেলে বসিয়া খাইতেছে, আয়ের চেষ্টাও নাই, ইচ্ছাও নাই। এতদিন বেশ চলিতেছিল, যুদ্ধের সময় হইতে বাজার চড়িয়াছে। বর্গাদার, প্রজারা আর আগের মত সৎ নাই। ন্যায্য প্রাপ্য বুঝাইয়া দিতে চাহে না। কি করিয়া যে ইহার পর চলিবে ভাবিয়া কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

বোঝার উপর শাকের আঁটির মত হইয়াছে দুইটি পোষ্য, পুষ্প ও তাহার ভাই হিমাংশু। হিমাংশুর মাথাটি খাইতেছে তাঁহার ছোট ছেলে। উহার মুখেও আজকাল বড় বড় কথার খৈ ফুটে। এটা যেন বড় বড় কথার যুগ পড়িয়াছে। নিরাশ্রয় ছেলে, কোথায় লেখাপড়া শিখিয়া রোজগার করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে, তাহা নয়, অসহযোগ করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া বাউণ্ডুলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আগে ছেলেটি এমন ছিল না, অসহযোগের হিড়িকে পড়িয়া ও বিগড়াইয়াছে। তারপর পুষ্প। কতদিন আর জামাইবাড়ীতে নিজের কাঁধের বোঝা রাখিবেন? আর নিজের কাছে রাখিয়াই কি শান্তি আছে? উমানন্দ পুষ্পকে দেখিতে পারে না। কি যে করিবেন পুষ্পকে লইয়া তিনি ভাবিয়া পান না।

ত্রিনয়না নিজের মনে ভাবেন, তাঁহার ভাবনা চিন্তা কাহারও কাছে প্রকাশ করেন না। কদাচ দুই একটা কথা হয় লক্ষ্মীর সঙ্গে। কিন্তু গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার মনের ভাব দেবানন্দের কাছে গোপন থাকে না।

কথায় কথায় ইন্দ্রের কাছে নিজের অস্বাচ্ছন্দ্যবোধের একটু আভাস দিবার পরে শীঘ্রই দেবানন্দ নিজের মন স্থির করিয়া ফেলিল।

একদিন সন্ধ্যার পরে কথাবার্তার মধ্যে সে ইন্দ্রকে জানাইল তিন চার দিনের মধ্যে সে রাজনগর ত্যাগ করিবে।

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ইন্দ্র বলিল, হঠাৎ এ সঙ্কল্প কেন দেবুদা?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, হঠাৎ নয়। কিছু রোজগার করার চেষ্টা করতে হবে। উমানন্দ এখন নেতৃত্ব করছে। এই আন্দোলনের জোয়ার নেমে গেলেও ও আর পড়াশোনা করবে বলে মনে হয় না। আমাদের মত ঘরের ছেলে লেখাপড়া না শিখলে অর্থোপার্জনের পথ কোথায়? সবাই মিলে বাড়ী বসে খেলে চলবে কেন? নিজের গ্রাসাচ্ছাদন ও মাকে সাহায্য করার জন্য কিছু উপার্জন করা আবশ্যক। আমরা ছাড়া তাঁর আরও পোষ্য আছে।

ইন্দ্র দেবানন্দের কথায় কোন উত্তর না দিয়া কি ভাবিতে লাগিল। বোধহয় তাহার মনে হইল এগারো বৎসর আন্দামানে ও নির্বাসনে কাটাইয়া আসিয়াছ তুমি, তোমার এত বুদ্ধি, সাহস, ত্যাগ, শক্তি, সামান্য কয়টা টাকা রোজগার করিবার জন্য তুমি গৃহত্যাগ করিবে? সে বলিল,

রাজনগর ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ক'টা টাকাই বা পাবে দেবুদা? তার চাইতে এখানে বসে ছোট খাটো কোন ব্যবসা আরম্ভ কর।

দেবানন্দ হাসিয়া কি বলিতে যাইতেছিল ইন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, দাঁড়াও কথাটা শেষ করতে দাও। চাষবাস করতে পার, ব্যবসাও করতে পার। ভাল করে করতে পারলে, মানে গোড়াতে কিছু খরচপত্র করে আরম্ভ করতে পারলে দু'টোতেই লাভ পাওয়া যাবে। আমার সঙ্গে বখরায় কর, আমি মূলধন যোগাব, তুমি খাটবে। তাতে যদি আপত্তি থাকে মূলধন ধার নেও আমার কাছে।

দেবানন্দ মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, বখরা কি রকম হবে? আর ধার নিলে কত সুদ নিবি?

ইন্দ্র নিজেও হাসিল তাহার কথা শুনিয়া। বলিল, আমি সিরীয়াস দেবুদা। সেবকাশ্রমের জন্য আমি এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ করেছি, কত পরিশ্রম করেছি তুমি জানো না দেবুদা। জিনিষটাকে কোনমতেই স্বাবলম্বী করে দাঁড় করাতে পারলাম না। তবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি অনেক। তুমি যদি অর্থকরী কোন একটা কাজ করতে চাও আমি মূল্যবান পরামর্শ দিতে পারি। যে টাকা উপার্জন করার জন্য তুমি বাইরে যেতে চাও বাড়ী বসে তার চাইতে বেশী টাকা তুমি রোজগার করতে পারবে।

দেবানন্দ কোন উত্তর দিল না।

ইন্দ্র বলিল, যদি এখানকার স্কুলে চাকুরি করতে চাও সে চেষ্টা আমি করতে পারি। অবশ্য স্কুল এখন শূন্য। কিন্তু স্কুল থেকে ক'টা টাকা আর পাবে?

দেবানন্দ এবার কথা বলিল। বলিল, তোর কথা আমি ভেবে দেখব। মুস্কিল হয়েছে এই যে আমি এখনও ভাল করে মন স্থির করতে পারিনি। এত বড় একটা আন্দোলন চলছে চোখের সামনে, আমি ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে রয়েছি, এতে মনটা ভাল নেই। তারপর বাড়ীতে বড় অশান্তি লাগছে। তাই ভাবছি অন্য কোথাও গিয়ে কিছুদিন থাকব ও কোন কার্যক্ষেত্রের সন্ধান করব।

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, সরস্বতী কয়েকদিন ধরে পিছনে লেগেছে। আমাকে তারাপুরে নিয়ে যাবার জন্য। ও আর এখানে থাকতে চাইছে না। মুখে বলছে বিষয় সম্পত্তি নিজে না দেখলে মিঠুর কিছু থাকবে না,

তাকে যেতেই হবে। ওর ইচ্ছে আমি ওর কাছে কিছুদিন থেকে ওকে সব বুঝিয়ে শিখিয়ে দিই। আমি ওখানে কাজ চলবার মত একটা বন্দোবস্ত করে এসেছি। তহশীলদার টাকা কড়ি পাঠাচ্ছেও। সরস্বতী ওখানে থাকতে পারলে সব চাইতে ভাল হয়। কিন্তু ও এখন ছেলেমানুষ, পারবে কি একা থাকতে ?

ইন্দ্র বলিল, তুমি কি তারাপুর গিয়ে থাকতে চাও কিছু দিন ?

দেবানন্দ—চাইনে. তবে থাকতে হবে বোধ হয়। এতখানি বয়স হল আত্মীয় স্বজন কারো কোন কাজে আসলাম না। তাই ভাবছি যদি অভাগিনী বোনটার কিছু সুবিধে হয় আমাকে দিয়ে।

ইন্দ্র বলিল—কবে যাবে ?

দেবানন্দ—সরস্বতী যাবার কথা মাকে বলেনি। আমি যেতে রাজি হলেই বলবে বলেছে।

ইন্দ্র—তারাপুর থেকে হঠাৎ কোথাও পালাবে না তো দেবুদা ?

দেবানন্দ হাসিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, একখানি খবরের কাগজ হাতে লইয়া যোগেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল।

যোগেন্দ্র রাজনগরের ডেপুটি লীডর, অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ। ইন্দ্র ও দেবানন্দ আন্দোলনে যোগ না দেওয়াতে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, ইন্দ্রের কাছে বিশেষ আর আসিত না। তাহাকে দেখিয়া ইন্দ্র বলিল, কি যোগেন্দ্র, খবর কি ? তোমাকে যেন কিছু উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

যোগেন্দ্র সেদিনকার খবরের কাগজখানি তাহার হাতে দিল।

ইন্দ্র এক মিনিট চোখ বুলাইয়া জোরে পড়িল—War declared. Gandhiji's Ultimatum to the Viceroy.

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, সুখবর যোগেন্দ্র।

যোগেন্দ্র- সুখবর নিশ্চয়। এত দিন আপনারা দু'জন এড়িয়ে গিয়েছেন, এবার কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন না ? এই সঙ্কটের মুহূর্তেও কি আপনারা বাইরে থাকতে চান ? আপনাদের মত পরিবর্তন করবার সময়—

দূরে একবার শাঁখের শব্দ শুনিয়া দেবানন্দ বলিল, শাঁখের শব্দ শুনছি, কোন গোলমাল লাগল না কি ?

যোগেন্দ্র শাঁখের শব্দ শুনিতে পায় নাই। সে বলিল, শাঁখের শব্দ শুনেছেন ? নূতন পুলিশ দল এসে পড়েছে বোধ হয়। আমি যাচ্ছি এখন, সময় পেলে

আজই আবার আসব। এখনও আপনাদের কি আপত্তি আছে জানতে চাই।

যোগেন্দ্র কাচারী বাড়ী পার হইয়া ফটক পর্যন্ত পৌছিয়াছে, দেখিল শরৎ পণ্ডিত আসিতেছেন। যোগেন্দ্রকে দেখিয়া তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, এই যে ডেপুটি লীডর! এখানে কেন বাপু, এবার যাও ঠেলা সামলাও।

যোগেন্দ্র বিস্মিত স্বরে বলিল, কি হল আপনার পণ্ডিত মশাই?

শরৎ পণ্ডিত—পণ্ডিত মশায়ের কিছু হয়নি, মায়া দেখাতে হবে না বাপু! মহাত্মা গান্ধী লড়াই ঘোষণা করেছেন, নয়? একবার গুরুদাসপুরে যাও বেড়াতে, পুলিশের গুলিতে পাঁচশো লোক সাবাড়, অতবড় হাট পুড়ে ছারখার।

যোগেন্দ্র ব্যগ্র স্বরে বলিল, আপনি কোথায় শুনলেন এ খবর?

উত্তর না দিয়া হন হন করিয়া শরৎ পণ্ডিত আগাইয়া গেলেন। যোগেন্দ্র তাঁহার পিছনে কয়েক পা গেল, তারপর ফটক পার হইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

শরৎ পণ্ডিতের মুখে গুরুদাসপুরে পুলিশের গুলি চালাইবার খবর শুনিয়া ইন্দ্র ও দেবানন্দ কোন কথা বলিল না, উভয়েই চিন্তায় মগ্ন রহিল কিছুক্ষণ।

ঘটনার গতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। গান্ধীজী চরমপত্র পাঠাইয়াছেন, কি উত্তর পাইলেন গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে জানা যায় নাই। অথবা পুলিশের গুলি কি গভর্ণমেণ্টের উত্তর? দেশের হাওয়া তাতিয়া উঠিয়াছে। উত্তেজনা জনতার সহিষ্ণুতা ও সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। শতাব্দীর পুঞ্জীভূত উপেক্ষা, লাঞ্ছনা, নিষ্পেষণ, বঞ্চনার গ্লানি আজ আক্রোশের বহ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। প্রতিশোধ লইবার বাসনায় আজ শতধাবিছিন্ন জনতা মারমুখী হইয়াছে। কে আছে আজ নেতা যে এই উত্তেজনা-সম্বল, আক্রোশ পরায়ণ জনতার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া সুশৃঙ্খলভাবে, প্রণালীবদ্ধভাবে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সুদীর্ঘ কাল সংগ্রাম চালাইবার প্রেরণা দিবে তাহাকে, ধ্বংসের জন্য ধ্বংস করিবার মোহ হইতে তাহাকে মুক্ত রাখিবে, সর্বাঙ্গীণ ও সমষ্টিগত অসহযোগের অস্ত্রে শক্তিশালী মারণঅস্ত্রে সজ্জিত গভর্ণমেণ্ট ও তাহার সমর্থক গোষ্ঠীকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অসহায়, অকর্মণ্য করিয়া দিবে?

নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া শরৎ পণ্ডিত বলিলেন, ব্যাপার বড় সুবিধের মনে হচ্ছে না ইন্দ্র। নূতন পুলিশ আসবার পর থেকে রোজ একটা না একটা খিটিমিটি বাধছে। মুক্তিসেনার দল যত সামলে চলতে যায় সোনাউল্লার খিলাফতী ফৌজ তত রুখে

ওঠে। এদিকে শুনছি আমাদের লীডর ও ডেপুটি লীডরের মধ্যে মতান্তর হয়েছে।

ইন্দ্র বলিল, কি নিয়ে মতান্তর ?

শরৎ পণ্ডিত—তা ঠিক প্রকাশ নেই। শোনা যায় মুক্তিসেনার ওপর যোগেন্দ্রের প্রভাব নাকি বেশী। উমানন্দ তা সহ্য করতে পারছে না। সোনা উল্লার প্রভাব এখন সকলের চাইতে বেশী।

দেবানন্দ তখনও ভাবিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া ইন্দ্র বলিল, দেবুদা, কি ভাবছ ?

দেবানন্দ ধীরে ধীরে স্বগত উক্তির মত বলিল, ভাবনার কথা বলছিস ? ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। মনে হচ্ছে উন্মত্ত কোলাহল এগিয়ে আসছে।

ইন্দ্র বলিল, তাই যদি হয় তুমি কেন এগোবে না ?

দেবানন্দ একটু বিষণ্ণভাবে হাসিল। বলিল, না এগোতে পারবার দুঃখে আমার মন আজ ভারী হয়ে উঠেছে। আমার অতীত জীবনের সকল কাজ, আশা, আকাঙ্ক্ষা আজ জিজ্ঞাসা চিহ্নে রূপান্তরিত হয়ে ভাসছে চোখের সামনে। আমি সে জিজ্ঞাসার উত্তর তৈরী করছিলাম মনে মনে। কি উত্তর তৈরী করছিলাম তোকে বলছি খুলে। মনে হচ্ছে সংগ্রামের প্রস্তুতির তালিকায় কোথায় যেন বড় ত্রুটি রয়েছে। সেনাপতি ও সৈন্যদলের মধ্যে বোঝাপড়ায় যেন ফাঁক রয়েছে। উত্তেজনার মুখে এই ত্রুটি চোখে পড়ছে না, কিন্তু সংঘর্ষ আরম্ভ হলে সৈন্যব্যূহের একতায় ফাটল দেখা দেবে, ক্রমে সে ফাটল বড় হবে। একটা দিকের কথা বলছি। আমি লক্ষ্য করেছি সেভার্স সন্ধির পর থেকে মুসলমানরা ক্রমে আন্দোলন থেকে সরে যাচ্ছেন। কিন্তু কেউ এই সত্য প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চাইছেন না। দ্বিতীয় দিকের কথা বলছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যদি কোন কারণে আন্দোলনকে তার পরিণতির পথে অগ্রসর হতে বাধা দেয়া হয়, বিরোধ ও বিপদের বালুচরে—

ইন্দ্র একটু অধীরভাবে বলিল, তোমার আশঙ্কার কারণ কি ?

দেবানন্দ বলিল, আশঙ্কার কারণ ? আশঙ্কার কারণ সংশয়। সংশয় কি তোর মনে নাই ইন্দ্র ?

ইন্দ্র—সে সংশয় আমি ঝেড়ে ফেলতে প্রস্তুত আছি।

দেবানন্দ একটু গম্ভীরভাবে বলিল, ভাল কথা। আমি ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। আমাকে তুই ক্ষমা কর ভাই।

ইন্দ্র একটু অনুনয়ের সুরে বলিল, মহাত্মাজী চরমপত্র পত্র পাঠিয়েছেন। এখনও তোমার কিসের সংশয় খুলে বলবে কি ?

দেবানন্দ—বলছি। গান্ধীজীর ভাইসরয়কে চরমপত্র দেবার কথা কাগজে বেরিয়েছে। আজ কয়েকদিন আগে তাঁর নবজীবন কাগজে তিনি যা লিখেছেন তুই বোধ হয় দেখিস নি। তাঁর কথা "I do not know what is the best course at the moment. I am positively shaking with fear." তিনি বলিতেছেন আমি জানিনা এই মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা ভাল পথ কোনটি, ভয়ে আমি সত্য সত্য কাঁপিতেছি। আমরা এখনও স্বরাজ্যের যোগ্য হয়েছি কিনা সন্দেহ। অকালে স্বরাজ পেলে তার ফলে বিপদ ঘটতে পাবে। পর্তুগাল ও তুর্কীতে আকস্মিক বিপ্লবের ফলে গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তন হয়ে কি হয়েছে আমার চোখের সামনে রয়েছে। এই দুই দেশে ঘন ঘন গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তন হচ্ছে। অশান্তির অন্ত নেই, লোকের দুঃখ দুর্দশার সীমা নেই। এই অবস্থা দেখে নিজের দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে আমি আতঙ্ক বোধ করছি। আপোষের কোন সুযোগ পেলে সে সুযোগ আমি ছাড়ব না (I shall miss no opportunity for a settlement.)

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, সেনাপতির মন যদি দ্বিধাগ্রস্ত হয়, সংশয়ে দুর্বল হয়, লক্ষ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব হয়, তাঁর তাহলে চরম পত্র দেবার সার্থকতা কি ? যুদ্ধ ঘোষণা করবার আগেই তো তিনি পরাজয় মেনে নিতে প্রস্তুত।

ইন্দ্র কোন উত্তর দিল না। দেশময় বিপুল, অভূতপূর্ব আলোড়ন তাহার চিত্তে যে ভাবাবেগের সৃষ্টি করিয়াছিল মহাত্মা গান্ধীর চরম পত্র প্রেরণের সংবাদে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া দিতে আর বিলম্ব করিলে নিজের কাছে সে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে। পুরাতন অভ্যাসেরবশে সে দেবানন্দের সাহায্য দাবি করিল এই ভাবিয়া যে দেবানন্দের পক্ষেও আর সরিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। দেবানন্দ সে দাবি প্রত্যাখ্যান করিয়া যাহা বলিল তাহা শুনিয়া ইন্দ্রের মন গভীর হতাশায় পূর্ণ হইল। তাহার চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইল কিছুক্ষণের জন্য।

শরৎ পণ্ডিত বার দুই ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া তিনি বলিলেন, দেবানন্দ, তোমার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে

এত কাণ্ড কিসের জন্য? সোজাসুজি ইংরাজের কাছে কাঁদাকাটি করলেই তো হত।

দেবানন্দ বা ইন্দ্র কেহই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল না। আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আজ আর কথাবার্তা জমিবে না বুঝিয়া শরৎ পণ্ডিত উঠিলেন।

দেবানন্দও উঠিল। বলিল, আমি উঠলাম ইন্দ্র। সরস্বতীর ছেলেটার জ্বর হয়েছে, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম।

ইন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ও বেলা তুমি আসবে না আমি যাব? মনটা বড় খারাপ লাগছে।

তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া দেবানন্দ বলিল, আচ্ছা, আমি আসব।

দেবানন্দ ও শরৎ পণ্ডিত ফটক পর্যন্ত গিয়াছেন মিনু পিছন হইতে ডাকিল, ও বড় মামা, মা ডাকছেন।

দেবানন্দ ফিরিল। সে শরৎ পণ্ডিতকে বলিল, আপনি এগোন। বাড়ী যাবার পথে ডাক্তারকে একবার বলে যাবেন আমাদের বাড়ী যেতে। আমি কতক্ষণে বেরোতে পারব জানিনে।

শরৎ পণ্ডিত চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মীর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে দেবানন্দের দেরি হইল। লক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়াছিল পুষ্পের সম্বন্ধে কথা বলিতে। বাহিরের উত্তেজনার হাওয়া পুষ্পকে স্পর্শ করিয়াছিল। অবশেষে সে সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীকে জানাইয়াছিল মহাত্মা গান্ধীর কাজে সে যোগ দিতে চায়। প্রস্তাব করিয়াছিল তাঁহার যে আশ্রম আছে সবরমতীতে সেখানে তাহাকে পাঠাইয়া দিলে তাহার জন্য কাহাকেও আর চিন্তা করিতে হইবে না। সবরমতীতে পাঠান সম্ভব না হইলে অন্য কোন আশ্রমে সে যাইতে পারে। কোন সূত্রে সে পঞ্চক্রোশীর দীনদয়াল ঠাকুরের আশ্রম ও গোবিন্দপুরের মহানন্দ আশ্রমের নাম শুনিয়াছিল। লক্ষ্মীর কাছে এই দুইটি আশ্রমের নাম করিয়াছিল সে। পুষ্পের সঙ্গে কথা বলিয়া দেবানন্দ বুঝিল শুধু মহাত্মা গান্ধীর কাজ করিবার জন্য নয়, রাজনগর হইতে অন্য কোথাও পালাইবার জন্য সে আশ্রমে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছে। তারাপুরে যাইবার প্রস্তাবেও সে রাজি হইল না।

তাহার কথা শুনিয়া দেবানন্দ বলিল, সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া কি ব্যবস্থা করা যায় সে দেখিবে পুষ্প যেন হঠাৎ কিছু না করিয়া বসে।

পুষ্প তাহার কথায় সম্মত হইল।

দিন দুই পরে সরস্বতীর ছেলের জ্বর ছাড়িলে দেবানন্দ সরস্বতীকে লইয়া তারাপুর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

দেবানন্দের আরও দিন কয়েক অপেক্ষা করিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু সরস্বতী পীড়াপীড়ি করাতে তাহাকে রাজি হইতে হইল। সরস্বতীর পীড়াপীড়ি করিবার কারণ ছিল। উমানন্দ আগে বাড়ীতে খাইতে আসিত। সেদিন দেবানন্দের সম্বন্ধে তাহার কোন উক্তিতে সরস্বতী প্রতিবাদ করায় উমানন্দ ভাত ফেলিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে জানাইল বাপুজীর প্রতি অবজ্ঞায় এ বাড়ীর হাওয়া বিষাক্ত, এ বাড়ীর প্রত্যেকটি মানুষের মন দুষিত, এই অভিশপ্ত গৃহের অন্নগ্রহণে সে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। পুত্রের স্বভাবে ও ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেও ক্ষুধার সময়ে সে ভাত ফেলিয়া উঠিয়া গেল ইহাতে ত্রিনয়নী মনে ব্যথা পাইলেন। সরস্বতীকে বলিলেন খেতে বসেছিল, ওর কথার জবাব না দিলেই পারতিস। জানিস তো ও মানুষ ঐ রকম।

মাতার কথায় সরস্বতী মনে মনে আহত হইল, কোন উত্তর দিল না। ইহার পর সে দেবানন্দকে জানাইল মিঠুর জ্বর ছাড়িয়াছে, সে আর দেরি করিতে চাহে না। ভিতরের কথা সে বড ভাইয়ের কাছে সযত্নে গোপন রাখিল। ভাবিল মায়ের কথা ভাবিয়া এই লোকটি উমানন্দের অনেক ধৃষ্টতা, নীচতা ও অন্যায় সহ্য করেন, ইহার মনের ভাব আর কেন বাড়াই।

সরস্বতীর যাইবার প্রস্তাবে ত্রিনয়নী মৃদু আপত্তি করিলেন, সরস্বতী সঙ্কল্প পরিবর্তন করিল না। পরের দিন যাত্রার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

দেবানন্দ অনেক রাত্রি পর্যন্ত ডায়রী লিখিতেছিল। ঘড়িতে দুইটা বাজিল দেখিয়া সে লেখা বন্ধ করিয়া চোখে মুখে জল দিয়া শয়ন করিল। সে ক্লান্ত হইয়াছিল কিন্তু নানা রকম চিন্তা একটার পর একটা তাহার মাথায় আসিতে লাগিল। অবশেষে এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িল। বোধহয় ঘণ্টা দুই সে ঘুমাইয়াছে, দেহের ও মনের ক্লান্তি তখনও দূর হয় নাই, তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিসের শব্দ হইল? বন্দুকের শব্দের মত মনে হইল না? সে বিছানায় উঠিয়া বসিল, চাহিয়া দেখিল রাত শেষ হইয়া ভোরের আবছা আলো ফুটিয়াছে।

পরক্ষণে দরজায় করাঘাতের শব্দ আসিল, ত্রিনয়নী বাহির হইতে ডাকিলেন, দেবু জেগে আছিস? ও দেবু—

দেবানন্দ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল, বলিল, কি হয়েছে মা? ডাকছো কেন?

ত্রিনয়নী ঘরে আসিয়া বিছানায় বসিলেন। বলিলেন, বন্দুকের শব্দ শুনতে পাসনি? কোন গোলমাল বাধল? আনন্দ আজ পাঁচ'দিন বাড়ী আসেনি, হিমাংশুরও দেখা পাওয়া যায় নি। বড় ভাবনা হচ্ছে আমার।

দেবানন্দ—তুমি ক'টা আওয়াজ শুনেছ?

ত্রিনয়নী—অনেকবার আওয়াজ হয়েছে। প্রথমটা খেয়াল করিনি। তারপর ঘন ঘন আওয়াজ শুনে মনে হয় নিশ্চয় গোলমাল বেধেছে। পুলিশ আজকাল কথায় কথায় গুলি চালাচ্ছে।

দেবানন্দ—গোলমাল আরম্ভ হলে খবর পেতে দেরি হবে না। আনন্দের জন্য ভেবো না, সে লীডর মানুষ।

ত্রিনয়নী—পুলিশ কি লীডর অলীডর বেছে গুলি করবে? কি যে বলিস তুই?

দেবানন্দ—পুলিশ বাছবে কেন, লীডররা স্থির করবেন কারা গুলি খাবে, কারা আড়ালে থাকবে।

ত্রিনয়নী—তোর কথা বুঝলাম না।

দেবানন্দ—ও কথা এখন থাক। দেশে লড়াই বেধেছে, গুলিটুলি কিছু চলবে। এর আগে বড় ছেলের জন্য ভেবেছ, এখন ছোট ছেলের জন্য না হয় ভাবো। যেমন বরাত করে এসেছ মা। আমি আর একটু শুয়ে নিচ্ছি, আজ আবার তারাপুর রওনা হতে হবে।

দেবানন্দ শুইয়া পড়িল। ত্রিনয়নী আর কিছু না বলিয়া [illegible]জের কাজে চলিয়া গেলেন। রাত্রের অন্ধকার ভাল করিয়া দূর হইবার আগে হইতে তাঁহার দৈনন্দিন কর্তব্যের পালা আরম্ভ হয়।

ছোট ছেলের জন্য ভাবনার কথায় দেবানন্দ তাহার মাতার বরাতের কথা তুলিয়াছিল, কিন্তু তাহার বরাতেও নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া থাকা লেখা ছিল না। মাতা চলিয়া যাইবার পর সে চোখ বুঁজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছে, হিমাংশু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার ডাকে দেবানন্দ চোখ মেলিয়া দেখিল হিমাংশু হাঁফাইতেছে। মনে হইল সে দৌড়াইয়া আসিয়াছে।

বলিল, কি খবর হিমাংশু? এত হাঁফাচ্ছ কেন এই সকালে?

হিমাংশু বলিল, ভয়ানক গোলমাল বেধেছে বড় কাকা। যোগেন্দ্র দা পাঠালেন আপনাকে খবর দিতে।

দেবানন্দ উঠিয়া বসিল। বলিল, আমাকে খবর দিতে? কি গোলমাল বেধেছে?

হিমাংশু বলিল, কাল হাটে জিনিস কেনা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া বেধেছিল। ভলান্টিয়াররা গোলমাল থামিয়ে দিতে গেলে পুলিশ তাদের যাচ্ছেতাই গালাগালি করে কয়েকজনের গান্ধী টুপী কেড়ে নিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। খবর শুনে আর সব ভলান্টিয়াররা ছুটে এল। হাটের লোকও তাদের পক্ষে দাঁড়াল। সবাই বলল গান্ধী টুপী মাড়িয়ে পুলিশ যে দোষ করেছে তার জন্য ক্ষমা না চাইলে হাটবাজার সব বন্ধ হবে, পুলিশকে কেউ জিনিস বেচবে না। অত লোক রুখে দাঁড়াতে পুলিশ ক্যাম্পে পালিয়ে গেল। দুপুর রাতে পুলিশ দল বেঁধে এসে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটির অফিস ভেঙ্গে দিয়েছে, জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলেছে, আর যে সব ভলান্টিয়ার অফিসে ছিল তাদের গ্রেপ্তার করেছে। আনন্দ কাকা, যোগেন্দ্র দা, আমি ও আরও কয়েকজন নদীর ধারে দশরথ পাটনীর বাইরের ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম। একজন দোকানী আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে খবর দিয়ে গেল। হাটখোলায় কুঞ্জ দোকানীর বাড়ীতে ও কাশেম দর্জির দোকানে মুক্তি সেনা ও খিলাফতী ফৌজের কোয়ার্টার। খবর পেয়ে তারা এল।

হিমাংশু এই পর্যন্ত বলিয়া চুপ করিতে দেবানন্দ বলিল, তারপর?

হিমাংশু একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, তারপর কখন কি ঘটল আমি নিজের চোখে দেখিনি। আমাকে ক্যাম্পের চার্জে রাখা হয়েছিল। শুনলাম পুলিশ ক্যাম্পে আগুন লেগেছিল, পুলিশ কয়েকবার গুলি চালায়। শেষ রাত থেকে বড়াল নদীর ওপার থেকে দলে দলে লোক আসছে। শোনা যাচ্ছে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করা হবে। গুজব রটেছে তিনজন খিলাফতী ফৌজ মারা গিয়েছে গুলিতে, পুলিশ তাদের লাশ সরিয়ে ফেলেছে। তাই তারা ক্ষেপে গিয়েছে। যোগেন্দ্র দা, আনন্দ কাকা সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। মহাত্মা গান্ধীর দোহাই দিচ্ছেন, আলি ভাইদের দোহাই দিচ্ছেন, তারা কারো কথা মানতে চাইছে না।

দেবানন্দ কি চিন্তা করিল। তারপর বলিল, সোনাউল্লা কোথায়?

হিমাংশু—তা জানিনে। খিলাফতী ফৌজের কেউ কেউ বলছে শেষ রাতে সে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছে, পাঁচ হাজার লোক নিয়ে আসবে। গঞ্জের কাঁয়াদের গদীও নাকি লুট হবে।

দেবানন্দ ভাবিতে লাগিল। হিমাংশুর গলার শব্দ পাইয়া ত্রিনয়নী ও সরস্বতী ঘরে আসিল। ত্রিনয়নীর প্রশ্নের উত্তরে দেবানন্দকে হিমাংশু যাহা বলিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে জানাইল। তাহার কথা শেষ হইলে দেবানন্দ বলিল, আমার কাছে তোমাকে কে পাঠাল ?

হিমাংশু— যোগেন্দ্র দা পাঠালেন। আনন্দ কাকা কিছু জানেন না, তিনি সোনাউল্লার জন্য অপেক্ষা করছেন।

দেবানন্দ অবস্থা বুঝিতে পারিল। যোগেন্দ্র জনতার রুদ্র মূর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে জনতাকে শান্ত করিবার জন্য। উমানন্দ স্রোতে গা ভাসাইতে চাহে।

সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। হিমাংশুকে বলিল, তুমি যাও, যোগেন্দ্রকে ব'লো আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি। তাকে আরো ব'লো একটা সভা হবে সবাইকে যেন জানিয়ে দেয়।

হিমাংশু যাইবার জন্য উঠিল। বলিল, মহাত্মাজীর অহিংসার কথা কেউ কানে তুলতে চাইছে না বড কাকা, বলছে দুষমনদের মারো, তাদের সব কেড়ে নাও, বাড়ীঘর জালিয়ে দাও।

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, দুষমন দলের মধ্যে আমিও পড়ি, আমাকে কি ওরা ছাড়বে ?

হিমাংশু—আপনাকে কিছু বলবে না। আপনি স্বদেশী বাবু ছিলেন কিনা ?

দেবানন্দ—ভরসার কথা। আচ্ছা, তুমি যাও।

হিমাংশু চলিয়া গেলে দেবানন্দ প্রাতকৃত্য সারিয়া ইন্দ্রের গৃহের দিকে চলিল। তাহাকে অবস্থা জানাইয়া ও সতর্ক থাকিতে বলিয়া দেবানন্দ হাট খোলার দিকে রওনা হইল। হাটখোলা হইতে কিছুদূর থাকিতে সে শুনিল ধ্বনি হইতেছে,

মহাত্মা গান্ধী কি জয় !

আল্লা হো আকবর !

পাথর চাপা উৎসমুখের বিরাট পাথর মন্ত্রবলে সরাইয়া দিয়াছেন যাদুকর। যাদুকর বোধহয় ভাবিয়াছিলেন উৎস হইতে তন্বী স্রোতস্বিনী উপলখণ্ড চুম্বন করিয়া কুলকুল শব্দে বহিয়া পাহাড হইতে সমতলে নামিবে। পাহাড়িয়া প্রবাহ হইবে কূলে কূলে ভরা নদী। তারপর দেশে দেশে ঘুরিয়া সবুজের স্নিগ্ধতা বিস্তার করিতে করিতে সে নদী সাগরে পড়িয়া হারাইয়া যাইবে।

পাথরখানি সরিয়া যাইতে যুগযুগান্তরের আবদ্ধ জলরাশি ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পাহাড় ভাঙ্গিয়া, গম্ভীর গর্জনে ত্রাস সঞ্চার করিয়া প্লাবনের প্রবাহ নামিল। সমতলে তাহার ধ্বংসোন্মত্ততা দেখিয়া যাদুকর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।

কোথায় গেল পাঞ্জাবের নিদারুণ অত্যাচারের প্রতিকার দাবি, কোথায় গেল তুর্কী সুলতানের বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের দাবি! সরকারী শান্তি রক্ষকদের হাতে লাঞ্ছনা উৎপীড়ন, নির্বিচারে গুলিবর্ষণ যে আক্রোশের সৃষ্টি করিল অহিংসার অমিয় বাণী ডুবিয়া গেল তাহার দন্তঘর্ষণের শব্দে।

তিন দিন পরের কথা।

গুজবের পর গুজব রটিতেছে। রাজনগরের পাড়ায় পাড়ায় সন্ত্রস্ত ভাব। ইন্দ্র তাহার বৈঠকখানা দালানের বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। দেবানন্দ গ্রেপ্তার হইয়াছে, যোগেন্দ্র অজ্ঞাত আততায়ীর আঘাতে গুরুতর আহত হইয়া ইন্দ্রের সেবকাশ্রমে নীত হইয়াছে, হিমাংশু গ্রেপ্তার হইয়াছে। গঞ্জ আক্রান্ত হইবার সংবাদ পাইয়া পুলিশ বাহিনীর অধিকাংশ সেখানে চলিয়া গিয়াছে। সোনাউল্লার ফৌজ বিক্রম দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

ইন্দ্র পায়চারি করিতেছে ও ভাবিতেছে। ঘরের মধ্যে কিসের শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মী দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্র তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কোন কথা আছে?

লক্ষ্মী বলিল, একটা কথা শুনলাম, বোধহয় তুমিও শুনেছ। সত্যি নাকি? আমার তো বিশ্বাস হয় না।

ইন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, কথাটা কি তাই তো বললে না।

লক্ষ্মী মৃদুস্বরে বলিল, মুখ দিয়ে বেরোতে চাইছে না। আনন্দ নাকি দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

ইন্দ্র বলিল, শুনেছি কে নাকি ম্যাজিস্ট্রেটকে বেনামী চিঠি লিখেছিল একজন এক্স-রিভোল্যুশনারী অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়ে জনতাকে হিংসার পথে যেতে ওসকাচ্ছে। গভর্ণমেণ্টের ও দেশের শত্রু এই ব্যক্তিটিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার না করলে এখানে অরাজকতা প্রবল হয়ে উঠবে।

লক্ষ্মী—যে কেউ ঈর্ষার বশে এ রকম লিখে থাকতে পারে।

ইন্দ্র—তা পারে, আনন্দও পারে। জানিনে সেই লিখেছে কিনা। তবে অহিংসাবাদী আনন্দ এক্স-রিভোল্যুশনারীদের প্রতি বড় বিরূপ। তারা নাকি দেশের সর্বনাশ করেছে ও করতে চায়।

লক্ষ্মী—কিন্তু শুনেছি দাদা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আইন অমান্যের আদর্শ সবাইকে বোঝাচ্ছিলেন সভায়, অনেককে তাঁর মতে এনেছিলেন।

ইন্দ্র—তাই তো পুলিশ লাঠি চার্জ করে সভা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

লক্ষ্মী স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল। বলিল, তোমার যুক্তি আমি বুঝলাম না। অহিংসা প্রচার করা, উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করবার চেষ্টা করা কি অপরাধ ?

ইন্দ্র হাসিল লক্ষ্মীর প্রশ্নে। বলিল, বরাত মন্দ হলে অপরাধ বই কি।

লক্ষ্মী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, এমন নীচু কাজ, বিশ্বাস-ঘাতকের কাজ আনন্দ করতে পারে ভাবতে দুঃখ হয়।

ইন্দ্র কোন উত্তর দিল না। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া সে বলিল, ডাক্তার বললেন যোগেন্দ্রের আঘাত কিছু গুরুতর হয়েছে। আমি ওর মাকে টেলিগ্রাম করেছি আসবার জন্য।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা যোগেন্দ্রকে মারবার জন্যও কি আনন্দ দায়ী ? এই রকম একটা কথা শুনলাম।

ইন্দ্র উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

লক্ষ্মী আবার বলিল, ছেলেটিকে বাড়ীতে আনলে হয় না ? ওখানে অনেক ত্রুটি হচ্ছে।

ইন্দ্র মুখ তুলিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল এক মুহূর্ত। বলিল, তা হয়। ঐ রকম রোগীর সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে পারবে ?

লক্ষ্মী বলিল, সে দেখব। পুষ্প রয়েছে। ওর মা আসছেন তুমি নিয়ে এস।

ইন্দ্র—পুষ্প কি যোগেন্দ্রের শুশ্রূষা করবে ?

লক্ষ্মী—একথা বলছ কেন ? রোগীর শুশ্রূষা করবে না কেন ? যোগেন্দ্রের সম্বন্ধে ওর খুব উঁচু ধারণা।

তারপর বলিল, তুমি যোগেন্দ্রকে নিয়ে এস, আর দেরি করো না।

ইন্দ্র বলিল, আচ্ছা।

পরদিন সন্ধ্যার পর হইতে একটার পর একটা সংবাদ ও নানা রকম গুজব রটিতে লাগিল।

বাজারের পুলিশ ক্যাম্প ভস্মীভূত, দশজন পুলিশকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে।

পুলিশ স্কুল বাড়ীতে নূতন ক্যাম্প করিয়াছে। হাটখোলার স্থায়ী দোকানীরা পলাইতেছে। রাজনগরের পোষ্টাফিস পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে লুটতরাজ আরম্ভ হইয়াছে। গঞ্জে ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে পুলিশের বড় রকমের লড়াই হইয়াছে। পুলিশ মার খাইয়া পলাইয়াছে। গঞ্জের থানা পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজনগরের বাবুদের বাড়ী লুট করিবার জন্য সোনাউল্লার ফৌজ আসিতেছে।

পরদিন চৌরিচৌরার খবর বিকৃত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। লোকের মুখে মুখে গুজব রটিল গভর্ণমেণ্টের পুলিশ ও সিপাহীরা মহাত্মা গান্ধীর আদেশে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছে। দেশে গান্ধীরাজ হইয়া গিয়াছে। খিলাফৎ কমিটির ফর্মান আসিতেছে সোনাউল্লার নামে। লুটতরাজ ও জুলুমের ভয়ে আর একটি দিন আতঙ্কের মধ্যে কাটিল। খেলাফতী ফৌজ গ্রামের মধ্যে টহল দিয়া বেড়াইতে লাগিল, বাবুদের সতর্ক করা হইল কেহ পলাইবার চেষ্টা করিলে তাহার বাড়ী লুটিয়া আগুন দেওয়া হইবে। ঘন ঘন আল্লাহো আকবর! ধ্বনিতে সোনাউল্লার ফৌজ বিজয় উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। তৃতীয় দিন খবর রটিল মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের সন্ধি হইয়াছে বার্দোলিতে, সন্ধির ফলে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

খবর শুনিয়া মুক্তিসেনা ও খিলাফতী ফৌজের সদস্যরা হতবুদ্ধির মত পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিল। বেলা কিছু বাড়িতে খবর রটিল মহাত্মা গান্ধীর আদেশে মহকুমা হাকিম আসিতেছেন স্থানীয় নেতা সোনাউল্লা ও উমানন্দের সঙ্গে সন্ধির কথা বলিতে। দুপুরের আগে বড় একটি সশস্ত্র ফৌজ লইয়া মহকুমা হাকিম রাজনগরে আসিয়া পৌছিলেন। সন্ধির কথা বলার জন্য এত বড় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী লইয়া মহকুমা হাকিমকে আসিতে দেখিয়া খিলাফতী ফৌজ ও মুক্তিসেনাদল সন্ধির বার্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইল। সন্দেহ ক্রমে ছড়াইয়া পড়িল ও মুক্তিসেনাদলকে ফেলিয়া রাখিয়া খিলাফতী ফৌজ নদী পার হইয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুক্তিসেনাদলও ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। নেতাদের সঙ্গে সন্ধির সম্বন্ধে একটি কথাও না বলিয়া পুলিশ বাহিনী কংগ্রেস কমিটি ও খিলাফৎ কমিটির নূতন অফিস দখল করিয়া সোনাউল্লা, উমানন্দ ও তাহাদের যতগুলি অনুচরকে কাছে পাইল তাহাদের গ্রেপ্তার করিল। তারপর ব্যাপক তল্লাসী ও গ্রেপ্তার আরম্ভ হইল

রাজনগরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে। অসুস্থ যোগেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ সদর হাসপাতালে পাঠাইল। ইহার পর নদী পার হইয়া পুলিশ দল গ্রামের পর গ্রাম তছনছ করিল সোনাউল্লার খিলাফতী ফৌজের সন্ধানে।

পরদিন আসামী দল লইয়া পুলিশ বাহিনী যখন রাজনগর ত্যাগ করিল ভস্মীভূত পোষ্টাফিস ও কংগ্রেস কমিটির অফিসের ছাইয়ের গাদায় শুইয়া গোটা কয়েক হাটের কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাইল, তারপর চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। হাটখোলায় একখানি দোকানও খুঁটির উপরে দাঁড়াইয়াছিল না, একজন মানুষও ইতস্তত বিকীর্ণ ভগ্নস্তূপের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল না।

পাঁচ

কলিকাতা (১৯২২)

কংগ্রেসের সর্ব-ভারতীয় নেতৃদলের মধ্যে এক মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আর বড় কেহ জেলের বাহিরে ছিলেন না। বাংলার সকল বড় নেতা বহু সাঙ্গোপাঙ্গ সহ প্রেসিডেন্সী জেল ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেল আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। হরিশঙ্কর জেলে গেলেন চিত্তরঞ্জনেব সঙ্গে। পরদিন নিমাই শাস্ত্রী আসিলেন। নগ্নগাত্র, চপ্পল পায়ে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, দীর্ঘ শ্মশ্রু পণ্ডিত শাস্ত্রী যখন কচ্ছ ও খদ্দরের উত্তরীয় মাটিতে লুটাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া ভগবদগীতার "বাসাংসি জীর্ণানি যথা—" শ্লোকাদি বলিতে বলিতে জেল ফটক পার হইলেন বিহারী সিপাহীরা সম্ভ্রমে নত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার জানাইল। নিমাই শাস্ত্রীব পরে কয়েদী নেতাদের বিস্মিত করিয়া স্মিত হাস্য করিতে করিতে এককড়িবাবু আসিলেন।

আসিলেন না হরিশঙ্করের বন্ধু এঙ্গোরা ফণ্ডের কোষাধ্যক্ষ মৌলভী নুরুল হক সাহেব। তিনি সংস্কৃত আইন সভায় ঢুকিয়া প্রজাপার্টি গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আসিলেন না মহাত্মাজীর পবমভক্ত বড়বাজারী অসহযোগীদের নেতা বালাচাঁদজী ও নেতৃত্বকামী, অদ্ভুতকর্মী বলাই সরকার। আর আসিল না হরিশঙ্করের ভক্ত এক্স রিভোল্যুশনারী দলের নেতা ফণী সিংহ।

ফণী আসিল না কেন বুঝা কঠিন নয়। হরিশঙ্কর জেলে যাইবার পর হইতে ফণী আন্দোলনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদন করিয়াছিল। সে কোন সময়েই এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। শুধু তাগার মুরুব্বী ও পৌনঃপুণিক অর্থ সাহায্যের দাবিতে বিরক্তিহীন নেতা হরিশঙ্করের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ সে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। হরিশঙ্কর জেলে যাইবার পর আর সব কাজ ছাড়িয়া দিল, মাত্র দুইটি কাজ সে নিয়মিত ভাবে করিত। একটি কাজ, দলবল লইয়া হরিশঙ্করের গৃহে আড্ডা জমাইয়া সে অসহযোগ ও নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলন ও তাহার নেতাদিগকে বিদ্রূপ করিত। দ্বিতীয় কাজ, সময় অসময়ে সরলা দেবীকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। স্বামী ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া দিবার পর হইতে সরলা দেবী অর্থ কষ্টে পড়িয়াছিলেন

এখন তিনি রিক্তহস্ত ফণী জানিত। তবু সে কতকটা অভাব, কতকটা অভ্যাস বশতঃ তাঁহাকে পীড়ন করিত। আবার এমনও ঘটিত যে বাজার দেনার দায়ে সরলা দেবীকে অস্থির হইতে দেখিয়া মাঝে মাঝে চাহিয়া চিন্তিয়া দশ বিশ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সে তাঁহার হাতে দিত।

বালাচাঁদজী আসিলেন না অন্য কারণে।

২৪ শে ডিসেম্বর তারিখের হরতালের আগে বড় বাজারে পলায়নের হিড়িক লাগিল। বালাচাঁদজী মহাত্মাজীর পরম ভক্ত নেতা মানুষ। লুট তরাজের ভয়ে পলায়ন করিবার কথা তিনি ভাবিতে পারিলেন না। শেঠানী এই সময়ে পুষ্কর তীর্থে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হরিশঙ্করের গ্রেপ্তারে বালাচাঁদজী বিচলিত হইলেন না, ভাবিলেন তিনি ব্যারিষ্টার মানুষ, তিনি তো জেলে যাইবেনই। নিমাই শাস্ত্রীর গ্রেপ্তারও তাঁহাকে বিচলিত করিল না। কিন্তু এককড়িবাবু গ্রেপ্তারের পর শেঠানীর ধর্মতৃষ্ণা পরিতৃপ্তির পথে বাধা দিয়া তিনি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে ভরসা করিলেন না। পরদিনই গাড়ী রিজার্ভ করিয়া তিনি সপরিবারে যাত্রা করিলেন পুষ্কর অভিমুখে। পুষ্করে সস্ত্রীক পুণ্য অর্জন করিয়া জয়পুরে গেলেন বিশ্রাম করিতে।

বলাই সরকার স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য জেলে যাইতে পারিল না। সকালে টেলিফোনে এককড়িবাবুর গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইবার পর হইতে তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা এত খারাপ বলিয়া মনে হইল যে, নিজের কাজে দুপুর বেলার মধ্যে সিমুলতলা রওনা না হইয়া পারিল না। এত তাড়াতাড়ি তাহার সঙ্কল্প স্থির ও তাহা কার্যে পরিণত হইল যে, পরদিন পুলিশ তাহার খোঁজে আসিয়া ভৃত্যের কাছে বাবু মুলুক গয়া সংবাদ পাইয়া বিরস বদনে ফিরিয়া গেল।

জেলে সপ্তাহ তিনেক থাকিবার পর হঠাৎ এককড়িবাবু মুক্তির আদেশ পাইলেন। তাঁহার মুক্তির আদেশের কথা শুনিয়া ছোকরা অসহযোগীরা ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এককড়িবাবু নেতাদিগকে যথাযোগ্য বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া বাহিরে আসিলেন। সরকারী আদেশে তাঁহার কাগজ প্রকাশ করা বন্ধ হইয়াছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে এই আদেশ বাতিল হইল। নূতন পর্যায়ের কাগজের প্রথম সংখ্যায় এককড়িবাবুর স্বাক্ষরে "অহিংসা ও ভারতে আধ্যাত্মিক বাণী" শিরোনামায় একটি সারগর্ভ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। তারপরের সংখ্যাগুলিতে অসহযোগ আন্দোলন, চরকা ও খদ্দরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বলিত সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রবন্ধগুলিতে বাঙালীর সংশয়বাদিতা আধ্যাত্মিকতায় অবিশ্বাস সম্বন্ধে বহু তথ্য থাকিত। অধঃপতিত বাঙালী জাতিকে সম্বোধন করিয়া সখেদে লিখিতে লাগিলেন যে-পঞ্চগৌড়ে একদা অহিংসা ও মৈত্রীর মূর্তবিগ্রহ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল আত্মবিস্মৃত গৌড়বাসী বাঙালী আজ সেই প্রাচীন গৌরবের কথা ভুলিয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে এককড়িবাবুর প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিল, তাঁহার কাগজের কাটতিও বৃদ্ধি পাইল। আধ্যাত্মিকতায় আস্থাশীল সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিরা সভা করিয়া এককড়িবাবুকে সম্বর্ধনা জানাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ভক্তিমান বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে সমাজ কল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্যে এককড়িবাবু প্রতি সপ্তাহে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সমাজের শীর্ষ স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক ও মহিলারা এই ব্যাখ্যা শুনতে আসিতে লাগিলেন। তত্ত্বদর্শিগণ কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদের উপর নূতন আলোক ক্ষেপ করিয়াছেন এককড়িবাবু। তাঁহারা সগর্বে বলিলেন বাংলা দেশ না হইলে এমন উর্বর মস্তিষ্ক অন্য কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে?

এককড়িবাবু যখন খ্যাতির তুঙ্গ শিখর হইতে তুঙ্গতর শিখরে অবলীলাক্রমে উঠিতেছিলেন তখন একদিন তীর্থ পর্যটন শেষ করিয়া শেঠানী সহ বালাচাঁদজী নিরাপদে বড়বাজারের মোকামে ফিরিলেন। আসিয়াই তিনি তাঁহার পুরাতন বন্ধু এককড়িবাবুর নূতন খ্যাতির কথা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি ভাবিলেন পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রীর প্রভাবে পড়িয়া এতদিন তিনি এককড়িবাবুকে অবহেলা করিয়াছেন। কয়েকদিনের জন্য জেল হইতে ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহার বরাত যে এমন করিয়া খুলিয়া যাইবে কে জানিত। পূর্ব ত্রুটি স্খালন করিবার জন্য তিনি নিয়মিতভাবে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে যাইতে আরম্ভ করিলেন।

ইহার পর নূতন স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া সিমুলতলা হইতে বলাই সরকার কলিকাতায় ফিরিল।

ফিরিয়া আসিয়া বলাই প্রথমে তাহার অভ্যাসমত দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বড় বড় নেতারা সরকারের কয়েদখানা গুলজার করিতেছেন। উৎপীড়নের দাপটে শাঁসালো ব্যক্তিরা আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। রাজনৈতিক মঞ্চ একেবারে সাফ। চুনোপুটিরা শূন্য মঞ্চে নৃত্য করিতেছে। এই সুযোগে

ইচ্ছা করিলেই হরিশঙ্করের শূন্য আসন দখল করিতে পারে সে। একটা বাধা আছে বটে। গান্ধীজী আসিয়া ত্যাগ দেখানো ফ্যাশন করিয়াছেন। যাহার শতছিন্ন পাদুকা ছাড়া আর কিছু ত্যাগ করিবার মত সম্বল নাই সেও ত্যাগের কথা কপচায়।

বলাই ভাবিল, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন কি করা যায়? এককড়িবাবুর সংবাদ সে ইতিমধ্যে পাইয়াছিল। সে ভাবিল উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ বুজরুকের শিরোমণি এককড়ি আজ ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, হবে বা সে এক নূতন অবতার হইয়া বসে, যা অবতার উৎপাদিকা মাটি এ দেশের। এককড়ির এখন বৃহস্পতির দশা। কিছু টাকা খসাইলে সে তাহার মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু টাকা সে অনেক খসাইয়াছে, অনেকের জন্য, আর পারিবে না, পারিবার উপায় নাই। ক্যাজুরিনা এভিন্যুতে 'বলাই বিলাস' প্রাসাদ তৈরী করিতে গিয়া বহু টাকা খরচ হইয়াছে, ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল নয়। নূতন মহাজন ধরিতে হইবে তাহাকে। এতদিন সে ছিল মহাজন, এবার তাহাকে মহাজন ধরিতে হইবে। বালার্চাঁদের কথা মনে হইল তাহার কেমন করিয়া বালার্চাঁদকে হাতের মধ্যে আনা যায় সে ভাবিতে লাগিল।

তাহার মনে হইল বালার্চাঁদের টাকা ও ফণীর দলের সহায়তা পাইলে এই পড়তির বাজারে সে গুছাইয়া লইতে পারে কিন্তু ফণী লোকটি যেমন আনস্ক্রুপুলাস তেমনি লোভী। তবে কাজের লোক, কুকুরের মত অন্ধ প্রভুভক্তি আছে খানিকটা।

অনেক চিন্তা করিয়া বলাই নূতন কাজের পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিল। এককড়িবাবু বালার্চাঁদ ও ফণীর সাহায্য পাইলে এবার আর হরিশঙ্করের দক্ষিণহস্ত নয় দ্বিতীয় হরিশঙ্কররূপে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হইতে পারিবে সে।

পরিকল্পনা স্থির করিয়া সে পদ্মিনীকে চিঠি লিখিতে বসিল। গভীর ভগ্নী-বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া সে লিখিল সিমুলতলায় চেঞ্জে গিয়া আরও অসুস্থ হইয়া ফিরিয়াছে সে, পদ্মিনী যেন একবার সময় করিয়া দেখা দিয়া যায়।

পরদিন সংবাদ লইয়া বলাই এককড়িবাবুর গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য উপস্থিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যার সমারোহ দেখিয়া বলাই রীতিমত বিস্মিত হইল। মহা ভিড়। বাঙ্গালী, মাড়োয়াড়ী, গুজরাটি, ভাটিয়া, সিন্ধি, মাদ্রাজী, উৎকলী

সব প্রদেশের লোক আসিয়াছে। মহিলার সংখ্যাও বড কম নয়। পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়া এত লোক জমান যায় কলিকাতায় সে জানিত না। যাত্রা নয়, থিয়েটার নয়, ফুটবল ম্যাচ নয়, কংগ্রেসের সভা নয়, কবেকার লেখা এক ধর্ম গ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনিতে এত লোক আসিয়াছে। তাজ্জব কাণ্ড! বলাই ভাবিল এককড়িবাবু অনেক রকম জানেন দেখা যাইতেছে।

একপাশে কোনমতে একটু স্থান কবিয়া বসিয়া সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি পডিল বালাচাঁদের উপর। দুই চোখ বুজিয়া তন্ময় হইযা তিনি বসিয়া আছেন। মূর্তিমতী ভক্তি যেন ভাবের ঘোরে স্ফীত উদব, হ্রস্ব মস্তক, পুরুষ দেহ ধারণ করিযা যোগারূঢ হইযাছে।

ব্যাখ্যা শেষ হইয়া আসিযাছিল। ভিড ভাঙ্গিতে আবম্ভ কবিল। শ্রোতা ও শ্রোত্রীরা অনেকে প্রণামী ও প্রণাম বাখিয়া বিদায় লইতে লাগিলেন।

ভিড পাতলা হইযা গেলে বালাচাঁদ নযনোন্মীলন করিলেন ও বলাইযেব উৎসুক দৃষ্টিব সঙ্গে তাঁহাব দৃষ্টি মিলিত হইল। শেষ শ্রোতা চলিয়া গেলে এককডিবাবু শ্রীমদ্ভাগবতখানি মাথায ছোঁযাইয়া সবাইযা বাখিলেন ও বালাচাঁদেয পাশে আসিয়া আসন গ্রহণ কবিলেন। বলাই উঠিযা উভযের কাছে গেল।

বালাচাঁদেব সহজ অবস্থা ফিরযা আসিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বলাইবাবু, আপনি কোথায গিয়েছিলেন? হামি তো সিনান কবতে গেইলাম পুষ্করে। আপনি?

বলাই জানাইল সে স্বাস্থ্যোদ্ধাব কবিতে সিমুলতলা গিযাছিল, তিন চাবদিন হইল ফিরিযাছে।

বালাচাঁদ—এককডিবাবু জেলসে ফিরলেন ভাবি ভক্ত মানুষ হোয়ে। কি কাণ্ড আঁখসে দেখলেন না?

দেশের বাজনৈতিক অবস্থার কথা উঠিল। নেতাবা জেলে কি কবিতেছেন, কেমন আছেন সে কথাও হইল। বালাচাঁদ বলিলেন এককডিবাবু মহাত্মাজীর আন্দোলনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কবিতেছেন। জেলে তাঁহাব চেঞ্জ অব হার্ট হইয়াছে। হাঙ্গামা-হুজ্জুত যাহারা ভালবাসে না তাহাবা খুব খুশী হইযাছে এককডিবাবুর কথা শুনিয়া। বলিলেন, হামি তো অনেকদিন বোলছি মোশা মহাত্মাজী শ্রীকিষনজীব অওতার। বাংগালী লোক ধরম মানে না, শাস্ত্র মানতে চায় না, হামার বাত কেউ শসন করে নাই। জানেন বোলাইবাবু, অসহযোগ আন্দোলন কেন হোয়েছে? বাংগালী লোক হিংসা করে, বহুত

হট হেডেড জাত আছে। অসহযোগ আন্দোলন হোয়েছে আপনাদের ধরম শিখাতে, গরম মাথা ঠাণ্ডা বানাতে। এককড়িবাবু জেলমে এই সাচ্চা কথা বুঝেছেন, বাহার এসে সে কথা বলছেন।

বলাই মাথা নাড়িয়া বলিল, আপনার কথা বিলকুল ঠিক বালাচাঁদজী।

এককড়িবাবু আপোষের আলোচনার কথা তুলিলেন।

পণ্ডিত মালবীয় প্রমুখ তিন জন নেতা বড়লাটের কাছে ডেপুটেশনে গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছিলেন আপোষের আলোচনা চালাইবার জন্য একটি গোলটেবিল সভার ব্যবস্থা করা হউক। তাঁহাদের প্রস্তাব গৃহীত হইল না। একখানি কাগজ তাঁহাদিগকে টুলী ষ্ট্রীটের তিন দর্জির সঙ্গে তুলনা করিল। ইহার পর পণ্ডিত মালবীয় ও মিঃ জিন্না প্রমুখ কয়েকজন নেতা সকল দলের নেতাদিগকে একটি বৈঠকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল সকল দলের মধ্যে একটা আপোষ করিয়া গভর্মেণ্টের সঙ্গে আপোষের আলোচনা আরম্ভ করা। বোম্বাইতে স্যর শঙ্করণ নায়ারের সভাপতিত্বে বৈঠক বসিল। বৈঠকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রবল মত-বিরোধের ফলে বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল।

বলাই বলিল, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষের আশা দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং এখন কর্তব্য মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টা যাহাতে সফল হয় তাহার ব্যবস্থা করা। নেতাদের অনুপস্থিতিতে দেশবাসীকে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করিবার দায়িত্ব আমাদের উপর পড়িয়াছে। যথাশক্তি এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

সে বলিল, আমাদের এই জনের মধ্যে এককড়িবাবু প্রধান নেতার স্থান পাবার যোগ্য ব্যক্তি। লোক আকৃষ্ট করবার অসাধারণ শক্তি আছে ওঁর। ওঁর শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শুনতে যে পরিমাণ লোক সমাগম হয়েছিল তা থেকে একথা বলা যায়। বাস্তবিক এ রকম হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা আর কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। ভগবদ্দত্ত শক্তি না থাকলে এমন হয় না। আমার ভগ্নী পুরাণ ব্যাখ্যা শুনতে বড় ভালবাসে। এরপর যেদিন ব্যাখ্যা হবে তাকে নিয়ে আসব।

বলাইয়ের কথা শুনিয়া বালাচাঁদজী অতিশয় উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। উৎসাহের আতিশয্যে এককড়িবাবুর হাঁটুতে এক থাবড়া মারিয়া বলিলেন, বিলকুল সাচ্চা বাত বোলেছেন বলাইবাবু। এককড়িবাবু মহর্ষি বেদবিয়াসের অওতার।

কি ভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ সৃষ্টি করা

যায় সে আলোচনা হইল। বালাচাঁদজী বলিলেন, আমরা তিনজন এক দিল হইয়া কাজ করিলে সব কিছু করিতে পারি। এককড়িবাবুর কাগজ আছে, বলাইবাবুর সাফ মাথা আছে, আমি সামান্য ব্যক্তি, তবু পয়সা কড়ি যাহা খরচ করিতে হইবে শ্রীকিষণজীর অওতার মহাত্মা গান্ধীর অধীন সেবকরূপে আমি তাহা করিব।

তারপর বলিলেন, আমার একটা নিবেদন এককড়িবাবুর দরবারে পেশ করছি, কৃপা করে মঞ্জুর করবেন।

বালাচাঁদজী প্রস্তাব করিলেন আগামী সপ্তাহে তাঁহার মোকামে এককড়িবাবুর শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করা হইবে।

বলাই তাহার ভগ্নীকে ব্যাখ্যা শুনিতে আনিবার প্রস্তাবের পর বালাচাঁদজীর এই প্রস্তাব শুনিয়া এককড়িবাবু একবার অলক্ষ্যে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

স্থির হইল তাঁহারা তিনজন কংগ্রেস কমিটির আফিসে গিয়া কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করিবেন। এককড়িবাবু বলাইকে পরামর্শ দিলেন ফণীর দলকে হাত করিবার জন্য। বলাই বলিল, ফণীকে কোন কথা বললে আগে সে হাত পাতে। আমি শেয়ার বাজারে অনেক লোকসান দিয়েছি, "বলাই বিলাসের" জন্য অনেক খরচ হয়েছে। এদিকে কোম্পানীর অবস্থাও ভাল নয়। বড় বড় অনেক অসহযোগী রাজনীতিকরা প্রিমিয়াম দেয়া বন্ধ করেছেন, কিছু বলবার উপায় নেই। কোম্পানীর গাঁট থেকে উপস্থিত প্রিমিয়ামের টাকা বের করতে হচ্ছে। এক য দ বালাচাঁদজী অনুগ্রহ করেন।

বালাচাঁদজী বলিলেন ফণী তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলিতে রাজী হইলে টাকার কোন চিন্তা নাই।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর বলাই উঠিল। সে চলিয়া যাইবার পরেও বালাচাঁদজী ও এককড়িবাবু অনেকক্ষণ বসিয়া পরামর্শ করিলেন। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির ব্যাপার।

পরদিন সকালে ফণী আসিল বলাইয়ের সঙ্গে দেখা করিতে।

ফণী আসন গ্রহণ করিয়াই সরলাদেবীর বর্তমান দুরবস্থার কথা বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল, যাহারা ব্যারিষ্টার সাহেবের খাইয়া মানুষ, যাহারা নিজের দুর্দশার কথা জানাইয়া শীঘ্রই পরিশোধ করিবে বলিয়া মোটা মোটা টাকা হাওলাৎ লইয়াছে তাঁহার কাছে, আজ সরলা দেবীকে একটি টাকা দিয়াও তাহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নয়। যে বাড়ীতে লোকের ভিড়ে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল

ব্যারিষ্টার সাহেব জেলে যাইবার পর আজ সে বাড়ি পাওনাদার ছাড়া আর কেহ মাড়ায় না। তারপর বলিল, তাহার এক্স-বিপ্লোভাল্যুশনারী বন্ধুরা খাইতে পাইতেছে না। কোন দলই তাহাদিগকে খাইতে দিতে রাজি নয়। সেদিন একজন নেতা মুখের উপর বলিলেন তাহাদিগকে খাইতে দিলে হিংসাবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

বলাই বাধা দিয়া বলিল, বলে থাকলে তাতে এমন কি অপরাধ হয়েছে? হিংসাবাদের দিন চলে গেছে। এখনও যারা ঐ মতে বিশ্বাস করে তারা দেশের শত্রু।

ফণী বাধা পাইয়া চুপ করিয়াছিল। বলাইয়ের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিল, বলাইবাবু, হিংসাবাদীদের মুখের ওপর তাদের দেশের শত্রু বলা একটু দুঃসাহস নয় কি?

বলাই ফণীর ইঙ্গিত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, কথাটা আমার নয় ফণী, অন্য লোকের কথা বলছি। তারপর বলিল, এ সব তর্ক এখন থাক। সত্যিকারের কাজের প্রস্তাব করছি তোমার কাছে।

ফণী—কি প্রস্তাব

বলাই—কংগ্রেস মাস সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। মহাত্মা গান্ধী টুর করে বেড়াচ্ছেন। আন্দোলন আরম্ভ হবে। মহাত্মাজি আজ একা, সব বড় বড় নেতারা জেলে। সব তর্ক বিতর্ক বন্ধ করে মহাত্মাজীর সাহায্য করা কি আমাদের কর্তব্য নয়?

ফণী—কর্তব্য। কি করে সে কর্তব্য পালন করবেন?

বলাই উৎসাহিত হইয়া বলিল, আমরা নেতারা সেটা স্থির করব। তোমার দল যদি আমাদের সাহায্য করে, তারা যাতে অনাহারে না থাকে আমারা সে ব্যবস্থা করতে পারি।

ফণী—সে ব্যবস্থা হলে আমার বন্ধুদের রাজি করাবার চেষ্টা করব। তবে একটা কথা বলে রাখা—

বলাই—ব্যস, আর কোন কথা নয় যে কথাটুকু দিলে তাই যদি রাখ তাহলেই চলবে।

ফণী আর কোন কথা বলিল না।

বলাই বলিল চল, সরলাদেবীকে প্রণাম করে তার আশীর্বাদ নিয়ে আস।

ফণী মৃদুস্বরে বলিল, প্রণামী নিয়ে চলুন, খালি হাতে যাবেন না।

বলাই হাসিয়া বলিল, প্রণামী, আশীর্বাদী ছুটোরই ব্যবস্থা হবে যদি তোমরা নূতন নেতৃত্ব স্বীকার করে নাও।

উভয়ে হরিশঙ্করের গৃহের দিকে রওনা হইল। পথে গাড়ী থামাইয়া বলাই মিষ্টি ও ফল কিনিল।

হবিশঙ্কবেব গৃহে প্রবেশ কবিতে প্রথমেই পদ্মিনীব সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

অগ্রজকে দেখিয়া পদ্মিনী মুখ ফিবাইযা চলিযা যাইতেছিল, বলাই তাহাকে ডাকিল। সে কাছে আসিতে ফল ও মিষ্টি উপবে সরলাদেবীব কাছে লইযা যাইতে বলিল। তারপব বলিল, ব্যারিষ্টাব সাহেবেব খাসকামরায় চল। একটু কথা আছে।

ভৃত্যকে ডাকিয়া জিনিসগুলি উপবে লইয়া যাইতে বলিযা পদ্মিনী অনিচ্ছার সঙ্গে ভ্রাতাব অনুসবণ কবিল।

পকেট হইতে এক গোছা নোট বাহিব করিয়া পদ্মিনীর হাতে দিযা সে বলিল, এগুলো এখন তোমাব কাছে রাখ আমি চলে গেলে সবলা দেবীব হাতে দিযো আমাব প্রণামী বলে। আমাব আগেই আসা উচিত ছিল কিন্তু শবীব খুব খাবাপ হওযাতে সিমুলতলা যেতে হযেছিল। সবে ফিবছি।

পদ্মিনী নোটেব তাডা হাতে লইল। নোটগুলি হাতে পাইয়া তাহাব আনন্দ হইল। সযত্নে সে ভাব অগ্রজেব কাছে গোপন কবিবার চেষ্টা কবিল। সংসার খরচ চালাইবাব জন্য সরলাদেবী একে একে তাঁহার অলঙ্কাবগুলি বিক্রয কবিতে আবম্ভ কবিয়াছিলেন। হবিশঙ্কর জেলে যাইবার আগে বাডীটি বাঁধা পডিযাছিল। এই টাকাগুলি পাইযা তাঁহাব বড ভবসা হইবে। দেখিতে দেখিতে পদ্মিনীব মন হইতে অগ্রজেব উপর বিরূপ ভাব অন্তর্হিত হইবে। তাহার দাদাকে লোকে যতটা হীন চরিত্র বলিয়া মনে করে বাস্তবিক সে ততটা হীন চরিত্র নয।

পদ্মিনীব মনে যে পরিবর্তন ঘটিতেছিল তাহার মুখ দেখিয়া বলাইযেব তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে বলিল, আমি ওপরে প্রণাম কবতে যাব, তুমি একবাব দেখে এস উনি কি কবছেন।

সরলাদেবীকে প্রণাম কবিয়া ও তাঁহাব সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করিয়া উঠিবার মুখে বলাই বলিল, আমার শরীর বড় খারাপ হয়েছিল। হার্টেব দোষ হয়েছে স্যর নীলরতন বলেছেন। পদ্মিনী যদি কয়েকটা দিন বাড়ীতে থাকত—

সরলাদেবী ব্যস্ত হইয়া পদ্মিনীকে ডাকিয়া বলাইয়ের অনুরোধের কথা জানাইলেন। এত ব্যাপারের পর পদ্মিনী আপত্তি করিবার কথা ভাবিতে

পারিল না। সরলাদেবীকে আড়ালে ডাকিয়া তাঁহার হাতে টাকাগুলি দিয়া সে দাদার সঙ্গে গৃহে ফিরিল।

বলাই যখন পদ্মিনীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল ফণী হরিশঙ্করের গৃহে তাহার পুরাতন ঘরটিতে বসিয়াছিল। পদ্মিনীকে বলাইয়ের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সে উপরে গেল।

তাহাকে দেখিয়া সরলাদেবী বলিলেন, ফণী এস। বলাই অনেক খাবার দিয়েছে, খেয়ে যাও।

একটি সন্দেশ মুখে ফেলিয়া ফণী বলিল, বলাইবাবু ভগ্নীকে নিয়ে গেলেন দেখলাম।

সরলাদেবী বলিলেন, বলাইয়ের হার্টের অসুখ হয়েছে বললে, তাই পদ্মিনী গেল।

ফণী বলিল, হার্টের অসুখ? ওর হার্ট বলে কিছু আছে না কি? কি মতলবে আছে কে জানে?

সরলাদেবী একটু বিরক্ত হইলেন ফণীর কথা শুনিয়া। কোন উত্তর দিলেন না।

বোম্বাই কনফারেন্স ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ও গভর্ণমেণ্ট আপোষের আলোচনা করিবার কোন সুযোগ না দেওয়াতে দেশের অনেকে সন্তুষ্ট হইলেন। সরকারী দমননীতি অপেক্ষা নেতাদের দোলায়মান ভাব অনেককে বেশী নিরুৎসাহ করিয়াছিল আপোষের কথাবার্তা তাহাদের মনে আশঙ্কার উদ্রেক করিয়াছিল। আপোষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হইতে হইবে ইহা ভাবিয়া অনেকে খুশী হইল। ক্রমে নিরুৎসাহের ভাব কাটিয়া যাইতেছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া লিবারেল ও লয়ালিষ্ট কাগজগুলি বলিতে লাগিল—There is a talk of revolution in the air. It is not a bloodless revolution which is hinted at. At several places the masses have actually broken into methods of force. The new spirit cannot be ignored. (বাতাসে বিপ্লবের বার্তা শোনা যাইতেছে। এ বিপ্লব রক্তপাতহীন নয়। কতকগুলি স্থানে জনগণ হিংসার পথ গ্রহণ করিয়াছে। এই নূতন ভাব উপেক্ষা করিবার বিষয় নয়।)

কনেষ্টবলের লাঠি, সার্জেণ্টের বেটন, সশস্ত্র পুলিশের গুলি বর্ষণ, পাইকারী গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড, বিভিন্ন জেলে জেলে বেত্রদণ্ড, সব উপেক্ষা করিয়া কর্মীরা

প্রস্তুত হইতে লাগিল আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য। তাহারা বলিতে লাগিল, আপোষের কথা, হৃদয় পরিবর্তনের কথা অনেক হইয়াছে, আর নয়।

বলাই আজ কাল অতিশয় কর্মব্যস্ত। পদ্মিনী তাহার দাদার সংসারের ভার লইয়াছে। ভলান্টিয়ার দলের সঙ্গে যোগ দিয়া কাজ করিবার ইচ্ছা তাহাকে আপাততঃ দমন করিতে হইয়াছে। বলাই আশ্বাস দিয়াছে শীঘ্রই কাজ করিবার সময় আসিবে, শুধু পদ্মিনী কেন দেশের প্রত্যেকটি লোকের কাজ করিবার সুযোগ আসিবে। পদ্মিনী সকালে উঠিয়া কাগজ পড়িতে বসে দেশের কোথায় কি হইতেছে জানিবার জন্য। সে দিন কাগজ খুলিয়া তাহার চোখে পড়িল ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত একটি বিবৃতি আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে। বিবৃতির নীচে এককড়িবাবু, বলাই সরকার ও বালাচাঁদ পটপটিয়ার নাম দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। তাহার আনন্দ হইল এই ভাবিয়া যে তাহার দাদা তাহা হইলে সত্যই দেশের কাজে নামিয়াছে। আনন্দ সে মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিল না, দাদার কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

বলাই সস্নেহে ভগ্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, আমাদের বড় বড় নেতারা সব জেলে, আমরাও যদি চুপ করে বসে থাকি দেশের কি উপায় হবে? আমাদের সাহায্য না পেলে মহাত্মাজী কি করে তাঁর আন্দোলন চালাবেন?

দাদার কথা শুনিয়া পদ্মিনীর মন উৎসাহে ও আনন্দে পূর্ণ হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য বলাই সে দিন সভগ্নী বালাচাঁদজীর গৃহে উপস্থিত হইল। তিনি মহা সমাদর করিয়া উভয়কে গ্রহণ করিলেন।

- এককড়িবাবুর সুমিষ্ট, উদাত্তস্বরে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও বালাচাঁদজীর আন্তরিক আদর আপ্যায়নে পদ্মিনী মুগ্ধ হইল।

ব্যাখ্যার পরে শ্রোতারা চলিয়া গেলে আলোচনা আরম্ভ হইল। আলোচনা শুধু অন্তরঙ্গ দলের মধ্যে, পদ্মিনী ছাড়া বাহিরের লোক কেহ নাই। বালাচাঁদজী পদ্মিনীকে তাহার মতামত জানাইবার জন্য আহ্বান করিলেন, পদ্মিনী ভাবিল ইঁহারা কত মহৎ লোক। তাহাকেও অন্তরঙ্গদের সভায় সমান মর্যাদা দিতে কৃপণতা করিলেন না।

আলোচনার বিষয় কি ভাবে আইন অমান্য আন্দোলনকে সফল করা যায়। আলোচনার শেষে বালাচাঁদজী ঘোষণা করিলেন বড়বাজারে এক লক্ষ কর্মী আছে তাঁহার হাতে। শ্রীকিষণজীর অওতার মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন সফল করিবার জন্য এই লক্ষ কর্মীকে তিনি এককড়িবাবু ও পদ্মিনী দেবীর হাতে

তুলিয়া দিতে প্রস্তুত। তাঁহার যাহা কিছু আছে ধন দৌলত তিনি পদ্মিনী দেবীর হাতে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত, তিনি স্বয়ং তাঁহার অধীনে দীন সেবকরূপে কাজ করিতে প্রস্তুত।

বড়লাটের কাছে মহাত্মা গান্ধীর চরম পত্র প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহের বন্যা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এককড়িবাবুর কাগজে প্রতিদিন বলাই সরকারের বড় বড় বিবৃতি প্রকাশিত হইতে লাগিল দেশবাসীকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া। পদ্মিনী কাজ পাইল। গভীর রাত্র পর্যন্ত জাগিয়া সে গোপনীয় বুলেটিন ও পোষ্টারের কপি করিতে লাগিল। কাজের মধ্যে একটু ছেদ পড়িত যখন বালাচাঁদজী স্বয়ং আসিয়া তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইতেন ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য।

ফণী সদলবলে নূতন নেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। নিষেধ অমান্য করিয়া পিকেটিং, শোভাযাত্রা, সভা হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে বেটনধারী সার্জেন্ট-দিগকে প্রহার করা হইতে লাগিল। সরকারী উৎপীড়ন আইনের, ভদ্রতার, মনুষ্যত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া ক্রমে যত উগ্র হইতে লাগিল কর্মীদের সঙ্কল্প ও প্রতিরোধ তত দৃঢ় হইতে লাগিল। ঘাতপ্রতিঘাতে দেশের বাতাস তাতিয়া উঠিল। নানা স্থানে গুলি চালনার সংবাদ ইন্ধন যোগ করিতে লাগিল কর্মীদের অবরুদ্ধ আক্রোশের অগ্নিতে। সরকার পক্ষ যেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে কতদিন নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলন নিরুপদ্রব থাকিতে পারে তাহাদের উপদ্রবের সম্মুখে তাহারা দেখিবে। বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না। সারা দেশ জুড়িয়া সরকারী বাহনদের তাণ্ডবের কাহিনী ছাপাইয়া চৌরিচৌরার ঘটনার কথা বড় হইয়া প্রকাশ পাইল। যাঁহারা উচ্চ আধ্যাত্মিক মঞ্চ হইতে আন্দোলনের সমালোচনা করিয়া, নেতাদের ত্রুটি উদ্ঘাটন করিয়া দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করিতেছিলেন, চৌরিচৌরার সংবাদ পড়িয়া তাঁহারা অকৃত্রিম আতঙ্ক প্রকাশ করিলেন।

চৌরিচৌরার খাণ্ডব দাহন আরম্ভ হইতে না হইতে পর্জন্যদেব অপর্যাপ্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন, প্রচুর ধূম উদগিরণ করিতে করিতে অগ্নি নিভিয়া গেল।

সরকারী উদ্যমে বার্দৌলি সিদ্ধান্ত দেশের সর্বত্র সুপ্রচারিত হইয়া কর্মীদলের ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা হইল।

বলাই সরকার, এককড়িবাবু ও বালাচাঁদজী যেন বার্দৌলি সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী এই ভ্রমাত্মক ধারণায় ফণী সিংহের এক্স-রিভোল্যুশনারী দল ক্রুদ্ধ হইয়া

তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে সংবাদ পাইয়া বালাচাঁদজী স্বগৃহের মির্জাপুরী দারোয়ানের উপব ভরসা না করিয়া গোপনে অর্থগর্ভ দরবার কবিয়া রিভলভাবধারী সার্জেন্ট পাহারাব ব্যবস্থা করিলেন এবং কিছু নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীমদ্ভগবত ব্যাখ্যা করিবার জন্য এককড়িবাবুকে ও তাহা শুনিবার জন্য সভগ্নী বলাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

বলাই ফণীর দলকে বিশেষ ভয় কবিত। নানা কাজে তাহাকে সর্বদা বাহিরে যাইতে হয়, বালাচাঁদজীব মত ঘবে বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিলে তাহার চলে না। সে দিন বালাচাঁদজীর নিমন্ত্রণ পাইয়া ভগ্নীকে তাঁহার নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিয়া বলাই পবিচিত এক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচাবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল।

সেই দিনই সে ফোনে খবর পাইল সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ দলবল সহ ফণী সরকাবী অতিথিশালায় নীত হইয়াছে। নিশ্চিন্ত হইয়া ভগ্নীকে আনিবার জন্য বালাচাঁদের গৃহে গিয়া সে শুনিল বাত্রে কোন এক শেঠজীর মোকামে শাস্ত্র ব্যাখ্যা হইবে, বালাচাঁদজী সবাইকে লইয়া সেখানে গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন বলিয়া যান নাই।

অনেক রাত্রে একখানি গাডী আসিযা বলাইয়ের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হর্ণ দিতে লাগিল। ভৃত্যের ডাকাডাকিতে তাহাব ঘুম ভাঙ্গিযা গেল। বলাই নীচে আসিয়া দেখিল বালাচাঁদজী দাঁড়াইয়া।

বালাচাঁদজী সকাতবে জানাইলেন বড বিপদ হইয়াছে। হনুমানদাস বাম দাস শেঠজীর মোকামে শেঠানী ও পদ্মিনী দেবীকে লইয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইলে শেঠজী সবাইকে সববৎ পরিবেশন কবিলেন। তারপব সকলে তাঁহার মোকামে ফিরিলেন পদ্মিনী দেবীকে বাড়ী পৌছাইয়া দিবেন বলিয়া তিনি অপেক্ষা কবিতেছেন, শেঠানী খবর দিলেন পদ্মিনী দেবীর তবিয়েৎ খারাপ লাগিতেছে। তখনই তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিবাব আগেই পদ্মিনী দেবী বেহুঁস হইয়া গেলেন। ডাক্তাবের দাওয়াইতে হুঁস ফিরিল না। বাব দুই ভেদ হইল মাত্র। তখন শেঠানী বলিলেন, বলাইবাবু আসিয়াছিলেন, দেরি দেখিয়া তিনি ভাবিবেন, তুমি ডাক্তার ও দাই লইয়া উঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাও। তিনি এই পরামর্শ ভালু মনে করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া তাঁহাকে আনিয়াছেন। ডাক্তাব বলিতেছেন আসিবার সময়ে খোলা হাওয়া গায়ে লাগিয়া উঁহার হুঁস ফিরিয়াছে, তবে সম্পূর্ণ ফিরে নাই।

গাড়ীর কাছে গিয়া বলাই দেখিল দাই বলিয়া বর্ণিত স্ত্রীলোকটির কাঁধে মাথা রাখিয়া পদ্মিনী বসিয়া আছে, ডাক্তার নীচে নামিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভ্রাতার গলার স্বর শুনিয়া পদ্মিনী মাথা উঠাইতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

বলাই পদ্মিনীর পরিচারিকাকে ডাকিল। দাই ও তাহার সাহায্যে পদ্মিনীকে তাহার শয়ন কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি ঔষধ খাওয়াইবার ও পরিচর্যার ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। বলিলেন, সরবতের সঙ্গে হয়ত কোন বিষাক্ত জিনিস ছিল, তাহার ফলে পদ্মিনী অসুস্থ হইয়াছেন। কয়েক বার বমি হইয়া উহা বাহির হইয়া গিয়াছে। আর ভয়ের কারণ নাই, তবে বিশ্রাম আবশ্যক। তিন চার দিন উঁহাকে বিছানা হইতে উঠিতে দিবেন না।

বালাচাঁদজী বলাইয়ের কাছে বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ও শ্রীরামজীর কাছে পদ্মিনীজীর দ্রুত আরোগ্য লাভের প্রার্থনা জানাইয়া গাড়ীতে উঠিয়েছে, দাই মেয়েদের ব্যবহৃত একটি ব্যাগ হাতে লইয়া জানাইল বাঈ এটি ফেলিয়া গিয়াছেন। বালাচাঁদজী উহা বলাইকে দিলেন। বলাই পরিচারিকাকে ডাকিয়া ব্যাগটি দিদিমণির বিছানার পাশে রাখিতে বলিল।

আবার নমস্কার জানাইয়া ডাক্তার ও দাইকে লইয়া বালাচাঁদজী চলিয়া গেলেন। বলাই ভগ্নীর ঘরে গিয়া দেখিল সে চুপ করিয়া শুইয়া আছে। পরিচারিকা ইঙ্গিতে জানাইল সে ঘুমাইতেছে।

কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বলাই আবার শয়ন করিতে যাইতেছে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এককড়িবাবু তাঁহার অফিস হইতে কথা বলিতেছেন। বলাই বিস্মিত হইয়া বলিল, এত রাতে আপনি অফিসে, কি ব্যাপার মশাই?

এককড়িবাবুর উত্তর শুনিয়া বলাই বলিল, বলেন কি মশায়? মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হয়েছেন? এত দিন অপেক্ষা করে শেষে আন্দোলন বন্ধ করবার পর গভর্ণমেণ্ট তাঁকে ধরলেন?

এককড়িবাবু কি বলিলেন। বলাই বলিল, আপনার কথা বোধহয় ঠিক। যারা আন্দোলন চালাচ্ছিল তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে, কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ করবার সিদ্ধান্ত করায় কর্মীরা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। গভর্ণমেণ্ট এটা ভাল করে লক্ষ্য করেছেন। এই অসন্তোষ গভর্মেণ্টের কাছে শাপে বর হয়েছে। তাই এর আগে যা করতে তাদের সাহস হয়নি এখন সেই সাহস হয়েছে।

এককড়িবাবু আবার কি বলিলেন। বলাই বলিল, এর মধ্যে আপনার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা চলছে? আচ্ছা, সেটা পড়ে আমি আমার বিবৃতি লিখে পাঠাব।

এককড়িবাবু কি বলিলেন। উত্তরে বলাই বলিল, সন্ধ্যার আগে আমার বিবৃতি চান? আচ্ছা তাই হবে! এবার ছেড়ে দিচ্ছি, বড্ড ঘুম পেয়েছে মশাই।

রিসিভার রাখিয়া বলাই শয়ন করিবে, দরজায় টোকা পড়িল। পদ্মিনীর অসুখ বাড়িয়াছে ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিল। পদ্মিনীর পরিচারিকা বলিল, দিদিমণির বেশ জ্ঞান হয়েছে, আপনি কার গ্রেপ্তারের কথা বলছিলেন তিনি জানতে চাইলেন।

পরিচারিকার কথা শুনিয়া বলাই নিশ্চিন্ত হইল। একটু হাসিয়া বলিল, দিদিমণির বেশ জ্ঞান হয়েছে? আচ্ছা, তাকে বলো মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদে পরিচারিকা উত্তেজিত স্বরে বলিল, গাঁধি রাজা গ্রেপ্তার?

খবর জানাইবার জন্য সে চলিয়া গেল।

পরদিন সংবাদপত্রগুলিতে বড় বড় অক্ষরে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রকাশিত হইল।

হাত মুখ ধুইয়া চা খাইয়া বলাই কাগজগুলি দেখিতে লাগিল। এককড়িবাবুর কাগজ খানি খুলিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপর সে চোখ বুলাইল।

বার্দৌলি সিদ্ধান্ত

জাতীয় জীবনের আধ্যাত্মিক সঙ্কটে সবরমতীর ঋষির দিব্যবাণী।

প্রবন্ধটি মনযোগ দিয়া পড়িয়া বলাই এককড়িবাবুর রচনার মুন্সীয়ানার প্রশংসা করিল মনে মনে। ভাবিল, ভদ্রলোকের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, যে বিষয় লইয়া লিখুন, যে মত প্রচার করুন, তাহার সমর্থনে ভূরি ভূরি গুরুগম্ভীর শাস্ত্রবচন মজুদ রহিয়াছে তাঁহার ভাণ্ডারে।

প্রবন্ধটি পড়া শেষ করিয়া সে কিছুক্ষণ ভাবিল। তার পর লিখিবার প্যাড লইয়া নিজের বিবৃতি রচনা করিতে বসিল। শিরোনামা লিখিল

বাপুজীর কারাবরণের পর জাতির কর্তব্য

শিরোনামা লিখিয়া কলমটি একবার ঝাড়িল। তারপর খসখস করিয়া লিখিতে লাগিল।

রচনা শেষ করিয়া বলাই যখন উঠিল তখন বেলা হইয়াছে। কাগজগুলির উপরে দ্রুত চোখ বুলাইয়া সে স্নান করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তেল মাখিতে মাখিতে তাহার মনে হইল আজ অফিস বন্ধ রাখা ভাল। তখন অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে ফোনে ডাকিয়া বলিল আজ মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের জন্য হরতাল। অফিস হবে না, মুখে সবাইকে জানিয়ে দিবেন, লিখিত নোটিশ দিবেন না।

স্নান শেষ করিয়া আহারে বসিতে গিয়া তাহার মনে হইল পদ্মিনীর শরীর ভাল নয়, সেও সকালে খাইয়া লইতে পারে।

পদ্মিনীর ঘরের সম্মুখে গিয়া সে দেখিল দরজা খোলা, ঘরে কেহ নাই। বলাই ভাবিল বোধহয় পদ্মিনী স্নান করিতে গিয়াছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে পদ্মিনীর পরিচারিকাকে ডাকিল। পরিচারিকা জানাইল দিদিমণি সকালে উঠিয়া স্নান করিয়া বাহিরে গিয়াছেন কাহার সহিত দেখা করিতে।

খবর শুনিয়া বলাই অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কাল অত রাত অবধি যে বেহুঁস ছিল সকালে উঠিয়া সে বাহিরে গেল। ভাবিতে ভাবিতে সে ফিরিয়া আসিয়া আহারে বসিল।

কিছুক্ষণ পরে পদ্মিনীর পরিচারিকা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একখানি নোট দেখাইয়া বলিল, দিদিমণির বিছানার নীচে এখানা পড়ে ছিল, নোট বলে মনে হচ্ছে। এমন নোট তো দেখিনি।

আগাইয়া আসিয়া সে নোটখানি বলাইয়ের হাতে দিল। বলাই দেখিল একখানি হাজার টাকার নোট। তাহার বিস্ময় চরমে উঠিল। পদ্মিনীর কাছে হাজার টাকার নোট! কোথা হইতে এ নোট আসিল? বিছানার নীচে গেল কি ভাবে?

আহার্য সম্মুখে রাখিয়া হাত গুটাইয়া বলাই ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ কি একটা কথা মনে হইতে তাহার চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন হইল। মুখের সমস্ত রক্ত সরিয়া গিয়া মুখ ফ্যাকাশে, মড়ার মুখের মত হইল। বিড়বিড় করিয়া সে স্বগত বলিল, বালাচাঁদ? বালাচাঁদ শয়তান?

আসন হইতে উঠিয়া সে পদ্মিনীর ঘরে প্রবেশ করিল। পাতি পাতি করিয়া সে ঘরের জিনিসপত্র উল্টাইতে লাগিল।

বলাই যখন এই কাণ্ড করিতেছিল, সরলাদেবী তাঁহার গৃহে একখানি চেয়ারে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া কি ভাবিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ আগে ভৃত্য একটি মেয়েদের ব্যাগ তাঁহার হাতে দিয়া বলিয়াছিল পদ্মিনী দিদিমণি বললেন মার হাতে এটা দেবে, আমি একটু পরে আসছি।

সরলা দেবী ব্যাগ খুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন একতাড়া একশ' টাকার নোট, সঙ্গে একখানা চিঠি।

চিঠি খুলিয়া পড়িলেন, আপনার এখন বড় অভাব। টাকাটা আপনি ব্যয় করিবেন। ফণীবাবুর দলের যাঁহারা এখনও বাহিরে আছেন ও খাইতে পাইতেছেন না তাঁহাদিগকে কিছু দিবেন। আমার মানুষরূপী শয়তান ভ্রাতা ও তাহার শয়তান বন্ধুদের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। জেলের পথ ধরিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম আমি সে পথের যোগ্য নই। তাই গঙ্গার পথ ধরিলাম। আমার শত দোষত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

পত্র পড়িয়া সরলাদেবী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তারপর ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবির দিকে চাহিয়া মনে মনে কি প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল।

চতুর্থ খণ্ড

এক

অতসীকুঞ্জ (১৯২৩-২৪)

বন্যাব জল নামিয়া গিয়াছে। তার পবের একটি কাহিনী আরম্ভ হইল।

মনোহর পুকুর বোডের উপব সুদৃশ্য একখানি বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী।

বাড়ীব সম্মুখে ও পাশে খানিকটা কবিযা খোলা জমি। এই খোলা জমিতে ফুলের বাগান তৈযারী হইযাছে। বাগানেব মধ্যে লাল সিমেণ্ট বাঁধানো ইটের বেঞ্চি বসিবার জন্য। বেঞ্চিব চাবিদিকে লাল রং কবা মাটির টবে এরেকা পামের গাছ পবিপাটি কবিযা সাজানো। সম্মুখে একটা বুগেনভিলিয়ার ঝাড়, এখনও বেশী বড হয নাই। রাস্তা হইতে বাড়ীটিব দিকে চাহিলে মনে হয বেশ শৌখিন লোকের বাড়ী। ফটকেব উপর সাদা মার্বেলের প্লেটে বাড়ীর "অতসী কুঞ্জ" নামটি পডিযা এই ধারণা আবও দৃঢ হয।

ধারণা মিথ্যা নয। অতসী কুঞ্জেব মালিক রাধেশ শুধু শৌখিন নহে, একজন কবিও বটে। আগে তাহার কবিত্বেব খ্যাতি পাডায সীমাবদ্ধ ছিল, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া ছয মাস জেল খাটিযা ফিবিবাব পবে খ্যাতির পরিধি বিস্তৃত হইযাছে। শুধু তাহাব প্রতিবেশী ও বন্ধু আজন্ম সিনিক বিরাজ এখনও বিদ্রূপ কবিযা তাহাকে আডালে কবি-বাজ বলিযা থাকেন।

অতসী কুঞ্জেব অধিবাসী মাত্র দুইটি প্রাণী, রাধেশ ও তাহার ভগ্নী হৈমন্তী। রাধেশ বিপত্নীক। স্বর্গতা পত্নী অতসীব নামে বাড়ীর নাম বাখিযাছে। হৈমন্তী শিক্ষিতা, বযস্থা, অবিবাহিতা। বাধেশ কবি, হৈমন্তী রাজনৈতিক কর্মী। সেও ছয় মাস জেল খাটিয়া কিছুদিন আগে মুক্তি পাইয়াছে।

শুধু রাধেশ ও হৈমন্তী কেন অতসী কুঞ্জের প্রতিবেশিত্ব বা বন্ধুত্বের দাবিতে যাহারা যাতায়াত করিত, যেমন বিরাজ, ভানু, রাধামোহন প্রভৃতি, সকলেই জেল ফেরত। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল আকর্ষণ ব্যক্তিগত মতামত ও চরিত্রের পার্থক্য সত্ত্বেও ইহাদের সকলকে সরকারী অতিথিশালায় পৌছাইয়া দিয়াছিল। দুই চার সপ্তাহ আগে মুক্তি পাইয়া আবার সকলে পুরাতন জীবনের ছিন্ন সূত্র জোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল।

হাঁ, চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু জোড়া ঠিকমত লাগিতেছিল না। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানের দুর্নিবার আকর্ষণে সকল স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া তাহারা এক পথে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু কয়েক মাস জেল খাটিয়া বাহিরে আসিবার পরে দেখা গেল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত ও চরিত্রের পার্থক্য যেন আরও প্রবল হইয়াছে।

রাধেশের কথা না বলিলেও চলে। অসহযোগের আগে সে কবিগুরুর হস্তাক্ষর নকল ও ভাষা চুরি করিয়া প্রেমের কবিতা লিখিত। স্ত্রী অতসী তখন জীবিতা। সে চোখের সম্মুখে থাকিতে কবিতা লিখিবার অন্য কোন সবজেক্টের কথা সে ভাবিতেই পারিত না।

তারপর একদিন অতসী আঁতুড়ে মারা গেল। কবির কাকলি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কিছুকাল পরে আসিল অসহযোগ আন্দোলন ও হৈমন্তীর হস্ত চালিত চরকার সঙ্গীত। নিঃসাড় কবির প্রাণে আবার সাড়া জাগিল। কবি সত্যেন্দ্র দত্তের অনুকরণ করিয়া সে অসহযোগের কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিল। হৈমন্তীর সঙ্গে খদ্দর ফেরি করিতে গিয়া তাহাকে জেলে যাইতে হইল। কাব্য চর্চা বন্ধ হইল সাময়িকভাবে। মুক্তি পাইবার পরে বেশ কিছুদিন কাটিল শরীর শুধরাইতে। শরীর শুধরাইলে অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে একখানি মহাকাব্য রচনা করিবার অভিপ্রায়ে সে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে বিখ্যাত এপিকগুলি পড়িতে আরম্ভ করিল।

জেল খাটিয়া আসিয়া রাধেশ কবিতা লেখা ছাড়িল না। জেল খাটিয়া আসিয়া হৈমন্তী অসহযোগ ছাড়িল না। অনেক অসহযোগী মেয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়াছিল জেলে; তাহাদের কয়েকটিকে জুটাইয়া লইয়া সে কাজ করিতে লাগিল। অর্থাৎ জেলে যাইবার আগে সে অসহযোগ আন্দোলন করিতেছিল। মুক্তি পাইয়া আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মসূচী বাদ দিয়া সে গঠনমূলক আদর্শ অনুসরণ করিল।

রাধেশের প্রতিবেশী ভানুও জেলে গিয়াছিল অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া। জেলে যাইবার আগে ভানু ছিল স্বভাবকর্মী। অর্থাৎ তাহাকে না হইলে পাড়ার কোন আয়োজন, কোন উৎসবের বা শোকের অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব হইত না। সে ছিল সদানন্দ স্বভাবের, সমান সৌহার্দ্যের সঙ্গে সকলের সঙ্গে মিশিত। জেল হইতে ফিরিয়া ভানুর চরিত্রের পরিবর্তন হইল। তাহার কর্ম

প্রেরণা ও আনন্দ পূর্বের মত পাড়ায় ব্যাপ্ত না হইয়া পাড়ার একটি বিশেষ গৃহকে আশ্রয় করিয়া কেন্দ্রীভূত হইল। এই বিশেষ গৃহটি অতসী কুঞ্জ।

একটু বিশদ করিয়া বলিলে এই দাঁড়ায় যে ভানুর উত্তরজেল জীবন অতসী কুঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া নূতন ভাবে গঠিত হইতেছিল। অতসী কুঞ্জ মানে হৈমন্তী। পূর্বে ভানু ছিল প্রতিবেশী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া সে হৈমন্তীর সঙ্গে বেশী করিয়া মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইহার ফলে জেলে বাস করিবার সময়ে সে কল্পনায় নিজেকে হৈমন্তীর বিশেষ অনুগ্রহভাজনের আসনে উঠাইয়াছিল। জেলের বাহিরে আসিয়া হৈমন্তীর দিক হইতে তাহার প্রত্যাশিত সাড়া না পাইয়া ভানু বিস্মিত হইল। তখন হইতে ভানুর চরিত্রে দ্বিতীয় পরিবর্তন ঘটিল। জেলে যাইবার দলে ভিড়িয়া অসহযোগ করিলেও ভানুর রাজনৈতিক মতামতের কোন বালাই ছিল না। যখন ভানু আবিষ্কার করিল এতদিন যে দুইজনকে বন্ধু ও সহকর্মী ভাবিয়া সে শ্রদ্ধা করিয়াছে সেই বিরাজ ও রাধামোহন তাহার প্রতিদ্বন্দী, তখন হইতে তাহার রাজনৈতিক মতামত গঠিত হইল।

হৈমন্তী মহাত্মাজীর নিষ্ঠাবতী ভক্ত; ভানু অনুভব করিল সেও মহাত্মাজীর নিষ্ঠাবান ভক্ত। কিন্তু বিরাজ জেল খাটিলেও সংশয়বাদী, আর রাধামোহন নন্‌কো করিয়া জেল খাটিলে কি হইবে, সে হিংসাবাদী। নিজের মনে এই দুই প্রতিদ্বন্দীকে এইভাবে হৈমন্তীর সঙ্গে অপাঙক্তেয় করিয়া ভানু খুশী হইল, আশা করিল শীঘ্রই হৈমন্তীর চোখেও তাহারা অপাঙক্তেয় হইবে। হৈমন্তীর কাছে তাহাদিগকে অপাঙক্তেয় করিবার কাজকে সে মিশন স্বরূপ গ্রহণ করিল। দুই প্রতিদ্বন্দীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে হৈমন্তীর অগ্রজ রাধেশের সাহায্য পাইবার আশায় সে তাহার কাব্যের ভক্ত হইয়া উঠিল।

বিরাজ আগে অভিজাত পাড়ায় এক আত্মীয়ের গৃহে বাস করিত। বছর তিনেক হইল মনোহরপুকুর রোডে অতসী কুঞ্জের অনতিদূরে বাড়ী করিয়াছে। বিত্তবান পরিবারের লোক, বাল্যাবধি অভিজাত মহলে মানুষ বিরাজ। মনোহরপুকুর রোডে বাড়ী করিয়া বড় ডেমোক্রেটিক কীর্তি করিয়াছে এই রকম একটা ভাব যেন সে দেখাইতে চাহে; ভাষায় এই ভাব প্রকাশ না পাইলেও তাহার সুগঠিত, তীক্ষ্ণ নাসিকাটি কুঞ্চিত করিবার ভঙ্গী দেখিয়া মনোহরপুকুর রোডের আদি ও অকৃত্রিম অধিবাসীদের কেহ কেহ একথা মনে না করিয়া পারিতেন না। বিরাজের এই তথাকথিত উন্নাসিকতার একটি কারণ ছিল আদি মনোহরপুকুরীয়ানদের মতে। বিরাজ বিখ্যাত সবুজ সংসদের সভ্য। শিক্ষিত

সমাজের কাহারও অজানা ছিল না যে বাংলাদেশের সেরা ইনটেলেকচুয়ালদের মজলিস সবুজ সংসদ, এবং এই মজলিশের প্রাণ সবুজ সংসদের সভাপতি বাংলা সাহিত্যে নূতন রীতি ও ধারার প্রবর্তক ব্যারিষ্টার মি. চ্যাটার্জি। অভিজাত পাড়ায় মি. চ্যাটার্জির সুরম্য ভবনে সবুজ সংসদের সাপ্তাহিক মজলিস বসিত। সবুজ সংসদের ভালমন্দ সব কিছু বিরাজ গ্রহণ করিয়াছিল। সবুজ সংসদের দেশজোড়া প্রতিষ্ঠা দেখিয়া একদল সমালোচকের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন ইনটেলেক্টের বড়াই, ভাল জিনিসকে ব্যঙ্গ করিয়া খেলো প্রতিপন্ন করিবার অভ্যাস সবুজ সংসদের বৈশিষ্ট্য, উন্নাসিকতা তাহার ট্রেডমার্ক।

বার্দৌলী সিদ্ধান্তের ঘোষণা ও মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর জেল হইতে ছাড়া পাইয়া বাহিরে আসিলে লোকে দেখিল অসহযোগী বিরাজের উগ্র পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে চরকা টানিয়া উঠানে ফেলিয়া দিল, খদ্দরের জামা কাপড়গুলি ভিক্ষুকদের দান করিল, স্বদেশী বিড়ি ছাড়িয়া আবার বিলাতী সিগারেট ধরিল। এ যেন যেমন প্রবল আকর্ষণ তেমনি প্রবল বিকর্ষণ অসহযোগী হইয়া সে ধুতি পরিত। এখন ইংরাজি পোশাক পরিয়া বিলাতী সিগারেট টানিতে টানিতে আগের মত অতসীকুঞ্জে হাজিরা দিতে লাগিল। হৈমন্তীর কটাক্ষ সে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, রাধেশের মহাকাব্যের আবৃত্তি শুনিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসে। ভাল মানুষ রাধেশ কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ম্লানমুখে কবিতার খাতা লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া যায়।

রাধামোহন মনোহরপুকুর রোডের অধিবাসী নহে। তাঁহার ছোট পিসী ভানুদের বাড়ীর কয়েকখানা পরের বাড়ীর ভাড়াটিয়া। রাধামোহন ছোট পিসীর বাড়ীতে থাকিয়া পড়িত। স্বভাবকর্মী ভানুর মাধ্যমে অতসী কুঞ্জের সকলের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছিল। আগে বছর খানেক সে বিনা বিচারে বন্দী ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের গোড়াতে সে জেলে গিয়াছিল। ছাড়া পাইয়া মাস কয়েক বাহিরে থাকিবার পরে আবার সে জেলে প্রবেশ করিল নয় মাসের জন্য। যেন তাহার দেখাদেখি গোটা অতসীকুঞ্জ সার্কেল জেলে প্রবেশ করিল। আর সকলে মুক্তি পাইবার মাস তিনেক পরে মুক্তি পাইয়া রাধামোহন দিন কয়েক পরে কোথায় অন্তর্ধান করিল কেহ জানে না।

রাধামোহন এইভাবে অন্তর্ধান করায় অতসীকুঞ্জ সার্কেলের অন্য সকলের চাইতে বেশী বিস্মিত হইল স্বয়ং হৈমন্তী। রাধামোহনের ছোট পিসীর কাছে সে মাঝে মাঝে জানিতে যাইত তাঁহার পলাতক ভ্রাতুষ্পুত্রের

কোন খবর পাইলেন কিনা। ছোট পিসী বড় সাদাসিধা ভাল মানুষ, বয়সও হইয়াছে যথেষ্ট। সংবেদনশীল শ্রোত্রী পাইয়া তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে নিজের অভিযোগগুলি প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন।

বলিতেন, রাধুর সঙ্গে তোমাদের ক'দিনের আলাপ বাছা, তাই তোমরা তাকে চিনতে পারো নি, আমার কাছে এয়েছ তার খবরের জন্য। মা মরা ছেলে, দুরন্ত স্বভাবের জন্য সৎমা দেখতে পারে না, তাই নিজের কাছে আনলাম। সে কবেকার কথা। ছোট থেকে এত বড় করে তুলেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি। কত আশা করেছিলাম ও টাকা পয়সা কামাই করবে, বিয়ে থা করে সংসারী হবে। হরি বলো! লেখাপড়ায় ভারী মাথা ওর, কিন্তু হলে কি হবে? ছেলেবেলার সেই দুরন্তপনা গেল না। আমি বলি, হাঁরে রাধু, এমন করে ডোকলার মত যদি ঘুরে বেড়াবি তোকে মানুষ করলাম কি আশায়? একগাল হেসে হতভাগা বলে, কেন, মুখে আগুন পাবে আশায়! শুনলে কথার ছিরি! কি কথা বলছিলাম? হাঁ, লেখাপড়ায় ওর ভারী মাথা। সেই যেবার যুদ্ধ শেষ হবে-হবে শোনা গেল জলপানি নিয়ে ও তিনটি পাশ করল। ওর বাপ লিখল, রাধুকে একবার পাঠিয়ো দিদি, অনেকদিন দেখি না। বুঝলাম ছেলের ভাল পাশ করবার খবর পেয়ে বাপের সাধ হয়েছে ছেলের কামাই খাবে। এত যদি দেখবার সাধ এতদিন খবর নাওনি কেন বাপু? বাপের চিঠির কথা শুনে রাধু বলল, আচ্ছা পিসী দু'একদিন ঘুরে আসি। আমি বললাম, আচ্ছা এসো। ছেলে তো বাপের কাছে যাবে বলে গেল। ক'দিন পরে পুলিশ এসে বাড়ী তোলপাড়। শুনলাম রাধু গেরেপতার হয়েছে। রাজার সঙ্গে লড়াই করবে বলে কোন দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে নাকি বোমা বানাচ্ছিল।

হৈমন্তী—পুলিশ কোন প্রমাণ পেয়েছিল?

পিসী—কে জানে বাছা? সবাই জানে পুলিশ একবার কাউকে ধরলে তার আর রক্ষা নেই। মামলা মোকদ্দমার কোন কথা নেই শুধু শুধু রাধুকে এক বছর জেলে আটক রাখল। যখন ছেড়ে দিল তখন যুদ্ধ থেমে গেছে। কিছুক্ষণ পরে তোমাদের চরকা কাটার হাঙ্গামা আরম্ভ হল, ছোঁড়া আবার ফাটকে গেল।

হৈমন্তী—সে খবর জানি। উনি হিংসার পথ ছেড়ে অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

পিসী—হিংসে অহিংসের কথা কি বুঝিনে বাছা, তবে এটা বুঝি দেশের কাজে নামলেই জেলে যেতে হয়।

মাসখানেক পরে হৈমন্তী আবার আসিল রাধামোহনের কোন খবর পাওয়া গেল কিনা জানিবার জন্য। পিসী জানাইলেন রাধুর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

হৈমন্তী—আপনি তাঁকে মানুষ করলেন, এতদিন গেল একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না। কোন মায়া দয়া নেই পিসীর ওপর।

পিসী মুখ তুলিয়া হৈমন্তীর মুখের দিকে চাহিলেন। স্মিতহাস্যে বলিলেন, বুড়ী পিসী কেন বাছা, আরো কারো কারো উপর মায়া দয়া নেই দেখছি।

পিসীর কথা শুনিয়া হৈমন্তীর মুখ ঈষৎ আরক্ত হইল। তাড়াতাড়ি সে বলিল, আচ্ছা, আজ যাই।

পিসী বলিলেন, রাধুর খবর পেলে আমি মোক্ষদা ঝিকে পাঠাব তোমাকে জানাতে।

আচ্ছা, বলিয়া হৈমন্তী চলিয়া গেল।

আরও মাস খানেক পরের কথা।

শীতের রৌদ্র পড়িয়া আসিতেছে। অতসীকুঞ্জের বাগানে লাল সিমেন্টের বাঁধানো বেদীতে বসিয়া হৈমন্তী একখানা বই পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ পড়িবার পরে মনে কি কথাব উদয় হওয়ায় বইখানি কোলেব উপর রাখিয়া সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল। চিন্তার সূত্র ধরিয়া একটার পর একটা গ্রন্থি পার হইয়া তাহার মন কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ শীত বোধ হওয়াতে হৈমন্তী সম্বিৎ পাইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। এত শীঘ্র সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সে যেন একটু বিস্মিত হইল। সান্ধ্য প্রার্থনা, গীতা পাঠ, সূতা কাটা কত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতে কোলের বইখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। বইখানি তুলিয়া লইয়া সে বারান্দা পার হইয়া বসিবার ঘরে ঢুকিল। পাশের ঘর হইতে তাহার দাদা রাধেশের সুর করিয়া কবিতা পড়িবার শব্দ কানে আসিল। হৈমন্তী বুঝিল ভানু আসিয়াছে। ভানু আজকাল তাহার দাদার কবিতার অনুরাগী শ্রোতা হইয়াছে। বিরাজবাবু সেদিন ভানুকে ইহা লইয়া বিদ্রূপ করায় ভানু উত্তরে বলিয়াছিল ইহাও একপ্রকার ত্যাগ। বাপুজী ত্যাগ ধর্ম শিখাইয়াছেন, সে তো সেই ধর্ম আচরণ করিতেছে। ইহাতে বিস্ময়ের বা বিদ্রূপ করিবার কী আছে? বিরাজবাবু ভানুর মুখে বাপুজীর

ত্যাগধর্মের এহেন ব্যাখ্যা শুনিয়া হৈমন্তীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া মুচকিয়া হাসিলেন। বসিবার ঘরের মধ্যে দিয়া হৈমন্তী নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সান্ধ্য কর্তব্যগুলি শেষ করিয়া সে যখন বসিবার ঘরে ফিরিল তখন ভানু, রাধেশ ও বিরাজের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। হৈমন্তী জানে অতসী-কুঞ্জের এই সান্ধ্যসভার আলোচনার মানে বিরাজবাবু এক তরফা বলিয়া যান, ভানু ও তাহার দাদা অধিকাংশ সময় চুপ করিয়া শোনেন। বিরাজবাবুর অভ্যাস সবাইকে ও সব কিছু লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা। ইদানীং ভানু মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে কিন্তু বিরাজবাবুর সবুজ সংসদীয় কাটা কাটা কথার প্রতিবাদ সে করিতে পারিবে কেন? তর্ক আরম্ভ হয় যখন হৈমন্তী বিরাজবাবুর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে। আজও এইভাবে তর্ক আরম্ভ হইল।

হৈমন্তী বলিল, আপনার যখন মহাত্মাজীর আন্দোলনের আদর্শের প্রতি সত্যিকার নিষ্ঠা ছিল না তখন নিষ্ঠার ভান করে খদ্দর ধরলেন কেন, কেনই বা জেলে গেলেন?

বিরাজ একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, নিষ্ঠার কথা উঠছে কেন? হিড়িকের সময়ে আমি নিজের প্রেস্টিজ রক্ষা করবার জন্য খদ্দর ধরেছিলাম, জেলেও গিয়েছিলাম। নিষ্ঠা হ্যাড নাথিং টু ডু উইথ ইট। তখন অসহযোগীদের দিন পড়েছিল। অবশ্য আর একটা গভীরতর কারণ যে ছিল না তা নয়।

হৈমন্তী জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

বিরাজ বলিল, এই গভীরতর কারণ সম্বন্ধে ভানুর একটা নিজস্ব থিসিস আছে। তার কাছে সেটা জেনে নিয়ো। আমার নিজের কথা এই যে আই নেভার বিলিভ্ড্ দি স্পিরিচুয়াল ইণ্টারপ্রিটেশনওয়ালজ এণ্ড ইনার লাইট ওয়ালজ, বাট মহাত্মাজীস সাক্সেস উইথ দি মাসেস ইম্প্রেস্ড্ মি।

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল, তাহলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছেন কেন আপনি?

বিরাজ—আমি কিছু দিয়ে কিছু ঢাকতে চাইছি না, আমার কথার অর্থ এই যে আই ওয়াণ্টেড টু গিভ নন-কো এ ট্রায়াল।

হৈমন্তী মৃদু হাসিয়া বলিল, সো ভেরি জেনারাস অব ইউ!

বিরাজ ডান হাতের সিগারেট বাঁ হাতে লইয়া বলিল, আই লাইক ছাট স্মাইল অব ইওরস। ঐ হাসি দেখে বুঝতে পারি যে আমরা উভয়ে কিনড্রেড স্পিরিটস।'

হৈমন্তী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, বিরাজ বাধা দিয়া বলিল প্লিজ ডোণ্ট—

বিরাজ চোখ বুঁজিল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর বলিল, লেট আস্ রিটার্ণ টু নন-কো। সবাই জানে নন-কো নেভার এপিল্ড টু দি বেঙ্গলী ইনটেলেকচুয়ালস্।

রাধেশ বলিল, কিন্তু বিরাজ, বাংলার অসহযোগ তো শিক্ষিত লোকের মধ্যে বেশী প্রচার হয়েছিল।

রাধেশের প্রতিবাদ কানে না তুলিয়া বিরাজ বলিল, রবীন্দ্রনাথ ও বিপিন পাল নন-কোর সমালোচনা করেছিলেন বোধ হয় আপনার মনে নাই। ইংলিশ ম্যান তাই নিয়ে খুব বগল বাজিয়েছিল ও বেঙ্গলী ইনটেলেকটের জয় গান করেছিল আমার মনে আছে।

ভানু বলিল, আপনার এ সব কথা খুব মনে থাকে।

বিরাজ বলিল, আমার অনেক কথা মনে থাকে যা তোমার মাথায় ঢোকবার পথ দিয়ে গলতে পারে না, ভানু। বাংলা দেশ নন-কোর পলিটিক্স মেনে নিতে পারে নাই, ফিলোসফিও মেনে নিতে পারে নাই। ফলে মহাত্মাজী ক্ষুব্ধ হয়ে বাংলাকে লষ্ট প্রভিন্স বলেছিলেন। মহাত্মাজীর অ-বাঙ্গালী ভক্তদের মধ্যে জোর এণ্টি-বেঙ্গলী ফিলিংস দেখা দিয়েছিল। এ সব ইতিহাসের কথা, উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। নন-কোর ছেলে-ভুলানো ফিলোসফি ও স্কুল-বয় মর্যালিটির কোড মানতে না পারলেও বাঙ্গালী নন-কোর পোলিটিকেল প্রোগ্রামকে ট্রায়াল দিতে রাজি হয়েছিল—

ভানু বাধা দিয়া বলিল, রাজি হয়েছিল? অনুগ্রহ নাকি?

বিরাজ ভানুর মুখের দিকে চাহিয়া স্মিতহাস্যে বলিল, কি ব্যাপার ভানুবাবু? আজ এত চটছ কেন?

ভানু ফাটিয়া পড়িল। বলিল, বাপুজীকে স্কুল বয় বলেন এত সাহস আপনার? জানেন সকলে তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলে মানে? কত লোক তাঁর ছবি পূজো করে জানেন? দেশে কত গান্ধী নোট চলেছিল জানেন? জানেন রাধেশ দা বাপুজীর জীবনী নিয়ে নূতন মহাকাব্য লিখছেন?

বিরাজ রাধেশের দিকে চাহিয়া বলিল, তাই নাকি রাধেশ দা? কি নাম দিয়েছেন আপনার মহাকাব্যের?

ভানু বলিয়া উঠিল, বলবেন না রাধেশ দা, বাপুজীকে যে মানে না তার সঙ্গে বাপুজীর কথা আলোচনা করা পাপ।

বিরাজ বলিল, ভানু আজ বড় আপসেট হয়েছে। কি ব্যাপার জানো হৈমন্তী ?

হৈমন্তী মৃদু হাসিয়া বলিল, ভানুবাবু বলেন সবুজ সংসদের লোকরা বুদ্ধির দেমাকে কাউকে গ্রাহ্য করে না, কিছু মানতে চায় না। তারা নাস্তিক, তারা আনপ্রেট্রিয়টিক।

বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল, উঁহু, হ্যাট ইজ এন ওল্ড ষ্টোরি। মনে হচ্ছে ভানুর তিতিক্ষার অভাবের ডীপার রীজন আছে।

হৈমন্তী কি উত্তর দিতে যাইতেছিল ভানু কলরব করিয়া উঠিল, এই যে রাধু দা, আসুন; আসুন।

হৈমন্তী চমকিয়া পাশের দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল রাধামোহন পরদা একটু সরাইয়া ইতস্তত করিতেছে ঘরে ঢুকিবে কিনা।

হৈমন্তী ব্যগ্রভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেছিল, বিরাজের দিকে চোখ পড়ায় আর উঠিল না। বিরাজ তাহার দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।

রাধেশ বলিল, এসো রাধামোহন, এতদিন কোথায় ডুব দিয়েছিলে ভাই ? তোমার পিসীর বাড়ীতে হৈমন্তী—

হৈমন্তী তাড়াতাড়ি দাদার কথায় বাধা দিয়া বলিল, নমস্কার, আসুন, বসুন।

রাধামোহন আসিয়া বিরাজের পাশে বসিল। বিরাজের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনাদের কি সব কথা হচ্ছিল, ডিসটার্ব করলাম।

বিরাজ হাসিয়া বলিল, অফুলী গ্ল্যাড টু হেভ বীন ডিসটার্বড্। তারপর তোমার খবর কি ? মহাত্মাজী জেলে যেতে না যেতে তোমরা প্যাক্ট বাঁতিল করলে না কি ?

হৈমন্তী—কিসের প্যাক্ট বিরাজবাবু ?

বিরাজ—আন্দামান ফেরৎ দলের বা বাংলার রিভোল্যুশনারী দলের সঙ্গে মহাত্মাজীর প্যাক্ট হয়েছিল দেশবন্ধুর রসারোডের বাড়ীতে, তারা টেরোরিজম বন্ধ রেখে নন-কোকে একটা চান্স দেবে। শুনছি বার্দৌলী সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে প্যাক্টের মেয়াদ নাকি শেষ হয়েছে।

হৈমন্তী জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে রাধামোহনের দিকে চাহিল। রাধামোহন সে দৃষ্টির ইঙ্গিত বুঝিয়াও কোন কথা বলিল না। ভানু রাধেশের কাছে সরিয়া বসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি বলিল।

বিরাজ নিজের কথার জের টানিয়া বলিল, প্যাক্টের মেয়াদ শেষ হয়েছে

নানা লক্ষণে বোঝা যাচ্ছে। আন্দামানী দল আত্মকথা লিখতে সুরু করেছেন। যুগান্তর নাম নিয়ে নূতন একখানা কাগজ আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস বেরুচ্ছে কোন কোন কাগজে। পুলিন দাসের হক কথা, বিজলী, আত্মশক্তি, শঙ্খ প্রভৃতি কাগজগুলো তারস্বরে নন-কো ও গান্ধীজীকে গালাগালি করছে। কোন কোন কাগজ দেখছি প্রুধোমের প্রশংসা করে এনার্কিজম প্রচার করছে। নারায়ণ কাগজে শরৎ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছেন, ইংরাজ অহিংসার বলে ভারতবর্ষ জয় করেনি, আমরাই বা কেন অহিংস থাকবার গুরু দায়িত্ব স্বীকার করব? কলিঙ্গের হত্যা সম্বন্ধে ধূমকেতু কাগজ মন্তব্য করেছে, শত্রুকে ভোঁতা ছুরি দিয়ে জবাই করায় পাপ হয় না। এক শ্রেণীর কাগজ মানে ধূমকেতু, শঙ্খ, সন্তান, ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিয়ারার, আত্মশক্তি সারথি, জাগরণ, নূতন যুগান্তরে ক্ষুদিরাম, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক সাভারকরের, গণেশ দামোদর সাভারকরের প্রশংসা করে লেখা বেরুচ্ছে, রক্ত চাই বলে শ্লোগান দেয়া হচ্ছে। অল দিজ ইণ্ডিকেট এ রেক্রুডেসেন্স অব টেরোরিজম।

একটু থামিয়া রাধামোহনের দিকে চাহিয়া বিরাজ বলিল, হয়ত এটা বার্দৌলীর রিএকশন। কিন্তু তোমাদের দল কী আবার সেই পুরনো ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে?

রাধামোহন কি উত্তর দেয় শুনিবাব জন্য হৈমন্তী সাগ্রহে তাহার দিকে চাহিল।

রাধেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, রাধামোহন, পালিয়ো না ভাই। তোমাদের কচকচি শেষ হোক, তারপর কথা হবে। হৈমী, এঁদের চা দিস।

রাধেশ চলিয়া যাইতে ভানু উঠিয়া দাঁড়াইল, হৈমন্তীর দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে কথাটা শেষ হয়নি, একটু বাইরে আসবে?

কথাটা বলিয়া সে প্রথমে বিরাজ তারপর রাধামোহনের দিকে চাহিল, হৈমন্তীর সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত তাহারা কি ভাবে লয় দেখিবার জন্য।

হৈমন্তী ভানুর কথার উত্তর না দিয়া রাধামোহনের প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ করিল। বলিল, বিরাজবাবুর কথার উত্তর দেবেন না?

রাধামোহন মৃদু হাসিয়া বলিল, মনে হচ্ছে প্রশ্নটা আপনারও বটে।

হৈমন্তী বলিল, আপনার উত্তরটাই শুনি না।

ভানু হৈমন্তীর দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া রাধেশের ঘরের দিকে

চলিয়া গেল। রাধামোহন বলিল, উনিশশো উনিশের সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে গান্ধীজী হিমালয়ান ব্লাণ্ডার বলেছিলেন। উনিশশো একুশের মাস সিবিল ডিসওবিডিয়েন্স তাঁর দ্বিতীয় হিমালয়ান ব্লাণ্ডার। বার্দৌলী সিদ্ধান্ত তাঁর তৃতীয় হিমালয়ান ব্লাণ্ডার—

বিরাজ হাসিয়া ফোড়ন দিল, হি হোল্ডস্ দি পেটেণ্ট ফর মেকিং হিমালয়ান ব্লাণ্ডারস এট দি একস্‌পেন্স অব দি পিপল।

হৈমন্তীর মুখের ভাব কঠিন হইল। সে বলিল, আপনাকে ছ্যাবলা বলতে পারলে খুশী হতাম—

বিরাজ মুচকি হাসিয়া বলিল, কিন্তু পারছ না। দেয়ার ইজ দি রাব। রাধামোহন, আই ইণ্টারাপটেড ইউ। এবার বলো।

রাধামোহন বলিল, বলবার বিশেষ কিছু নেই। গান্ধীজীর এতগুলো ভুল যদি আপনারা সহ্য করে থাকেন আমাদের ভুলও না হয় সয়ে যাবেন।

বিরাজ বলিল, গান্ধীজী এতগুলো ব্লাণ্ডার করেও যতখানি কাজ করেছেন সেটা কি সোজা জিনিস? তোমরা সেই মধ্যযুগীয় মাদার কাল্ট রিভাইভ করে কি করতে পারবে আশা কর? বাংলার বিপ্লববাদ আসলে হচ্ছে এন এক্সপ্রেশন অব বেঙ্গলী সেন্টিমেণ্টালিজম।

রাধামোহন এই মন্তব্য শুনিয়া হাসিল।

বিরাজ বলিল, তুমি হাসছ কিন্তু আমি দেখছি রিভোল্যুশনারী দলের আত্মশক্তি কাগজে সেই পুরনো রব তুলেছে—বাংলা মা আবার একদল আত্ম-ভোলা তরুণ সন্ন্যাসী চান। আমি দেখছি তোমাদের দলের কাগজগুলো হুবহু পুরনো phraseology ব্যবহার করছে, সেই শব সাধনা, তাণ্ডব, রুদ্র, অঘোরপন্থী, প্রলয়বিষান, ধ্বংসের দোলা, রক্তপাগল ইত্যাদি কথার ছড়াছড়ি, সেই এক্সপ্লয়টেশন অব শৈব এণ্ড শাক্ত ভোকাবুলারী, সেই ওল্ড সেন্টিমেণ্টাল এফ্যুশানস! গান্ধীর ফিলোসফির যদি বা কোন অর্থ বের করা যায় বাংলার সিউডো-রিলিজিয়াস, সেন্টিমেণ্টাল রিভোল্যুশনারিজমের অর্থ বের করা অসাধ্য।

রাধামোহন একটু হাসিয়া বলিল, অসাধ্য চেষ্টা করবেন না।

বিরাজ কোন উত্তর দিবার আগে হৈমন্তী বলিল, তা না হয় না করলাম, কিন্তু এই পথে আপনারা কোন্ ফল লাভের আশা করেন? সত্যি বলুন তো।

রাধামোহন হাসিল। সে বলিল, দুটো উত্তর দিচ্ছি, হয়ত ভাল লেগে যেতে পারে আপনার। প্রথম উত্তর, গান্ধীজীও তো তাঁর আন্দোলন থেকে

ফল লাভের আশা করেছিলেন, আমরাই বা করব না কেন? দ্বিতীয় উত্তর, গীতার শাশ্বতবাণী—কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। হল কি যুৎসই উত্তর?

বিরাজ মুচকি হাসিয়া বলিল, হল না। হৈমন্তীর প্রশ্ন ছিল যে পথে ফল লাভের কোন আশা নেই জানো কেন সে পথ ছাড়ছো না?

রাধামোহন হৈমন্তীর দিকে চাহিয়া বলিল, গান্ধীজীর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বিরাট অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে অভীষ্ট পাওয়া গেল না, নিজের চোখে দেখলেন। সশস্ত্র বিপ্লববাদে ফল পাওয়া যাবে না আপনারা বলছেন। তাহলে আপনারা কোন পথে এগোলে ফল পাবেন মনে করেন?

হৈমন্তী কোন উত্তর দিল না। রাধামোহনকে সে হিংসার পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহে। সে নিজে নৈষ্ঠিক অসহযোগী। অসহযোগ আন্দোলনের শেষের দিকে রাধামোহনের কর্মশক্তি দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, সহকর্মীরূপে তাহাকে পাইয়া সে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার আগে হইতে নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার মন এই দেশকর্মী যুবকের প্রতি ধীবে ধীরে আকৃষ্ট হইতেছিল। সে আজ এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে রাধামোহন অহিংস অসহযোগ ছাড়িয়া তাহার পূর্বের রাজনৈতিক পথে অগ্রসর হইলেও হৈমন্তী আর তাহার মনকে ফিরাইতে পারিতেছিল না। তাহার অবস্থা আর কাহারও না হউক বিরাজের চোখে ধরা পড়িয়াছে। রাধামোহনকে সে যে প্রশ্ন করিয়াছিল তাহা রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়, রাধামোহনের প্রশ্নের উত্তর দিবার মত গভীর রাজনৈতিক চিন্তা সে করে নাই।

রাধামোহন হৈমন্তীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, বোধ হয় উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল। হৈমন্তী একবার তাহার দিকে চাহিতে উভয়ের দৃষ্টি মিলিল। সে মাথা নামাইল।

বিরাজ সোফায় দেহ এলাইয়া দিয়া অর্ধ-নিমীলিত নয়নে দৃশ্যটির রস উপভোগ করিতেছিল। হৈমন্তীকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করা আবশ্যক মনে করিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, ফল আমরা কোন পথেই পাবো না, আনলেস আনফোরসীন সারকামস্টানসেস উইকেন দি ব্রিটিশ গ্রিপ ফ্রম উইদিন।

রাধামোহন ঘুরিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

বিরাজ তেমনি ধীরভাবে বলিল, এত জাতের রক্ত আমাদের শিরায় রয়েছে, এত বিভিন্ন রকমের কালচার মিশে আমাদের মেণ্টাল মেক-আপ তৈরী হয়েছে

যে অল আওয়ার বেষ্ট এফার্টস এণ্ড ইন কনট্রাডিকটিং আওয়ারসেলভস।
গান্ধীজী ইজ দি প্রিন্স অব ডেনমার্ক ইন লয়েন ক্লথ। আমরা জাতশুদ্ধ
হ্যামলেট। নিজের ওপর অবিশ্বাস আমাদের কর্মের উদ্যমকে নিউট্রালাইজ করে
দিচ্ছে। নিজের ওপর অবিশ্বাস থেকে আমরা হয়েছি দারুণ ক্রিটিক জাত।
ইন মাই হার্ট অব হার্টস আই উইশ ইউ সাক্সেস মাই ফ্রেণ্ড, ইয়েস সাক্সেস,
বাট ইফ ইউ ওয়াণ্ট মাই ওপিনিয়ন আই উড ড্যাম ইউ থ্রাইস অর—

কথা শেষ না করিয়া বিরাজ হঠাৎ সোজা হইয়া বসিল। কণ্ঠস্বরে কোথা
হইতে এক রাশ কোমলতা আনিয়া হৈমন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, হৈমন্তী,
তুমি কি উঠে বারান্দায় একটু পায়চারি করবে? ইউ আর লুকিং পেল।

হৈমন্তী একবার বিরাজ একবার রাধামোহনের মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া
দাঁড়াইল। তারপর মুখ নত করিয়া মৃদু পদক্ষেপে দরজা সরাইয়া বারান্দায়
চলিয়া গেল।

রাধামোহন অন্যমনস্ক হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল বিরাজের কথা,
অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার ফলে ব্রিটিশের মুষ্টি শিথিল না হইলে আমরা কোন পথেই ফল
পাইব না। হৈমন্তীর হঠাৎ নিষ্ক্রমণের কার্যকারণ তাহার অগোচর রহিয়া
গেল।

বিরাজ সিগারেট ধরাইয়া একবার টানিল। তারপর পার্শ্বে উপবিষ্ট
রাধামোহনের কাঁধে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য
বরান্নিবোধত।'

রাধামোহন বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিল, বলিল, কি বলছেন?
বিরাজ মুচকি হাসিয়া বলিল, হা হতোস্মি! বলছি বারান্দায় একটু পায়চারি
করে এস মোহন, রাধা ইজ ওয়েটিং ফর ইউ।

রাধামোহন বলিল, কিছু বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

বিরাজ হাসিয়া বলিল, বুঝিয়ে দিচ্ছি। গেট আপ প্লিজ।

রাধামোহন বিমূঢ় ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ হাসি চাপিয়া বলিল,
পরদা সরিয়ে বারান্দায় যাও তো একটু।

রাধামোহন বলিল, কেন? হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন?

অতিকষ্টে উচ্ছুসিত হাসি চাপিয়া রাখিয়া বিরাজ বলিল, ব্রাদার, অনুরোধে
এই চিনির ঢেঁকিটি গেলো না কেন? যাও, যাও, মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে।

রাধামোহন বিমূঢ়ভাবে পরদা সরাইয়া বাহিরে গেল।

হৈমন্তীর শূন্য আসনের দিকে চাহিয়া বিরাজ একবার মুখ ভেংচাইল। তারপর হাতের নিভিয়া যাওয়া সিগারেটটি ফেলিয়া দিয়া নূতন একটি সিগারেট ধরাইয়া চোখ বুজিয়া টানিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ভানু ফিরিল। দুইটি আসন শূন্য দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, হৈমন্তী কোথায় গেল? তার সঙ্গে যে আমার বিশেষ কথা ছিল?

বিরাজ মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, বিশেষ কথাটা আমার সঙ্গে হয় না ভানু?

ভানু—ঠাট্টা করছেন?

বিরাজ—তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করব? আমার এত উদ্বৃত্ত ব্যঙ্গরস নাই ভানু। বসো একটু। একটা ভাবি মজার গল্প মনে পড়ল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভানু বসিল।

বিরাজ একমনে সিগারেট টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ভানু বলিল, কি গল্প বলছেন না তো?

বিরাজ বলিল, মজাব গল্প কিনা, মজা জমছে। আর একটু ধৈর্য ধরে বসো, গল্প তৈরী হয়ে যাবে।

ভানু গল্পের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল, বিরাজ নিজেব মনে সিগারেট টানিয়া চলিল।

দুই

পলাশডাঙা (১৯২০-২৪)

বন্যার জল নামিয়া গিয়াছে। তারপরের আর একটি কাহিনী আরম্ভ হইল।

পলাশডাঙার আর্যসংঘে ও পলাশডাঙার উপকণ্ঠে পলাশী নদীর ধারে মাতাজীর আশ্রমে বিশেষ কর্মচাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছে ব্রহ্মচারী বিমল ও পরমানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্ররোচনা দিবার ও দাঙ্গা করিবার অভিযোগে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হইলে উভয়ে এক সঙ্গে জেল ফটকের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন প্রকাণ্ড এক জনতা অপেক্ষা করিতেছে শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবার জন্য। জনতার পুরোভাগে ত্রিশূল অঙ্কিত গৈরিক পতাকাধারী আর্যসংঘের স্বেচ্ছাসেবকদল, তাহাদের পুরোভাগে রায়বাহাদুর নিকুঞ্জ মল্লিক স্বয়ং। শঙ্খ ও শিঙা বাজাইয়া জনতা কারামুক্ত নেতৃদ্বয়ের সম্বর্ধনা জানাইল, ঘন ঘন "হর হর মহাদেব" "আর্যসংঘ কি জয়!" ধ্বনি দিতে দিতে শোভাযাত্রা তাঁহাদের লইয়া শহরের যে পাড়ায় আর্যসংঘের অফিস সেই পাড়ার দিকে অগ্রসর হইল। পথে রায়বাহাদুরের গৃহের সম্মুখে শোভাযাত্রা কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইল, রায়বাহাদুরের কন্যা শকুন্তলার ইঙ্গিতে। ব্রহ্মচারী ও পরমান ক লইয়া রায়বাহাদুর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শকুন্তলা আগে হইতে সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ শেষ করিয়া অপেক্ষমান জনতার সঙ্গে যোগ দিতে ব্রহ্মচারী ও পরমানন্দের আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগিল না। তাঁহারা যাইবার সময়ে শকুন্তলার ইঙ্গিতে তাহার সাত বছরের ভাই দুই গাছি ফুলের মালা তাঁহাদের উভয়ের গলায় পরাইয়া দিল।

আর্যসংঘের অফিসের প্রাঙ্গণে দুই নেতার অভ্যর্থনা করিয়া সভা হইল। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্কুলের ছাত্র, ইতর ভদ্র, বহু লোক আসিয়াছিলেন সভায়। মুনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও বার লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট রায়বাহাদুর

নিকুঞ্জ মল্লিক অভ্যর্থনা সভার সভাপতিরূপে শহরবাসীর পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা জানাইয়া বলিলেন, ভগবান বলেছেন, ভারতবর্ষে যখনই ধর্মের গ্লানি ঘটবে আমি অবতীর্ণ হব গ্লানি দূর করে ধর্মকে, সমাজকে পুনঃসংস্থাপন করবার জন্য। আজ ধর্ম ও সমাজের গ্লানির সীমা নেই কিন্তু কোথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ? কোথায় আমাদের রক্ষাকর্তা? তবে কি তাঁর আশ্বাসবাণী সত্য নয়? না, তাঁর বাণী কখনও মিথ্যা হতে পারে না। ভগবান এসেছেন। আমরা মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকায় তাঁকে দেখতে পাব না আজ। তিনি এসেছেন রাধিকারমণরূপে নয়, পার্থসারথি রূপেও নয়, তিনি আজ এসেছেন কর্মীরূপে, বহু দেহে। যে দু'জন আত্মত্যাগী বীর কর্মী ধর্ম ও সমাজরক্ষীকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য আমবা এখানে মিলিত হয়েছি তাঁরাই আমাদের মধ্যে এসেছেন ভগবানের শাশ্বতবাণী কার্যে পরিণত করবার জন্য। তাঁরা প্রেরিত পুরুষ, ভগবানের কর্মীরূপী অবতার।

শ্রোতারা রায়বাহাদুরের কথার সমর্থন জানাইয়া ঘন ঘন করতালি দিল ও ধ্বনি দিল আর্যসংঘ কি জয়! সনাতন ধর্ম কি জয়!

সভা শেষ হইবার পর কর্মীদলের পরামর্শ সভা আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে মাতাজীর আশ্রম হইতে লোক আসিল চিঠি লইয়া। মাতাজী ব্রহ্মচারী বিমল ও পরমানন্দকে আশ্রমে আহ্বান করিয়াছেন।

আশ্রমে তাঁহাদের সম্বর্ধনার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল। আশ্রমের প্রবেশ দ্বারে দুইটি কলাগাছ এবং তাহার নীচে আম্রপল্লব সহ দুই পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করা হইয়াছিল। মাতাজীর নির্দেশে সুভদ্রা মাটির কলসে নদী হইতে জল আনিয়া নিজ হাতে মন্দিরের সম্মুখের প্রাঙ্গণ নিকাইয়াছিল। সুভদ্রা জল আনিতে গিয়া নদীর ঘাটে বসিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়াছে। প্রাঙ্গণ নিকাইতে নিকাইতে তাহার চোখ হইতে জল পড়িতেছিল। মাতাজীকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া হাতের কাজ সারিতে লাগিল। মাতাজী দূর হইতে তাহার আঁচলে চোখ মোছা দেখিলেন। দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তিনি কি ভাবিলেন, তারপর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

মাস আট নয় আগের কথা।

মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হইবার কিছুদিন আগে মাতাজী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহার আগে রায় বাহাদুর নিকুঞ্জ

মল্লিক ও তাঁহার বন্ধু সামসুদ্দীন তোগলক সাহেব বে-আইনী শোভাযাত্রায় যোগ দিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরে পরমানন্দ ও ব্রহ্মচারী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন আইন অমান্ত আন্দোলন পরিচালনা করিবার অভিযোগে, আর শকুন্তলা গ্রেপ্তার হইয়াছিল তাঁহাদের গ্রেপ্তারের কিছু পরে, খদ্দর ফেরি করিবার উদ্দেশ্যে বে-আইনী স্বেচ্ছাসেবিকা দল পরিচালনা করিবার অভিযোগে।

তিন মাস, চারি মাস, ছয় মাস করিয়া জেল খাটিয়া তাঁহারা একে একে বাহিরে আসিলেন। সকলেব শেষে বাহিরে আসিলেন ব্রহ্মচারী ও পরমানন্দ এক বৎসর কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ করিয়া।

তাঁহাবা যখন বাহিরে আসিলেন তখন দেশের মূর্তি একেবারে অন্য রকম হইয়াছে। দেশের সর্বত্র হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মন কষাকষি চলিতেছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ আবম্ভ হইয়াছে।

পলাশডাঙায় দেশের এই অবস্থা প্রতিফলিত হইল দুইটি ঘটনায়। এককালীন অসহযোগী নেতা, হিন্দু ও মুসলমানেব মধ্যে সমান জনপ্রিয় মৌলভী সামসুদ্দীন তোগলক সাহেব কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া খিলাফৎ কমিটি গঠন কবিলেন যদিও তুর্কীর সুলতান ও খলিফা ইতিমধ্যে সিংহাসন ও দেশ হইতে বিতাডিত হইয়াছিলেন। পলাশডাঙার মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও জঙ্গী মনোভাব ও সরকারী প্রশ্রয়ের সাহায্যে তাঁহারা সংখ্যা লঘিষ্ঠতার ত্রুটি পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনা হইল সুভদ্রা হরণের চেষ্টা।

সুভদ্রা পলাশডাঙার এক দরিদ্র ভদ্র ঘরের বাল-বিধবা। তাহাদের বাড়ী মৌলভী সাহেবের বাড়ীর কাছে। বিধবা মা ও নাবালক এক ভাই ছাড়া সুভদ্রাদের সংসারে আর কেহ ছিল না। শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা খারাপ বলিয়া এবং রুগ্না মাতাকে দেখিবার আর কেহ নাই বলিয়া সুভদ্রা পিত্রালয়ে থাকিত। রায় বাহাদুরের কন্যা শকুন্তলা গান্ধী বিদ্যালয়ের নাম দিয়া মেয়েদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিল। সুভদ্রা এই বিদ্যালয়ে সেলাই শিখাইবার কাজ পাইয়াছিল শকুন্তলার অনুগ্রহে। তাহার শান্ত, নির্বিরোধী স্বভাব ও কর্তব্য পালনে আগ্রহের জন্য শকুন্তলা তাহাকে ভালবাসিত। স্কুল হইতে সে যে সামান্য বেতন পাইত তাহার উপর শকুন্তলা অন্যভাবেও তাহাকে কিছু সাহায্য করিত। সুভদ্রার ছোট সংসার এইভাবে এক রকম চলিয়া যাইত। পিতাকে

বলিয়া সুভদ্রার ভাইটির বিনা বেতনে স্কুলে পড়িবার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিল শকুন্তলা।

নিরাশ্রয়া সুভদ্রার উপর দৃষ্টি পড়িল মৌলভী সাহেবের শ্যালক স্থানীয় এঙ্গোরা লিজিয়নের ভলান্টিয়ার দলের কাপ্তেন আলাউদ্দীন মিঞা সাহেবের। প্রলোভন ও নানা রকম উপদ্রবে কোন সুবিধা হইল না দেখিয়া মিঞা সাহেব বন্ধুবান্ধবদেব সঙ্গে নানা রকম সলা-পরামর্শ করিল এবং তাহাদের সাহায্যে একদিন স্কুল হইতে ফিরিবার পথে সুভদ্রাকে পথের মধ্যে ঘিরিয়া জোর করিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিবার চেষ্টা কারল।

সুভদ্রা বার দুই চীৎকার করিবার পরে তাহার মুখ বাঁধিয়া গাডীতে তুলিয়া আলাউদ্দীন মিঞা ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী সবেগে গাডী ছুটাইয়া দিল। আর্যসংঘের দুইজন সাইকেল আরোহী স্বেচ্ছাসেবক দূর হইতে ঘটনা দেখিয়া একজন খবর দিবার জন্য ছুটিল, অন্যজন গাড়ীর অনুসরণ করিয়া সাইকেল চালাইল।

যে ব্যাপারের আরম্ভ এইরূপ, তাহা শেষ হইল একটি ছোটখাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ও বৃহত্তর দাঙ্গা বাধিবার সম্ভাবনা বহন করিয়া। অনুসবণকারী সাইকেল আরোহীর সঙ্গে কিছু লোক জমিয়াছিল। খবর পাইয়া পবমানন্দ ও ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন। গোলমাল শেষ হইবার মুখে পুলিশ আসিয়া আরও গোলমাল বাধাইল। ব্রহ্মচারী বিমল ও পরমানন্দ গ্রেপ্তার হইল আলাউদ্দীন্ মিঞাকে মারাত্মক ·আঘাত করিবার অভিযোগে। মিঞা সাহেব ও তাহার দুইজন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ হাসপাতালে পাঠাইল। সুভদ্রা হাজতে স্থান পাইল। পরদিন আর্যসংঘেব অফিসে হানা দিয়া পুলিশ আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিল।

শহরে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল এই ঘটনায়।

এঙ্গোরা লিজিয়নের ভলান্টিয়ারগণ লাঠি হাতে রাস্তায় প্যারেড করিয়া বেড়াইতে লাগিল ও হিন্দুদের শাসাইতে লাগিল। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারি করিল এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণকে মুচলেখায় আবদ্ধ করিল। রায় বাহাদুর নিকুঞ্জ মল্লিককে ডাকিয়া স্থানীয় শাসক ধমকাইলেন হিন্দুদের জঙ্গী মনোভাবের উস্কানি দিবার জন্য এবং ভয় দেখাইলেন কোন মুসলমান আক্রান্ত হইলে বার লাইব্রেরীর সকল উকিলকে স্পেশাল কনেষ্টবল নিযুক্ত করা হইবে।

মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে দুই পক্ষে দুই বন্ধু ও ভূতপূর্ব সহকর্মী অর্থাৎ রায় বাহাদুর ও সামসুদ্দীন তোগলক সাহেব দাঁড়াইলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে জেল খাটিবার কথা তুলিয়া আদালত ব্রহ্মচারী ও পরমানন্দের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিল। আলাউদ্দীন মিঞা সাহেব ও তাঁহার দুইজন সঙ্গী জামিনে খালাস পাইল। বৃহৎ এক মুসলমান জনতা শোভাযাত্রা করিয়া, ফুলের মালা গলায় দিয়া তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গেল। পুলিশ কয়েকজন হিন্দু পথচারীকে ধরিয়া চালান দিল ১৪৪ ধারা অমান্য করিবার অভিযোগে।

যথাসময়ে মোকদ্দমার রায় প্রকাশিত হইল। পরমানন্দ ও ব্রহ্মচারী দাঙ্গা ও গুরুতর আঘাত করিবার অপরাধে দেড় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইলেন, আলাউদ্দীন মিঞা বেকসুর খালাস পাইল। হাইকোর্টে আপিলের ফলে ব্রহ্মচারী ও পরমানন্দের দণ্ডের আদেশ ছয়মাস কমিল।

ইতিমধ্যে সুভদ্রার মাতার মৃত্যু হইল। সুভদ্রা মাতাজীর আশ্রমে বাস করিতে আসিল। তাহার ভ্রাতা রায় বাহাদুরের গৃহে আশ্রয় পাইল।

কারাদণ্ড ভোগ করিয়া মুক্তি পাইয়া তাহার দুই রক্ষাকর্তা আশ্রমে আসিতেছেন। তাঁহাদের সম্বর্ধনার আয়োজন করিতে করিতে পূর্ব কথা মনে পড়ায় সুভদ্রার চোখের জল বাধা মানিতে চাহিতেছিল না।

তাঁহারা আশ্রমে পৌছিবার আগে অনাথা সুভদ্রার দুই রক্ষাকর্তার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ব্রহ্মচারী বিমল সংসারত্যাগী গেরুয়াধারী হইলেও সাধনভজনপ্রিয় সন্ন্যাসী নহেন। তাঁহার কোন মঠ, আশ্রম বা আখড়া ছিল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুলিশের নজরে পড়েন খনি মজুরদের মধ্যে অসহযোগের আদর্শ প্রচার করিবার সময়ে। মজুররা তাহাকে সাধুবাবা বলিত, আপনাদের পরম হিতৈষী বলিয়া জানিত। রোগে, শোকে, অভাব অভিযোগে প্রতিকারের জন্য তাহারা তাঁহার শরণ লইত। মালিকরা তাঁহাকে ভয় করিত, পুলিশ সন্দেহের চোখে দেখিত।

ক্রমে তিনি কয়েকজন সহকর্মী পাইলেন। মালিকদের ইঙ্গিতে এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি এই সকল বিপজ্জনক শ্রমিক কর্মীদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল কাগজ লিখিল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যেমন স্বদেশী বৈরাগীর আবির্ভাব হইয়াছিল, বিপ্লবী আন্দোলনের সময়ে যেমন সন্ন্যাসী এনার্কিষ্টের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, গান্ধী

আন্দোলনের ফলে সেইরূপ সাধু, সন্ন্যাসী, ফকিরের ছদ্মবেশে রাজদ্রোহ প্রচারকের উদ্ভব হইয়াছে। আসলে ইহারা গুপ্ত বোলশেভিষ্ট প্রচারক। খনি ও চটকল এলাকায়, গ্রাম-অঞ্চলে চাষীদের মধ্যে ধর্মপ্রচারকের ছদ্মবেশে এই সকল সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করিতেছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া এই সকল ভণ্ড, সাধু ফকিরদের গ্রেপ্তার করা পুলিশের কর্তব্য।

দেশের বহু স্থানে পুলিশ অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক সাধু সন্ন্যাসীদের গ্রেপ্তার করিতে আরম্ভ করিল। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যও গ্রেপ্তার হইলেন। ইহা লইয়া দেশে খানিকটা উত্তেজনার সঞ্চার হইল।

ব্রহ্মচারী বিমলের সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হইতে আরম্ভ হইলে তিনি কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করিলেন। খনি এলাকা ছাড়িয়া তিনি পলাশডাঙায় আসিলেন। পলাশডাঙ্গায় তখন প্রবল অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে। আন্দোলনের নেতা রায় বাহাদুর নিকুঞ্জ মল্লিক ও মৌলভী সামসুদ্দীন তোগলক সাহেব জেলে যাইবার পরে পরমানন্দ আন্দোলন চালাইবার ভার লইল ও তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য শকুন্তলা ও মাতাজী অগ্রসর হইলেন। এই তিনজন গ্রেপ্তার হইলে আন্দোলন পরিচালনা করিবার ভার লইলেন ব্রহ্মচারী বিমল। নিজে আড়ালে থাকিয়া তিনি এমন বিস্ময়কর শৃঙ্খলার সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করিতে লাগিলেন যে, চারিদিকে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হইল ও ব্রহ্মচারীর নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। পলাশডাঙার চারদিকের গ্রাম অঞ্চলে অনেক আদিবাসীর বাস। ব্রহ্মচারীর প্রভাবে আদিবাসী স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে আইন অমান্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল, সকলে চমৎকৃত হইল। পুলিশ ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। অবশেষে কাহারও নিকট গোপন সংবাদ পাইয়া পুলিশ আদিবাসীদের একজনের গৃহ হইতে ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করিল।

জেলে বসিয়া ব্রহ্মচারী চৌরিচৌরা, বার্দৌলী সিদ্ধান্ত, মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার ও ছয় বৎসর কারাদণ্ডের সংবাদ পাইলেন।

তাঁহার সক্রিয় চিন্তাধারায় অভ্যস্ত মন ধীরে ধীরে অন্য কর্মক্ষেত্রের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে বদলী হইয়া তিনি নূতন যে জেলে আসিলেন পরমানন্দ, সেই জেলে ছিল। আলাপের ফলে তিনি দেখিলেন বার্দৌলী সিদ্ধান্তের ফলে রুষ্ট ও হতাশ পরমানন্দের মনও নূতন কর্মক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছে।

মালাবারে মোপলা বিদ্রোহের সময়ে হিন্দুদের উপর বীভৎস ও নিষ্ঠুর উৎপীড়নের বিবরণ পাঠ করিবার সময় হইতে নূতন চিন্তার উদয় হইয়াছিল ব্রহ্মচারীর মনে। আফগান আক্রমণের গুজব প্রচারিত হইবার সময়ে কোন কোন মুসলমান নেতার উক্তি ও মনোভাব প্রকাশিত হইবার পর, সেভার্স সন্ধির পরে সেন্‌ট্রাল খিলাফৎ কমিটির নেতাদের ধীরে ধীরে আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা লক্ষ্য করিবার পর হইতে এই সকল চিন্তা তাঁহার মনের মধ্যে নূতন সক্রিয় রূপ লইবার চেষ্টা করিতেছিল।

স্বরাজ সম্পর্কে মুসলমান সম্প্রদায়ের দ্বিধাগ্রস্ত ভাব, অবিশ্বাস ও আশঙ্কা ইত্যাদির দরুণ সংশয় ও সন্দেহে আচ্ছন্ন পরমানন্দের মন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আলোচনার নূতন পথের ইঙ্গিত দেখিতে পাইল।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিবার অভিযোগে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া পরমানন্দ অত্যন্ত উত্তেজিত হইল। সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইবার সময়ে যে শ্রদ্ধানন্দকে মুসলমানরা দিল্লীর জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল তাঁহার এই পরিবর্তন কেন হইল উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী পরমানন্দকে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন।

কথায় কথায় ব্রহ্মচারী পরমানন্দকে বলিলেন, কংগ্রেস জন্মাবধি মুসলমানদের তোষণ করবার নীতি অনুসরণ করেছে তাঁদের দলে পাবার জন্য। এই নীতির ফলে মুসলমানদের মন নেশনালিজমের দিকে না গিয়ে গিয়েছে স্বাতন্ত্র্যের দিকে। মুস্লিম নেতারা বোঝেন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চললে তাঁরা সময় বুঝে একবার হিন্দু একবার ইংরাজের কাছ থেকে পাওনা গণ্ডার বেশী আদায় করে নিতে পারবেন। তাঁরা বরাবর পাওনা গণ্ডার বেশী দাবি করে আসছেন, কংগ্রেসও নেশানালিজম ও ডেমোক্রেসীর নীতি বিসর্জন দিয়ে এই দাবি ধাপে ধাপে মেনে নিয়েছে। নইলে খিলাফৎ আন্দোলনের মত ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারে অবাস্তব আন্দোলনকে গান্ধীজী এতখানি প্রশ্রয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করতেন।

পরমানন্দ বলিল, কোথায় যেন, বোধ হয় কোন কাগজে, খিলাফৎ ও নন-কো আন্দোলন সম্বন্ধে একটা লেখা পড়েছিলাম। তার কয়েকটা লাইন এখনও মনে আছে। লাইনগুলো এই: Mahatma Gandhi's greatest mistake has been to tag the Indian national movement to the Khilafat agitation. In the hot haste for a

united front the Mahatma has made the most egregious blunder. Musalman feeling has been roused in the name of Khilafat, not in the name of Swaraj, which to the Musalmans can only mean Moslem raj. A frank and candid man as the Mahatma is he will some day confess his mistake." (মহাত্মা গান্ধী সর্বাপেক্ষা বড় ভুল করেছেন খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের জোট বাঁধিয়া দিয়া। তাড়াতাড়ি যুক্তফ্রণ্ট গঠনের আশায় মহাত্মা গান্ধী মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। মুসলমানগণের মত উত্তেজিত হইয়াছে খিলাফতের নামে, স্বরাজের নামে নহে। তাহাদের কাছে স্বরাজের অর্থ শুধু মোশ্লেম রাজ। মহাত্মাজী অকপট, সরল স্বভাবের মানুষ, একদিন তাঁহাকে নিজের ভুল স্বীকার করিতে হইবে।) মজার কথা এই যে একথা কেউ মুখ ফুটে বললে তাকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলে গালাগালি করা হয়। আর এই গালাগালি সব চাইতে বেশী শোনা যাবে ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের কাছ থেকে।

ব্রহ্মচারী হাসিলেন। বলিলেন, অনেকের ধারণা মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদ ইংরাজের প্রশ্রয়ে সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন চলবার সময়ে মালাবারের ঘটনা, জোর করে ধর্মান্তরকরণ প্রমাণ করেছে এই স্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তি হচ্ছে প্রাধান্য লাভের স্বপ্ন। নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির এই কৌশল মুসলমানরা অনেক দিন থেকে অনুসরণ করছেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, মুসলমানরা দেশের আর সকলের সঙ্গে সমান পর্যায়ে দাঁড়াতে অস্বীকার করলে তাদের alien বা বিদেশী বলে গণ্য করা উচিত। আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা এমন নীচু স্তরের যে এই সহজ কথাটা কেউ বুঝতে পারে না। বুঝতে চায়ও না।

মালাবারের ঘটনা, বার্দৌলী সিদ্ধান্ত ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কারাদণ্ড, এই ঘটনাগুলি ব্রহ্মচারীর মস্তিষ্কে যে চিন্তার আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছিল সেই আবর্ত হইতে উদ্ভূত হইল আর্যসংঘ প্রতিষ্ঠার কল্পনা। ব্রহ্মচারীর আর্যসংঘের আদর্শ ও পরিকল্পনার ব্যাখ্যা শুনিয়া পরমানন্দ উৎসাহের সঙ্গে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিল, সর্বশক্তি দিয়া ইহাকে কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। এই পরিকল্পনার আলোচনা প্রসঙ্গে সে একদিন ব্রহ্মচারীকে মাতাজীর আশ্রমের ইতিহাস বলিল। বলিল, মাতাজীর অতীত জীবনের ঘটনা কেউ জানে না।

কবে তিনি পলাশভাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি কিভাবে একা স্ত্রীলোক হয়ে অনাথা, সমাজ-পরিত্যক্তা মেয়েদে? শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে নূতন জীবন আরম্ভ করতে সাহায্য করবার জন্য দিয়া ব্রহ্মাণী নদীর ধারে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কেউ তার সব কথা অন্তর্দৃষ্টি। আশ্রমের কাজ আরম্ভ হলে কোন কোন লোকের দৃষ্টি পড়ল তার ওপর' এঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় রায়বাহাদুর নিকুঞ্জ মল্লিকের। তাঁর' মত প্রভাব ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্য পেয়ে মাতাজী তাঁর আশ্রমকে দাঁড় করাতে পেরেছেন। তাঁর কন্যাও মাতাজীর সহকর্মিনী।

জেল হইতে মুক্তি পাইয়া ব্রহ্মচারী পলাশডাঙায় আর্যসংঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরমানন্দের সহায়তা ছাড়াও তিনি সৌভাগ্যক্রমে রায়বাহাদুরের সহায়তা লাভ করিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনে ভাটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে নূতন করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উৎপত্তি হইতে দেখিয়া অসহযোগের প্রধান ভিত্তি হিন্দু-মুসলমানে ঐক্যের সম্বন্ধে রায়বাহাদুরের মতের পরিবর্তন হইতেছিল।

এঙ্গোরা ফণ্ডের চাঁদা দেওয়া লইয়া তাঁহার বন্ধু মৌঃ সামসুদ্দীন তোগলকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হইল। একটি হিন্দু রমণী হরণের মোকদ্দমায় আসামী পক্ষের উকিল দাঁড়াইয়া সওয়াল প্রসঙ্গে হিন্দু সমাজের স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া মন্তব্য করায় উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। মাতাজীর আশ্রমে মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল, লাঠিখেলা ও ছোরা চালনা শিক্ষা দেওয়া হইত। তাঁহার কন্যা শকুন্তলা এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিল। মেয়েদের ছোরা ও লাঠি খেলা লইয়া মৌলভী সাহেবের দলের মধ্যে কুৎসিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চলে শুনিয়া তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং মনোমালিন্য বিচ্ছেদে পরিণত হইল।

পরিবর্তিত মনোভাব লইয়া তিনি মুসলমান নেতাদের সাম্প্রতিক মনোভাব ও আচরণের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন দুই চারিজন ছাড়া আর সকল মুসলমান নেতা ক্রমে জাতীয় আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতা, দেশপ্রীতির অভাব, হিন্দুদের প্রতি বদ্ধমূল অবিশ্বাস, মুখোস ফেলিয়া দিয়া আবার স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার মনে পড়িল স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাংলা দেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের গৃহশত্রু বিভীষণের ভূমিকা লইবার কথা, লর্ড মিণ্টোর সময়ে সরকারী প্ররোচনায়

সাম্প্রদায়িক নির্বাচন দাবির কথা, বিরোধিতার কথা। তিনি ভাবিলেন মুসলমানদের চরিত্রের আসলে কোন পরিবর্তন হয় নাই, হিন্দুরা দেশপ্রেমের রঙীন তাঁহাদিগকে নিজের লোক বলিয়া মনে করিয়াছে। হিন্দুরা চির ও চক্ষুপীড়াগ্রস্ত জাত। মনের এই অবস্থায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলন তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিল। শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমান কাগজগুলির ও নেতাদের যুক্তিহীন উক্তি ও শাসানির ফলে তিনি স্বামীজীর আদর্শের বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে ব্রহ্মচারী বিমল ও পরমানন্দ মুক্তি পাইয়া তাঁহার কাছে আর্য-সংঘ প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ের কথা জানাইলে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মাতাজীও তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বার্দৌলী সিদ্ধান্তের অতর্কিত আঘাতে ও সকল কর্মী নেতার গ্রেপ্তারের ফলে পলাশডাঙায় রাজনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড যেন ভাঙিয়া গিয়াছিল। আর্যসংঘকে অবলম্বন পাইয়া ভাঙা মেরুদণ্ড আবার সোজা হইবে আশা হইল।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়াইয়া পড়িয়াছিল দেশে। পলাশডাঙাও অব্যাহতি পাইল না। সুভদ্রা হরণ উপলক্ষ্য করিয়া কিছু দাঙ্গাহাঙ্গামা হইল। সরকারী সুবিচারের ফলে আততায়ীর কবল হইতে যাঁহারা সুভদ্রাকে রক্ষা করিলেন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তাঁহারা কর্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন।

পুনরায় জেলে আসিয়া ব্রহ্মচারী ও পরমানন্দ আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রচুর অবসর পাইল। পরমানন্দ নিজে উচ্চ শিক্ষিত যুবক, যথেষ্ট পড়াশোনা করিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মচারী বিমলের স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া প্রথম হইতে সে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার জীবনে সে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী হইয়া সাধন ভজনে এমন নিস্পৃহ মানুষ দেখে নাই, প্রকৃত জ্ঞানীর নির্লিপ্ততার সঙ্গে কঠোর বাস্তববাদী কর্মীর এমন সমন্বয় দেখে নাই, অসংসারী ও পরিবার-সম্পর্কহীন হইয়া সমাজ ও জাতির সেবায় উৎসর্গিত প্রাণ এমন মানুষও আর দেখে নাই।

একদিন দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারকম আলোচনার পরে পরমানন্দ কৌতুহল দমন করিতে না পারিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনি সন্ন্যাসী

মানুষ হয়েও এত তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি কেমন করে লাভ করলেন? এত পড়াশোনাই বা কখন করলেন?

প্রশ্ন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিয়া ব্রহ্মচারী হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি আছে না কি আমার? বোধহয় বহির্দৃষ্টির অভাবে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়েছে।

তারপর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, যাকে তুমি অন্তর্দৃষ্টি বলছ সেটা বোধহয় আমার দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব। রাজনৈতিক ব্যাপারে শুধু দু'টো জিনিসকে লক্ষ্য পথে রেখে আমার চিন্তা ভাবনা চলে, আর সব শুধু অবান্তর।

পরমানন্দ—কি সে জিনিস দু'টো?

ব্রহ্মচারী—আমার দেশ ও আমার জাতি। আমার রাজনৈতিক মতামতের একটিমাত্র প্রিন্সিপল হচ্ছে আমার দেশ ও জাতির ইষ্ট। আমার দেশ মানে হিমাচল থেকে দক্ষিণ মহাসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডের মধ্যে যা কিছু আছে সব আমার, এখানে আর কারো কোন অধিকার আমি স্বীকার করি না। আমার জাতি মানে এই ভূখণ্ডের অধিবাসী জনসমষ্টি। এই জনসমষ্টি এক, অবিভাজ্য। এদের মধ্যে ধর্মের ভেদ, বর্ণের ভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদের বিশেষ দাবি আমি মানি না, কোন অজুহাতে এই সমষ্টির কোন অংশের স্বাতন্ত্র্যের দাবি আমি স্বীকার করি না, কোন দিন স্বীকার করব না। আমার এই আদর্শের সঙ্গে যার মিল নাই এমন কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের পন্থা আমি কখনও অনুসরণ করব না।

পরমানন্দ—আমাদের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের পন্থার প্রথম ধাপ হিন্দু মুসলমানের মিলন। এই মিলন না হলে আমরা ইংরাজের অধীনতা থেকে মুক্তি পাব কি করে? অবশ্য আমার ধারণা ইংরাজ থাকতে এ মিলন হবে না।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, যদি মিলন অপরিহার্য বলে মনে কর তবে মিলন কোন দিন হবে না, ইংরাজ থাকতেও নয়, গেলেও নয়। হিন্দুরা মিলন মিলন বলে প্রথম থেকে চিৎকার করছে তাই মিলনের সমস্যা এত কঠিন হয়েছে। আসলে আমরা ইংরাজের অনুগ্রহ চাই, ইংরাজকে তাড়াতে চাই না। এজন্য মুসলমানের সাহায্য আমাদের আবশ্যক মনে হয়েছে। ইংরাজকে বাস্তবিক দেশ থেকে তাড়াবার অভিপ্রায় থাকলে মুসলমানদের সাহায্যের আশায় বসে থাকতে হত না।

পরমানন্দ—কিন্তু আমরা মুসলমানদের এড়িয়ে চলতে চাইলে ইংরাজ তো হিন্দুমুসলমানের গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে।

ব্রহ্মচারী—গৃহযুদ্ধ বাস্তবিক বাধাতে গেলে রাজত্ব করবার আশা ত্যাগ করে ইংরাজকে তা করতে হবে।

ব্রহ্মচারীর কথা পরমানন্দ চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, আপনার কথা শুনলে লোকে বলবে আপনি হিন্দু নেশানালিজম চান, ইণ্ডিয়ান নেশানালিজম চান না।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, হাঁ, স্বামী বিবেকানন্দের মিলিটাণ্ট হিন্দু নেশনালিজম চাই। ইণ্ডিয়ান নেশনালিজম জিনিসটা হচ্ছে সোনার পাথরবাটি। হিন্দু নেশনালিজম প্লাস মুস্লিম এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল পেট্রিয়টিজম মিলে যে জিনিস হবে সেটা কি ইণ্ডিয়ান নেশনালিজম? হিন্দু ও মুসলমানদের যাঁরা পৃথক জাত বলে মনে করেন সেই সব দুর্বল, ইংরাজি ভাবাপন্ন সিনথেথিস প্রয়াসী রাজনীতিজ্ঞদের আবিষ্কার ঐ ইণ্ডিয়ান নেশনালিজম কথাটি। ইণ্ডিয়ান নেশনালিজম জন্মাবে ইংরাজ এদেশ থেকে বিতাড়িত হলে, তার আগে নয়। একটা পুরনো কথা বলছি শোন। ১৮৯৩-৯৪ সনের কথা। হিন্দু রিভাইভ্যালিজম কথাটার খুব বেশী ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে তখন গোরক্ষিণী সভা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপার নিয়ে। স্যার চার্লস ইলিয়ট ঘোষণা করলেন হিন্দু রিভাইভ্যাল আন্দোলন সরকার বিরোধী। ছদ্মবেশী পোলিটিকেল সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হতে লাগল। স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার কথা তুলে একখানা মুসলমান কাগজ লিখিল—"আমেরিকায় যশোলাভ করিয়া বিবেকানন্দ দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। সম্ভবতঃ দেশীয় খৃষ্টানরা তাঁহার কথায় গো-মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিবে। তারপর "difference between the different communities will therefore disappear, and they will be welded together into one great nation". (বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য লোপ পাইবে এবং সব সম্প্রদায় মিলিয়া এক মহাজাতি গঠিত হইবে।)

পরমানন্দ—গোরক্ষিণী সভা নিয়ে এত কাণ্ড?

ব্রহ্মচারী—১৮৯৩ সনে গোরক্ষিণী সভা নিয়ে হিন্দু রিভাইভ্যালের কথা উঠেছিল, নানা স্থানে দাঙ্গাও বেধেছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদের স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিবাদে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল পূর্ববঙ্গে। এখন শুদ্ধি আন্দোলন

নিয়ে হিন্দু রিভাইভ্যালের কথা উঠেছে, দাঙ্গাও আরম্ভ হয়েছে নানা জায়গায়। প্রত্যেক বারের দাঙ্গায় প্রেরণা এসেছে ইংরাজ সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে। এটা আমার কথা নয় ইতিহাসের কথা। হিন্দু মুসলমানের মিলনকে গভর্ণমেণ্ট যত না ভয় করে হিন্দু রিভাইভ্যালিজমকে তার চাইতে বেশী ভয় করে। কেন করে? হিন্দু মুসলমান মিলনের কথা যারা বলে তারা এক দিকে মুসলমানের অন্য দিকে সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী। এই মিলন কোন দিন হয় নি, হবেও না।

ইহার কয়েকদিন পরে মুসলমান আততায়ী কর্তৃক আর্যসমাজী প্রচারক পণ্ডিত নরসিংহ দেবের হত্যার সংবাদ প্রকাশিত হইল। এই হত্যার সংবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী পরমানন্দকে বলিলেন, ভায়া ১৯১৯ সনে ইংরাজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল। অসহযোগের ঢেউ মিলাতে না মিলাতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ আরম্ভ হল। বলকান যুদ্ধের সময়ে গলাগলির পরে একচোট দাঙ্গা বাধিয়ে মুসলমানরা ইণ্ডিয়ান নেশনালিজমের শ্রাদ্ধ করেছিলেন। খিলাফতী গলাগলির পরে আবার পুরনো নাটকের অভিনয় হচ্ছে।

পরমানন্দ—একটা খবর দেখলাম কাগজে। পাঞ্জাবের প্রাদেশিক কনফারেন্সে মাদ্রাজের এক উকীল নেতা বলেছেন "Of our two objects Swarj and Khilafat, the higher one was Khilafat". (স্বরাজ ও খিলাফত, আমাদের এই দুইটি লক্ষ্যের মধ্যে খিলাফত উচ্চতর লক্ষ্য।) দেশে এই ধরণের লোকের প্রতিপত্তি থাকতে স্বরাজ লাভের কোন আশা আছে কি?

ব্রহ্মচারী এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া মিবাট ও আজমীঢে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা উঠাইলেন। তারপর বলিলেন, খবর হিন্দু জা[illegible]কে চ্যালেঞ্জ করে মুসলমান কাগজ দশ লক্ষ টাকা চাঁদা চেয়েছে। চাঁদা চাইবার উদ্দেশ্য "So that in every home in India the song of Islam may be sung". (যাহাতে ভারতের প্রতিটি ঘরে ইসলামের সঙ্গীত শোনা যায়।

পরমান্দ সংগঠন আন্দোলনের উত্তরে মুসলমানদের তবলীগ ও তঞ্জীম আন্দোলন আরম্ভ করিবার কথা তুলিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বিরুদ্ধে জামিয়াত-উল-উলেমার আক্রমণের কথাও উঠিল। ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, পাঞ্জাবে, মধ্যপ্রদেশে, পণ্ডিত মালবীয়ের পরামর্শে হিন্দুরা কুস্তির আখড়া খুলছে, মুসলমানদের কিছু না করলে চলবে কেন। কেমন মনের মিল দেখ ইংরাজ ও মুসলমানের মধ্যে। হিন্দুরা কুস্তীর আখড়া খুলেছে এটা উভয়েরই

অসহ্য। ইংরাজের নাকে আসছে রাজদ্রোহের গন্ধ, মুসলমানের নাকে আসছে সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধির গন্ধ। ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া পরমানন্দ হাসিতে লাগিল।

দিন তিনেক পরে জেল ডাক্তারের নিকটে একটি খবর পাইয়া পরমানন্দ অত্যন্ত চিন্তিত হইল। জেল ডাক্তারের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দের সহপাঠী ছিল। সেই সূত্রে ডাক্তারের সঙ্গে তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এককালে। জেল ডাক্তারের এক কন্যার বিবাহ হইয়াছিল পলাশডাঙায়। কন্যা তাঁহাকে লিখিয়াছিল আলাউদ্দিন মিঞার দলের উৎপাত অসম্ভব বাড়িয়াছে। কয়েকদিন আগে এই দল সুভদ্রাকে আবার হরণ করিবার জন্য মাতাজীর আশ্রম আক্রমণ করিতে গিয়াছিল। কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া রায়বাহাদুর নিকুঞ্জ মল্লিকের কন্যা শকুন্তলা আর্যসংঘের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের চেষ্টায় দুষ্টদের অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়। তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া রায় বাহাদুরকে বেনামী চিঠিতে ভয় দেখাইয়াছে তাঁহার কন্যাকে শীঘ্রই হরণ করিয়া পবিত্র ইসলামে দীক্ষিত করা হইবে। রায়বাহাদুর চিঠিখানি লইয়া ইংরেজ মহকুমা হাকিমের সঙ্গে দেখা করিলে তিনি নাকি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলে, মুসলমানদের বেনামী চিঠিতে ভয় পাও! সেটানিক গভর্ণমেণ্টের কাছে গান্ধীর চেলারা সাহায্য চায় কোন মুখে?

পরমানন্দ সংবাদটি ব্রহ্মচারীকে জানাইল। তাহার নিজের মনের দুশ্চিন্তাও ভাবে ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইল।

ব্রহ্মচারী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, শকুন্তলা আর্যসংঘের নেত্রীর পদ গ্রহণ করেছেন জেনে আমি বড় সুখী হয়েছি। ও সাধারণ মেয়েদের মত নয়, ও ঠিক যেন একখানি খাপখোলা তরবারি। যেমন তেজস্বিনী, তেমনি বুদ্ধিমতী। মাতাজীর উপযুক্ত শিষ্যা শকুন্তলা। তুমি এত ভাবছ কেন? আমাদের মেয়াদ তো শেষ হয়ে এল।

পরমানন্দের মুখে মহকুমা হাকিমের উত্তর শুনিয়া ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, তোমার কথায় ষ্টেটসম্যান কাগজের একটা মন্তব্য মনে পড়ল। দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্বন্ধে মন্তব্য করে ষ্টেটসম্যান কিছুদিন আগে লিখেছিল—"As unregenerate men we should feel a certain *schaden freude*, a feeling of satisfaction in seeing the proof of our own indis-

pensibility when Hindus and Muslims fight one another and have to call in the British to settle their trouble" *Schaden freude* কথাটি জার্মান, মানে malicious pleasure at seeing others in trouble (যখন হিন্দু ও মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে লড়াই করে এবং নিজেদের লড়াই মিটাইবার জন্য আমাদিগকে ডাকে তখন আমাদের প্রয়োজন কতখানি অপরিহার্য তাহার প্রমাণ পাইয়া সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা খুশী হই বই কি।)

ব্রহ্মচারীর মুখে শকুন্তলার সম্বন্ধে খাপখোলা তরবারির উপমাটি পরমানন্দের ভাল লাগিল। সে ভাবিল, হ্যাঁ শকুন্তলা খাপখোলা তরবারি বটে, চেহারা, বুদ্ধি, চরিত্রের তীক্ষ্ণ ঋজুতায়।

জেলের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, পরমানন্দ, শ্রীঘরে ফেরবার জন্য তৈরী হয়ে বেরুবে। সংগঠন আন্দোলন আরম্ভ করবার জন্য আর্যসংঘকে প্রস্তুত হতে হবে।

পরমানন্দ—কথাটা আপনাকে বলব ভাবছিলাম। বাংলার সংগঠনের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। কাগজে দেখেন নি পূর্ব ও উত্তর বাংলায় নারী হরণের সংখ্যা কত বেড়েছে ?

ব্রহ্মচারী—দেখেছি। আরও দেখছি স্বরাজ পার্টি মুসলমানদের সঙ্গে প্যাক্ট করবার কথা চালাচ্ছে।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি আবার বলিলেন, অনেক দুর্গতি আছে এ দেশের বরাতে।

এক সপ্তাহ পরে জেল হইতে মুক্তি পাইয়া উভয়ে পলাশডাঙ্গা রওনা হইলেন।

তিন

পঞ্চক্রোশী—(১৯২৩-২৪)

বন্যার পরের আর একটি কাহিনী।

১৯২৩ এর শেষের দিকে জেলের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতে শেখর ভাবিল বাহিরে গিয়া তাহার প্রথম কাজ হইবে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা। দীর্ঘকাল আমাশয়ে ভুগিয়া তাহার সুন্দর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অসহযোগী কয়েদীদের সঙ্গে জেলের ডাক্তারও অসহযোগিতা করিতেন, কাজেই চিকিৎসা প্রায় কিছুই হয় নাই। সে স্থির করিল কলিকাতায় ডাক্তার দেখাইয়া কিছুদিন চিকিৎসা করাইবে, তারপর শরীর একটু ভাল হইলে কোন ভাল জায়গায় যাইবে।

জেল ফটকের বাহিরে পা দিতে সে দেখিল শ্যামানাথ দাঁড়াইয়া আছে।

শেখরকে জড়াইয়া ধরিয়া শ্যামানাথ বলিল, চেহারাখানা তো বেড়ে করেছ দেখছি। পেটের অসুখ হয়েছিল বোধ হয়।

শেখর—হয়েছিল নয়, হয়েছে। কি ক'রে ডায়াগনোজ করলে ?

শ্যামানাথ হাসিয়া বলিল, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। বেশ কিছুদিন ধরে আমাশয়ে ভুগেছি। আগের স্বাস্থ্য এখনও পাইনি। ভেবেছি কোথাও যাব। তোমার ছাড়া পাবার অপেক্ষায় রয়েছি এতদিন, অবশ্য চিকিৎসাও চলছিল।

শেখর হাসিয়া বলিল, আমার সঙ্কল্পও তাই, তবে কলকাতায় গিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে আগে।

শ্যামানাথ—আগে বাড়ী গিয়ে একটু জিরিয়ে নাও, তারপর কলকাতা যেও।

শেখর—আমার তো তোমার মত জিরিয়ে নেবার মত বাড়ী নেই। সোজা কলকাতায় যাব। তোমরা কোথায় যাচ্ছ জানিয়ো, পারি তো পরে আমিও জুটে যাব।

শ্যামানাথ বলিল, কলকাতা যাবার মতলব ছাড়। কে তোমাকে দেখবে সেখানে ? গৃহিণী কড়া হুকুম দিয়েছেন তোমাকে পঞ্চক্রোশী নিয়ে যেতে হবে।

শেখরের কোন আপত্তি টিকিল না, শ্যামানাথের পীড়াপীড়িতে তাহাকে পঞ্চক্রোশী রওনা হইতে হইল। সে পঞ্চক্রোশীর বর্তমান অবস্থা জানিতে চাহিল।

শ্যামানাথ বলিল, পঞ্চক্রোশীর অবস্থা? রায় বাহাদুর হেমাঙ্গিনাথ এখন অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করছেন। দীনদয়াল ঠাকুর জেলে। ঠাকুরের আশ্রম নিশ্চিহ্ন, বেতাইচণ্ডীর ঠাকুরের শিষ্য ও ভক্তরা ছত্রভঙ্গ, রায় বাহাদুর সবাইকে টিট করেছেন। পিরু হাজী ফেরার, তার ভিটে মাটি সব শেষ। তোমার সেই ফায়ার-ইটিং কালিন্দীর নো পাত্তা। কোথায় উধাও হয়েছে কেউ জানে না।

শেখর—রাঙামামীমা কেমন আছেন?

শ্যামানাথ—রাঙাকাকীমা ও তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যাতারার দু'মাস জেল হয়েছিল।

শেখর—এ খবর তো আমি শুনিনি।

শ্যামানাথ—শোননি, শোন। জেল থেকে বেরিয়ে এলে রায়বাহাদুর জাতিচ্যুত বলে তাঁকে বাড়ী ঢুকতে দেননি। আমি তখন জেলে, গ্রামে তাঁর পক্ষ নেবার কেউ ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি তীর্থ পর্যটন করতে বেরিয়ে পড়েন। এখন তিনি মাইল পনের দূরে গোবিন্দপুর গ্রামের আশ্রমে রয়েছেন। কয়েকদিন আগে চিঠি লিখেছেন মাস খানেকের মধ্যে ফিরবেন।

এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শ্যামানাথ বলিল, গৃহিণীর কাছে শুনলাম রাঙা কাকীমা এখানে এলে তাবা আসতে পারে।

পঞ্চক্রোশী পৌছিয়া শ্যামানাথেব বহু অনুরোধ সত্বেও শেখব তাহার গৃহে উঠিল না, নিজের গৃহে উঠিল। শ্যামানাথ পঞ্চক্রোশীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় মাধব ভিষগরত্নের পুত্রকে ডাকিয়া শেখরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু পেটেব অসুখের রোগী, পথ্যের প্রশ্ন বড় প্রশ্ন। নারী শূন্য শেখরের গৃহে পথ্যের ব্যবস্থা কে করিবে? অন্য উপায় না দেখিয়া শ্যামানাথ রাধারাণীকে আসিবার জন্য লিখিল। কোন কথা না জানাইয়া সন্ধ্যাতারাকেও কয়েকদিনের জন্য একবার আসিবার কথা লিখিল। ইতিমধ্যে শ্যামানাথের গৃহিণী প্রত্যহ শেখরের জন্য কিছু কিছু রান্না করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন।

কিছুদিন চুপচাপ কাটিয়া গেল।

শেখরের পঞ্চক্রোশী আর ভাল লাগিতেছিল না। তাহার শরীর যে কতখানি অপটু হইয়াছে জেলের বাহিরে আসিয়া সে যেন নূতন করিয়া বুঝিতে পারিল। শরীরের চাইতে মন যেন আরও অপটু হইয়াছে। জেলে যাইবার সময়ে সে প্রজ্জ্বলিত আশ্রমের দৃশ্য দেখিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল সে দৃশ্য যেন দেশময় প্রজ্জ্বলিত চিতার প্রতীক। সেই চিতায় সব উদ্যম,

আশা, বিশ্বাস পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। জেলে প্রায় দুই বৎসর বসিয়া বসিয়া সে কেবল ভাবিয়াছে, পড়িবার বই পাইত না, তাই কেবল ভাবিয়াছে। অসহযোগী সহকর্মীরা কেহ বলিত অহিংসা ছাড়িয়া আবার হিংসার পথ ধরিতে হইবে, কেহ বলিত মুসলমানদের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দুদের নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, কেহ আবার বলিত আমরা মহাত্মাজীর উপদেশ কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করি নাই তাই ইংরাজ জয়ী হইল। এত বড় আন্দোলন কেন ব্যর্থ হইল, এতখানি উদ্যমের কেন অপচয় ঘটিল, কোথায় কোন ত্রুটি ঘটিয়াছে গভীরভাবে সে কথা একটি লোকও চিন্তা করিয়া দেখিতেছে না। প্রায় দুই বৎসর পরে সে বাহিরে আসিয়া দেখিতেছে নির্বাপিত চিতাভূমিতে যেন লক্ষ লক্ষ ছায়াদেহী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সে দেখিল অন্তরে, বাহিরে প্রকাণ্ড একটা শূন্যতা-বোধ তাহাকে দিবারাত্র পীড়ন করিতেছে। শারীরিক ও মানসিক উদ্যম নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। উদ্যান চর্চা তাহার প্রিয় ব্যসন, ইহাতেও সে আর তেমন উৎসাহ বোধ করে না। পিছনে দুই হাত জড় করিয়া উদাসীনভাবে সে বাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কোন গাছে কুঁড়ি আসিল, কোন গাছে ফুল ফুটিল তাহা লইয়া আর কোন ঔৎসুক্য নাই। বই পড়িতে ভালবাসিত, সোশিয়লিজম, বোলশেভিজম, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্বন্ধে কত বই আলমারীতে সাজান রহিয়াছে, একখানি বইও টানিয়া হাতে লইতে ইচ্ছা করে না।

তাহার অবিচ্ছিন্ন শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে সাময়িক ছেদ পড়ে শুধু শ্যামানাথের সঙ্গে কথাবার্তায়।

কিন্তু শ্যামানাথের মনের গতি এমন পথ ধরিয়াছে যে, তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া শেখর তৃপ্তি পায় না। ভাবে শ্যামনাথ হ্যাজ বীন টুউ সিরীয়াসলী ফ্রাইটেণ্ড টু বী এ রেশনাল থিংকার। (এত ভয় পাইয়াছে যে পরিষ্কার করিয়া চিন্তা করিতে পারে না)।

শ্যামানাথ বলে. মহাত্মাজীর এত বড় আন্দোলন আমাদের ত্রুটিতে রেখে গেল তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, জমিদারদের প্রতি প্রজাদের তিক্ত মনোভাব ও সাধারণ লোকের মধ্যে ভদ্রলোকের ওপর অবিশ্বাস। তারা ভাবে তারা প্রবঞ্চিত হয়েছে।

শেখর বলে—তা তো ভাববেই।

শ্যামানাথ—কেউ তাদের প্রবঞ্চিত করে নি, কেন তারা ভাববে সে কথা?

তারা একটা অবাস্তব, অসম্ভব আশা করেছিল। দোষ আমাদের। অসহযোগের সোশ্যাল প্রোগ্রাম, মরাল সাইডের দিকে জোর না দিয়ে মাসকে নিজেদের সঙ্গে পাবার জন্য আমরা তাদের শুধু উত্তেজিত করেছি, এ কাজের ফলাফলের কথা ভাবিনি। মহাত্মাজীর সব চাইতে বড় উপদেশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, নিরুপদ্রব আন্দোলন। শান্তি কোন অবস্থাতে ভাঙ্গা চলবে না। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সিরীয়াসলী চালাতে পারলে দেখতে দেশের ভেষ্টেড ইণ্টারেষ্টওয়ালাদের ধীরে ধীরে চেঞ্জ অব হার্ট হত, তারা আপনা থেকে নিজেদের বিশেষ অধিকারগুলো ত্যাগ করত। তা না করে আমরা মাস একশনের ভয় দেখিয়ে অর্থাৎ জবরদস্তির ভয় দেখিয়ে তাদের ভড়কে দিলাম।

শেখর বলে, বাট রিয়েলী উই রিফ্যুসড্ টু গিভ এনি ইকনোমিক প্রোগ্রাম ফর দি মাসেস। উই পুট বিফোর দেম এ হার্মলেশ মিডল ক্লাশ প্রোগ্রাম এণ্ড এক্সটোল্ড্ ইট টু দি স্কাইস। (কিন্তু সত্যিকথা এই যে জনসাধারণকে কোন অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম দিতে আমরা অস্বীকার করেছি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা নিরাপদ প্রোগ্রাম তাদের সামনে ধরে আমরা আকাশে তুলে দিয়েছি সেটাকে) ভাল ভাল বাক্যের ছটায় ভুলিয়ে আমরা মাসকে এই মিডল ক্লাশ প্রোগ্রাম সমর্থন করবার জন্য আহ্বান করলাম। উই ওয়াণ্টেড টু এক্সপ্লয়েট দি মাসেস।

শ্যামানাথ বলে এক্সপ্লয়েট করবার কথা বলছ কেন? সাধারণ লোকে মহাত্মাজীকে দেবতার মত পূজো করত।

শেখর বলে, ট্রু। মহাত্মাজীর মাহাত্ম্যের খ্যাতি, তাঁর সাহস, অভূতপূর্ব প্রতিপত্তি দিয়েছিল তাঁকে, কিন্তু এই প্রতিপত্তির আসল রূপটা কি? দেশের লোক তেত্রিশ কোটি দেবতার ভক্ত। মহাত্মাজী হলেন তাদের কাছে নূতন এক দেবতা। অন্ধ ভক্তি নিয়ে লোকে এই নূতন দেবতাকে পূজো করতে লাগল।

শ্যামানাথ দেখিল শেখর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তেজনার মুখে সে আরও কি বা বলিয়া বসে এই ভয়ে সে চুপ করিয়া যায়।

শ্যামানাথকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া শেখর ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইল। শ্যামানাথের মন যে অন্য দিকে মোড় লইয়াছে তাহার দুই চারিটা বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা হইতে সে আন্দাজ করিয়া লইয়াছিল। আজিকার আলোচনার ফলে শ্যামানাথের মনের গতি কোন দিকে সে সঠিক বুঝিতে পারিল। মহাত্মাজীর আন্দোলনের ব্যর্থতার পর একদল লোক তাঁহার আরও গোঁড়া ভক্ত হইয়াছে। নিজের মনে হাসিয়া সে বলিল, মহাত্মাজী যে তাঁহার

আন্দোলনকে গলা টিপিয়া মারিয়াছেন এই জন্য বোধ হয় এই শ্রেণীর, অর্থাৎ জমিদার, বড় বড় শিল্পপতির দল, ভেষ্টেড ইণ্টারেষ্টওয়ালারা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার বশে মহাত্মাজীর প্রতি তাঁহাদের ভক্তি আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, মহাত্মাজীর আসল ত্রুটি ঢাকিবার জন্য তাঁহারা মুখে সবাই পরম সাত্ত্বিকপুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। "ভেষ্টেড ইণ্টারেষ্টওয়ালারা আপনা থেকে স্বার্থ ত্যাগ করবে"—মর‍্যাল গুডনেসের উপর কি অগাধ বিশ্বাস! লোককে বুঝাইবার কি জোর যুক্তি! এই বিশ্বাসের ভান, এই যুক্তি যে কায়েমী স্বার্থ-ওয়ালাদের বড় রক্ষাকবচ একথা বুঝিবার মত বুদ্ধি যেন দেশের কাহারও মগজে নাই।

শেখর ভাবিল শ্যামানাথ যাহা বলিল তাহা যে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে তাহাতে সন্দেহ নাই, শ্যামানাথকে সে জানে। কিন্তু তাহার মন যে কোথায় হইতে কোথায় গিয়াছে ও কেন গিয়াছে শ্যামানাথ তাহা জানে না। স্বাভাবিক-ভাবে আত্মরক্ষার যুক্তির পথে তাহার মন চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে দোষ দিয়া লাভ নাই। কিন্তু কৌতুকের কথা এই যে, যাহা তাহার শ্রেণীর আত্মরক্ষার যুক্তি মাত্র তাহা সে সকল শ্রেণীকে আহ্বান করিতেছে ধর্মহিসাবে নির্বিচারে গ্রহণ করিবার জন্য।

শ্যামানাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, এখন আসি শেখর, ও বেলা আবার আসব।

শ্যামানাথের মুখের দিকে চাহিয়া শেখরের হঠাৎ মনে হইল শ্যামানাথের উপর সে অবিচার করিতেছে না তো? শ্যামানাথ তো পোলিটিসিয়ান নয়, তাহার উপর কেন সে বিরক্ত হইতেছে?

সে নিজে উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া বলিল, তোমার কবরেজী ওষুধে ফল দিয়েছে, কথাটা জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম।

শ্যামানাথ বলিল, তুমি তো খেতেই চাচ্ছিলে না। আরও সপ্তাহ দুই খাও, উপকার স্পষ্ট বুঝতে পারবে।

শেখর—আরও দু'হপ্তা? বেশ, দু'হপ্তার ওষুধ নিয়ে যাব তা হলে।

শ্যামানাথ—নিয়ে যাবে বলছ কেন? এর মধ্যে আবার কি বুদ্ধি মাথায় এল?

শেখর কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। তারপর বলিল, এবার আমাকে ছেড়ে দাও ভাই, আর ভাল লাগছে না এখানে। কোন কাজ নেই, পড়াশোনা পর্যন্ত

ভাল লাগছে না। ক'দিন হল বার্ট্রাণ্ড রাসেলের Theory and Practice of Bolshevism বইখানা পড়তে আরম্ভ করেছিলাম, ৩০।৪০ পাতা পর্যন্ত পড়ে আর পড়তে পারলাম না। ভাবছি এবার বেরিয়ে পড়ব।

শ্যামানাথ—শরীরের এই অবস্থায় যে রকম বলছ সেভাবে বেরিয়ে পড়লে কিছু সুবিধে হবে কি? রাঙা কাকীমার চিঠি পেয়েছি, কয়েকদিনের মধ্যে তিনি আসছেন। উনি এলে তোমাকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব।

শেখর নিজে আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, বসো, বসো। কোথায় বেরিয়ে পড়বে স্থির হয়েছে?

শ্যামানাথ—চুনারে একটা বাড়ীর খবর হচ্ছে। সেটা না পেলে ঘাটশীলা যাব।

শেখর—চুনার বা ঘাটশীলা দুটো জায়গাই আমার কাছে সমান অজ্ঞাত-কুলশীল। পেটের পক্ষে ভাল বুঝি?

শ্যামানাথ—চুনার ভাল শুনেছি, ঘাটশীলার কথা বলতে পারিনে।

আরও কিছুক্ষণ কথা বার্তার পরে শ্যামানাথ উঠিল।

কয়েকদিন পরের কথা।

শেখরের গৃহে শ্যামানাথ ও শেখর কথা বলিতেছিল বাহির হইতে কে ডাকিল, শেখর, বাড়ী আছ?

শ্যামানাথ বলিল, রায় বাহাদুর এসেছেন তোমার খবর নিতে। ব্যাপার কি?

শেখর উঠিয়া বারান্দায় গিয়া রায় বাহাদুর হেমাঙ্গনাথকে অভ্যর্থনা করিল।

হেমাঙ্গনাথ ঘরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার হঠাৎ আগমনের অভিপ্রায় জানিবার জন্য শ্যামানাথ নিজের আসন ত্যাগ করিল না। শেখরের দিকে চাহিয়া হেমাঙ্গনাথ বলিলেন, কেমন আছ শেখরনাথ? ঘানি টেনে গাঁধি রাজার চেলাগিরি করবার শখ মিটল? না এবার লেনিন রাজার চেলা হবে?

শেখর হাসিয়া বলিল, লেনিনের ওপর আপনার রাগ কেন বড় মামা? তিনি তো বহু দূর দেশের লোক?

হেমাঙ্গনাথ—দূর দেশ কেমন করে বলি? বোলশেভিজমের বীজাণু সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়েছে শুনি। তোমরা গাঁধি রাজার চেলারা তো বর্ণচোরা বোলশেভিস্ট, তাই জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের উসকাতে গিয়েছিলে। এই যে নোয়াখালিতে, কুমিল্লায়, ইউ. পি.তে, পাহাড়রাজ্য কুমায়ুনে, ভীলদের মধ্যে,

সাঁওতালদের মধ্যে জমিদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, এত যে ধর্মঘট, এর প্রেরণা কোথা থেকে এল? তোমাদের গাঁধি রাজা কৌপীনধারী বোষ্টম মানুষ, এদিকে ঘুরে বেড়ান তো শুনি বিড়লা, বাজাজ, সরাভাই, মানে টাকার কুমীরদের সঙ্গে। তবে কার কাছে মন্ত্র পেয়ে তোমরা ছোটলোকদের খেপাতে গিয়েছিলে?

শেখর—মন্ত্র আপনারাই দিয়েছিলেন। এতকাল ধরে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেছেন, ভেবেছিলেন চিরকাল তারা মুখ বুঁজে সয়ে যাবে, কোনদিন প্রতিবাদ করবে না।

হেমাঙ্গনাথ—তোমাদের মত ঘরভেদী বিভীষণদের সাথে পেলে প্রতিবাদ করবেই তো। কিন্তু তোমরা ভুলে গিয়েছিলে এটা যে-ইংরেজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে প্রজাদের সঙ্গে সেই ইংরেজের রাজত্ব। যাদের বড় বাড় হয়েছিল তোমাদের সেই সব ছোটলোক চেলারা, দীনু বাগদীব দল মার খেয়ে ঢিট হয়ে গিয়েছে, নাকে কানে খত দিয়েছে। রায় বাহাদুর হেমাঙ্গনাথের নামে এখন তারা ভয়ে কাঁপে। জেল খেটে এসেছ, ভেবেছ তোমাদের প্রতিপত্তি বেড়েছে। যাও না একবাব চেলাদের মধ্যে ঘুরে এস, দেখবে বোলশেভিজমেব ভূত পুলিশের ঝাড়ফুঁকের দাপটে শুধু তাদের কাঁধ থেকে নয় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

শেখর—অত ভরসা করবেন না বড মামা।

হেমাঙ্গনাথ হাসিয়া বলিলেন, আর একবার লড়াই বাধাবে নাকি? বাধিয়ে দেখ, একটা কাকপক্ষীও তোমাদের দলে যাবে না এবাব। নেডা ক'বাব বেলতলা যায়?

তারপর বলিলেন, এ সব কথা যাক, আমি যে জন্য এসেছি তাই বলি। বয়েস হয়েছে, বাজে কাজে নেমে শিক্ষাও পেয়েছ বেশ। চেহারা দেখলেই সেটা বোঝা যায়। তাই বলছি এবার ও সব শখের নেতাগিরি ছেড়ে দিয়ে বে থা করে সংসারধর্ম কর।

শ্যামানাথ এতক্ষণ পরে আলাপে যোগ দিল। বলিল, আমিও শেখরকে সে কথা বলি, ও কানে নেয় না।

হেমাঙ্গনাথ শ্যামানাথের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে পড়িল শেখরকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া দারোগা তাহার বাডীতে দেবনাথের বিধবা ও শ্যামানাথের শ্যালিকাকে দেখিয়াছিল, জানাইয়াছিল তাঁহাকে। তাঁহার আরও মনে পড়িল দেবনাথের বিধবা এই শ্যালিকাটির মাথা খাইয়াছে। বাদৌলী

সিদ্ধান্তের পরে পুলিশ যখন ঝাঁকশুদ্ধ ধরিতে আরম্ভ করে তখন এই দুইটি রত্নও ধরা পড়িয়াছিল।

তিনি ভাবিলেন, শ্যামানাথ তাহার শ্যালিটিকে শেখরের ঘাড়ে গছাইবার আয়োজন তো ভাল করিয়াছিল, তারপর কি হইল কে জানে? তাঁহার শ্যালক কন্যার জন্য তিনি ঘটকালী করিতে আসিয়াছেন শ্যালকের অনুরোধে, কিন্তু শেখরের উপর তাঁহার বিশেষ ভরসা নাই। বাপ অগাধ পয়সা রাখিয়া গিয়াছে, মেয়ের বাপেরা তাই শুনিয়া লুব্ধ হয়, ছেলেটি যে মাকাল ফল সে কথা জানে না। এত টাকার মালিক হইয়া যে ছোটলোকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের মোড়লী করে, স্বেচ্ছায় জেলে যায়, তাহাকে ভরসা কি?

প্রকাশ্যে তিনি শ্যামানাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কোথাও মেয়ে দেখা হয়েছে?

শ্যামানাথ বলিল যে বিয়ে করবে তার মত না হলে মেয়ে দেখে কি হবে? মেয়ে তো কতই আছে।

হেমাঙ্গনাথ ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, তাই তো, ভুলে গিয়েছিলাম বোলশেভিক শাস্ত্রে বিয়ে উঠে গিয়েছে। কি যেন কথাটা, নেশনালাইজেশন অব উইমেন হয়েছে।

শেখর হাসিয়া বলিল, বোলশেভিক শাস্ত্রের সব চেয়ে বড় কথাটা আপনারা জেনে গিয়েছেন।

হেমাঙ্গনাথ বলিলেন, ঠাট্টা করছ নাকি? বোলশেভিস্টরা আমাদের শত্রু। শত্রুর হালচালের কিছু খবর রাখতে হয় বই কি। খবর না রাখলে দীনু বাগদীর আড্ডার বদলে পঞ্চক্রোশীর রাজবাড়ী পুড়ত, বুঝলে?

শেখর উত্তর দিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার মনে হইল অন্দরে তাহার ভৃত্য কানাই যেন কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছে, গলা শুনিয়া মনে হয় স্ত্রীলোক। শ্যামানাথও শুনিয়াছিল। সে উঠিয়া ভিতরে গেল।

শেখরকে একা পাইয়া হেমাঙ্গনাথ সুর পাল্টাইলেন, বলিলেন, তোমার সংসারধর্ম করবার বয়স হয়েছে শেখর। দেখবার লোক কেউ নেই। শরীর খারাপ হয়েছে, বুঝতে পারছ না কি সেবাযত্নের প্রয়োজন? আমার সন্ধানে বয়স্থা, সুন্দরী, সদ্বংশের মেয়ে আছে, যদি মত কর মেয়ে দেখবার ব্যবস্থা করি। কি বল?

শেখর ভাবিতেছিল কে আসিয়াছে ভিতরে। শ্যামানাথ দেখিতে গেল এখনও ফিরিতেছে না কেন?

হেমাঙ্গনাথের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, এখন থাক বড় মামা। আমি কিছুদিনের জন্য কোথাও যাব শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে। ফিরে আসলে এ সব কথা হবে।

হেমাঙ্গনাথ বলিলেন, কোথায় যাবে?

শেখর বলিল, এখনও স্থির হয় নি। শ্যামানাথের সঙ্গেও যেতে পারি।

হেমাঙ্গনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। তাঁহার সন্দেহ হইল শ্যামানাথ ষড়যন্ত্র করিয়া শেখরকে লইয়া যাইতেছে, উদ্দেশ্য শ্যালিকাটিকে পার করা।

তিনি বলিলেন, বুঝলাম। বোলশেভিষ্ট হলেও তুমি মানুষ বড় সোজা, শেখর। দেখো, পস্তাতে না হয় শেষে।

হেমাঙ্গনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শেখর বলিল, আপনার কথা বুঝলাম না বড় মামা।

হেমাঙ্গনাথ বলিলেন, বুঝবে দেখিতে, আচ্ছা, আজ আসি।

তাঁহাকে ফটক পর্যন্ত গিয়া বিদায় দিয়া ফিরিয়া শেখর ভিতরে গেল।

শ্যামানাথের স্ত্রী সুনীতি হাত নাড়িয়া উত্তেজিতভাবে স্বামীকে কি বুঝাইতেছিল, শেখরকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া সে চুপ করিয়া গেল। শেখর অপ্রতিভভাবে ফিরিয়া যাইতেছিল, শ্যামানাথ ডাকিল, দাঁড়াও শেখর, দাঁড়াও, আমাদের সাক্ষাৎ অভিবাদনটা সেরে নিতে দাও। ওগো সন্ধ্যাতারা—

উঠানের বড় গোলাপগাছের ঝাড়ের কাছে একটা মোড়ায় পিছন ফিরিয়া বসিয়া তারা কানাইয়ের হাত হইতে চায়ের কাপ লইতেছিল ও কানাইকে কি বলিতেছিল, শেখরের আগমনের কথা সে জানিতে পারে নাই। শ্যামানাথের উচ্চকণ্ঠের আহ্বান শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল, ছলাৎ করিয়া খানিকটা চা তাহার শাড়িতে ও গায়ে পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া শেখরকে দেখিয়া সে চা র কাপটি কানাইয়ের হাতে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামানাথের স্ত্রী ঘোমটার মধ্য হইতে অনুচ্চকণ্ঠে স্বামীকে কি বলিল।

শ্যামানাথ হাসিয়া বলিল, ঘোমটা দিয়ে মুখখানা তো ঢেকেছ, তবু ধমকাবার বদ অভ্যাসটি রক্ষা করা চাই।

স্বামীর কথার উত্তর না দিয়া শ্যামানাথের স্ত্রী ভগ্নীর দিকে অগ্রসর হইয়া চাপা স্বরে কি বলিল।

তারা এক পা অগ্রসর হইতে কানাই বলিল, দিদিমণি চা খেয়ে নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

চা-র কাপটি তাহার হাত হইতে লইয়া সে শেখরের কাছে গিয়া হাসিমুখে কাপটি তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, চা খান।

শেখর দেখিল আগেকার সিরীয়াস তারার যেন পরিবর্তন হইয়াছে। সে এখন বেশ হাসে। এমন মিষ্টি করিয়া তারা হাসিতে পারে জেলে এতদিন কাটাইয়া শেখর ভুলিয়া গিয়াছিল।

তাহাব হাত হইতে কাপটি লইয়া শেখর হাসিয়া বলিল, আমার চা খাওয়া বারণ। তবে তুমি যখন—

হাত খালি হইতে তারা নত হইয়া শেখরের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

সে উঠিয়া দাঁড়াইতে শেখর দেখিল তাবার চোখমুখ হইতে খুশীব আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহাকে এত খুশী হইতে দেখিয়া শেখর কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল, তোমার চা দাতব্য করলে, কানাইকে বলে আর এক কাপ করিয়ে নাও।

সেখানে আর না দাঁড়াইয়া শেখব বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিবের বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া কয়েক চুমুক চা খাইয়া শেখর কাপটি নামাইয়া রাখিল। সে বাস্তবিক সঙ্কুচিত বোধ করিতেছিল। স্বেচ্ছায় হউক বা শ্যামানাথরা চিঠি লিখিয়া আনাইয়া থাকুক তারার আগমনে একটি সমস্যাব সৃষ্টি হইল তাহার পক্ষে। সম্ভবতঃ ভগ্নী ও ভগ্নীপতির সঙ্গে তারাও যাইবে। শ্যামানাথের সঙ্গে যাইতে রাজি হইয়া এই সম্ভাবনার কথাটা সে ভাবিয়া দেখে নাই। সে ভাবিয়াছিল বোধহয় রাধারাণী ও শ্যামানাথের স্ত্রী যাইবেন। তারাকে লইয়া শ্যামানাথ অনেক সময় রহস্য করিযাছে তাহার সঙ্গে। জেলে যাইবার আগে তারার সম্বন্ধে তাহার নিজের মনেও খানিকটা দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল তাহা সে ভুলে নাই। দীর্ঘকাল জেলে থাকিয়া এই দুর্বলতা সে খানিকটা কাটাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার জীবনের গতি যে ইহার পর কোন পথ ধরিবে সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের উপব বিশ্বাস হারাইয়াছে সে, নেতাদের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে, দেশের লোকের উপরেও বিশ্বাস হারাইয়াছে। এত সহজে ইহারা প্রতারিত হয়, আসল জিনিস ফেলিয়া বাজে জিনিস লইয়া মাতামাতি করিতে ভালবাসে। সত্যকে বুঝিবার, আঁকড়াইয়া ধরিবার বুদ্ধি ও নিষ্ঠার এত অভাব ইহাদের মধ্যে যে কোনদিকে আর ভরসা করিবার মত কোন সূত্র পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে দেশের লোকের মানসিক গঠন এখনও সেই

প্রিমিটিভ যুগের মত রহিয়াছে! ইহারা সর্বত্র দেবতা, দৈব ও দৈববাণী খুঁজিয়া বেড়ায়—

শ্যামানাথ আসিল। শেখরের দিকে চাহিয়া বলিল, কি হে, অমন করে পালিয়ে এলে কেন? এত দিন পরে দেখা, দু'চারটা মিঠা মিঠা বুলির আদান প্রদান হবে—

শেখর বলিল, তোমরা কবে যাচ্ছ শ্যামানাথ?

হঠাৎ এই প্রশ্নে শ্যামানাথ বিস্মিত হইয়া বলিল, আর পাঁচ দিন পরে, আগামী বুধবারে। কেন, তুমি কি ভুলে গেছ?

শেখর বলিল, আমি কাল কলকাতা যাচ্ছি ভাই। যদি পারি কলকাতা থেকে তোমাদের সঙ্গ নেব, নয়তো তোমরা পৌঁছে চিঠি—

শ্যামানাথ শেখরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, হঠাৎ সঙ্কল্পের পরিবর্তন হল কেন? এমন তো কথা ছিল না। কি হয়েছে তোমার?

শেখর মুখ না তুলিয়া বলিল, কিছু তো হয়নি। একটু বিশেষ কাজ আছে কলকাতায়। তোমাদের রওনা হবার দু'তিন দিন আগে গিয়ে সেরে রাখতে চাই।

শ্যামানাথ—ইজ দিস দি হোল ট্রুথ?

শেখর—কেন সন্দেহ করছ? ভাল কথা, রাঙা মামীমা সময় মত না এলে তোমাদের যাত্রা কি পেছুবে?

শ্যামানাথ—পেছুবে না বলেই তো স্থির আছে। আমি কিন্তু তোমার ব্যাপার বুঝতে পারছিনে।

শেখর মৃদু হাসিয়া বলিল, নূতন করে বোঝবার মত কোন ব্যাপার তো হয়নি। তোমার ব্যাপারই বরং অবোধ্য। তুমি সন্দেহ করছ আই এম ট্রাইং টু গিভ ইউ দি স্লিপ।

শ্যামানাথ—সন্দেহ নয়, সত্যি কথা সেটা। সে যা হোক, তোমার নূতন সঙ্কল্প নিয়ে আমার বাড়ীর মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। অবশ্য সে ঝড় তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছবে না, আমাকে একা সামলাতে হবে।

শেখর কোন উত্তর দিল না।

শ্যামানাথকে একা ঝড় সামলাইবার জন্য রাখিয়া শেখর কলিকাতা রওনা হইল। সারা রাস্তা একটা কথা বার বার তাহার মনে হইয়াছে। কথাটা বিদায় লইবার সময়ে তারার মুখের চেহারা দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছে। সী

লুকড্ পাজল্ড্। কলিকাতায় পৌঁছিয়াও কথাটা সে কয়েকদিন ভুলিতে পারিল না।

বাস্তবিক কোথায় দিয়া কি হইয়া গেল তারা কিছু বুঝিতে পারিল না। গভীর বিস্ময়ের ধাক্কা কাটাইতে যে সময়টুকু লাগিল তাহার পর মুহূর্ত হইতে প্রত্যাখ্যানের লজ্জায় তারার মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। শেখর যদি তাহাকে ডাকিয়া নিজের পরিবর্তিত মনোভাবের কথা জানাইত সে বেদনা পাইত, লজ্জিত হইত না। কিন্তু এ কি করিল শেখর? তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া একটি কথা বলিল না, কোন কৈফিয়ৎ দিল না কাহাকেও। সকলের কাছে তাহাকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ করিয়া সে চলিয়া গেল।

রওনা হইবার আগের দিন তারা শ্যামানাথকে জানাইল সে তাহাদের সঙ্গে যাইবে না। পিতৃগৃহে ফিরিবে। শ্যামানাথ তাহার মুখে এই কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল, তারা, তুমি একথা বলবে আমি জানি। কিন্তু তোমাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। শেখরের ব্যবহারের ভুল ব্যাখ্যা করো না। অপরাধ যা ঘটেছে তার শাস্তি আমাদের প্রাপ্য, আমাদের তাড়াহুড়ায় এই অবাঞ্ছিত ব্যাপার হল। আমার অনুমান নিরিবিলি ভাববার, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য শেখর এমন করে পালাল। সবে দু'বছর জেল খেটে বেরিয়েছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এখনও ভাল করে ভাববার সময় পায় নি সে। কিছু সময় ওকে দিতে হবে।

তারা নিজের অভিপ্রায়ের পরিবর্তন করিল না কিন্তু শ্যামানাথের কথায় তাহার মনে নূতন চিন্তার উদয় হইল। সে ভাবিল দুর্বলতা বরাবর সে নিজে প্রকাশ করিয়াছে, শেখর কোন দিন কোন দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই তাহার সঙ্গে ব্যবহারে। সে কি অনুচিত প্রত্যাশা করিতেছিল? অথবা দুই বৎসরের ব্যবধানে শেখরের পূর্বের অনুকূল মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে? তাহাই যদি হয় তবে এমন করিয়া চলিয়া যাইবার কি কারণ ঘটিয়াছে?

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা রাধারাণী আসিয়া পৌঁছিলেন।

রাধারাণী ও শ্যামানাথের স্ত্রীর মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল, শ্যামানাথের সঙ্গে কথা হইল।

রাধারাণী বলিলেন—আমার মনে হয় না তাতে তোমাদের এমন কিছু ভাববার কারণ আছে। শেখরের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা চলছে, অপেক্ষা করতে হবে। তারাকে আমি তোমাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি, তবে

আমাকে তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে। মহানন্দ আশ্রমের কাজ দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। ঐ রকম একটা আশ্রম আমি এখানে করতে চাই। কিন্তু ঠাকুরমশাই জেল থেকে না ফিরলে সেটা করা যাবে না। আর বোধহয় মাস খানেক দেরি আছে তাঁর মুক্তি পাবার। এই সময়টা আমি মহানন্দ আশ্রমে থাকব। দু'চার জন কর্মী সংগ্রহ করবার চেষ্টা করব। ঠাকুর মশাই ফিরে আসুন, তোমরাও চেঞ্জ সেরে ফিরে এস, আমি রায় বাহাদুরের চোখের ওপর নূতন আশ্রম গড়ব আবার।

রাধারাণী তারাকে কি বুঝাইলেন কেহ জানিল না, কিন্তু সে ভগ্নী ও ভগ্নীপতির সঙ্গে যাইতে কোন আপত্তি করিল না। শুধু রাধারাণীকে বলিল, ওঁর হাওয়া পরিবর্তন করা দরকার। আমাকে পাঠাচ্ছেন, হয়ত দেখবেন আমি থাকবার জন্য উনি আসবেন না।

রাধারাণী বলিলেন, যদি না আসে না আসবে। অত ভাবিস না।

তাহারা রওনা হইল, রাধারাণীও মহানন্দ আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

চার

কলিকাতা (১৯২৩-২৪)

বন্যার পরের কাহিনী।

বলাই সরকার কাজের মানুষ। সে জানে সংসারে কাজের চাকা এত দ্রুত ছুটে যে সে গতির সমান তালে চলিতে গেলে মানুষকেও ছুটিতে হয়। পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিবার সময় কোথায়? পদ্মিনী আত্মহত্যা করিয়াছে। সে বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে দিয়া কি কাজ পাওয়া যাইত না হয় ভাবা যাইত, কিন্তু যে কারণেই হউক সে যখন মরিয়াছে তখন আর সে কথা ভাবিয়া কাহার কি সুবিধা হইবে? সংসারে যাহার প্রাণে উচ্চাশা আছে তাহাকে অনেক দিকে শক্ত হইতে হয়, স্নেহ মমতার মত চিত্ত-দৌর্বল্য, বন্ধুত্বের মত চিত্তবিকার হইতে সযত্নে তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হয়।

পারিবারিক দুর্ঘটনার চিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়া বলাই কাজ লইয়া মাতিল। অসহযোগের বন্যা শেষ হইয়াছে, নূতন পথের ইঙ্গিত ক্রমে স্পষ্ট হইতেছে।

এই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া সে চট্টগ্রাম জেলা কনফারেন্সে গিয়াছিল। কাউন্সিলে প্রবেশের কথা অস্পষ্টস্বরে গুঞ্জিত হইতেছিল, চট্টগ্রাম কন্‌ফারেন্সে সভানেত্রীর বক্তৃতায় সে কথা স্পষ্ট উচ্চারিত হইল।

চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পরে সর্বেশ্বর তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল। এই যুবকটির সঙ্গে কনফারেন্সে তাহার আলাপ হইয়াছিল। চমৎকার বলিতে পারে। অসহযোগ আন্দোলনের আগে ওকালতি করিত, আন্দোলনে যোগ দিয়া ওকালতি ছাড়িয়াছিল। তারপর জেলে গিয়াছিল। জেল হইতে বাহির হইয়া অর্থকষ্টে পড়িয়াছে, কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। তাহার বলিবার ক্ষমতায় আকৃষ্ট হইয়া বলাই কলিকাতায় তাহার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়াছিল সর্বেশ্বরকে, কোন ব্যবস্থা করিয়া দিবে বলিয়া আশ্বাসও দিয়াছিল।

সেই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা আসিয়া সর্বেশ্বর বলাইয়ের সঙ্গে দেখা করিল।

সে বলিল, অসহযোগের হুজুকে ওকালতি ছেড়ে খদ্দর ফেরি করে জেলে গেলাম, ভবিষ্যতের কথা ভাবলাম না। শুধু আমি নয়, আমার ছোট বোন অনিমা বালিকা বিদ্যালয়ে মাষ্টারী করত। আমার দেখাদেখি সেও চাকুরি ছেড়ে পিকেটিং করতে, খদ্দর বেচতে সুরু করল। তারও জেল হল। এখন দু'জনেই বেকার, পেট চলে না সুর। মাষ্টারীটা ফিরে পাবার চেষ্টা করেছিল অনিমা। গভর্ণিং বডি জেল-ফেরৎ টিচার রাখতে রাজী হলেন না। আমি আবার ওকালতি সুরু করব বলে কোর্টে বেরুচ্ছিলাম, লোকের টিটকারিতে পালাতে হল। ভাই বোন দু'জনে চাটগাঁ ছেড়ে কলকাতায় এসেছি কাজকর্মের চেষ্টায়। অনিমা বলল হরিশঙ্করবাবুর পরিবারের সঙ্গে আপনার নাকি খুব ঘনিষ্ঠতা আছে শুনেছি। তাঁর স্ত্রী সরলা দেবীর সঙ্গে যদি ওকে ইন্ট্রোডিউস করে দেন ওব হয়ত কিছু সুবিধা হতে পারে।

বলাই বলিল, আপনার ভগ্নীকে নিয়ে আসবেন, পরিচয় করে দেবার কথা বিবেচনা করব। আমার সামান্য ক্ষমতায় যতটুকু পারি আপনাকে সাহায্য করতে রাজি আছি যদি আপনি আমাকে সাহায্য করেন।

সর্বেশ্বর একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, আপনাকে সাহায্য করব আমি? কি ভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন।

বলাই হাসিয়া বলিল, বিশেষ সাহায্য করতে পারেন। আপনাব বক্তৃতা আমি শুনেছি। আমরা এখানে শীঘ্রই একটা সভা করব। এই সভায় আপনাকে বক্তৃতা দিতে হবে। তবে কাউন্সিল-এন্ট্রির পক্ষে বক্তৃতা দিতে হবে, চট্টগ্রামে কাউন্সিল-এন্ট্রির বিপক্ষে আপনার বক্তৃতার মত নয়।

সর্বেশ্বর বলিল, আপনি কি মনে করেন কাউন্সিল-এন্ট্রির ফলে দেশের সুবিধা হবে? কাউন্সিল-এন্ট্রি যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের যেটুকু প্রাণ অবশিষ্ট আছে সেটুকুও শেষ করে দিতে চান।

বলাই বলিল, আপনি চট্টগ্রাম কনফারেন্সে কাউন্সিল-এন্ট্রিব সপক্ষে সভানেত্রীর বক্তৃতা শুনেছেন। এই বক্তৃতা বাস্তবিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা। মি. কেলকার, মি. জয়াকারের মত বিখ্যাত মহারাষ্ট্র নেতারা কাউন্সিল-এন্ট্রির পক্ষে। আপনি বলছেন দেশের সুবিধা। দেশের সুবিধা মানে কি? আমাদের সুবিধা হলে দেশের সুবিধা হবে। আমাদের সুবিধা মানে আপনার সুবিধা, আপনার চাকুরি-প্রার্থিনী ভগ্নীর সুবিধা, আমার সুবিধা, বুঝতে পারছেন?

সর্বেশ্বর একটু ভাবিয়া বলিল, ভাল পারছিনে। তবে আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি আছি। আমার সুবিধাটা কি রকম হবে স্যর?

বলাই—সে দেখতে পাবেন। দু' এক দিনের মধ্যে আপনার ভগ্নীকে নিয়ে আসবেন।

কয়েকদিন পরে সর্বেশ্বর একাই আসিল বলাইয়ের গৃহে। অনিমার একটা অস্থায়ী চাকুরি জুটিয়াছিল কোন বালিকা বিদ্যালয়ে, সে আসিল না।

কাউন্সিল-প্রবেশের সমর্থনে সভা-সমিতি আরম্ভ হইয়াছিল। বক্তৃতায় কি বলিতে হইবে বলাই সর্বেশ্বরকে বুঝাইয়া দিতেছে, এমন সময় ফণী আসিল।

ফণী দিন দুই আগে জেল হইতে ছাড়া পাইয়াছিল বলাই জানিত না। হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া বলাইয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

আসন গ্রহণ করিয়া ফণী বলিল—শ দুই টাকার বড্ড দরকার বলাই বাবু। এতদিন জেলবাস করিয়ে আনলেন কিছু খেসারৎ দিন। সত্যি বলছি বড্ড দরকার।

ফণীর ফেরপ্রাম করাইয়া আনিবার ইঙ্গিত কানে না তুলিয়া বলাই ভ্রূ আরও কুঞ্চিত করিয়া বলিল, আমি কি টাকার গাছ যে নাড়া দিলেই টাকা পড়বে? এ পর্যন্ত তুমি কত টাকা খেয়েছ হিসেব করে বল দেখি? তার বদলে এতটুকু কাজ করেছ?

ফণীর মুখে হাসি দেখা দিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, বলাই কি ভাবিয়া বাধা দিয়া বলিল, নূতন কাজ দিচ্ছি, করবে? যদি তোমার দলবল নিয়ে কাজে নামতে পার কিছু যোগাড় করবার চেষ্টা করতে পারি।

ফণী বলিল—কাজটা কি?

বলাই—শক্ত কাজ নয়। আশা করি জেল থেকে বেরিয়ে বুঝতে পারছ গান্ধীজীর আন্দোলন শেষ হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র শূন্য ফেলে রাখা চলে না, বিস্তর আগাছা জন্মাতে পারে। আমরা একটি নূতন আন্দোলনের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাই দেশে। গান্ধীজী বাইরে থেকে লড়াই চালিয়ে হেরে গেছেন। আমরা আরও শক্ত লড়াই করতে চাই। গভর্ণমেন্টের দুর্গে ঢুকে আমরা লড়ব, মানে ফেসিং দি লায়ন ইন ইটস্ ডেন। আমরা সুরু করব ডেষ্ট্রাকশন ফ্রম উইদিন, দেশে রেজিষ্টান্সের স্পিরিট আমরা জাগিয়ে তুলব—

ফণী বাধা দিয়া বলিল, কাজের কথাটা সোজা করে বলুন বলাইবাবু।

সর্বেশ্বর বলিল—কাউন্সিল-এন্ট্রির পক্ষে কাজ করতে হবে।

ফণী বলিল—ওঃ!

তারপর সর্বেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনাকে এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পরিচয়?

বলাই বলিল, সর্বেশ্বরবাবু একজন ত্যাগী দেশকর্মী, ওকালতি ছেড়ে জেল খেটে বেরিয়েছেন, সুবক্তা। উনি নূতন আন্দোলনের সপক্ষে।

ফণী হাসিয়া বলিল, সেটা এঁচে নিয়েছি। হাঁ বলাইবাবু, ফেসিং দি লায়ন টায়ন অনেক গালভরা কথা তো বললেন। তা আপনারা কি মনে করেন গান্ধীজী যাদের সঙ্গে লড়াইতে হেরে গিয়েছেন বললেন কাউন্সিলে ঢুকে শুধু গলাবাজি করে আপনারা তাদের হারিয়ে দেবেন? আপনাদের ভরসা তো কম নয়!

বলাই—আমরা ডায়ার্কি খতম করে গভর্ণমেণ্টকে প্যারালাইজ করব। হরিশঙ্করবাবুর জেল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হল। তাঁকে লীডর করে আমার নূতন পার্টি গড়ব।

ফণী হাসিয়া বলিল, ব্যারিষ্টার সাহেব আপনার পার্টির লীডর হতে রাজি হবেন কি করে জানলেন? তাঁর মতিগতি এখন অন্য রকম হয়েছে। পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রীর কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শোনেন। চৈতন্য চরিতামৃত, বৈষ্ণব পদাবলী পড়েন। শাস্ত্রী মশায়ের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে ছোট বড় সব লীডর মোক্ষ প্রয়াসী হয়ে উঠেছেন। সন্ধ্যার পরে জেলে রীতিমত কীর্তনের আসর জমে মশাই, জানেন?

ফণীর কথার ভঙ্গীতে সর্বেশ্বর হাসিল।

বলাই বলিল, জেলে ওঁদের কোন কাজ নেই তাই মোক্ষ সাধনা করছেন। তুমি ভাবছ ওঁদের স্বভাব বদলেছে। বাইবে এসে ভোর্ল পাল্টে যাবে দেখো। এ সব কথা থাক। তুমি টাকার জন্য এসেছ। যদি আমাদেব প্রোগ্রাম সাপোর্ট কর তাহলে কিছু সংগ্রহ করবার চেষ্টা করব। তোমার দলবল নিয়ে কাজে নামতে হবে। একস-রিভোল্যুশনারীরা কাউন্সিল-এন্ট্রি সমর্থন করছে দেখলে অনেকের মত আন্দোলনের পক্ষে যাবে।

ফণী কিছুক্ষণ ভাবিল। গান্ধীজী জেল হইতে বাহির হইবার আগেই ইহারা কংগ্রেসের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি দল খাড়া করিতে চাহে। কংগ্রেস লইয়া একটা লড়াই আসন্ন, কংগ্রেস ভাগ হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ্যে সে বলিল, এখন কিছু আগাম দিয়ে আমাকে বিদায় দিন। দলের লোকের সঙ্গে পরামর্শ না করে আপনাকে পুরো ভরসা দিতে পারছিনে।

বলাই ফণীকে কিছু টাকা দিয়া বিদায় করিল। বলিল, মনে রেখ আমাদের পার্টি একবার দাঁড়িয়ে গেলে তোমাদের আর পেটভাতায় কাজ করতে হবে না।

ফণী চলিয়া গেলে সর্বেশ্বর বলিল, ভদ্রলোকটি কে?

বলাই হাসিয়া বলিল, উনি ফণী সিংহ লীডার অব দি এক্স-রিভোল্যুশনারীস। অতি ত্যাঁদড় লোক মশাই, তবে ইচ্ছে করলে কাজ করতে পারে। কিন্তু দারুণ টাকার খাঁই।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বলাই বলিল, আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু কিছু পাবেন বক্তৃতা পিছু। পার্টি দাঁড়িয়ে গেলে একটা বাঁধা চাকুরির ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করব। ব্যারিষ্টার সাহেব বেরিয়ে না আশা পর্যন্ত পাকাপাকি কোন কথা বলতে পারছিনে।

সর্বেশ্বর বিদায় লইবার জন্য উঠিল। বলাই বলিল, ভাল কথা মশাই, একটা সৎ পরামর্শ দিচ্ছি বন্ধু হিসেবে। আপনার ভগ্নী একটা স্কুল টিচারি পেয়েছেন বলছিলেন না? সামান্য স্কুল টিচারি করা স্থির কবলেন তিনি? এটা উদ্যমশীল ও বুদ্ধিমান লোকের ওঠবার যুগ। তাঁকে দলের মধ্যে নিয়ে আসুন, কত সুযোগ এসে যেতে পারে হাতের কাছে। সর্বেশ্বর বলিল, আচ্ছা তাকে বলব।

জেলের মেয়াদ শেষ হইতে নেতারা একে একে বাহিরে আসিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন হাওয়ার গতি উল্টামুখে বহিতেছে। গান্ধীজীর সমালোচনায় দেশ মুখর। ছোট, বড়, মাঝারি সকল রকম লোকই গান্ধীজীকে গালাগালি করিতেছে। হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ আবার প্রবল হইতেছে দেশে। বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়াপন্থী সুর শোনা যাইতেছে কর্মীদের মধ্যে। ইহার মধ্যে কাউন্সিল প্রবেশ সমর্থনকারী দলের সুর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহারা পুরনো কনষ্টিট্যুশনালিষ্ট দলের লোক, কিন্তু ইহাদের বুলিগুলি বিভ্রান্ত, বিক্ষিপ্তচিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীকে আকৃষ্ট করিবার জন্য নূতন ঢঙে রচিত হইয়াছে। নিজের অল্পসংখ্যক অনুগত ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

হরিশঙ্কর মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য বলাই এক বৃহৎ সভার আয়োজন করিয়াছে। বলাইয়ের কর্মদক্ষতায় তিনি প্রীত হইলেন। সভামঞ্চে বালাচাঁদজী, এককড়িবাবু, পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রী, মৌলভী নুরুল হক প্রভৃতি পুরাতন বন্ধুগণের আন্তরিকতাপূর্ণ সম্বর্ধনায় তিনি অভিভূত হইলেন।

বলাই বাংলার বৃহৎ নেতৃত্বের শূন্য আসন অধিকার করিবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিল যে দেশের নির্বোধ ও অকৃতজ্ঞ লোক পুরাতনের মোহে অভিভূত। দেশশুদ্ধ লোক টাকার জন্য তাহার কাছে হাত পাতিতে লজ্জিত হয় না, কিন্তু হরিশঙ্করের শূন্য আসনে বলাই সরকার বসিয়াছে ভাবিতে লজ্জা বোধ করে। সে বুঝিল তাহার মই ফেলিয়া দিবার সময় এখনও হয় নাই, আরও কিছুদিন মই অবলম্বন করিয়া উঠিতে হইবে। এই জন্য সে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করিয়াছিল।

সভা শেষ হইলে নেতারা বসিয়া দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, লোকের মনোভাব ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কমিটির রিপোর্টের কথা ও চট্টগ্রাম কনফারেন্সে সভানেত্রীর বক্তৃতার কথা উঠিল। পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রী ছাড়া আর সকল নেতা কাউন্সিল প্রবেশের সমর্থন করিয়া বলিলেন।

নিমাই শাস্ত্রী বলিলেন, সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কমিটি কাউন্সিল এন্ট্রির পক্ষে বলেছে কিন্তু এই আন্দোলন চললে কংগ্রেসে গৃহ বিবাদ সুরু হবে।

হরিশঙ্কর বলিলেন, The Councils are exotic to the soil of India (কাউন্সিল ভারতের মাটিতে বিদেশ হইতে আমদানি করা বস্তু।) স্বরাজ লাভের পথে Councils আমাদের বড় বাধা, স্বরাজ লাভের পথে অপ্রয়োজনীয় জিনিস। The Congress will destroy with one hand and create with the other (কংগ্রেস এক হাতে ধ্বংস অন্য হাতে সৃষ্টি করিবে।) কাউন্সিলের মধ্যে দিয়ে বুরোক্রেসির সঙ্গে লড়াই না চালালে কনষ্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক চলতে পারবে না।

নিমাই শাস্ত্রী বলিলেন, কাউন্সিলে বুরোক্রেসির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমাদের দৃষ্টি আসল লক্ষ্য থেকে সরে যাবে।

বলাই, মৌঃ নুরুল হক, এককড়িবাবু মিলিয়া নিমাই শাস্ত্রীর যুক্তিকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন কাউন্সিলে গিয়া বুরোক্রেসির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ না করিলে স্বরাজ লাভের কোন আশা নাই, একসঙ্গে আমাদের ডেষ্ট্রাকশন ও কনষ্ট্রাকশন চালাইতে হইবে।

ব্যূহবেষ্টিত অভিমন্যুর মত নিমাই শাস্ত্রী আর মুখ খুলিবার অবসর পাইলেন না। রুষ্ট হইয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন। হরিশঙ্কর দেখিলেন খদ্দরের ময়লা উত্তরীয়খানি ফেলিয়া রাখিয়া নিমাই শাস্ত্রী

চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার ইঙ্গিতে একজন স্বেচ্ছাসেবক চাদরখানি হাতে লইয়া তাঁহার পিছনে ছুটিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহার মুক্তির পরে কাউন্সিল প্রবেশের আন্দোলন আরও প্রবল হইয়া উঠিল ও কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন আসন্ন বলিয়া মনে হইল। গয়া কংগ্রেসে দুই দল শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নূতন প্রোগ্রাম প্রচারিত হইল। প্রোগ্রামে চাষী ও মজুরদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার কথা ছিল। মজুরদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার কথায় কোন কোন জাতীয়তাবাদী কাগজ বলিল, ইহার ফলে দেশে বোলশেভিজম আসিবে। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি এই সময়ে রয়টার প্রেরিত মানবেন্দ্র রায়ের নামে প্রচারিত কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল চিত্তরঞ্জনের নূতন প্রোগ্রাম বোলশেভিষ্ট অনুপ্রাণিত।

গয়া কংগ্রেসে কংগ্রেসের ভিতরে স্বরাজ্য পার্টি নামে নূতন দল গঠিত হইল চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে।

নূতন দলকে শক্তিশালী করিবার জন্য হরিশঙ্করকে বাংলার বাহিরে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে হইত। বলাই সর্বেশ্বরকে তাঁহার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিল। সর্বেশ্বর ইংবাজিতে চমৎকার বলিতে পারে দেখিয়া হরিশঙ্কর তাহাকে মাঝে মাঝে সঙ্গে করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। পার্টির প্রচারক হিসাবে তাহার একটা বাঁধা মাহিনার ব্যবস্থাও হইল। সর্বেশ্বর দেখিল বলাই নূতন পার্টিকে শক্তিশালী করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। বড় বড় নেতাদেব কাছে তাহার খাতির, তাহার উপর তাঁহাদের বহু বিষয়ে নির্ভরতা দেখিয়া বলাইয়ের প্রভাব সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হইল। তাহার ধারণা হইল বলাই পিছনে থাকিয়া নূতন দলকে চালনা করিতেছে। একাধারে সে নেতাদের অসময়েব ফিন্যানসিয়ার ও সর্বক্ষণের ব্রেন ট্রাষ্টী। বলাইয়ের মত অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তিকে মুরুব্বীরূপে পাইয়া সে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিল। স্থির করিল অনিমাকে মাষ্টারী ছাড়িয়া পার্টির কাজে যোগ দিতে সম্মত করিবার জন্য ভাল কবিয়া চেষ্টা করিবে।

কংগ্রেসের দুই দলের মধ্যে মীমাংসার কথা আলোচনা করিবার জন্য বোম্বাইতে এক কনফারেন্স ছিল। বলাইকে লইয়া হরিশঙ্কর কনফারেন্সে গেলেন। বোম্বাই হইতে ফিরিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অসুখের

সময় পদ্মিনীর আত্মহত্যার কাহিনী সরলাদেবীর কাছে ভাল করিয়া শুনিবার অবসর পাইলেন। অবশ্য কথাটা ইহার আগেই তাঁহার কানে উঠিয়াছিল কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে সরলা দেবী নিজে কিছু জানিতেন না, স্বামীকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলেন না। শুধু বলিলেন কয়েকদিন পরে বলাইকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি ইহার কারণ। অসুখের সময়ে ফণীর কথাও তাঁহার মনে পড়িল। ফণী ও তাহার দলবল আর তাঁহার গৃহে আসে না। তিনি ভাবিলেন ফণীর এক্স-রিভোল্যুশনারী দলের ক্রনিক অনশনের সমস্যার কোন সুরাহা হইয়াছে বোধ হয়, নহিলে তাহারা এখানে আসিত। কিভাবে সুরাহা হইল জানিতে তাঁহার কৌতূহল হইল কিন্তু তখনই কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিবার উপায় নাই জানিয়া তিনি ধৈর্য ধারণ করিলেন।

সুস্থ হইয়া উঠিবার পরে একদিন পরামর্শের জন্য রসা রোডে চিত্তরঞ্জনের গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে হরিশঙ্কর দেখিলেন ফণী কয়েকজন যুবকের সঙ্গে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। গাড়ী থামাইয়া ফণীকে ডাকিবার আগে সে চলিয়া গেল। পরামর্শ সভায় এক্স-রিভোল্যুশনারী দলের কথা উঠিল।

একজন নেতা বলিলেন, এই দল আবার গোলমাল সুরু করেছে। মিঃ কলিন্সের হত্যা তার প্রমাণ। নূতন কতকগুলো কাগজ বেরিয়েছে বোলশেভিজম ও টেরোরিজম প্রচার করবার জন্য। ধূমকেতু নামে একখানা কাগজ বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিল, সেদিন তার সম্পাদকের জেল হয়ে গেল। এই দলকে হাত করতে না পারলে আমাদের পার্টির আইডিয়ালস পপুলার হওয়া কঠিন।

এ সম্বন্ধে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল কিন্তু কিভাবে এই দলকে হাত করিয়া সন্ত্রাসবাদের পথ হইতে সরাইয়া আনা যায় সে সম্বন্ধে কোন সর্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হইল না। বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন, শুধু স্বরাজ দলের নেতা স্বয়ং ও হরিশঙ্কর কোন মত প্রকাশ করিলেন না।

নানা সূত্র হইতে সন্ধান লইয়া দিন কয়েক পরে হরিশঙ্কর স্বয়ং ফণীর আড্ডায় উপস্থিত হইলেন।

হরিশঙ্করকে তাহার দরিদ্র আবাসে দেখিয়া ফণী অতিমাত্র বিস্মিত হইল। অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইল।

হরিশঙ্কর বলিলেন, আমার সঙ্গে এসো, জরুরী কথা আছে।

ফণীকে লইয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী তাঁহার গৃহে পৌঁছিলে উভয়ে তাঁহার খাস কামরায় বসিলেন।

হরিশঙ্কর বলিলেন, তোমার ব্যাপার কি হে? জেল থেকে ফিরে এলাম, অসুখে ভুগলাম, একবার দেখা করতে এলে না?

ফণী বলিল, আপনাকে দেখবার জন্য কয়েকদিন এসেছি কিন্তু ভেতরে ঢুকিনি, দারোয়ানের কাছে খবর নিয়ে চলে গিয়েছি।

হরিশঙ্কর—হোয়াট ওয়াজ দি আইডিয়া? কেন ভেতরে ঢুকলে না?

ফণী—বলাইবাবুকে দেখে ঢুকলাম না।

হরিশঙ্কর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বলাইয়ের সঙ্গে কবে থেকে তোমার ভাসুর ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ হল হে?

ফণী কথা ঘুরাইয়া বলিল, আর ঢুকেই বা কি করব স্যর? আপনারা স্বরাজদল করছেন, কাউন্সিল প্রবেশের আন্দোলন করছেন, এ সবের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

হরিশঙ্কর—কেন বল ত?

ফণী—কেন সে কথা আপনি নিজেও বোঝেন। গান্ধীজীর আন্দোলনে আমরা কোনদিন বিশ্বাস করিনি, নূতন এই আন্দোলনেও বিশ্বাস করি না। নন-কো আন্দোলনে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আর সময় নষ্ট না করে আমরা যে মতে বিশ্বাস করি সেই মতে—

বাহিরে বলাইয়ের সাড়া পাইয়া ফণী চুপ করিল। চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল আমাকে এবার ছেড়ে দিন স্যর।

হরিশঙ্কর তাহার কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া বলেন, একটু অপেক্ষা কর।

তিনি বাহিরে গেলেন ও মিনিট পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিলেন। চেয়ারে বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বলাইয়ের সঙ্গে তোমাদের নূতন কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?

ফণী দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক! ওটা পুলিশে খবর দিয়ে আমাকে ও দলের কয়েক জনকে জেলে পাঠিয়েছিল। নিজের বোনকে মেরে ফেলেছে।

বিস্মিত হইয়া হরিশঙ্কর বলিলেন, কি বলছ ফণী? পাদ্মনীকে মার্ডার করেছে? আর ইউ সিরীয়াস? শুনেছি সে নাকি আত্মহত্যা করেছে?

ফণী কোন উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল,

আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু কেন আত্মহত্যা করেছে বলাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছেন ?

হরিশঙ্কর কোন উত্তর দিলেন না। ফণী বলিল, জিজ্ঞাসা করেছেন বলাইবাবুকে স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের একজন বড় অফিসার কেন ঘন ঘন তার বাড়ীতে যায় ? জিজ্ঞাসা করেছেন আপনাদের পরামর্শের খবর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে পৌঁছে যায় কেমন করে ?

হরিশঙ্করকে নিরুত্তর দেখিয়া ফণী আবার বলিল, ওটাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিন স্যর, ও আপনাদের সর্বনাশ করবে। নিজের বোনকে ও বালাচাঁদের কাছে বেচে দিয়েছিল, তাই সে আত্মহত্যা করেছে।

এতক্ষণ পরে হরিশঙ্কর কথা বলিলেন। চিন্তিতভাবে বলিলেন, তোমার অভিযোগ কতখানি সত্যি জানিনে, কিছু সত্যি হতে পারে। ওপরে ওঠবার জন্য, মানে টাকার জন্য, ক্ষমতা লাভের জন্য বলাই নিজের বাপ, মা, ভাই, বোন, স্ত্রীকে বেচে দিতে পারে। ব্ল্যাক মেইল করে, স্পাইগিরি করে, পিম্পের কাজ করে, টাকা খাইয়ে বলাই নিজের ওঠবার পথ করে, ওঠবার আর্টে ও একজন জিনিয়াস। আমাকে পর্যন্ত ও ওঠবার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, করছেও এ পর্যন্ত। যে কোন লোককে ও হাত করতে পারে যদি ওর কাজের জন্য সেটা প্রয়োজন হয়। লোক হাত করবার আর্টে ও একজন জিনিয়াস। ওকে তাড়াবার কথা বলছ, ও নিজে না সরলে ওকে সরানো একেবারে অসম্ভব কথা ফণী। সব দোষ সত্ত্বেও বলাই এত কাজের লোক, এত কম্পিটেন্ট—

ফণী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আচ্ছা আমি আসি স্যর।

হরিশঙ্কর বলিলেন, বসো, আরও কথা আছে।

ফণী বসিল। হরিশঙ্কর বলিলেন, তুমি এসেছ আমার স্ত্রী খবর পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে এস। আমার জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে, কিছু সময় লাগবে বলতে। যাও আগে দেখা করে এস।

সরলা দেবীর সঙ্গে দেখা করিয়া প্রচুর জলযোগ করিয়া ঘণ্টাখানেক বাদে ফণী যখন নামিয়া আসিল উপর হইতে তখন তাহার মেজাজ অনেক নরম হইয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া হরিশঙ্কর তাঁহার কথা পাড়িলেন। বলিলেন অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ফণীর দল তাঁহাকে যেভাবে সাহায্য করিয়াছিল নূতন পার্টির কাজে সেই রমক সাহায্য তিনি দলের কাছে চান। আহার, বাসস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে দলের সব অভিযোগ দূর করিবার আশ্বাস দিলেন তিনি।

ফণী স্বীকার করিল রসা রোড হইতে এই রকম প্রস্তাব আসিয়াছিল তাহাদের কাছে, মন স্থির করিতে পারে নাই। বলিল, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অন্য রকমের। দলের সকলের মত পাবার চেষ্টা করব আমি। যা স্থির হয় দু'এক দিনের মধ্যে জানাব। হরিশঙ্কর বলিলেন, তুমি আমাকে ত্যাগ করবে না এই ভরসা পেলেই যথেষ্ট। এত লোক রয়েছে পার্টির মধ্যে কিন্তু বিশ্বাস করবার, নির্ভর করবার লোক তোমাদের দল ছাড়া আর কোথায় পাব ?

ফণীর মন আরও নরম হইল। সে বলিল সবাইকে রাজি করাতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব স্যর।

হরিশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, এ বিশ্বাস বরাবর তোমার উপর আছে ফণী।

ফণী বিদায় লইল। বলাইয়ের কাছে ইতিমধ্যে সে টাকা আদায় করিয়াছিল হরিশঙ্করের কাছে সে কথা ফণী গোপন করিল। জেল হইতে বাহির হইয়া সে সোজা বলাইয়ের কাছে গিয়াছিল, পদ্মিনীর আত্মহত্যার কথা বা আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে গুজব তখনও সে শুনে নাই।

গয়া কংগ্রেস হইতে কোকনদ কংগ্রেসের সময় পর্যন্ত কংগ্রেসী রাজনীতির ধারা কংগ্রেসের পরস্পরবিরোধী দুই দলের মধ্যে বিতর্কের খাতে প্রবাহিত হইতে থাকিল। দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদের ফলে আন্দোলনের গতি স্তিমিত হইল। যেন শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য কোন কোন স্থানে মদের দোকানে পিকেটিং, নাগপুরে পতাকা সত্যাগ্রহ, কলিকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট সত্যাগ্রহ চলিল। অসহযোগ আন্দোলন যে প্রজা জাগরণ আনিয়াছিল তাহার বিলম্বিত ফল দেখা গেল মেদিনীপুরে সাঁওতাল হাঙ্গামায়।

গৃহ বিবাদে দুর্বল কংগ্রেসী আন্দোলনকে ছাপাইয়া হিন্দু মুসলমান বিরোধ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। কোকনদ কংগ্রেসে সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি বলিলেন হিন্দু ও মুসলমানরা দেশের আদিবাসীদিগকে ভাগ করিয়া লউক। হিন্দুদের পক্ষ হইতে এ প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ উঠিল।

কাউন্সিল-প্রবেশ আন্দোলনের বিরোধী নৈষ্ঠিক অসহযোগীরা প্রতিপক্ষকে নিস্তব্ধ করিবার জন্য অসহযোগের আদর্শের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসী রাজনীতির নূতন একদল সমালোচক দেখা দিলেন এই সময়ে। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "কংগ্রেস এখনও পূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলিতে ভয় পায়। কংগ্রেস উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের রক্ষক, জনসাধারণের দরদী নয়। "The fear lest

the interest of your own class should suffer, if there is unrest in the country, has paralysed you."

ডায়ার্কি শাসনসংস্কার মতে বাংলায় মন্ত্রী নিয়োগ করা হইতেছে গুজব প্রচারিত হইল। নূতন পার্টির নেতাদের মধ্যে ঘনঘন পরামর্শ বৈঠক বসিতে লাগিল।

বলাইকে সঙ্গে লইয়া মৌঃ নুরুল হকের গৃহে এক পরামর্শ সভায় যাইবার জন্য হরিশঙ্কর বলাইয়েব গৃহে আসিয়া দেখিলেন সর্বেশ্বর, ফণীর দলের কয়েকজন লোক ও একটি বিশ বাইশ বছরের মেয়ে সেখানে উপস্থিত। বলাই এই কর্মীদের লইয়া কাজের প্রোগ্রাম আলোচনা করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। সর্বেশ্বর মেয়েটির পরিচয় দিয়া বলিল, এটি আমার বোন অনিমা। ও একটা স্কুলে টিচারি করে। বলাইবাবু ওকে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে পার্টির কাজ নিতে বলছেন। ও এখনও রাজি হয়নি।

হবিশঙ্কর অনিমার দিকে চাহিলেন। পদ্মিনীর মত নরম নরম চেহারা নয়। একটু তীক্ষ্ণ ভাব রহিয়াছে। নাক মুখ চোখা, ইনটেলেকচুযাল ও বোল্ড টাইপের চেহারা। এক নজর দেখিযা তিনি হাসিয়া বলিলেন, তোমার আপত্তি কিসের? বেশী ঝামেলা পছন্দ না কর বেশ কোয়ায়েট কাজ দিতে রাজি আছি। আই এম ব্যাডলি ইন নীড অব এ পারসোন্যাল এসিস্টান্ট। ষ্টেটমেণ্ট, ম্যানিফেষ্টো লিখবে নোট থেকে, করেসপণ্ডেন্স চালাবে। পারবে না?

হরিশঙ্কর আবার হাসিলেন অনিমার দিকে চাহিয়া।

অনিমা দেশপ্রসিদ্ধ নেতার চেহারায়, ব্যবহারে আকৃষ্ট হইল।

কোন সঙ্কোচ না করিয়া বলিল, আমি এখন যে কাজ করি মাইনে ছাড়া তাতে অসুবিধে বিশেষ কিছু নেই। আপনি যে দায়িত্বপূর্ণ কাজের কথা বলছেন তাতে ভয় পাচ্ছি।

হরিশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন ওনলি দি টিমিড আর এফ্রেড, তোমাকে দেখে সে রকম তো মনে হচ্ছে না। দু' চার দিনের মধ্যে শিখে নিতে পারবে। মাইনে যা পাবে তাতে এখনকার অসু'বিধা থাকবে না। আই শ্যাল সি টু ইট। যদি রাজি থাক কাল চলে এস আমার বাড়ীতে।

অনিমা একটু ভাবিয়া বলিল, কাল হয়ত হবে না। স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এ সপ্তাহের শেষের দিকে হতে পারে।

হরিশঙ্কর বলিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ। তারপর বলাই, তোমাকে এখনই উঠতে হবে। আমি গাড়ীতে অপেক্ষা করছি, তুমি এঁদের বিদায় করে এস। আপনাকে বোধ হয় এলাহাবাদ যেতে হবে দু' চার দিনের মধ্যে।

দরজার কাছে গিয়া তিনি আবার বলিলেন, সর্বেশ্বরবাবু, কাল সন্ধ্যার পরে একবার আমার বাড়ীতে আসবেন।

তিনি চলিয়া গেলেন। চোখের উপর হরিশঙ্কর অনিমাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেলেন দেখিয়া বলাই অসন্তুষ্ট হইল। আজ কয়েক মাস ধরিয়া সে কত লোভ দেখাইতেছে অনিমাকে তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারী হইবার জন্য, অনিমা রাজি হয় নাই। সে বক্র কটাক্ষে একবার অনিমার দিকে চাহিল, অনিমা তাহা লক্ষ্য করিল না। মনের ভাব মুখে প্রকাশ করা বলাইয়ের স্বভাব নয়। সে হাসিমুখে উপস্থিত সবাইকে বিদায় দিল। অনিমাকে বলিল, আপনি তো এবার হাইকম্যাণ্ডে ঢুকে পড়লেন, কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি।

অনিমা বলাইয়ের কণ্ঠস্বরে শ্লেষের আভাস পাইয়া তাহার দিকে একবার চাহিল, কোন উত্তর দিল না।

বলাই আর কোন কথা না বলিয়া হরিশঙ্করের অনুসরণ করিল।

স্বরাজ্য দলের হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের খবর প্রচারিত হইতে দেশে বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ হইল। বেঙ্গলী লিখিল "We were not prepared for the preposterous surprise which Mr Das has chosen to spring upon us" অন্য একখানি কাগজ লিখিল, মি সি. আর দাস লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট ভাঙ্গিয়া মুসলমানদের তুষ্ট করিবার জন্য হিন্দুদের বলি দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কেহ বলিল, ইহা হিন্দু ধর্মের উপর আক্রমণ।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত নূতন দলের নেতাদের সভা চলিল কিভাবে এই বিরূপ সমালোচনার মোড় ঘুরাইতে পারা যায়।

সভা শেষ হইলে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া হরিশঙ্কর গৃহে ফিরিলেন। ফিরিয়াই কিছু নোট দিবার জন্য অনিমার খোঁজ করিলেন। বেয়ারা আসিয়া জানাইল অনিমা দিদিমণি ঘরে নাই। এত রাত্রে অনিমা ঘরে নাই শুনিয়া হরিশঙ্কর বিস্মিত হইলেন। সে গেল কোথায়?

বেয়ারাকে পাঠাইলেন উপরে মেম সাহেবের কাছে সে আছে কি না জানিবার জন্য। বেয়ারা উপরে গেল, হরিশঙ্কর হাত মুখ ধুইবার জন্য বাথরুমের দিকে অগ্রসর হইলেন। অনিমার ঘরের পাশ দিয়া বাথরুমে যাইতে হয়। এই

ঘরে আগে পদ্মিনী থাকিত। খোলা দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে চাহিতে হরিশঙ্করের মনে হইল কে যেন পিছন ফিরিয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।

তিনি ডাকিলেন, কে দাঁড়াইয়া? অনিমা?

বেয়ারা ফিরিয়া আসিল। জানাইল মেম সাহেব বলিয়াছেন অনিমা দিদিমণি বাড়ী গিয়াছেন। বেয়ারাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া হরিশঙ্কর থামিয়া গেলেন। শুধু বলিলেন, ও ঘরে কেউ আছে কি না দেখ।

বেয়ারা আদেশ শুনিয়া বিস্মিত হইল। ঘরে কেহ নাই একটু আগে সে দেখিয়াছে। তবু আদেশ পালন করিবার জন্য ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল, কেউ নাই হুজুর।

বিস্মিত হরিশঙ্কর বাথরুমে গেলেন। চোখে মুখে জল দিয়া তিনি খাস কামরায় ফিরিলেন। টিপয়ের উপরে রক্ষিত পানীয়টুকু নিঃশেষ করিয়া কিছু সুস্থ বোধ করিলেন। বেয়ারা ট্রেতে আর একটি পেগ আনিয়া টেবিলে রাখিল। তিনি বেয়ারাকে বলিলেন, তুমি শুতে যাও।

উঠিয়া লিখিবার টেবিলে গিয়া বসিলেন হরিশঙ্কর। জরুরী পয়েণ্টগুলি নোট করিয়া রাখিতে হইবে। অনিমা চলিয়া গিয়াছে বলিয়া কি কাজ বন্ধ থাকিবে? হাত বাড়াইয়া তিনি দ্বিতীয় পেগ টানিয়া লইলেন। সেটি নিঃশেষিত হইলে হঠাৎ ভুলিয়া যাওয়া কোন কথা আবছা মনে পড়িতেছে এই অনুভূতি জাগিল তাঁহার মনে। সিগারেট ধরাইয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে কয়েকবার টানিলেন। কথাটি এইবার পুরাপুরি মনে পড়িল। কথাটি অনিমার সম্বন্ধে।

কয়েক দিন ধরিয়া অনিমা অভিযোগ করিতেছিল গভীর রাত্রে তাহার ঘরের দরজায় কে করাঘাত করে। সে কে, কি চাই? বলিয়া উত্তর দিলে করাঘাত থামিয়া যায়। হরিশঙ্কর হাসিয়া তাহার অভিযোগ উড়াইয়া দিয়াছেন। গত রাত্রে দরজায় করাঘাতের শব্দ হইতে অনিমা নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া করাঘাতকারীকে দেখিয়া অস্ফুট চিৎকার করিয়া তখনই সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যত করাঘাতকারীর পায়ের বুড়া আঙুল নিষ্পিষ্ট হইতে হইতে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল।

করাঘাতকারী আরও কয়েকবার দরজায় মৃদু করাঘাত করিল, অনিমা কোন সাড়া দিল না, দরজাও খুলিল না। নিজের মনে মৃদু হাসিয়া করাঘাতকারী শ্লথচরণে ফিরিয়া গেল।

এইসামান্য ব্যাপারটা সারাদিন কাজের চাপে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন হরিশঙ্কর। হঠাৎ মনে পড়ায় কৌতুকের হাসিতে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইল। অনিমার অন্তর্ধানের কারণ তাহা হইলে এই নৈশ করাঘাত ঘটিত ব্যাপার।

হাসি বন্ধ করিয়া চোখ বুঁজিয়া মাথা নাড়িয়া হরিশঙ্কর আপন মনে বলিলেন, —সী স্যাড হেভ গিভন মি এ লিটল মোর টাইম; বড্ড তড়বড়ে মেয়ে অনিমা, কোয়াইট আনলাইক আনফরচুনেট পদ্মিনী।

হাতের সিগারেট এস্‌ট্রেতে ফেলিয়া দিয়া হরিশঙ্কর লিখিবার প্যাড টানিয়া লইলেন। জরুরী পয়েণ্টগুলি লিখিয়া রাখিতে হইবে। অনিমা চলিয়া গিয়াছে বলিয়া কি কাজ বন্ধ থাকিবে?

পঞ্চম খণ্ড

এক

অতসী কুঞ্জ (১৯২৪—২৫)

বাহিরে যাইবার পোষাক পরিয়া বিরাজ বারান্দায় আসিল, ভৃত্যকে ডাকিয়া ঘর বন্ধ করিতে বলিল। ভৃত্য দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, বিরাজ তখনও দাঁড়াইয়া। কি ভাবিতেছিল সে। কিছুক্ষণ পরে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট কেস হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে যাইবে, তাহার দৃষ্টি পড়িল রাস্তার দিকে। অন্ধকার হইয়াছে, অদূরবর্তী গ্যাসের আলোতেও ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না। তাহাব মনে হইল একটি মনুষ্যমূর্তি তাহার বাড়ীতে ঢুকিবার ফটকের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার সাড়া পাইয়াই দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। গ্যাসের আলো অতিক্রম করিবার সময়ে সে দেখিল মূর্তিটি স্ত্রীলোকের, তাহার মনে হইল সম্ভবতঃ হৈমন্তীর। যদি হৈমন্তীই হয় কেন সে আসিয়াছিল, কেনই বা এইভাবে পলায়ন করিল সে বুঝিতে পারিল না। একবার ভাবিল দ্রুত অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিবে, পরক্ষণে সে ইচ্ছা দমন করিল। হউক হৈমন্তী, সে যখন পালাইল তখন পিছনে তাড়া করিয়া তাহকে ধরিতে যাইবার কোন মানে হয় না। সিগারেটটি ধরাইয়া সে কয়েকবার টানিল। তারপর সেটি ফেলিয়া দিয়া ভৃত্যকে ডাকিল দরজা খুলিবার জন্য। অতসীকুঞ্জে যাইবে মনে করিয়াছিল, এ ইচ্ছা ত্যাগ করিল।

পোষাক পরিবর্তন করিয়া পড়িবার ঘরে একখানা আরাম চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়া সে আবার সিগারেট ধরাইল। কিছুক্ষণ হৈমন্তীর কথা তাহার মাথায় ঘুরিল। তারপর এই চিন্তা মাথা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। আপনাকে ব্যঙ্গ করিয়া স্বগত বলিল, গিভ আপ গেটিং সেন্টিমেণ্টাল এবাউট ছ্যাট গার্ল। এক সময়ে ওকে নির্বোধের মত ভালবেসেছিল, মানলাম। তাতে হয়েছে কি? সী ডিড নট লাইক ইউ এনি হাউ। প্লিজ ট্রাই টু বী রেশনাল। ভালবাসাকে রেশনালাইজ করলে পাওয়া যায় ভাল লাগা। ছ্যাট ইজ দি পয়েণ্ট—

সিগারেটের ছাই ঝাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তীর চিন্তা মাথা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বিরাজ অন্য দিকে চিন্তার গতি ফিরাইল। তাহার মনে পড়িল সবুজ সংঘের গত শনিবারের অধিবেশনের কথা। আলোচনাটা খুব জমিয়াছিল সেদিন। সভাপতি মি. চ্যাটার্জির ঘাড়ে বোধহয় দুষ্ট সরস্বতী ভর করিয়াছিলেন, হি রিভেল্‌ড ইন ব্ল্যাসফেমিজ। তিনি স্বরাজী পোলিটিকসের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছিলেন পুরনো পটকাবাদের ওপর ব্যর্থ নন'কোর ছেঁড়া নামাবলি চড়িয়ে বাঙালীরা সাইমালটেনিয়াস ডেষ্ট্রাকশন ও কনষ্ট্রাকশনের থিওরি প্রচার—

বিরাজদা বাড়ী আছেন? বাহির হইতে কে ডাকিল।

গলা শুনিয়া সে বুঝিল ভানু ডাকিতেছে। সে বলিল, এসো ভানু।

ভানু ঘরে ঢুকিয়া একখানা চেয়ারে বসিতে বসিতে বলিল, বিরাজদা, আপনি একটা উপায় করুন।

মাস কয়েক আগে পর্যন্ত ভানু, বিরাজ ও রাধামোহনকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিত ও মনে তাহাদের উভয়েব বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করিত। যখন হইতে রাধামোহনের প্রতি হৈমন্তীর পক্ষপাতের কথা সে বুঝিতে পারিল বিরাজের প্রতি তাহার বিদ্বেষভাব দূর হইল। বিরাজের সাহায্য লইয়া তাহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাধামোহনকে সরাইয়া দেওয়া যায় কিনা ভানু সেই চেষ্টায় তৎপর হইল। ইদানীং রাধামোহনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জানাইবার জন্য সে প্রায়ই বিরাজের কাছে আসিত।

ভানুব কথা শুনিয়া বিরাজ বলিল. কিসের উপায় ভানু? নূতন কি হল?

ভানু—কি হয়নি জিজ্ঞেস করুন বরং। দিনের মধ্যে পাঁচবার ডেকে পাঠিয়ে হৈমন্তী বলে রাধামোহনের খোঁজ নিয়ে এস। এদিকে অতসী কুঞ্জে পা দিলেই রাধেশদা এসে গ্রেপ্তার করেন, বলেন বাপুজী মহাকাব্যের আর এক সর্গ লেখা হয়েছে, শুনবে এস। কয়েক দিন যাওয়া বন্ধ করলাম। সেদিন হৈমন্তী নিজেই আমাদের বাড়ী এসে হাজির। ভাবলাম, ভাবলাম—

বিরাজ,—হৈমন্তী কি বলল?

ভানু—হৈমন্তী আমাকে বলল তুমি কোন কাজের লোক নও; এ পর্যন্ত কোন খবর আনতে পারলে না। কি অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে বুঝুন দাদা। কি ভাবে সে আমাকে? আমি কি পাগল যে রাধামোহনের খবর আনব তাকে খুশী করবার জন্য? ধরুন না হয় হৈমন্তীকে খুশী করবার জন্য একবার সত্যি সত্যিই গেলাম তার বাড়ীর দিকে। কিন্তু গিয়ে ঢুকব কি করে? পুলিশ

দিনরাত তার বাড়ীর ওপর নজর রাখছে আমি জানি, পাড়ার অনেকেই জানে। বাড়ীতে ঢুকলে নামটি লেখা পড়বে পুলিশের খাতায়। তারপর? তাছাড়া রাধামোহন কি বাড়ীতে থাকে যে তাকে পাব? কোথায় কোন গুপ্তদলের সঙ্গে মিশে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে গা ঢাকা দিয়ে। শাঁখারিটোলার পোষ্ট মাষ্টার খুন হবার ও ডে সাহেবকে মারবার জন্য গোপীনাথ সাহা ধরা পড়বার পর সে সে কি আর বাড়ীমুখো হয় পুলিশের ভয়ে? পুরনো বিপ্লববাদীদের পুলিশ আবার ঝাঁক শুদ্ধ গ্রেপ্তার করছে। হৈমন্তীকে কতবার বলেছি রাধামোহন পুলিশের ভয়ে ফেরার হয়েছে, সে বিশ্বাস করে না। মুখ ভার করে বলে তুমি কোন কাজের লোক নও, এ পর্যন্ত খবর আনতে পারলে না। তার মুখ ভার দেখে আমার হৃদয়—

বিরাজ হাতের সিগারেটটি য়্যাশট্রেতে চাপিয়া ধরিয়া নির্দয়ভাবে সেটি পিষ্ট করিল। বলিল, তোমার হৃদয় থাক, তারপর?

দগ্ধাবশেষ সিগারেটের টুকরার উপর এই পীড়নের দৃশ্যে ভানু একবার ঢোক গিলিল। বলিল, আমি বললাম রাধামোহনের জন্য এত মন খারাপ কেন হৈমন্তী? সে তো একটা বিপ্লবী। হৈমন্তী বলল বিপ্লবীরা কি মানুষ নয়? আমাদের বাড়ীর পাশে হরিবাবুর বাড়ীতে আগে এক ভাড়াটে ছিল। ওদের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। ওদের এক আত্মীয় ছিল নাম কুন্তল চক্রবর্তী। কাগজে কুন্তল চক্রবর্তীর মৃত্যু সংবাদ পড়েছিলাম সেদিন। আমি বললাম কুন্তল চক্রবর্তী তো একজন ভয়ানক বিপ্লবী ছিল। হৈমন্তী কোন উত্তর না দিয়ে আবার বলল, আর একটি ছেলের মৃত্যু খবর পেলাম সেদিন। তার সঙ্গে এক সময়ে আমার আলাপ হয়েছিল। তার নাম মতিলাল। বেলিয়াঘাটায় এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে বসন্ত রোগীর শুশ্রূষা করতে গিয়ে তার বসন্ত হয়েছিল। লোকে জানত সে একজন নির্মমহৃদয় বিপ্লবী। বরানগর অস্ত্র আইনে তার জেল হয়েছিল। চাটগাঁ জেলে থাকবার সময়ে—

আমি বাধা দিয়ে বললাম যে সব হতভাগ্য বিপ্লবী মারা গেছে তাদের জন্য মন খারাপ না করে—

বিরাজ নূতন একটি সিগারেট ধরাইতেছিল। ভানুর কথা শুনিয়া জ্বলন্ত কাঠিটি সিগারেটে না লাগাইয়া আক্রোশে য়্যাশট্রের উপর চাপিয়া ধরিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কঠোর দৃষ্টিতে ভানুর দিকে চাহিল।

ভানু ইহা লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিল, আমার কথার কোন উত্তর না

দিয়ে হৈমন্তী চলে গেল। যাবার সময়ে বলল, রাধামোহন বাবুর খবর শীগগির চাই।

বিরাজের কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হইল; কঠোর দৃষ্টি শান্তভাব ধরিল। নূতন একটি কাঠি জ্বালাইয়া সে সিগারেট ধরাইল।

ভানুর স্বর অভিমানে ভারী শুনাইল। সে বলিল, এই কি আমার প্রাপ্য ব্যবহার? আপনিই বিচার করুন বিরাজ দা। রাধামোহন কে? মহাত্মাজীর অহিংসা ধর্মে অবিশ্বাসী একজন দাম্ভিক এনার্কিষ্ট। বলে মার ছাড়া ইংরাজকে ভাগাবার অন্য ঔষধ নাই। ইংরাজের গায়ে হাত দেবার শখ তোমাদের? সার্জেন্টের মার, কনেষ্টবলের বেটনের গুঁতো খেয়ে, ঘানি টেনেও আক্কেল হল না? চোরের মার নির্বিবাদে হজম করে এসে এখন হিংসাবাদী হয়েছে রাধামোহন, এখন সে রেড বেঙ্গল লিফলেট ছড়ায় আর বোমা বানায়। মির্জাপুর ষ্ট্রীটের বোমার ব্যাপারের পর বাড়ী ছেড়ে উধাও হয়েছে সে। হৈমন্তী কি এসব কথা জানে না? তবু কেন সে আমাকে রাধামোহনের খবর আনতে বলে? ওর মুখে রাধামোহনের নাম আমার কানে বিষ ঢালে। অপদার্থ অযোগ্য রাধামোহনের জন্য এত দরদ আর আমি যে ভিখিরীর মত হাত পেতে—

ভাবাবেগে ভানু আত্ম সংবরণ করিতে পারিল না, চোখে জল আসিল।

বিরাজ তাহার দিকে একবার চাহিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, নিনকম্পূ!

রুদ্ধকণ্ঠে ভানু বলিল, কি বললেন বিরাজ দা?

বিরাজ—বললাম তুমি একজন অতি যোগ্য পাত্র। হৈমন্তীর চোখ নেই তাই—

ভানু সোফা হইতে উঠিয়া বিরাজের হাত জড়াইয়া ধরিল, বলিল, ঠিক কথা বলেছেন বিরাজ দা, হৈমন্তীর চোখ নেই তাই।

আরও মিনিট পনের ধরিয়া হৈমন্তীর অবিবেচনার জন্য হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া ভানু চলিয়া গেল।

ভানু চলিয়া যাইবার পর বিরাজ অনেকক্ষণ আরাম চেয়ারে টান হইয়া পড়িয়া রহিল ও একটার পর একটা সিগারেট পোড়াইতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল রাধামোহন-হৈমন্তী কাব্য কি ভাবে শেষ হইবে বোঝা যাইতেছে না। ভানু বলিল রাধামোহন ফেরার হইয়াছে। বোধ হয় কথাটা সত্য। হোম মেম্বার ষ্টিফেনসন প্রেস কনফারেন্সে বাংলায় রেক্রুডেসেন্স অব টেরোরিজম

সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার পর এংলো ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি চিৎকার করিতে সুরু করিয়াছিল। সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশনে গোপীনাথ সাহা রেজোল্যুশন পাশ করিয়া রিভোল্যুশনারী দল চ্যালেঞ্জ দিয়াছে। মহাত্মাজী নাকি এই রেজোল্যুশন পাশ হওয়াতে আপসেট হইয়াছেন। শীঘ্রই অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে কাউণ্টার রেজোল্যুশন উপস্থিত করিবেন। বাংলায় বিপ্লববাদকে আবার মাথা তুলিতে দেখিয়া অহিংসাবাদী দেশীয় কাগজগুলি লিখিতে সুরু করিয়াছে, মহাত্মাজীর অহিংসা নীতি যাহারা অগ্রাহ্য করে দেশের মঙ্গল তাহারা চাহে না, তাহারা দেশের শত্রু। হিংসার ভ্রান্ত পথ ধরিয়া তাহারা স্বদেশপ্রেমকে লোকের চোখে কলঙ্কিত করিতেছে। ইহাদের মতে The cult of revolution is against the spirit of India. It does not harmonise with Indian character. (বিপ্লববাদ ভারতের প্রকৃতির বিরোধী। ভারতীয় চরিত্রের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য সাধন করা যায়না)। শুধু বোমা বিভলবার কেন, পুরনো "ভদ্রলোক ডাকাতির" ধূয়াও উঠিয়াছে আবার। গভর্ণমেণ্ট আবার পাইকারীহারে গ্রেপ্তার ও ইণ্টার্ণমেণ্ট আবার আরম্ভ করিয়াছে। এ অবস্থায় রাধামোহন ফেরার না হইয়া করিবে কি ? কিন্তু কতদিন ফেরার হইয়া থাকিতে পারিবে ?

হাতের দগ্ধাবশেষ সিগারেটটি ফেলিয়া দিয়া বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল ভৃত্য ইতিমধ্যে তাহার সান্ধ্যকালীন পানীয় পাশের টিপয়ে রাখিয়া গিয়াছে। পানীয়টুকু নিঃশেষ করিয়া সে স্বগত বলিল, রাধামোহন-হৈমন্তী কাব্য কি ভাবে শেষ হবে বোঝা যাচ্ছে না। তা না যাক্ কিন্তু এদিককার ব্যাপারটা কি ? শেষকালে মি সি. আর দাশ পর্যন্ত বলে বসলেন—"There is undoubtedly an anarchist movement in Bengal which is much more serious than the authorities realise and it is becoming increasingly difficult to suppress it". (বাংলার এনার্কিষ্ট আন্দোলন চলিতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্তৃপক্ষ যতটা মনে করেন এই আন্দোলন তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা দমন করা ক্রমশঃ দুরূহ হইতেছে)। ষ্টেটসম্যান কাগজের প্রতিনিধির কাছে একথা বলবার উদ্দেশ্য কি ? হোয়াট ডাজ হি মিন ? ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে বিরাজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এই উক্তির মর্ম উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল এই উক্তি সম্বন্ধে একখানি কাগজ লিখিয়াছে, "যদি মি দাশ

গভর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইবার স্থূল উদ্দেশ্য লইয়া ষড়যন্ত্রের কাহিনীর কথা বলিয়া থাকেন গভর্ণমেণ্ট ইহা অপব্যবহার করিবার সুযোগ লইয়াছে।

আর একখানা কাগজের কথা মনে পড়িল। কাগজখানা বলিয়াছে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া পুরনো বিপ্লববাদীরা বিনা বাধায় আত্মকাহিনী, নানা রকম বই লিখিয়াছেন মহাত্মাজীর প্রভাব নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে। লেখকরা অনেকে আমাদিগকে বলিয়াছেন সরকারের পরোক্ষ সমর্থন পাইয়া তাঁহারা এইরূপ করিতে পারিয়াছেন। এ কথার মধ্যে সত্য কতখানি আছে আমরা জানি না, তবে কোন কোন বিপ্লবপন্থীর প্রতি সরকারের সদয় ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

কিছুক্ষণ পরে নিজের পড়িবার ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া বিরাজ টেবিলে বসিল।

ইহার কয়েক দিন পরে নূতন বেঙ্গল অর্ডিনান্স পাশ হইল। তারপর বেড়াজাল ফেলিয়া পুলিশ সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বাহাত্তর জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করিল। কেহ কেহ বলিল গোপীনাথ সাহা প্রস্তাব সম্পর্কে এই গ্রেপ্তার হইয়াছে, কেহ বলিল স্বরাজ্য দলকে ধ্বংস করিবার জন্য দলের শ্রেষ্ঠ কর্মীদিগকে সরাইয়া দেওয়া হইল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। অতসী কুঞ্জে রাধেশ তাহার ঘরে বসিয়া বাপুজী মহাকাব্যের দশম সর্গ শেষ করিয়া একাদশ সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। লাইন কয়েক লিখিয়া কলম রাখিয়া সে মৃদুস্বরে লিখিত অংশ পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে হৈমন্তীর মত জানিবার জন্য সে বার দুই তাহাকে ডাকিল। তাহার নিয়মিত শ্রোতা ভানুকে কিছু দিন হইতে দেখা পাওয়া যাইতেছে না। তাই সময়ে অসময়ে হৈমন্তীর ডাক পড়ে মতামত দিবার জন্য। হৈমন্তীর সাড়া না পাইয়া রাধেশ নিজেই আর একবার লিখিত অংশ পড়িল। তারপর কলমের ডগা দিয়া কপালে টোকা মারিতে লাগিল মস্তিষ্ককে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য।

দাদার ডাক হৈমন্তীর কানে যায় নাই। বসিবার ঘরে কয়েকখানা পুরনো চিঠি পাশে রাখিয়া গভীর মনোযোগ দিয়া সে একখানি করিয়া চিঠি পড়িতেছিল। দোরে আঘাতের শব্দ হইতে সে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক যে ভানু তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না তাহার মনে। তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল বিরক্তিতে। বিরক্তি দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া সে ত্রস্তপদে পরদা সরাইয়া পাশের ঘরে ঢুকিল। তাড়াতাড়িতে

চিঠিগুলি সরাইয়া রাখিবার কথা তাহার মনে হইল না। সে ভাবিল ভাত্থ ডাকিলে ভৃত্যকে ডাকিয়া কোন অজুহাতে তাহাকে বিদায় করিবে।

হৈমন্তী চলিয়া যাইতে আগন্তুক ভেজানো দরজা ঠেলিয়া পরদা সরাইয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরে ঢুকিয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না কিন্তু পরদার কম্পন হইতে কোন লোক যে এইমাত্র ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইল না। যে চলিয়া গিয়াছে সে হৈমন্তী ছাড়া অন্য কেহ হইতে পারে না এই সিদ্ধান্ত করিয়া আগন্তুক দরজায় ছিটকিনি লাগাইয়া একখানি কৌচে বসিল। তাহার দৃষ্টি পড়িল চিঠিগুলির দিকে। কি ভাবিয়া একখানি চিঠি তুলিয়া লইয়া পড়িতে গিয়া সে দেখিল তাহারই লেখা চিঠি। আপন মনে মৃদু হাসিয়া সে চিঠিখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তারপর পাশের ঘরে কেহ থাকিলে শুনিতে পায় এইরূপ স্বরে বলিল, এক কাপ চা চাই।

হৈমন্তী পরদার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল, গলা শুনিয়া সে বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

আগন্তুক রাধামোহন।

রাধামোহনের দিকে চাহিয়া হৈমন্তী বিস্ময়ে কুশল প্রশ্ন করিতে ভুলিয়া গেল। তাহার শুষ্ক, শীর্ণ চেহারা ও বসিবার ভঙ্গীতে মনে হয় ক্লান্তিতে সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া হৈমন্তীর হৃদয় আলোড়িত হইল। আপনার অতিমাত্র বিচলিত ভাব একটু সংবরণ করিয়া কাছে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার অসুখ করেছিল ?

রাধামোহন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া একটু ক্লান্ত হাসি মুখে আনিয়া বলিল, আমার খোঁজ করছিলে শুনলাম। কেন ?

হৈমন্তী বলিল, তুমি চা চাইছিলে না ? একটু অপেক্ষা কর, আমি এখুনি চা আনছি।

রাধামোহন—চা পরে হবে। আমার খোঁজ করছিলে কেন ?

তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া হৈমন্তী বলিল, আমি এখুনি আসছি।

সে ভিতরে চলিয়া গেল এবং একখানি কাঁচের ডিসে কয়েকটি সন্দেশ ও এক গ্লাস জল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

সে দেখিল রাধামোহন চোখ বুজিয়া কৌচে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কি না বুঝিতে পারিল না। হাতের ডিস ও গ্লাস নীচু গোল টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, চা আসছে, এইটুকু খেয়ে নাও।

রাধামোহন চমকিয়া সোজা হইয়া বসিল। হৈমন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হৈমন্তী বলিল, তাহতো, জাগিয়ে দিলাম।

তারপর হাসিয়া বলিল তুমি খেয়ে নাও, চা আসছে এখুনি।

রাধামোহন খাইতে লাগিল।

চা আসিল। কাপটি রাধামোহনের কাছে সরাইয়া দিয়া হৈমন্তী বলিল, এতদিন ছিলে কোথায়?

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া রাধামোহন বলিল, ছিলাম অনেক জায়গায়।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া সে বলিল, আমার হাতে সময় নাই, উঠতে হবে। আমাকে আশ্রয় দেওয়া বিপজ্জনক। শুনলাম তুমি আমার খোঁজ করছ। কি খেয়াল হল ভাল মন্দ না ভেবে চলে এলাম। আমি এখানে এসেছিলাম জানাজানি হলে—

হৈমন্তীর খেয়াল হইল বাহিরের লোক যে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে, বিরাজবাবু বা ভাসুর আসা অসম্ভব নয়। সে বলিল, তুমি ভেতরে এস, দাদার শোবার ঘরে গিয়ে বসবে। এ ঘরে কেউ এসে পড়তে পারে।

চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিয়া রাধামোহন বলিল আমি এবার যাই। কাল আমাকে কলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে।

হৈমন্তী দুই পা আগাইয়া রাধামোহনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শান্ত স্বরে বলিল, তুমি যাবে জানি, কিন্তু এমন করে তোমাকে যেতে দেব না। একটা বোঝাপড়া করতে চাই আমি। সোফার ওপর চিঠিগুলো দেখেছ? জান চিঠিগুলো কে লিখেছিল?

রাধামোহন হাসিল। বলিল, জানি। তবে যে লিখেছি[illegible] তাকে আর খুঁজে পাবে না হৈমন্তী। তার মৃত্যু হয়েছে।

হৈমন্তী বলিল, বলো অপমৃত্যু।

রাধামোহন হাসিয়া বলিল, বেশ, অপমৃত্যুই হয়েছে। কিন্তু তুমি উত্তেজিত হয়েছ হৈমন্তী।

হৈমন্তী চুপ করিয়া কি ভাবিল একটু। তারপর বলিল, না উত্তেজিত হইনি। আমার সঙ্গে এস।

রাধামোহন নীরবে হৈমন্তীর সঙ্গে ভিতরে রাধেশের শয়নকক্ষ গেল। তাহাকে সেখানে বসাইয়া হৈমন্তী বলিল, একটু বসো, আমি আসছি।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া হৈমন্তী আবার বলিল, ইচ্ছে হলে ঐ চিঠিগুলো দু' একখানা পড়ে দেখতে পার। এক সময়ে কি লিখেছিলে ভুলে গেছ, পড়লে মনে পড়বে।

বসিবার ঘর হইতে চিঠিগুলি সে লইয়া আসিয়াছিল। রাধামোহনের কোলের উপর সেগুলি ফেলিয়া দিয়া সে বাহিরে গেল।

রাধেশকে রাধামোহনের খবর জানাইয়া সে রান্নাঘরে গেল তাহার রাত্রে খাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে। ফিরিয়া আসিয়া সে শুনিল রাধামোহন ও তাহার দাদার মধ্যে আলাপ চলিতেছে। রাধেশ বলিতেছিল তোমার ঐ পথ ছেড়ে দাও ভাই। ও পথে গিয়ে অভীষ্ট লাভ হবে না। শুধু দুঃখ পাবে, দুঃখ বাড়াবে। মহাত্মাজীর নির্দিষ্ট পথে যদি আস্থা হারিয়ে থাক স্বরাজ পার্টির নূতন আন্দোলনে না হয় যোগ দাও। গুপ্ত আন্দোলনের পথে, হিংসার পথে দেশের ও জাতির মঙ্গল সাধন করতে পারবে না।

তাহার দাদার কথা শুনিয়া হৈমন্তী ভাবিল দাদা তো যুক্তি দিতেছেন না, অনুনয় করিতেছেন। অনুনয় করিলে কি ঐ পাষাণ গলিবে?

রাধামোহন কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। উত্তর না পাইয়া রাধেশ মনঃক্ষুণ্ণ হইল। বিমর্ষমুখে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমি আসছি, তোমরা বসে কথাবার্তা বল। হৈমী, রাধামোহনের—

হৈমন্তী বলিল, সে ঠিক আছে দাদা, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

রাধেশ চলিয়া যাইবার পরে কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

তুমি কি বোঝাপড়ার কথা,—বলিয়া রাধামোহন মুখ তুলিয়া হৈমন্তীর দিকে চাহিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার কোলের উপর হইতে চিঠিগুলি মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িল।

হেঁট হইয়া সে চিঠিগুলি কুড়াইতে গেল, হৈমন্তী আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, থাক, তোমাকে কষ্ট করে কুড়ুতে হবে না।

রাধামোহন চিঠিগুলি কুড়াইয়া খাটের উপর রাখিল। তারপর হৈমন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, আমাকে ক্ষমা করো তুমি। একদিন সুখের স্বর্গের দোর খুলে গিয়েছিল আমার সম্মুখে, সেই দোরে দাঁড়িয়ে এক স্বর্গকন্যা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার দিকে—

হৈমন্তীর চোখ দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল।

রাধামোহন বলিয়া চলিল, তার সে হাত ধরতে পারলাম না। ধরতে

গিয়ে মনে পড়ল আত্মসুখের স্বর্গ তো আমার জন্য নয়, আমার পথ লাঞ্ছনা, দুঃখ, কঠোর রাজদণ্ডের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির মুক্তি সাধনার লক্ষ্যে। আমাকে তুমি ক্ষমা করো হৈমন্তী।

হৈমন্তী চোখের জল মুছিল আঁচল তুলিয়া। বলিল, যে পথে আমরা একসঙ্গে চলেছিলাম সে পথও তো একই লক্ষ্যে গিয়েছে।

রাধামোহন বলিল, যাবার সময় আমি আর তর্ক করব না হৈমন্তী, শুধু বলব তাই যদি তোমার আন্তরিক বিশ্বাস হয় তুমি সেই পথে যাও।

শান্ত হইবার চেষ্টা করিয়া হৈমন্তী বলিল, আশীর্বাদ কর তাই যেন পারি।

রাধামোহন বলিল, আশীর্বাদ করছি। শেষ দিন পর্যন্ত—

বাহিরের বারান্দায় রাধেশের গলা শোনা গেল। কি খবর ভানু, এত রাতে? বাড়ীতে অসুখ বিসুখ—

ভানু কি বলিল শোনা গেল না।

রাধেশ বলিল, এখানে আসবে সে? কে বলল তোমাকে?

রাধামোহন হৈমন্তীর দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি ভানুকে আমার খোঁজ নিতে বলেছিলে, না? সে খোঁজ নিতে এসেছে, একা নয়, সঙ্গে পুলিশ আছে সম্ভবতঃ।

তাহার কথা শুনিয়া হৈমন্তী চমকিয়া উঠিল। বলিল, ভানু পুলিশের গুপ্তচর?

রাধামোহন কোন কথা না বলিয়া একটু হাসিল।

হৈমন্তী আবার বলিল, এ বাড়ীতে ও এসেছে তোমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য? এত সাহস ওর? দেখছি আমি।

হৈমন্তীকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া রাধামোহন বাধা দিল। বলিল, ভানুর সহায় সর্বশক্তিমান পুলিশ। তুমি ওকে ঠেকাতে পারবে না। তবে ভানুর হাতে আমি ধরা দেব না, জেনো। তোমাদের ভেতরের বাগানের খিড়কি দোর নেই, না?

হৈমন্তী বলিল, তোমার ধারণা ভানু বাড়ীর ভেতরে পর্যন্ত আসবে?

রাধামোহন—তা আসতে পারে। আমি থাকতে না আসাই ভাল। গুলির অপব্যয় করতে চাইনে আমি। আচ্ছা, আসি তবে

হৈমন্তী বলিল—এই শরীরে তুমি কি দেয়াল টপকাতে পারবে? এদিকে এস, আমার শোবার ঘরে একটু অপেক্ষা কর, আমি ওকে সরিয়ে দিয়ে আসছি।

ততক্ষণ রাধামোহন ভিতরের বারান্দা পার হইয়া বাগানের দিকে অগ্রসর

হইতেছিল। পিছনে যাইতে যাইতে হৈমন্তী বলিল, তোমার এই শরীর, অত উঁচু দেয়াল, পারবে না—

অন্ধকারের মধ্যে শোনা গেল, আসি হৈমন্তী।

কিছুক্ষণ পরে একটা শব্দ হইল দেয়ালের ওপারে।

বাগানের মধ্যে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া সে শব্দ শুনিল হৈমন্তী, শুনিয়া অস্ফুট স্বরে নিজের মনে বলিল, ঐ শরীরে, অত উঁচু দেওয়াল।

ভিতরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রাধেশ ডাকিল, হৈমী!

হৈমন্তী উত্তর দিল, যাই দাদা।

সে বারান্দায় উঠিয়া আসিতে রাধেশ বলিল, রাধামোহন?

হৈমন্তীর ঘোর কাটে নাই তখনও। সে আগের মত অস্ফুট স্বরে বলিল, অত উঁচু দেয়াল, ঐ শরীরে—

রাধেশ বলিল, চলে গেল? ওকে ধরে রাখলি না কেন হৈমী? ভানুকে আমি বিদেয় করেছি। যেতে কি চায়?

হৈমন্তী বলিল, ভানু গিয়েছে? তবে কেন ও খেয়ে গেল না?

রাধেশ তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, ঘরে আয় হৈমী।

মাস খানেক পরের কথা।

বিরাজ সন্ধ্যার পরে তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া একখানি লিথোকরা হ্যাণ্ডবিল পড়িতেছিল। হ্যাণ্ডবিলের উপরে একটি নকসা, দেখিয়া মনে হয় দলের শীলমোহর। ইংরাজিতে লেখা। পড়িতে পড়িতে সে লালনীল পেন্সিল দিয়া দাগ দিতেছিল। কাগজখানি দিন দুই আগে তাহার হাতে পৌঁছিয়াছিল, একবার চোখ বুলাইয়া টেবিলের উপর চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। দাগ দেওয়া শেষ হইলে সে সেই অংশগুলি আবার পড়িল:

Our Answer

"Since the first revolver shot was fired and the first bomb burst in India our critics have unwearingly told us that violence is a Western sin, violence is against our Shastras, violence is against India's mission of peace and love, against Indian tradition of ahimsa and spirituality.

* * *

The same critics of revolutionarism also twitted Gandhi with his non-violent non-cooperation. After the failure of non-violent non-cooperation they are now horrified by what they condemn as a recrudescence of terrorism. It is pointed out that a new path of emancipation has been opened by Swarajism. They pressume that people are too thick-headed to understand that Swarajism is but a swing-back, under a new cloak, to the old, harmless constitutionalism.

"It is clear that between Swarajist corrupt practices and Gandhite doctrine of passive submission to tyranny, faith in the Roman Catholic doctrine of original sin and need for self-purification and emphasis on soul-force and inner light there will be room only for cheats, cowards and sanctimonius hypocrities in the country in future.

* * *

"Gandhi has tried to spiritualise politics. Politics is not the field for soul force experiments. People accepted Gandhi as their leader in their political struggle, but they did not give leave to the discomfited general to befool them.

* * *

"We are asked, do we hope to achieve success by our methods?

"Frankly speaking, we do not, at this stage. But we want to save the country from the tide of hypocrisy and inertia that threatens to engulf it, we want to save the people from the demoralising effects of a revival of moderatism and we want to keep alive the spirit of hostility and resistance by our bloody sacrifices".

The Indian Republican Army

[আমাদের জবাব

ভারতে প্রথম রিভলবারের গুলি বর্ষিত ও প্রথম বোমা ফাটাইবার পর হইতে আমাদের সমালোচকগণ অক্লান্তভাবে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে হিংসা পাশ্চাত্যদেশীয় পাপ, হিংসা আমাদের শাস্ত্রের বিরোধী, হিংসা ভারতের শান্তি ও প্রেমের বাণীর বিরোধী, ভারতের অহিংসা ও সিপরিচুয়ালিটির বিরোধী। এই সমালোচকগণই গান্ধীকে অহিংস অসহযোগ লইয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইবার পরে তাঁহারা এখন তাঁহাদের নিন্দিত সন্ত্রাসবাদের পুনরভ্যুদয়ে ভয় পাইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে স্বরাজীজম মুক্তিলাভের নূতন পথ রচনা করিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে দেশবাসী এতখানি স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন যে তাহারা বোঝে না যে স্বরাজীজম নূতন পরিচ্ছদে পুরাতন, নির্দোষ কনষ্টিটিউশনালিজমের দিকে পশ্চাদপসরণ।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে একদিকে স্বরাজদলের অনাচার এবং অন্যদিকে উৎপীড়নের নিকটে গান্ধীর নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের নীতি, রোমান ক্যাথলিক ধর্মের আদি পাপের নীতিতে এবং আত্ম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস, আত্মিকশক্তি এবং অন্তরের আলোকের উপরে গুরুত্ব দিবার ফলে ভবিষ্যতে দেশে স্থান হইবে শুধু প্রবঞ্চক, কাপুরুষ এবং ভেকধারী ভণ্ডদলের। গান্ধী রাজনীতিকে আত্মিক তত্ত্বের পরিচ্ছদে সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাজনীতির ক্ষেত্র আত্মিক শক্তি লইয়া পরীক্ষার ক্ষেত্র নহে। দেশবাসী গান্ধীকে তাহাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, পরাজিত নেতাকে তাহাদের সঙ্গে ভাঁড়ামি করিবার সনদ দেয় নাই তাহারা। আমাদিগকে প্রশ্ন করা হয়, আমাদের পন্থায় আমরা কি সফলতা লাভের আশা করি ?

সত্য কথা বলিতে কি বর্তমান অবস্থায় আমরা সফলতা লাভের আশা করি না। কিন্তু যে ভণ্ডামি ও জড়তার বন্যা দেশকে প্লাবিত করিতে উদ্যত আমরা দেশকে তাহা হইতে রক্ষা করিতে চাই, দেশবাসীকে আমরা নূতন মডারেটিজমের অবক্ষয়ী প্রভাব হইতে রক্ষা করিতে চাই এবং আমাদের রক্তক্ষয়ী ত্যাগের দ্বারা শত্রুতা ও বিরোধের মনোভাব জাগ্রত রাখিতে চাহি।

ভারতীয় রিপাব্লিকান আর্মী]

পড়া শেষ হইলে কাগজখানি আবার টেবিলের উপর চাপা দিয়া বিরাজ নিজের মনে মন্তব্য করিল, নট ভেরি স্যাটিসফ্যাকটরি। একটিবারও মা চামুণ্ডার উল্লেখ—

বিরাজের টবি কুকুর ঘরের বাহিরে পা-পোষের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া সে ডাকিতে শুরু করিল।

বিরাজ বলিল—সাট্ আপ টবি।

টবি অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়া আরও জোরে ডাকিতে লাগিল। বারান্দায় জুতার শব্দ শোনা গেল। তখনই মৃদু শিষের শব্দ হইল।

টবি ডাকা বন্ধ করিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল ও একজন লোক তাহার পাশ দিয়া ঘরে ঢুকিল।

তাহার দিকে চাহিয়া বিরাজ সবিস্ময়ে বলিল, মোহন!

আগন্তুক হাসিয়া বলিল—রাধামোহন। দোরটা বন্ধ করে দিই?

বিরাজ—অবশ্য।

টবি দরজা বন্ধ হইতেছে দেখিয়া ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিল। রাধামোহন তাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিল।

বিরাজ বলিল, দিন তিনেক আগে ভানু এসেছিল তোমার খোঁজে। তার ভাবভঙ্গী ভাল মনে হল না। চল, ভেতরে যাই।

পড়িবার ঘরেব আলো বন্ধ করিয়া রাধামোহনকে লইয়া বিরাজ ভিতরের একটি ঘরে গিয়া বসিল।

বলিল, তোমাদের ম্যানিফেস্টো পড়ছিলাম। "Kill, kill," "white goats," "Mother thirsty of blood" ইত্যাদি পুরনো পরিচিত জিনিস নেই, বিশুদ্ধ ভেজিটেরিয়ান ফ্রেজিওলজি। তেমন জোর হয়নি হে।

রাধামোহন হাসিয়া বলিল, ঠাট্টা করছেন?

বিরাজ—ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সভ্য, রিভলবারধারী, রেড লিফলেটওয়ালাদের সঙ্গে ঠাট্টা করব, বল কি হে? তারপর তোমার খবর কি বল? চারদিকে ধরপাকড় চলছে, তুমি এখনও কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? মতলব কি তোমার? এবার ধরা পড়লে লম্বা পাড়ি জমাতে হবে ভ্রাদার। দু' চারটে ছাড়া দাগী আসামীদের তো সব ক'টিকে ধরেছে শুনছি। রবীন্দ্রনাথের হালের কবিতা পড়েছ? "নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিশ বাজায় শিঙা!" বলি শিঙার শব্দ কি তোমার কানে ঢুকছে না?

রাধামোহন বলিল, দাদা, কিছু খাবার ব্যবস্থা হতে পারে? আজ সারাদিন—

বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আচ্ছা ছেলে তুমি! সারাদিন না খেয়ে, —পাঁচ মিনিট সময় দাও ভাই, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চা খাবে?

রাধামোহন—পেলে খাই।

বিরাজ বাহিরে গেল। মিনিট কয়েক পরে নিজের হাতে চা ও কিছু খাবার লইয়া ফিরিল।

খাইতে খাইতে রাধামোহন বলিল, অতসীকুঞ্জের খবর কি বিরাজ দা? ও বাড়ীতে আলো দেখা গেল না।

বিরাজ—দেখলে হৈমন্তীর ওপর অতিথি সৎকারের ভার পড়ত বুঝি? ও মুখো হয়ো না ব্রাদার, ও বাড়ীর ওপর নজর রাখতে সাদা কাপড়ে পুলিশ বসেছে হৈমন্তী বলছিল। ভানুর সম্বন্ধেও সে কিছু বলেছে। টু বী সিরীয়াস মোহন, হৈমন্তীর মত মেয়ের মূল্য বুঝলে না তুমি।

রাধামোহন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া খাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, মূল্য বোঝবার আরও তো লোক আছে।

বিরাজ—তোমার কথার মানে?

রাধামোহন উত্তর দিতে যাইতেছিল, বাহিরে টবি হঠাৎ ডাকিতে শুরু করিল। তাহার ডাক ক্রমে ক্রুদ্ধ গর্জনে পরিণত হইল।

বিরাজ বলিল, টবি কাকে দেখে এমন রেগে গেছে?

সে উঠিয়া বাহিরে গেল। ভৃত্যকে বলিল, কে এসেছে দেখ তো। বলবি বাবুর অসুখ করেছে, শুয়ে আছেন।

ফিরিয়া আসিয়া বিরাজ ঘরের আলো নিভাইয়া দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

একটু পরে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া জানাইল ভানু বাবু আসিয়াছেন। অসুখের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন একবার দেখিয়া যাইবেন। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন।

ভৃত্যের কথা শুনিয়া বিরাজ বিরক্ত হইল। ভানুর হঠাৎ এই সময়ে আসিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহার রীতিমত সন্দেহ হইল।

গায়ে একখানা কাপড় জড়াইয়া সে বসিবার ঘরে গেল। ভানু তাহাকে দেখিয়া বলিল, আপনার না কি অসুখ হয়েছে? কেমন আছেন দেখতে এলাম।

বিরাজ স্বগত বলিল, ও দি স্কাউণ্ড্রেল! প্রকাশ্যে বলিল, ভয়ানক মাথা ধরেছে ভাই, এখন কোন কথা বলতে পারছিনে, কাল এস।

সে ভানুর কাঁধে হাত দিয়া বলিল, চল, বারান্দায় দাঁড়াই।

ভানু উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, দু'এক মিনিট সময় হবে না? একটু আর্জেণ্ট কথা ছিল।

বিরাজ ভানুকে ঠেলিয়া বারান্দায় লইয়া চলিল। বলিল, আজ না বললে চলবে না ভানু? আমার মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে—

বারান্দায় আসিয়া ভানু বলিল, হৈমন্তীর কীর্তির কথা বলতে চাই বিরাজ দা। আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেছে। আপনাকে বলেছি না টেরোরিস্ট রাধামোহন অতসীকু ঞ্জ—

বিরাজ স্বগত বলিল – তা হলে সে খবর পেয়েছ শয়তান? প্রকাশ্যে বলিল, কাল এসো ভানু তোমার আর্জেণ্ট কথা মন দিয়ে শুনব। আজ আর পারছিনে, বড় মাথা ধরেছে। আচ্ছা, এসো।

ভানুকে সিঁড়ি পর্যন্ত ঠেলিয়া আনিয়া বিরাজ ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, টাব ভেতরে আয়। আমার মাথা ধরেছে আর তুই কেবল চিৎকার করছিস! আয় ঘরে আয়!

টবি গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল, বিরাজ দরজা বন্ধ করিল।

ঘরে ঢুকিয়াও টবির গোঁ গোঁ শব্দ থামল না। বিরাজের সন্দেহ হইল ভানু হয়ত এখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। এই ভাবে ঠেলিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দেওয়াতে সম্ভবতঃ তাহার মনে সন্দেহ হইয়াছে।

ভিতরের ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিতে বিরাজ দেখিল রাধামোহন বসিয়া নিজের মনে হাসিতেছে।

বিরাজ বলিল, হাসছ যে? ভানু-সংবাদ শুনেছ নাকি?

রাধামোহন হাসিয়া বলিল, শুনেছি দাদা. আপনার বড্ড মাথা ধরেছে, শুয়ে পড়ুন।

বিরাজ ও শয়তানটা কিছু সন্দেহ করেছে, মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আহারের ব্যবস্থা হইল। আহার শেষ হইলে রাধামোহন বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিল, আপনার কাছে বিদায় নেবার জন্য এসেছিলাম। সম্ভবতঃ আর দেখা হবে না। আর একটা কথা বলবার ছিল। ভানুর হাত থেকে হৈমন্তীকে রক্ষা করা—

বিরাজ বাধা দিয়া বলিল, ছাট সী ইজ স্ট্রং এনাফ টু ডু হারসেলফ।

রাধামোহন হাসিয়া বলিল, কথাটা আমি ওভাবে বলিনি। আপনার সবুজ সংসদীয় চালের জন্ত হৈমন্তী আপনার সমালোচনা করে, কিন্তু মনে মনে সে আপনাকে শ্রদ্ধা করে। যদি—

বিরাজ আবার বাধা দিয়া বলিল, মাই বয়, তুমি রিভলবার ছুঁড়ে হাত পাকিয়েছ, মেয়েদের হৃদয়ঘটিত ব্যাপারের মধ্যে নাক গলাতে যেয়ো না। ইট ইজ এবসোলুটলি ইউজলেস।

রাধামোহন পকেট হইতে একখানি খামে বদ্ধ চিঠি বিরাজের হাতে দিয়া বলিল, আপনার কথা মেনে নিলাম। এই চিঠিখানা পরশু ওর হাতে দেবেন।

বিরাজ চিঠিখানা হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, কি আছে এতে হে? কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ নয়তো?

রাধামোহন যাইতে উদ্যত হইয়াছিল। হাসিয়া বলিল, না, লাভ লেটর।

বিরাজ বলিল, Last Ride-এর নিমন্ত্রণ নাকি? আরে টগবগ করে চললে কোথা? দাঁড়াও একটু, বাইরটা দেখে আসি আগে।

টবিকে লইয়া বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বিরাজ অন্ধকারের মধ্যে চারিদিক যতটা পারা যায় ভাল করিয়া দেখিল, তারপর রাধামোহনকে যাইতে অনুমতি দিয়া বলিল, এবার যেতে পার। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হৈমন্তীর কথা ভেব না, নিরাপদ আড্ডায় গিয়ে যত পার ভাববে। অ রেভোয়া!

রাধামোহন অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। বিরাজ নিঃস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। টবি তাহার পায়ে মাথা ঘষিতে লাগিল। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিয়া চলিল।

রাধামোহন চলিয়া যাইবার পরদিন তাহার চিঠিখানি লইয়া বিরাজ অতসীকুঞ্জে গেল।

অতসীকুঞ্জে ভৃত্য ছাড়া আর কাহারও দেখা পাওয়া গেল না। ভৃত্য জানাইল আগের দিন বিকালের গাড়ীতে বাবু ও দিদিমণি চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে বলিল দিদিমণি সবরমতী আশ্রমে গিয়াছেন। বাবু তাঁহাকে পেঁাছাইয়া দিতে গিয়াছেন।

বিরাজ বলিল, তাঁরা কবে ফিরবেন?

ভৃত্য জানাইল পনের দিন, এক মাস হইতে পারে। দিদিমণি এখন ওখানে থাকিবেন, বাবু ফিরিয়া আসিবেন।

পকেটের চিঠিখানি নাড়িয়া চাড়িয়া আবার পকেটে পুরিয়া বিরাজ অতসীকুঞ্জ হইতে বাহির হইল। সে ভাবিল রাধামোহনের দুর্ভাবনা মিথ্যা, হৈমন্তী নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইয়াছে। আশ্চর্য যে হৈমন্তী এই পথ ধরিতে পারে এমন সন্দেহ কাহারও মনে উদয় নাই। সবরমতী আশ্রম যে ভাঙ্গা হৃদয়ের হাসপাতাল কে জানিত ?

দুই

পলাশডাঙা (১৯২৪-২৫)

আর্যসংঘের বার্ষিক অধিবেশন লইয়া নূতন হাঙ্গামা বাধিবার উপক্রম হইল পলাশডাঙায়। মহকুমা হাকিম শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় প্রকাশ্য স্থানে অধিবেশন নিষিদ্ধ করিলেন। আর্যসংঘের কর্মীরা ইহাতে উত্তেজিত হইয়া সত্যাগ্রহ করিবার প্রস্তাব করিল। সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে বহু বিশিষ্ট নেতা আর্যসংঘের কাছে তার পাঠাইলেন সরকারী আদেশ যেন অগ্রাহ্য না করা হয় এই মর্মে। তাঁহারা যুক্তি দিলেন সাম্প্রদায়িক বিরোধে দেশের আবহাওয়া উত্তপ্ত, মহাত্মাজী এই বিরোধ নিবারণের উপায় চিন্তা করিতেছেন। আর্য সংঘের বার্ষিক অধিবেশনের মত ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়া ও গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ বাধান অকর্তব্য।

বিশিষ্ট নেতাদের এই উপদেশে, বিশেষ করিয়া আর্যসংঘের বিরুদ্ধে পরোক্ষে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ করায় কর্মীদের অনেকে রুষ্ট হইয়া নেতাদের উপর বিরূপ হইল। নিষেধ অমান্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রকাশ্যস্থানে অধিবেশনের আয়োজন করিতে লাগিল তাহারা। ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইয়া ১৪৪ ধারা জারি করিলেন। আর্যসংঘের কর্তৃপক্ষ দ্বিধার মধ্যে পড়িলেন। ব্রহ্মচারী বিমল তারকেশ্বরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন দলবল লইয়া, সেখানে সত্যাগ্রহ করিবার আয়োজন হইতেছিল। পরমানন্দও তাঁহার সঙ্গে যাইবে স্থির হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে পলাশডাঙায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের কার্যের ব্যাঘাত ঘটাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের মধ্যে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল ইতিমধ্যে শকুন্তলা প্রস্তাব করিল মাতাজীর আশ্রমে অধিবেশন করা হউক। মাতাজীর সম্মতি লইয়া সে এই প্রস্তাব করিয়াছিল।

সমস্যা সমাধানের এই উপায় দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মচারী শকুন্তলাকে সাধুবাদ দিলেন। কয়েকজন কর্মী লইয়া পরমানন্দ ও শকুন্তলা আশ্রমে গেল অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার জন্য।

অধিবেশনের স্থান বাহিরে বিজ্ঞাপিত না হইলেও অধিবেশনের দিন সভায় বেশ লোক সমাগম হইল। রায় বাহাদুর নিকুঞ্জ মল্লিকের হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কে ও কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা সম্বন্ধে বক্তৃতার পরে ব্রহ্মচারী আর্যসংঘের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দুসমাজ সংস্কার ও পুনর্গঠন সম্বন্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিলেন। পরমানন্দ হিন্দুদের মঠ মন্দির রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের আবেদন করিল। মাতাজী হিন্দু নারীদের আত্মরক্ষার কথা বিশেষভাবে বলিলেন।

প্রকাশ্য অধিবেশন শেষ হইবার পর কর্মীদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। নেতাদের তারেব কথা তুলিয়া কয়েকজন কর্মী প্রসিদ্ধ নেতাদের সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টার সমালোচনা করিল। পরমানন্দ বলিল, আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিটেফোঁটা রাজনৈতিক সুবিধা পাবার আশায় জাতীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে সেইদিন যেদিন মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। গলদ গোড়ায়, দু' চারটে মাথা ফাটাফাটি বন্ধ হলে কি এই গলদ দূর হবে?

রায় বাহাদুর বলিলেন, আর গলদ দূর হয়েছে! যে ফাটল চুল প্রমাণ ছিল আজ তার আয়তন দেখে ভয় হয়।

ব্রহ্মচারী কি ভাবিতেছিলেন। রায় বাহাদুরের শেষ কথাগুলি কানে যাইতে তিনি বলিলেন, এই ভয় আমাদের মেরে রেখেছে রায় বাহাদুর। চোখ খুলে বাস্তব তত্ত্ব দেখতে আমরা সাহস পাইনি কখনও। কবে জনকয়েক ইসলামী তুর্ক, আফগান ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিল, ভারতবর্ষের জনসমুদ্রে কবে তারা মিশে গিয়েছে। তবু সেই কথা স্মরণ রেখে ইসলামী ভারতীয়েরা এমন ভাবে চলেন যেন তাঁরা শত্রুর দেশে সুরক্ষিত ক্যাম্পে বাস করছেন। হিন্দুরা তাঁদের চোখে বিধর্মী শত্রু, ভাই নয়, মিত্র নয়, নইলে হিন্দুর দেবস্থানে আঘাত করে, হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে, হিন্দু নারীকে লাঞ্ছিত করে তাঁদের এত উল্লাস হয় কেন? নারীহরণ সভ্য সমাজে ঘৃণিত কাজ, নারীহরণকারী সমাজের শত্রু। সুভদ্রাহরণকারী আলাউদ্দীন মুক্তি পেলে তাকে একটি সম্প্রদায়ের ইতরভদ্র সকলে মিলে ফুলের মালা পরিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাবার অর্থ কি? কোন শ্রেণীর মনোভাব থেকে এই প্রবৃত্তির উৎপত্তি? কথাটা বললে কটু শোনায়, কিন্তু বাংলায় কি দেখছি আমরা? এ বিষয়ে শিক্ষিত, পদস্থ মুসলমান

ও অশিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখা যায় কি? সভ্য সমাজে প্রতিবেশীদের সম্পর্কে এমন বিসদৃশ মনোভাব ও ব্যবহার সম্ভব হয় কি করে? কথাটা কি আমাদের ঐক্যওয়ালারা ভেবে দেখেছেন?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ব্রহ্মচারী কি ভাবিলেন। তারপর স্বগত উক্তির মত বলিলেন, আমাদের রাজনীতিকগণ আত্মপ্রবঞ্চনাকে একটা আর্টে পরিণত করেছেন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সৃষ্টির জন্য তারা ইংরাজের দোষ দেন। তাঁরা কি জানেন না যে ইংরাজ মুসলমানের আলষ্টারিজমের প্রশ্রয় দিয়েছে নিজের সুবিধার জন্য? তাঁদের কথা শুনে তো মনে হয় একথা তাঁরা জানেন। তাহলে দৃঢ়ভাবে এই আলষ্টারিজমের প্রতিরোধ না করে তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন কেন? গোটা কয়েক চাকুরি পাবার আশায়, স্বায়ত্তশাসনের ছিটে-ফোঁটা অধিকার পাবার আশায় ভারতীয় জাতীয়তার মূল ভিত্তি তাঁরা নষ্ট করেছেন, এ কথা কি মিথ্যা? ইংরাজ বিদেশী, জবরদখলকারী, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা যা করেছে জাতীয়তাবাদী বলে যাঁরা আপনাদের পরিচয় দেন কেন তাঁরা সেই অপচেষ্টা মেনে নিয়েছেন?

তাঁরা কি লক্ষ্য করেন নি যে মুসলমানরা ঐক্যের কথা বলেন না, তাঁদের অস্ত্র ইংরাজের প্রশ্রয় ও আলষ্টারিজম? ঐক্যের কথায় খৈ ফোটে মুসলমানের মুখে যখন ঐক্যের ভয় দেখিয়ে ইংরাজের কাছে নূতন কিছু আদায় করবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দুরা যোগ দিলেন স্বরাজলাভের আশায়, আর মুসলমানরা যোগ দিলেন তুর্কীর জন্য বিশেষ সুবিধা আদায় করবার আশায়। এই দুই মনোভাবের মধ্যে মিল কোথায়? মিলনের সূত্র কি? মিল না থাকলেও মিলনের চেষ্টা হল কেন? সে চেষ্টার কি ফল আজ চোখে দেখা যাচ্ছে

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রায় বাহাদুরের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, এ সব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কি লাভ বলুন? তবু মন মানে না, বারবার মনে হয় এ কি দারুণ বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে আমাদের রাজনীতিকদের?

পরমানন্দের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, তারকেশ্বরে যাঁরা যাবেন তাঁদের নিয়ে তুমি তৈরী হও। তোমার দলবলকে রওনা করে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়তে চাই।

পরমানন্দ বিস্মিত হইয়া বলিল, আপনি বেরিয়ে পড়বেন কোথায়? তারকেশ্বরে যাচ্ছেন না?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, যাবার দরকার হবে না। সি. আর. দাশ হাত লাগিয়েছেন তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে। বিশ্বানন্দ তাঁর দলবল নিয়ে কাজে নেমেছেন। এখান থেকে কিছু কর্মী সঙ্গে নিয়ে তোমরা গেলেই চলবে। আমাকে হিন্দু সংগঠনের জন্য কিছুদিন ঘুরে বেড়াতে হবে।

শকুন্তলা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে বলিল, আমি কি তারকেশ্বরে যেতে পারি? ব্রহ্মচারী বলিলেন, কেন পারবে না মা? তবে সেখানে গিয়ে নিজের কাজের ক্ষেত্র তোমাকে বেছে নিতে হবে। সে তুমি পাববে।

কয়েকদিন পরে ব্রহ্মচারী দুইজন সঙ্গী লইয়া চলিয়া গেলেন। পরমানন্দ তাহার দলবল লইয়া ইতিমধ্যে তারকেশ্বরে রওনা হইয়া গিয়াছিল। এই দলবলের মধ্যে শকুন্তলাও ছিল।

সংবাদ প্রকাশিত হইল দেশের বহু স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় মর্মাহত হইয়া মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ উপবাস আরম্ভ করিয়াছেন। নেতারা ব্যস্ত হইয়া যুনিটি কন-ফারেন্স ডাকিয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন।

মহাত্মাজীর উপবাসের সংবাদ পাইয়া মাতাজী উপবাসের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন।

মাতাজীর উপবাস লইয়া আর্যসংঘ ও মাতাজীর আশ্রমের কর্মীদের মধ্যে মতান্তর দেখা দিল। কর্মীদের ছোট একটি দল এই প্রকারের উপবাসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল সাম্প্রদায়িক ঐক্য নষ্ট হইবার ভয়ে নেতারা মালবারে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কাহিনী চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনকে তাঁহারা উপেক্ষা করিলেন এখন। তাঁহারা কি মনে করেন এই সঙ্ঘাতে বদ্রোহের পরিচয় দিয়া তাঁহারা মুসলমানদের হৃদয় জয় করিবেন? গান্ধীজীর উপবাস কি দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ নষ্ট হতে পারবে? তাঁহার এই দলের চেষ্টায় যদি ফল না হইয়া থাকে তবে মাতাজীর উপবাসে কি ফল হইবে?

মহাত্মাজীর উপবাসের পঞ্চম দিনে মাতাজী অনশন আরম্ভ করিলেন। কর্মীদের মধ্যে সমালোচক দল ইহাতে ক্ষুব্ধ হইল। রায় বাহাদুর নিকুঞ্জ মল্লিক স্বয়ং আসিয়া মাতাজীকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, মাতাজী, ধর্মার্থে উপবাসের বিধান আছে আমাদের শাস্ত্রে। তার উদ্দেশ্য আত্মশোধনের দ্বারা দেবতার অনুগ্রহ লাভ করা। কিন্তু মহাত্মাজীর যাহা বিশুদ্ধ পোলিটিকেল ফাস্টিং, শাস্ত্রে, ইতিহাসে এর কোন নজির নেই।

মাতাজী বলিলেন, মহাত্মাজীর জীবন সব নজিরের বাইরে রায় বাহাদুর। কটিবাসপরা ঐ ক্ষীণকায় মানুষটি ভারতের আত্মার মূর্ত প্রতীক। কোটি কোটি নিপীড়িত মানবের আকুতি প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর প্রতিটি কাজে প্রতিটি ভাবনায়। তাঁর সমগ্র জীবনটা তো শৃঙ্খলিত মানব আত্মার মুক্তির সাধনা। এই সাধনার ক্ষুদ্র অংশই রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে, আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যেটুকুই চোখে পড়ে, সেইটুকু অবলম্বন করে আমরা তাঁর কাজের ভালমন্দ বিচার করার স্পর্ধা করি।

রায় বাহাদুর বুঝিলেন মাতাজী সাধারণ যুক্তির সীমার বাহিরে এমন এক স্তরে উঠিয়াছেন যে তাঁহার কাছে সন্তোষজনক উত্তর পাইবার আশা করা বৃথা। তবু তিনি বলিলেন, মাতাজী, মহাত্মাজীর অনশনের গভীর তাৎপর্য আমরা হয়ত বুঝি না, তবে স্থূল অর্থ কিছু উদ্দেশ্য বুঝতে পারি। তাঁর অনশনে দেশের অনেকে উদ্বিগ্ন হবেন, তিনি যে বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাইছেন সে বিষয়টি লোকের চিন্তায় প্রাধান্য লাভ করবে, কিছু চেষ্টা চরিত্র হবে, হয়ত ফলও কিছু হতে পারে। কিন্তু আপনার অনশনের কারণ বুঝলাম না। আমাদের অনুরোধ আপনি অনশন ভঙ্গ করুন।

মাতাজী বলিলেন, আমার অনশন নিয়ে কেউ উদ্বিগ্ন হবেন না জানি, কাউকে উদ্বিগ্ন করবার অভিপ্রায় আমার নেই, রায় বাহাদুর। আমার অনশন মহাত্মাজী যে মহান ব্রত আরম্ভ করেছেন তারই সামান্য একটু—

কথা শেষ না করিয়া হাত জোড় করিয়া দুই চক্ষু মুদিয়া মাতাজী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, হে মহামানব, দেশের মঙ্গলের জন্য তোমার কৃচ্ছ্রসাধন সফল হোক, সফল হোক!

দেখিতে দেখিতে দুই ফোঁটা জল মাতাজীর চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

রায় বাহাদুর নিস্তব্ধ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি উঠিলেন। মাতাজী মৃদু হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার অনশন আমরণ নয়, রায় বাহাদুর, দু'চার দিন পরে শেষ হবে।

মাতাজীর অনশন শেষ হইবার আগে সুভদ্রা হঠাৎ অনশন আরম্ভ করিল। কর্মীরা কেহ কেহ বিরক্ত হইল। যাহারা মাতাজীর বিশেষ অনুরক্ত তাহারা সুভদ্রাকে আনিয়া মাতাজীর কক্ষে রাখিয়া গেল।

অনশনের চতুর্থ দিনে সুভদ্রা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল, পুনঃপুনঃ বমি হইতে লাগিল। পঞ্চম দিনে তাহার একটা নিস্তেজ ভাব দেখা দিল। মাতাজী ইঙ্গিতে

তাহাকে আহার্য গ্রহণের আদেশ করিলেন। সুভদ্রা তাঁহার দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাতাজী এই রোদনের অর্থ বুঝিলেন।

পরদিন তিনি অনশন ভঙ্গ করিলেন সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া। শকুন্তলা না থাকায় রায় বাহাদুর আশ্রমে অনশনের ব্যাপার লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিযাছিলেন, অসন্তুষ্ট কর্মীদের বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইতেছিল। মাতাজীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবার জন্য তিনি রওনা হইতেছিলেন এমন সময়ে মাতাজীর অনশন ভঙ্গের সংবাদ তাঁহার কাছে পৌছিল। সংবাদ পাইয়া তিনি অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ কবিলেন।

মহাত্মাজীর অনশন ভঙ্গেব সংবাদ প্রকাশিত হইলে দেশেব লোকও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। অনশনেব সমালোচকগণও স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, গান্ধীজী এখনও অগণিত লোকের নেতা, নিজের জীবন এইভাবে বিপন্ন করিবার কোন অধিকার নাই তাঁহার।

য়ুনিটি কনফাবেন্সেব পর বোম্বাইতে অল পার্টি কনফারেন্স বসিল সাম্প্রদায়িক মিলনের একটা স্থাযী ফরমূলা আবিষ্কার কবিবাব জন্য। এদিকে বৎসরের শেষের দিকে কোহাটে গুরুতর দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হইল। কাগজে লিখিল, "The Mu lim in a body perpetrated serious oppressions on the Hindus, desecrated their temples, committed plunder, arson, rape, murder etc. with impunity, while the local authority witnessed there atrocities, powerless to do anything." •

তাবকেশ্বব সত্যাগ্রহ ক্যাম্পে আসিয়া শকুন্তলা ও পরমানন্দ পলাশডাঙার কর্মীদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইল।

শকুন্তলা প্রথমে লঙ্গরখানার তদ্বিরের ভার পাইল। অতগুলি সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকেব খাইবার ব্যবস্থা এক বিবাট ব্যাপার। অত্যধিক খাটুনির জন্য পাকশালাব কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। শকুন্তলা হট্টগোলের ব্যাপারের মধ্যে শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অসুস্থ স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য হাসপাতাল ক্যাম্প খুলিবার ব্যবস্থা হইল। শুশ্রূষাকারিণীর অভাব হওয়ায় পাকশালার ভার ছাড়িয়া শকুন্তলা এই কাজের ভার লইল।

পরমানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, স্বামী সত্যানন্দ প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে মিশিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। বিশ্বানন্দকে তাহার ভাল লাগিল। সে দেখিল এই অবাঙালী স্বামিজীর সন্ন্যাসীর পোষাকের সঙ্গে তাঁহার মিলিটারী মেজাজের

রীতিমত গরমিল রহিয়াছে। ব্রহ্মচারী বিমলের প্রতি স্বামিজীর গভীর শ্রদ্ধা পরমানন্দের তাঁহাকে ভাল লাগিবার অন্যতম কারণ। কয়লা খনি এলাকায় ব্রহ্মচারীর সঙ্গে স্বামিজী কাজ করিয়াছেন বলিলেন। আরও বলিলেন পুলিশ বোলশেভিষ্ট গুপ্তচর সন্দেহে তাঁহাকে একবার গ্রেপ্তার করিয়াছিল, কিছুদিন আটকাইয়া রাখিয়া প্রমাণাভাবে মোকদ্দমা না আনিতে পারিয়া ছাড়িয়া দেয়।

পরমানন্দ বলিল, ব্রহ্মচারীর মত মানুষের সম্বন্ধেও পুলিশ এই সন্দেহ করে।

বিশ্বানন্দ হাসিয়া জানাইলেন যাহারা কোন কাজ করিতে চাহে পুলিশের শাস্ত্রে বলে হয় বিপ্লবী নয় বোলশেভিষ্ট বলিয়া তাহাদিগকে সন্দেহ করিতে হইবে।

বিশ্বানন্দের একটি কথা শুনিয়া পরমানন্দের খুব ভাল লাগিল। সে কথাটি এই যে তারকেশ্বরে সতীশ গিরিকে তাড়াইবাব জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে ভারতবর্ষে যেখানে যত অত্যাচারী, বিলাসী মোহান্ত আছে তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাজশক্তি হাতে থাকিলে আইন করিয়া সকল মঠের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া জনসাধারণের হাতে আনা যাইত, ধর্মের নামে বিলাস ও পাপের কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করা যাইত।

পরমানন্দ বলিল, রাজশক্তি হাতে পেলেও তা পারতেন না স্বামিজী, দেশে ধর্মপ্রাণ লোকেরা তাতে বাধা দিত।

বিশ্বানন্দ হাসিয়া বলিলেন সে ভয় তাঁহারও আছে।

অহিংস সত্যাগ্রহ চলিতেছিল তারকেশ্বরে। সতীশ গিরির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত গুর্খাবাহিনী মাঝে মাঝে এমন দাপট দেখাইত যে হাঙ্গামা বাধিয়া যাইবার মত হইত। ভারপ্রাপ্ত নেতাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইত উত্তেজিত স্বেচ্ছাসেবকদিগকে শান্ত করিতে। বিশ্বানন্দ হাসিয়া পরমানন্দকে বলিতেন, যান না মশাই, কলকাতা থেকে গোটা কয়েক ভাল বোমা যোগাড় করে আনুন, একদিনে গিরি মহারাজকে চেলাচামুণ্ডা সমেত নিপাৎ করে দিই।

হঠাৎ সর্দি জ্বরে আক্রান্ত হইয়া স্বামী বিশ্বানন্দকে কয়েকদিন ক্যাম্প হাসপাতালে কাটাইতে হইল। হাসপাতাল হইতে ছাড়া পাইয়া তিনি আবার কাজে যোগ দিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে নিজের অসুখের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিলেন, পরমানন্দবাবু, হাসপাতালে একটি মেয়েকে দেখলাম, বাঙালী। একদম সাচ্চা কর্মী বটে। অসহযোগের সময়ে কিছু জেনানা কর্মী দেখেছিলাম। সে হট্টগোলের মধ্যে কে সাচ্চা, কে ঝুটা বুঝবার উপায় ছিল না।

এখন কাজের ধরণ দেখলে কিছু বোঝা যায়। চেহারা, চালচলন দেখে বুঝলাম বড় ঘরানার শিক্ষিত মেয়ে। কি শান্তভাবে হাসিমুখে দিনরাত খাটছেন দেখে বড় ভাল লাগল মশায়।

পরমানন্দ বুঝিল স্বামিজী শকুন্তলার কথা বলিতেছেন। শকুন্তলার এই অযাচিত প্রশংসায় তাহার মনে আনন্দের স্পর্শ লাগিল। ভাবিল এই আদর্শ শুশ্রূষাকারিণীর নাম জিজ্ঞাসা করিবে, কি ভাবিয়া করিল না।

শকুন্তলার সঙ্গে কয়েকদিন দেখা নাই। পরদিন সে হাসপাতালে গেল তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য। হাসপাতালে গিয়া শুনিল শকুন্তলার শরীর অসুস্থ, সে নিজের তাঁবুতে রহিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবিকাদের কাহারও সঙ্গে সন্ধ্যার পর দেখা করিতে হইলে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি লইতে হয়। শকুন্তলার অসুখের কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া তখনই সে অনুমতির জন্য ছুটিল। অনুমতি পাইয়া লণ্ঠন জ্বালাইয়া লইয়া শকুন্তলার তাঁবুতে গেল। তাঁবু ·ানে হাসপাতাল হইতে দূরে মাঠের মধ্যে পাশাপাশি কয়েকখানি চালাঘর। পরিচারিকার কাছে পরমানন্দের নাম শুনিয়া শকুন্তলা শয্যা হইতে উঠিয়া গায়ে একখানা চাদর জড়াইয়া বাহিরে আসিল।

বলিল, এখানে বসতে দেবার জায়গা নেই, কিছু মনে করবেন না।

পরমানন্দ—আপনি অসুস্থ শুনলাম। কি অসুখ হয়েছে ?

শকুন্তলা—সামান্য একটু জ্বরভাব হয়েছে। ব্যস্ত হবার মত কিছু নয়।

পরমানন্দ—আপনার গলার স্বর ভেঙ্গেছে কেন ?

শকুন্তলা—ভেঙ্গেছে না কি ? বোধহয় ঠাণ্ডা ·েগেছে।

পরমানন্দ—আমি বুঝতে পারছি কি হয়েছে। কাল ডাক্তার আসবে। আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

পরমানন্দ পশ্চাৎ ফিরিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইতে শকুন্তলা ডাকিল, শুনুন।

পরমানন্দ ফিরিয়া আসিল। শকুন্তলা বলিল, সত্যি আমার পিঠে একটু ব্যথা হয়েছে। আপনাকে বলিনি।

পরমানন্দ লণ্ঠনটি উঁচু করিয়া ধরিল, তাহার মুখে কি দেখিল সেই জানে, বলিল, আপনি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। যেদিন শরীর খারাপ মনে হয়েছিল সেইদিন কেন খবর দেন নি আমাকে ? এখানে অ. .নার দায়িত্ব আমার ওপর—

শকুন্তলা হাসিয়া বলিল, কয়েকদিন আপনার দেখা না পেয়ে ভেবেছিলাম সে কথা বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন।

পরমানন্দ এই কথার জবাব না দিয়া শুধু বলিল, আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না, ঘরে যান। কাল কাজে বেরুবেন না, আমি ডাক্তারকে বলছি অন্য লোকের ব্যবস্থা করতে।

শকুন্তলা তাহার তাঁবুতে প্রবেশ করিল। পরমানন্দ কি ভাবিতে ভাবিতে নিজের ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিল।

তিন দিন পরে রায় বাহাদুরের সঙ্গে শকুন্তলাকে রেলগাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া পরমানন্দ ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিল। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে রায় বাহাদুরকে আসিবার জন্য তার করিয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, মশায়, ব্রঙ্কাইটিস হোক আর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হোক মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে ভদ্রলোকের মেয়েকে ভোগাবার কোন মানে হয় না। কে ওঁকে দেখবে শুনবে? না আছে ওষুধপত্র, না আছে পথ্যের ব্যবস্থা। ঘরে ফেরৎ পাঠিয়ে দিন ওঁকে। আগেই পাঠানো উচিত ছিল।

বাস্তবিক শকুন্তলা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে গাড়ীতে উঠাইবার সময় রায় বাহাদুর একা পারিলেন না, পরমানন্দকে সাহায্য করিতে হইল। পরমানন্দ তাহাকে ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইল, বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া গরম কাপড় দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিল। শকুন্তলা একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া চোখ বুজিল।

পরমানন্দ জানে না কেন অসুস্থ শকুন্তলার সেই কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত তাহার মধ্যে যেন গাঁথিয়া গেল। রাত্রে দুইবার ঘুম ভাঙ্গিয়া সে উঠিয়া বসিল, তাহার মনে হইল অন্ধকারের অক্ষিকোটর হইতে সেই দৃষ্টি তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। ধরিয়া রেলগাড়ীতে উঠাইবার সময় পরমানন্দের সংকোচ দেখিয়া শকুন্তলা ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসিয়াছিল। শকুন্তলার সেই ম্লান হাসির কথা তাহার মনে পড়িল বারবার। কি সে হাসির অর্থ পরমানন্দ অনেক চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিল না। সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে তাহার মন খুঁজিতে লাগিল শকুন্তলার ম্লান হাসির অর্থ।

শকুন্তলা চলিয়া যাইবার পরে ক্যাম্প হাসপাতালের ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। ডাক্তারের মুখে এই অভিযোগ শুনিয়া সে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া হাসপাতালের কাজের ভার লইল। তাহার মনে হইল শকুন্তলার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিবার দায়িত্ব যেন বিশেষভাবে তাহারই।

এইভাবে কয়েক মাস চলিল। তারপর সতীশ গিরির সঙ্গে একটা আপোষের

আলোচনার খবর ছড়াইয়া পড়িল ক্যাম্পে। খবর শুনিয়া পরমানন্দ সহকর্মীদের কয়েকজনকে লইয়া তারকেশ্বর ত্যাগ করিবে স্থির করিল। পলাশডাঙায় ফিরিবার জন্য সে মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

পলাশডাঙায় ফিরিয়া পরমানন্দ দেখিল আর্যসংঘের কর্মীদের মধ্যে তখনও স্বরাজ পার্টির প্যাক্ট লইয়া উত্তেজনার জের চলিতেছে। কোহাটের দাঙ্গা লইয়া উত্তেজনাও কমে নাই। কোহাট যাইবার জন্য মহাত্মাজী গভর্ণমেণ্টের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়াছে। কোন কোন কর্মী বলিল, ভালই হয়েছে। গান্ধীজী সেখানে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশের মত হিন্দুদের আরও ডোবাবার কোন ব্যবস্থা করে আসতেন হয়ত।

অল পার্টি কনফারেন্সের ব্যর্থতা কর্মীদের অনেকের সন্তোষের কারণ হইয়াছিল। পরমানন্দ এই মনোভাবের প্রতিবাদ করিতে কেহ কেহ বলিল, কাদের সঙ্গে আপোষ করবেন? মহম্মদ আলি, সৌকত আলিকে চেনা হয়ে গিয়েছে। অল পার্টি কনফারেন্সের ব্যর্থতা সম্বন্ধে মন্তব্য করে বাংলার মুসলমান নেশনালিষ্ট কাগজ, সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের বড় সমর্থক "দি মুসলমান" কাগজ কি লিখেছে দেখেছেন? "We cannot subscribe to the political formula of a section of our fellow countrymen that we are Indians first and Hindus and Mussalmans next," (আমরা প্রথমে ভারতীয়, তারপর হিন্দু ও মুসলমান, আমাদের দেশবাসীর এক দলের এই রাজনৈতিক নীতি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।) এতদিন পরেও এই যাঁদের মনোভাব, মানে ভারতবর্ষে বাস করেও আমরা ভারতবাসী নই, আমরা মুসলমান, যাঁরা এই কথা শুধু চিন্তা করা নয় মুখ ফুটে বলতে লজ্জা পান না তাঁদের সঙ্গে কি আপোষ হতে পারে? আপোষ মানে কতটা অতিরিক্ত সুবিধে তাঁদের দেবেন আগে তাই বলুন।

পরমানন্দ ভাবিল কথাটা সত্য। মুসলমান ভ্রাতাদের কাছে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রস্তাব করা মানে নূতন নূতন বিশেষ সুবিধার লোভ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে দলে আনিবার প্রয়াস। ঐক্যের দায় যেন হিন্দুদের দায়, মুসলমানদের দায় নহে। সে দেখিল আর্যসংঘের কর্মীরা নেতাদের বিরূপ সমালোচনা লইয়া এত সময় ও উদ্যম ব্যয় করে যে সংঘের প্রকৃত কাজ অবহেলিত হইতেছে। কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য সে আর্যসংঘের অফিসে যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় সাইকেল চড়িয়া একজন কর্মী আসিয়া জানাইল গুরুদেব

এইমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তিনি বিশেষ অসুস্থ। ব্রহ্মচারী অসুস্থ হইয়া ফিরিয়াছেন শুনিয়া পরমানন্দ উদ্বিগ্ন হইয়া আর্যসংঘের অফিসে ছুটিল। সাইকেল আরোহী কর্মীকে বলিল, তুমি রায় বাহাদুরের বাড়ী গিয়ে খবরটা দিয়ে এস।

পরমানন্দ গিয়া দেখিল ব্রহ্মচারী বাস্তবিক গুরুতর অসুস্থ। তাঁহার চেহারা দেখিয়া সে ভয় পাইল, চিনিতে পারা যায় না এমন পরিবর্তন হইয়াছে তাঁহার।

তাঁহার সঙ্গে যে দুইজন কর্মী আসিয়াছিল তাহাদের কাছে সে শুনিল কয়েক মাস ধরিয়া বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের বহু স্থানে তিনি অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন সংগঠন কাজের জন্য। দুই মাস আগে আরা জেলার জগদীশপুরে তাঁহার বসন্ত হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার আগেই তিনি কাজ আরম্ভ করেন। আজ প্রায় দিন পনের হইল আসামের গোয়ালপাড়া জেলার এক গ্রামে বুকের ব্যথা, কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অচৈতন্যের মত হইয়া পড়েন। তাহারা ডাক্তার আনিয়া দেখাইয়াছিল। ডাক্তার বলিলেন প্লুরিসি হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন ইঁহাকে আশ্রমে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

কিছুক্ষণ পরে রায় বাহাদুর আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে শকুন্তলা আসিল। পলাশডাঙার বড় ডাক্তার ডাকা হইল।

আর্যসংঘের অফিস এ রকম রোগী রাখিবার পক্ষে উপযুক্ত নয় এই মত প্রকাশ করিয়া শকুন্তলা বলিল, গুরুদেবকে আমি বাড়ী নিয়ে যাব।

ব্রহ্মচারী জানাইলেন কাহারও বাড়ীতে গিয়া তিনি গৃহস্থকে বিব্রত করিতে চাহেন না, এখানেই তিনি থাকিবেন।

শকুন্তলা বলিল, বাবা, এখানে আপনার সেবা যত্নের ত্রুটি হবে, মেয়ের বাড়ীতে চলুন।

ব্রহ্মচারী একটু হাসিয়া মাথা নাড়িলেন।

ডাক্তার প্রস্তাব করিলেন তাহা হইলে হাসপাতালে ব্যবস্থা করা যাউক। পরমানন্দ ইহাতে রাজি হইল না, বলিল, আমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই।

শকুন্তলা—সেখানে কে দেখবেন? আপনার বুড়ো মা কি পারবেন? তাহ'লে আমাকেও আপনার বাড়ী যেতে হয়।

আলোচনা চলিতেছে এমন সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া মাতাজী আসিলেন।

মাতাজীকে দেখিয়া ব্রহ্মচারী হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন, বলিলেন, মা এসেছেন ?

মাতাজী তাঁহার কাছে বসিয়া একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর মৃদুস্বরে বলিলেন, একি করেছ বাছা ? অভিমান করে আপনাকে মেরে বসলে ? কে এ দুর্মতি দিল তোমাকে ?

রায় বাহাদুরের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, একখানা পাল্কীর যোগাড় হতে পারবে ? ঘোড়ার গাড়ীর ঝাঁকুনি সহ্য হবে না, নইলে এঁকে নিয়ে এখুনি রওনা হতাম আশ্রমে।

মাতাজী ব্রহ্মচারীকে নিজের আশ্রমে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে কেহ সাহস করিয়া আপত্তি করিতে পারিল না। পাল্কীর জন্য রায় বাহাদুর লোক পাঠাইলেন।

শকুন্তলা বলিল, মাতাজী, আমাকে আশ্রমে থাকবার অনুমতি দিন। গুরুদেবের সেবাশুশ্রূষার ভার আর কারো হাতে দিতে সাহস পাইনে।

মাতাজী বলিলেন, আশ্রমে দেখবার লোকের অভাব হবে না মা। তবে তুমি যদি যেতে চাও আপত্তি করব কেন ? আশ্রম তো তোমাদেরই মা।

আশ্রমের পূর্ব প্রান্তে পলাশী নদী। নদীর ধারে নূতন তৈয়ারী কুটিরখানিতে আসিয়া ব্রহ্মচারী বড় আরাম বোধ করিলেন। তাঁহার শীর্ণ মুখে হাসি ফুটিল। শকুন্তলা পরমানন্দের সাহায্যে ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিতেছিল, সুভদ্রা পথ্য তৈয়ারী করিয়া আনিতে গিয়াছিল। শকুন্তলাকে ডাকিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, এখানে এসে বড় ভাল লেগেছে মা, কত কথা মনে আসছে। তুমি একটু ব'সো এখানে।

শকুন্তলা মাটিতে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া বলিল, আপনি একটু ভাল হয়ে উঠুন বাবা। আমি একখানা ডেক চেয়ার আনতে বলেছি বাড়ী থেকে। বারান্দায় পেতে দেব, আপনি সকাল সন্ধ্যায় বসে গল্প করবেন। পলাশী নদীর ওপারের মাঠে একটা শিমুল গাছ আছে। তার নেড়া ডালগুলো লাল ফুলে ভরে গিয়েছে, বড় সুন্দর দেখায়।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, মা, আমি সন্ন্যাসী মানুষ হলেও ভালবাসার বড় কাঙাল। ভালবাসা কুড়োতে বেরিয়েছিলাম। কত লোককে ডেকে বলেছি তোমরা দেশকে ভালবাসো, জাতিকে ভালবাসো, ধর্মকে ভালবাসো। বলেছি আমি নিজের জন্য কিছু চাইনে, তোমরা শুধু স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্মের জন্য ভালবাসা

ভিক্ষে দাও আমাকে। এই দেখ আমার ঝুলি শূন্য, এই শূন্য ঝুলি ভালবাসায় ভরে নিয়ে যাব বলে পথে পথে, দোরে দোরে ঘুরছি। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, আমার শূন্য ঝুলি ভরল না মা। তাই আজ ফিরে এলাম তোমাদের মধ্যে। আজ এই কুঁড়েখানিতে বসে তোমাদের দিকে চেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে মা।

পরমানন্দ কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চোখ পড়িতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, এই যে এঁকে দেখছ মা, ইনি হচ্ছেন পরমানন্দ। কিন্তু এমন মানুষ যে নিজে জানেন না সে কথা। তাই না মা?

শকুন্তলা বিস্ময়ভরে ব্রহ্মচারীর কথা শুনিতেছিল। গুরুদেবের এমন ভাব সে আগে দেখে নাই। চিরদিনের গম্ভীর, কঠোর কৃচ্ছসাধনপর মানুষটির তুষারীভূত অন্তর কিসের উত্তাপে আজ গলিয়া শত ধারে উৎসারিত হইতে চাহিতেছে? এই চিন্তায় সে এত তন্ময় হইয়াছিল যে পরমানন্দ সম্বন্ধে গুরুদেবের রহস্যময় ইঙ্গিতের অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না। সে কি বলিতে যাইতেছিল, সুভদ্রা পথ্য লইয়া দেখা দিল।

চিকিৎসা চলিতেছিল। কয়েকদিন পরে ব্রহ্মচারী এমনভাব দেখাইলেন যেন তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বারান্দায় শকুন্তলার দেওয়া চেয়ারখানিতে বসিয়া হাত জোড় করিয়া পলাশী নদীর ওপারে দিগন্ত বিস্তৃত পূর্ব আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ধীরে ধীরে আকাশ লাল হইয়া উঠিত, প্রথম রবিরশ্মি স্পর্শে চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিত পলাশী নদীর বুক ঝলমল করিত। ধরণীর রূপের এই সুন্দর প্রকাশ নয়ন ভরিয়া তিনি দেখিতেন, তাঁহার অন্তর কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল নীরবে এই রূপের সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিত।

কিছু দিন যাইতে শকুন্তলা লক্ষ্য করিল গুরুদেব মাঝে মাঝে কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া পড়েন। অনেকক্ষণ এই বিমর্ষ ভাব থাকে। তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতিও যেন ব্যাহত হইয়াছে। সে দিন বিকালের দিকে রায় বাহাদুর আসিয়াছিলেন ব্রহ্মচারীকে দেখিতে। মাতাজী, রায় বাহাদুর ও আরও কয়েকজন তাঁহার কাছে বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। পরমানন্দ ও শকুন্তলাও ছিল সেখানে।

শকুন্তলা লক্ষ্য করিল কথা বলিতে বলিতে গুরুদেব প্রায়ই অন্যমনস্ক হইতেছেন। মাতাজী কি একটা কথা বার দুই জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইয়া মুখ তুলিয়া

ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কি চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন।

শকুন্তলা মৃদুস্বরে বলিল, তিন চার দিন হল এই ভাবটা দেখা যাচ্ছে।

শকুন্তলার কথা ব্রহ্মচারীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, কি বলছিলে মা? এই ভাবটা দেখা যাচ্ছে? তাই বটে। সময় হয়ে এল কিনা।

বিছানায় একটা বালিশ ঠেস দিয়া তিনি কথা বলিতেছিলেন। বালিশ ঠেলিয়া সরাইয়া তিনি সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন, জীবনের কাজের একটা হিসাব নিকাশ করবার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে, কোথাও ভুল হল কিনা খুঁজে দেখি। দেশের দীন-দরিদ্র, চাষী-মজুর, সাধারণ স্তরের লোককে জাগাবার ব্রত নিয়েছিলাম একদিন, তারা জেগে উঠছে, ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। দেশ কাল স্বাধীন হোক আর পরশু স্বাধীন হোক এদের জাগরণ কেউ আর ঠেকাতে পারবে না। তারপর নূতন মন্ত্র পেলাম স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কাছ থেকে, হিন্দুর সংঘশক্তি সাধনের মন্ত্র।

স্বামিজী বললেন কি বিমূঢ়তা হিন্দু রাজনীতিকদের লক্ষ্য করে দেখ। হিন্দু ধর্মের উদারতা তাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে এনেছেন, উদারতা দেখিয়ে তাঁরা চিত্ত জয় করবার স্বপ্ন দেখছেন এমন একটা সম্প্রদায়ে যার মূল মন্ত্র হচ্ছে উৎকট ধর্মান্ধতা। তিনি বললেন রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দুর উদারতাকে ইসলামীরা দুর্বলতা বলে মনে করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানের সঙ্গে কাজের নীতি তাদের বদলাতে হবে

অনেক ভেবে দেখেছি সত্যদর্শী স্বামীজীর কথা যথার্থ। আত্মঘাতী ঐক্যের মোহ আমাদের পেয়ে বসেছে। সাত শ বছর গোলামির ফলে আত্মসংশয় আমাদের জাতিগত অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যায় অগণিত হয়েও আমরা ঐক্যের কাঙাল, যে কোন মূল্য দিয়ে আমরা ঐক্য ক্রয় করতে প্রস্তুত। কি এই ঐক্যের স্বরূপ? শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের প্রতিবাদে তবলীগ ও তাঞ্জিম আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। তাঞ্জিম আন্দোলনের নেতা পেশোয়ারে বক্তৃতা করেছেন বাইরের কোন মুসলমান রাজাকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবার নিমন্ত্রণ করে এদেশে আবার মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা উচিত কিনা তাঁরা ভাবছেন। কালনেমির লঙ্কা ভাগের কাহিনী—

কাশির ধমকে ব্রহ্মচারী কথা শেষ করিতে পারিলেন না। কাশি থামিতে

বলিলেন, হিন্দুর শৌর্য বীর্যের অভাব নেই, অভাব সংঘশক্তির, অভাব রাজনীতি-জ্ঞানের। সংঘশক্তি অর্জন করলে একা হিন্দুর পক্ষে ইংরাজ ও দেশদ্রোহী—

আবার কাশির বেগ উঠিল। শকুন্তলা ব্যস্ত হইয়া একখানা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। কাশির বেগ থামিতে মাতাজী বলিলেন, এ আলোচনা থাক, তুমি বড় উত্তেজিত হয়েছ, বাবা।

ব্রহ্মচারী বালিশটা টানিয়া লইয়া তাহার উপর দেহের ভার রাখিলেন' মৃদুস্বরে, টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি উত্তেজিত হইনি। কথা বলবার সময় বোধহয় শেষ হয়ে এল মাতাজী। বাল্যে স্বপ্ন দেখেছিলাম হিমালয়ের বিপুল অরণ্যরাজি যাঁর মস্তকের অবিন্যস্ত কুন্তলভার, চরণ যুগল যিনি মহাসাগরের বুকে প্রসারিত করে অবস্থিত, সেই স্বর্ণবর্ণা মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্ন। যৌবনে, প্রৌঢ় বয়সে সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টায় শরীর ক্ষয় করেছি। ভগবানকে বলেছি, হে ভগবান, তোমাকে আমার দেশের পাহাড়ে, জঙ্গলে, মাঠে, নদনদীতে, মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে চাই, হৃদয়ের কোটরে তোমাকে বন্দী করে রাখতে চাইনে প্রভু।

হঠাৎ বালিশে মুখ গুঁজিয়া ব্রহ্মচারী শুইয়া পড়িলেন। সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মাতাজী ডাকিলেন, ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারী জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বালিশ সরাইয়া দিয়া তিনি টান হইয়া শুইলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, সেই গান, তোমার মনে আছে মা?

শকুন্তলা তাঁহার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, কি গান বাবা?

অতি মৃদুস্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, ভারত আবার—

শকুন্তলা সেইখানে বসিয়া মৃদু স্বরে গাহিতে লাগিল,

> বল বল বল সবে, শত বেণু বীণা রবে,
> ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
> ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে—

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তির মত এক অস্বাভাবিক ঝাঁকি দিয়া ব্রহ্মচারী উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার দেহ সশব্দে বিছানায় পড়িয়া গেল।

শকুন্তলার গান বন্ধ হইল। পরমানন্দ, মাতাজী, রায় বাহাদুর ব্যস্ত হইয়া বিছানার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্রহ্মচারীর গায়ে হাত দিলেন, বার বার তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা ডাকিল, বাবা বাবা!

ব্রহ্মচারী সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর ডাক্তার আনিবার জন্য তখনই নিজের গাড়ী শহরে পাঠাইলেন। পলাশডাঙায় সকল নামকরা ডাক্তার কবিরাজ আসিলেন। তাঁহাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল, ব্রহ্মচারীর জ্ঞান ফিরিল না। অজ্ঞান অবস্থায় পরদিন তাঁহার মৃত্যু হইল।

ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর মাস দুই পরে রায় বাহাদুর নিকুঞ্জ মল্লিকের মুখে মাতাজী সংবাদ পাইলেন পরমানন্দ বাড়ীঘর, জমিজমা আশ্রমে দান করিয়া সন্ন্যাস লইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। তিনি বলিলেন ব্রহ্মচারীকে হারাইয়া আর্যসংঘে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, পরমানন্দ চলিয়া গেলে সংঘ ভাঙ্গিয়া যাইবে, ব্রহ্মচারীর সাধনার ফল নষ্ট হইয়া যাইবে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, পারিবারিক দিক থেকেও আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়েছি পরমানন্দের এই সঙ্কল্পের ফলে।

মাতাজী কোন প্রশ্ন করিলেন না, একবার রায় বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার ইঙ্গিতের অর্থবোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর বলিলেন, আমার বয়স হয়েছে, যাবার সময় হল। কাজকর্ম আর তেমন পারি না। আশ্রমের বারো আনা কাজের ভার এখন সুভদ্রার ওপর। আশ্রমের বিষয়-সম্পত্তির প্রয়োজন নেই, কে দেখবে বাবা? পরমানন্দের মন বড় ব্যাকুল হয়েছে তার গুরুদেবের অকাল মৃত্যুতে। তাই সন্ন্যাসের কথা বলছে। শোকাতুর মন নিয়ে নিজের কর্তব্য কি বুঝতে পারছে না। তাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দেবে বাবা? শকুন্তলা মাকেও একবার পাঠিয়ো।

তাঁহার কথা শুনিয়া রায় বাহাদুর যেন একটু আশ্বাস পাইলেন।

সংবাদ পাইয়া পরমানন্দ আসিল। দুই একটা প্রশ্ন করিয়া মাতাজী বুঝিলেন তাঁহার অনুমান ঠিক। ব্রহ্মচারীর মৃত্যুতে বড় আঘাত পাইয়াছে পরমানন্দ, তাই স্থির করিয়াছে তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া তাঁহার বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইবে দেশে।

মাতাজী তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, জাতির বর্তমানের বিপদ ও ভবিষ্যতের বিপদের সম্ভাবনা নিবারণ করার জন্য সংঘশক্তি অর্জন করা আবশ্যক। অন্য ধর্ম হতে হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করার বহুদিনের রুদ্ধদ্বার অর্গল মুক্ত করা আবশ্যক। এই দু'টি কাজের জন্য ব্রহ্মচারী আর্যসংঘ গঠন করেছিলেন। তুমি নিজেও এই আর্যসংঘের জন্য বহু পরিশ্রম করেছ বাবা।

ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পর কোথায় তুমি এই সংঘের কর্মক্ষেত্র প্রশস্ত করবে, না সংঘকে দুর্বল করে নিজে চলে যেতে চাইছ।

পরমানন্দ বলিল, সন্ন্যাস নিয়ে আমি গুরুদেবের আদর্শ প্রচার করব।

মাতাজী বলিলেন, বাবা, ব্রহ্মচারী তাঁর আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে নিজের দেহপাত করলেন। দেশের ক'জন লোক তাঁর উপদেশমত কাজ করছে? আদর্শ প্রচার করবার অর্থ বীজ বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া। এ কাজ হয়েছে। এই যুগ একক কাজের যুগ নয়, সংঘবদ্ধ কাজের যুগ, প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাজ করার যুগ। ব্রহ্মচারীর শিষ্য হয়ে তুমি কেন ভুল পথে—

সুভদ্রা দরজার বাহির হইতে বলিল, মাতাজী, শকুন্তলাদি আর তাঁর বাবা এসেছেন।

মাতাজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, আমি আসছি, তুমি একটু বস। দরকারী কথা আছে। তোমার একার কথা ভাবলে চলবে না বাবা।

সুভদ্রা জানাইল শকুন্তলা ও রায়বাহাদুর ব্রহ্মচারী বিমল কুটিরের দিকে গিয়াছেন। পলাশী নদীর পাড়ে যে কুটিরে ব্রহ্মচারী দেহরক্ষা করিয়াছিলেন তাহার নাম হইয়াছিল ব্রহ্মচারী বিমল কুটির।

সুভদ্রা কাজে চলিয়া গেল, মাতাজী কুটিরের দিকে চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রায়বাহাদুর কাছে আসিয়া বলিলেন, পরমানন্দ এসেছে? কোথায় সে? মাতাজী জানাইলেন পরমানন্দের সঙ্গে এতক্ষণ আলোচনা হইতেছিল।

রায়বাহাদুর—আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে, চলুন উপাসনা মন্দিরের দিকে। পরমানন্দকে একটু জানাতে হবে শকুন্তলা তাকে কিছু বলতে চায়।

পরমানন্দ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন। রায়বাহাদুর হাত তুলিয়া তাহাকে আসিবার সংকেত করিলেন, সে দেখিতে পাইল না।

মাতাজী কি ভাবিলেন। বলিলেন, পরমানন্দ আমাকে না বলে যাবে না। চলুন আমরা উপাসনা মন্দিরে যাই। শকুন্তলাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

পরমানন্দ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চিন্তিতভাবে পলাশী নদীর দিকে চলিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বিমল কুটিরের কাছে আসিয়া সে একটু দাঁড়াইল, তারপর পলাশীর পাড়ের দিকে অগ্রসর হইল। সে ভাবিতেছিল মাতাজী একার কথা ভাবলে চলবে না বললেন কেন? শকুন্তলা কুটিরের বারান্দায় বসিয়াছিল।

পরমানন্দকে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে ডাকিয়া বলিল, আমি অপেক্ষা করে আছি।

পরমানন্দ চমকিয়া পিছন ফিরিল। দেখিল কুটিরের বারান্দায় ব্রহ্মচারী যে চেয়ারে বসিতেন তাহার পাশে মাটিতে বসিয়া শকুন্তলা তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে কাছে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমাকে কিছু বলছেন?

শকুন্তলা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে একবার চাহিল, ম্লান হাসিয়া বলিল, বলছি। আজ নয়, অনেকদিন থেকে বলবার জন্য অপেক্ষা করছি। বসুন।

কিছু বুঝিতে না পারিয়া অসহায়, বিমূঢ় দৃষ্টি লইয়া পরমানন্দ বসিল। চকিতে তাহার মনে পড়িল তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ ক্যাম্পের দিনগুলির কথা, শকুন্তলার তারকেশ্বর ত্যাগ করিবার সময়কার কথা। তাহার ভয় হইল শকুন্তলা বোধহয় তাহার তখনকার দুর্বলতার কথা বুঝিতে পারিয়াছিল, আজ তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সেই কথা তুলিয়া ভর্ৎসনা বা ব্যঙ্গ করিবে তাহাকে। প্রাপ্য শাস্তি গ্রহণ করিবার জন্য সে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল, আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিবার মত একটি কথাও তাহার মনে পড়িল না।

শকুন্তলা তাহার বক্তব্য বলিতে লাগিল। পরমানন্দের মনে হইল শকুন্তলা কি বলিতেছে সে শুধু কানে শুনিয়া যাইতেছে, বুঝিতে পারিতেছে না। ইহাতে সে আরও বিমূঢ় হইল। নিজের বোধশক্তির এই অক্ষমতায় বিরক্ত হইয়া সে মুখ তুলিয়া শকুন্তলার দিকে চাহিল।

শকুন্তলার বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এতক্ষণে। পরমানন্দের প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া সে বলিল, গুরুদেবের কাজ ছেড়ে, আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবেন আপনি? যেতে পাবেন না, যেতে দেব না আমি। আমরা দু'জনে মিলে তাঁর কাজ করব। বুঝেছেন?

পরমানন্দের বিমূঢ়তার ঘোর তখনও বুঝি কাটে নাই। উত্তরে সে শুধু মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, আচ্ছা।

সুভদ্রা আসিতেছে দেখা গেল। কাছে আসিয়া উভয়ের দিকে একবার চাহিল। পরমানন্দের জড়সড় ভাব দেখিয়া তাহার কেন যেন হাসি পাইল। হাসি চাপিবার চেষ্টা করিয়া পরমানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মাতাজী আপনাকে ডাকছেন উপাসনা মন্দিরে।

পরমানন্দ নীরবে উঠিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইল। সুভদ্রা বলিল, বেশ মানুষ আপনি! শকুন্তলাদিকে নিয়ে আসুন।

পরমানন্দ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, শকুন্তলার কাছে গিয়া বলিল, আসুন।

পরমানন্দের তখনও স্বপ্নের মত বা সম্মোহিত ব্যক্তির মত ভাব। তাহার অবস্থা দেখিয়া সুভদ্রা হাসি চাপিতে পারিল না, হাসিয়া বলিল, শকুন্তলাদি, হাত ধরে ওঁকে নিয়ে আসুন, নইলে উনি পথ হারিয়ে ফেলবেন।

শকুন্তলা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হাসিয়া জবাব দিল, আর সে ভয় নেই সুভদ্রা! তুমি এগোও, আমরা আসছি।

তিন

পঞ্চক্রোশী (১৯২৪—২৫)

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে।

পঞ্চক্রোশীতে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

মুক্তি পাইবার কয়েকদিন আগে জেলের মধ্যে দীনদয়াল ঠাকুরের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পঞ্চক্রোশীর বাগ্দী, হাড়ি, কেওট, বাউরী প্রভৃতি সম্প্রদায়-গুলির মধ্যে নূতন এক আলোড়নের সৃষ্টি করিল। তাঁহার ধর্মপ্রাণতা, সন্ন্যাসীর জীবন, অশিক্ষিত, উপেক্ষিত নিম্নশ্রেণীগুলির নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সারাজীবনের চেষ্টা, সকল প্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাহাদের মধ্যে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে সমাজের সকল স্তরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও শেষে সরকারী কয়েদখানায় তাঁহার মৃত্যু, এই সবগুলির স্মৃতি মৃত দীনদয়াল ঠাকুরকে যেন নূতন জীবন দান করিল। ভগবানের সাক্ষাৎ অবতাররূপে দয়াল বাবার পূজা আরম্ভ হইল পঞ্চক্রোশীর নিম্নশ্রেণীগুলির মধ্যে; দয়াল বাবার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনীর উদ্ভব হইল, এই সকল কাহিনী চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। কবে তিনি স্বপ্নে কোন ভক্তকে দর্শন দিয়া উপদেশ দিয়াছেন লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া তাহার কাহিনী ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

হিন্দু সমাজের অন্যদিকে যেমন হউক একটি বিষয়ে উদারতার সত্যই সীমা নাই। কোন নূতন দেবতার আবির্ভাব হইলে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ করে না এ দেশের মানুষ। দয়াল বাবার আবির্ভাবের পরে তাঁহার পূজা সমাজের ইতর স্তর হইতে ভদ্র স্তরে প্রচারিত হইতে বেশী সময় লাগিল না।

এই সময়ে কালিন্দী জেল হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিল। দীনদয়াল ঠাকুর গ্রেপ্তার হইবার সময়ে কালিন্দী ও পিরু হাজী পলাইয়াছিল। পুলিশ তাহাদিগকে ধরিতে পারে নাই। মাস খানেক পরে কালিন্দী ধরা পড়িল বা স্বেচ্ছায় ধরা দিল। পিরু হাজীর কি হইল কেহ বলিতে পারে না। পিরু

হাজীর পরিবারের লোকের বিশ্বাস কালিন্দী হাজীকে খুন করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিয়াছে। পুলিশের কাছে এ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ কেহ করে নাই, এ সন্দেহের সমর্থক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। হইতে পারে যে উভয়ের অজ্ঞাতবাসের সময়ে পিরু হাজী কালিন্দীকে নিঃসহায় যুবতী মেয়ে মানুষ মনে করিয়া লুব্ধ হইয়াছিল, কালিন্দী যে বাঘিনীর মত শক্তি রাখে লোভে পাগল হইয়া তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই।

কালিন্দী জেলের বাহিরে আসিয়া দীনদয়াল ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ পাইল ও দয়াল বাবার পূজার প্রচার লক্ষ্য করিল। মাস দুই যাইতে না যাইতে জমিদার রায় বাহাদুর হেমাঙ্গনাথ খবর পাইলেন দীনদয়াল ঠাকুরের ভস্মীভূত আশ্রমের জায়গাটিতে দয়াল বাবার পূজার মণ্ডপ উঠিয়াছে, সাড়ম্বরে সে মণ্ডপে ঠাকুরের চিত্রের পূজা, আরতি আরম্ভ হইয়াছে। তিনি খবর পাইলেন কালিন্দীর প্ররোচনায় জমিদার সরকারের খাস জমি এইভাবে বেদখল করা হইয়াছে।

যাহারা খবর আনিয়াছিল তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল জমিদারের আদেশে আবার একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধিবে। তাহাদের এই প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না।

রায় বাহাদুর হেমাঙ্গনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বের অহঙ্কার ও উগ্রতা কমিয়া আসিয়াছিল। দীনদয়াল ঠাকুরকে তিনি চিরদিন তুচ্ছ করিয়াছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের চরম সঙ্কটের সময়ে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে কিছুদিন শক্তিহীন হইয়া পড়িলেও তিনি নিজের দৃঢ়তা ও প্রতিহিংসার স্পৃহা হারান নাই। আশ্রম ধ্বংস হইলে তিনি স্বগৃহে আলোকসজ্জা করিয়া নহবৎ বাজাইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার জয়ের উল্লাস স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি যে কতখানি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন তাহা প্রথম উপলব্ধি করিলেন মৃত দয়াল বাগ্‌দী যখন দয়াল বাবা রূপে আবির্ভূত হইয়া ইতরভদ্রের পূজা পাইতে লাগিলেন। সংস্কারক, ধর্মপ্রচারক, সাধু দীনদয়ালকে পিষ্ট করিয়া মারিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। দেবতা দীনদয়ালের আবির্ভাবে তিনি ভয় পাইলেন। তাঁহার কেমন যেন মনে হইল এই নূতন দেবতা পাল্টা প্রতিহিংসা সাধন করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, প্রাচীন সমাজ, ধর্ম, রীতি, নীতি, সংস্কার সব ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবেন এই দেবতা।

এই ভয় হইতে খাস জমি বেদখল করিয়া দয়াল বাবার পূজার মণ্ডপ

নির্মিত হইবার সংবাদ শুনিয়া মানসিক চাঞ্চল্য বোধ করিলেও তিনি ভাবিলেন হঠাৎ কিছু করা সঙ্গত নয়।

দয়াল বাবার আবির্ভাবে শ্যামানাথ কিছুদিন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছিল। দীনদয়াল ঠাকুরের ভক্ত, অসহযোগী নেতা শ্যামানাথ এক সময়ে বার্দৌলী সিদ্ধান্তের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তের বহু বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিল। ক্রমে সে উপলব্ধি করিল এই সিদ্ধান্ত দেশকে সর্বনাশ হইতে বাঁচাইয়াছে, অচিন্তনীয় বিপর্যয় হইতে দেশের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষা করিয়াছে। শান্তিপূর্ণ, অহিংস আন্দোলন ছাড়া দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নাই এই বিশ্বাস তাহার মনে বদ্ধমূল হইল। সে বিপ্লবী দীনদয়াল ঠাকুরকে সমর্থন করিয়াছিল যৌবনসুলভ বিচার বিশ্লেষণ নিরপেক্ষ উৎসাহ লইয়া, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়, তাই দয়াল বাবার আবির্ভাবে প্রথমে সে ভয় পাইল। তারপর সে ভয় কাটিয়া গেল। তাহার বিশ্বাস হইল দয়াল বাবা নূতন বিঘ্ননাশক দেবতা সমাজের নব ত্রাণ-কর্তা। ভক্তির বন্যায় তিনি ভক্তদের মন হইতে সর্বপ্রকার উগ্র চিন্তা ভাসাইয়া লইয়া যাইবেন।

এই সময়ে শ্যামানাথের হাতে পণ্ডিচেরীর ঋষি শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine গ্রন্থখানি আসিয়া পৌঁছিল। মন দিয়া সে গ্রন্থখানি পড়িতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিল। অরবিন্দের অন্য গ্রন্থগুলি আনাইয়া সে পড়িতে আরম্ভ করিল। ইহার পর যোগ সাধনা সম্বন্ধে শিক্ষা লইবার জন্য সে পণ্ডিচেরী আশ্রমে যাইবে স্থির করিল। রায় বাহাদুর হেমাঙ্গনাথ গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ায় যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইল।

দীনদয়ালের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রাধারাণী আর পঞ্চক্রোশী ফিরেন নাই, গোবিন্দপুরের মহানন্দ আশ্রমে রহিয়া গিয়াছিলেন। দয়াল বাবার আবির্ভাবের কথা লোকমুখে শুনিয়া তিনি ভাবিলেন একবার দেখিয়া আসিতে হইবে ব্যাপার কি। আরও একটা কারণ ছিল। শ্যামানাথের স্ত্রী সুনীতি তাঁহাকে এক পত্রে যৌগিক প্রক্রিয়ায় স্বামীর অনুরাগ সম্বন্ধে অভিযোগ জানাইয়া শেষে লিখিয়াছিল, সন্ধ্যাতারার জন্য আমার দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। আজ মনে হইতেছে আমাদের দোষে তাহার জীবনটা মাটি হইল হয়ত। কোন মতেই তাহাকে বিবাহে রাজি করা যাইতেছে না, এদিকে যথেষ্ট বয়সও হইল। শেখরবাবুর সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় ভুল ছিল আজ বুঝিতেছি। মানুষের

জীবনে কোন ভুল হইলে সময়মত তাহা সংশোধন করা ভাল, ভুল আঁকড়াইয়া থাকিয়া অনর্থক দুঃখ পাওয়া উচিত নয় এই সোজা কথাটা সন্ধ্যাতারাকে বুঝাইতে পারিতেছি না। আপনি কি একবার এখানে আসিতে পারেন না? সে আপনাকে মানে। হয়ত আপনি বুঝাইলে কিছু ফল হইতে পাবে।

সুনীতির পত্রের এই অংশ পড়িয়া রাধারাণীর অন্তর হইতে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইল। ভাবিলেন শেখরকে তিনি কি সত্যই ভুল বুঝিয়াছিলেন? অথবা হয়ত তাহার মনে তারার প্রতি বাস্তবিক কোন আকর্ষণ জন্মে নাই, আকর্ষণটা ছিল তারার এক পক্ষের। তাহাকে তিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহাকে সতর্ক করেন নাই, তাঁহার মনে পড়িল। বাস্তবিক তাঁহার আশ্বাস কি অমূলক ছিল? তাঁহার মেয়ে নাণ্টি যে চিঠি লিখিয়াছিল তারাকে সতর্ক করিয়া সেই চিঠির কথা মনে পড়িল। তিনি নিজেব মনে মাথা নাড়িলেন। এমনও তো হইতে পাবে শেখরের মনে যে আকর্ষণ জন্মিয়াছিল নিজের জীবনের পববর্তী কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মনস্থির করিতে না পারিয়া সেই আকর্ষণ কাটাইয়া উঠিবার জন্য সে অমনভাবে সরিয়া পড়িয়াছিল।

দুই তিন দিন ধরিয়া তিনি সুনীতির চিঠির কথা ভাবলেন। ভাবিলেন তারা বড ভাল মেয়ে, বড় মিষ্ট স্বভাবেব মেয়ে, শেখর যে পথেই যাউক তারাকে লইয়া অসুখী হইত না সে। তাঁহাকে একবাব শেষ চেষ্টা কবিযা দেখিতে হইবে তারার জন্য।

অনেক দিন পরে তিনি শেখরকে চিঠি লিখিতে বসিলেন। আসল কথা গোপন রাখিয়া লিখিলেন, তোমাকে অনেকদিন দেখি না শেখব, মন বড ব্যাকুল হইয়াছে তোমাকে একবার দেখিবাব জন্য, সময় কবিয়া একবার কি পঞ্চক্রোশী আসিতে পার না? কাগজে দেখিয়াছিলাম কানপুর বোলশেভিক যড়যন্ত্রের মামলায় তুমি আসামীপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কানপুর গিয়াছিলে। তুমি কি নিয়মিত ওকালতি করিতেছ, না বোলশেভিক দলে যোগ দিয়াছ? কাগজে রুশিয়ায় বোলশেভিকদের সম্বন্ধে যাহা পড়ি তাহাতে ভয়ানক লোক বলিয়া মনে হয় তাহাদিগকে। বোলশেভিকরা নাকি ধর্ম মানে না, তাহারা নাস্তিক, বড় বড় গির্জাগুলি তাহারা দখল করিয়াছে। তাহারা বিবাহ উঠাইয়া দিয়াছে, স্ত্রীলোকদিগকে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছে, পরিবার প্রথা উঠাইয়া দিয়াছে। এ সব কথা কি সত্য না বোলশেভিজম্ বিরোধীদের অত্যুক্তি কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। সত্য হইলে তোমার মত লোক যে

ইহাদের দলে যোগ দিবে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তুমি এখানে আসিলে তোমার কাছে সত্য কথা শুনিব।

এ সব কথা যাউক। আমাদের যদি একেবারে ভুলিয়া গিয়া না থাক তাহা হইলে একবার আসিবে। তোমার পত্র পাইলে আমি পঞ্চক্রোশী রওনা হইব।

সপ্তাহ দুই বাদে শেখরের উত্তর পাইলেন রাধারাণী। সুদীর্ঘপত্র, পত্রের সঙ্গে কয়েকখানি সংবাদপত্র।

সে লিখিয়াছে, রাঙা মামীমা, অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। তাহলে আপনারা আমাকে ভুলে যান নি। সময় করতে পারলে আমার একবার পঞ্চক্রোশী যাবার ইচ্ছা আছে।

আমি কানপুরে যাচ্ছি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সভা উপলক্ষে। সেখান থেকে আপনাকে জানাতে পারব কখন যেতে পারব। এদেশে কম্যুনিজম প্রচার করবার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। যে কাগজগুলো পাঠালাম তাতে এই পার্টি গঠনের প্রয়োজন সম্বন্ধে স্বামী সত্যভকতের বিবৃতিটি পড়বেন। দেশবন্ধু কাগজে পার্টির প্রোগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বেরিয়েছে। সময় পেলে এটাও পড়বেন।

আমি বোলশেভিষ্ট হয়েছি কিনা জানতে চেয়েছেন। বোলশেভিক দল রুশিয়ার একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক দল। রুশিয়ার শত্রুরা বোলশেভিষ্ট কথাটাকে একটা জঘন্য গালির পর্যায়ে এনেছে। আমি বোলশেভিষ্ট নয়, কম্যুনিষ্ট।

কেন কম্যুনিষ্ট হয়েছি বিস্তারিত বলছি।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে আমরা স্বাধীনতা লাভের যত চেষ্টা করেছি সব ব্যর্থ হয়েছে। কেন? ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আন্দোলনে দেশের মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত শ্রেণী ও জনসাধারণ যোগ দেয়নি, হৃত রাজ্য কয়েকটি রাজবংশীয় লোকের অসন্তোষ, দেশীয় সৈন্যদলের মধ্যে একাংশের অসন্তোষ ও ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ মিলে বিদ্রোহ ঘটায়। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হল।

দেশের ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ হল। এরপর আরম্ভ হল আধুনিক চিন্তাধারার অধ্যায়, ডেমোক্রেসীতে বিশ্বাসী শিক্ষিতশ্রেণীর আন্দোলনের অধ্যায়। নূতন নেতারা আসলে রাজভক্ত সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এঁরা একটা গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করবার

চেষ্টা করলেন ভাবাবেগের সাহায্যে, জনসাধারণের সম্মুখে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার, চরকা ও বয়কট ছাড়া কোন অর্থ নৈতিক প্রোগ্রাম ধরতে পারলেন না।

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করলেন ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডীর ভক্ত নূতন বিপ্লব--বাদীর দল। শিক্ষিতশ্রেণীর কিশোর ও যুবকদের নিয়ে বিভিন্ন দল গঠিত হল। বিপ্লবের উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে দলে আনবার জন্য বিপ্লববাদীরা কোন অর্থ নৈতিক প্রোগ্রাম উপস্থিত করতে পারলেন না। নানা ভাবে উৎপীড়িত দেশের লাঞ্ছিত শ্রেণীর সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্য কোন সামাজিক সংস্কারের প্রোগ্রামও তাঁদের হাতে ছিল না। তাঁদের উদ্যম জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে শুধু শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। ফলে সামগ্রিক বিপ্লবের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ দেখা দিল দেশে। গভর্ণমেন্ট বিচ্ছিন্ন বিপ্লববাদীদের পিষে মারলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে জনগণ এগিয়ে এল জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। অসহযোগের আবেদনে তারা সাড়া দিয়েছিল তাদের ট্যাক্সের বোঝা কমবে ও সাধারণ অবস্থার উন্নতি হবে আশায়। নানা জায়গায় কৃষাণ সভা গড়ে উঠল, ঘন ঘন ধর্মঘট হতে লাগল। কিন্তু কংগ্রেসের প্রোগ্রামে এই সকল খণ্ড খণ্ড আন্দোলনের পরিচালনা ও নেতৃত্ব স্থান পেল না, জাগ্রত জনগণের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য নেতারা পুরাতন ট্যাকৃটিকস্‌এর পরিবর্তন করলেন না। আসল কথা কি জানেন? অসহযোগের আইডিয়া ও আদর্শকে রূপ দেবার পরিকল্পনা যাঁরা করেছিলেন, যে সকল সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে সেই পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়েছিল তার কথা গণনায় আনেন নাই তাঁরা। তাই বৈপ্লবিক গণশক্তির আকস্মিক অভ্যুত্থানে তাঁরা চমকে গেলেন।

আন্দোলনের কোন কোন নেতার বুঝতে দেরি হল না যে লাভের আশায় জনগণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে তাঁদের স্বার্থের সঙ্গে তার বিরোধ রয়েছে। উচ্চতর শ্রেণীর স্বার্থপরতা বুরোক্রেশীর সঙ্গে যোগ দিতে তাঁদের প্রলুব্ধ করবে তখনই বোঝা গিয়েছিল। এখন এই ব্যাপার স্পষ্টতর হয়েছে। একখানা কাগজের কথায় "Swaraj in their mouths has come to mean an equal right with the existing bureaucracy to exploit the toiling masses." অর্থাৎ তাঁদের মুখে স্বরাজ কথার অর্থ দাঁড়িয়েছে মেহনতী জনগণকে শোষণ করবার জন্য বর্তমান আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সমান অধিকার।

চিঠিটা বড হয়ে যাচ্ছে রাঙা মামীমা, আমার কথা শেষ হয়নি। আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না বিভিন্ন দিকে চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে অসহযোগের ব্যর্থতার ফলে যে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল কি করে সেই নৈরাশ্য ও অসহায়তার ভাব দূর করা যায়। বিপ্লবী দল, হিন্দু সংগঠনকামীরা, স্বরাজিষ্ট নাম নিয়ে পুরণো লিবারেল দল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু যে জনগণের সাহায্যের অভাবে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা এতবার ব্যর্থ হয়েছে, সেই জনগণের কথা, চাষী, মজুর, নিম্ন মধ্যশ্রেণীর কথা এরা ভুলে গিয়েছেন মনে হয়।

রাঙা মামীমা, আমার ধারণা হয়েছে, যে সকল দেশকর্মীর আন্তরিকতা আছে, এ দেশের আন্দোলনের ইতিহাস যাঁরা জানেন, বিদেশের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের সামনে একটি মাত্র চলবার পথ রয়েছে—চাষী মজুরদের সংঘবদ্ধ করতে হবে, তাদের দাবি মানবার স্বীকৃতি দিয়ে নূতন আন্দোলনের পত্তন করতে হবে। এই কাজ আরম্ভ করেছে ইণ্ডিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টি। এ প্রসঙ্গ আর বাড়াব না।

এবার অন্য কথায় আসা যাক। পড়াশোনা ও নানা রকম কাজকর্ম নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত থাকি। পঞ্চক্রোশীতে একবার যাবার কথা মধ্যে মধ্যে মনে হয়, মনে হয় আপনাদের সঙ্গে দিন কয়েক কাটিয়ে আসি। কিন্তু সঙ্কোচের জন্য যাওয়া হয় না। আপনি যখন এত করে লিখেছেন কয়েক দিন পরে যাবার চেষ্টা করব। যাওয়া স্থির হলে আপনাকে জানাব। শ্যামানাথ চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করেছে, আপনার চিঠি পেয়ে বড ভাল লাগল। আমি গেলে নাণ্টি কি একবার আসবে না? অনেক দিন তাকে দেখিনি।

শেখরের পত্রখানি পাইয়া রাধারাণী মনোযোগ দিয়া পডিলেন। সুদীর্ঘ পত্রের শেষ অংশে আসিয়া তাঁহার মন ক্ষীণ আশার আলোক দেখিতে পাইল। শেখর গান্ধীবাদ মানে কি সাম্যবাদ মানে তাহা লইয়া এখন তাঁহার মনে কিছু মাত্র কৌতুহল নাই; রাজনৈতিক কর্মের অধ্যায় তাঁহার জীবনে শেষ হইয়াছে। শেখরকে এখন তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন অন্য কারণে। তিনি ভাবিলেন সঙ্কোচের কথা সে লিখিয়াছে কেন? নিজের ব্যবহারের ত্রুটি কি এতদিন পরে চোখে ধরা পড়িল? তাহার মনের পরিবর্তন হইয়াছে কি? তাঁহার মনে হইল এ সকল ভাবনা এখন থাকুক, শেখর যাহা লিখিয়াছে তাহার অতিরিক্ত কিছু মনে করা উচিত হইবে না।

তিনি সুনীতিকে লিখিলেন শেখর পঞ্চক্রোশী আসিতে পারে। সে আসিবার আগে তিনি পঞ্চক্রোশী যাইবেন। অন্য কথাবার্তা সাক্ষাতে হইবে।

মাস খানেক পরে হঠাৎ শেখরের দ্বিতীয় পত্র আসিল। কানপুর হইতে ফিরিয়া সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, এখন কিছু ভাল। কলিকাতায় বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ হইতেছে না কাজের চাপে, কয়েক দিন পঞ্চক্রোশীতে থাকিয়া সে বিশ্রাম করিবে। আগামী পরশ্ব সে রওনা হইবে।

পত্র পড়িয়া রাধারাণী তেমন বিস্মিত হইলেন না। ভাবিলেন শরীর অসুস্থ হইয়াছে তাই কি পঞ্চক্রোশীতে আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণের কথা মনে পড়িল? পঞ্চক্রোশীতে তোমাকে যত্ন করিবার, তোমার শুশ্রূষা করিবার লোক কে আছে শেখর? যে তোমাকে যত্ন করিবার সুযোগ পাইলে কৃতার্থ হইত, কি ব্যবহার করিয়াছ তাহার সঙ্গে?

মনে যাহাই ভাবুন স্বভাবসিদ্ধ তৎপরতার সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় কাজে হাত লাগাইলেন। নাতিকে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন তাঁহার শরীর হঠাৎ খুব খারাপ হইয়াছে, সে যেন সন্ধ্যাতারাকে লইযা পঞ্চক্রোশী আসে। পবদিন তিনি নিজে পঞ্চক্রোশী রওনা হইলেন। স্থির কবিলেন শেখরের বাড়ীতে গিয়া উঠিবেন। এতদিন পরে সে অসুস্থ হইয়া আসিতেছে, বাড়ীঘর পরিষ্কার কবিয়া গুছাইয়া রাখিতে হইবে।

তাঁহার পৌঁছিবার দ্বিতীয দিন শেখবের আসিবাব কথা। কলিকাতা হইতে আসিলে দুপুরের আগে পঞ্চক্রোশী পৌঁছা যায়। দুপুর গডাইয়া বিকাল হইল, শেখর আসিল না। রাধারাণী চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন তবে কি তাহাব অসুখের বাডাবাডি হইয়াছে? শেখরের গৃহে সুনীতির আসিবার ইচ্ছা না থাকিলেও রাধারাণীর কথা ঠেলিতে না পারিয়া সে দুপুবে আসিয়াছিল। সে বলিল, শেষ পর্যন্ত হয়ত জানাবেন কাজে বড ব্যস্ত, আসতে পারলাম না।

তাহাব কথা শুনিযা রাধারাণী হাসিয়া বলিলেন, হয়ত তাই লিখবে। দেখা যাক।

সুনীতি বাড়ী ফিরিল। শ্যামানাথ খোঁজ লইতে আসিয়াছিল, সেও চলিয়া গেল। সুনীতি যাইবার আগে রাধারাণী বলিলেন, বৌমা, নাতির আসবার কথা আছে, তোমাকে বলা হয়নি। এলে এখানে পাঠিয়ে দিয়ো।

নাতির আসিবার কথা শুনিয়া সুনীতি বিস্মিত হইল। কিন্তু কোন কথা না বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিকাল গড়াইয়া সন্ধ্যা নামিল। রাধারাণী মনের উদ্বিগ্ন ভাব দমন করিয়া তাঁহার সান্ধ্য কর্তব্য গীতা পাঠাদি শেষ করিয়া উঠিয়াছেন এমন সময় শুনিলেন বাহিরে কে শেখরের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তিনি কানাইকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ তো বাইরে কে তোর বাবুকে ডাকছে।

কানাই দরজা খুলিয়া বলিল, বাবুর আসবার কথা ছিল, আসেন নাই।

অন্ধকারেব মধ্যে কে বলিল, আসেন নি? তা তুমি একবাব লণ্ঠনটা আন তো, আমরা খুঁজে দেখব বাবু এসেছেন কি না।

কানাই অন্ধকাবের মধ্যে কে কথা বলিতেছে চিনিতে পারিল না, শুধু বুঝিল যে কথা বলিতেছে সে স্ত্রীলোক। আবও বুঝিল অন্ধকারের মধ্যে কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। চাপা হাসির শব্দ তাহার কানে আসিল।

একটু বিব্রত বোধ কবিয়া কানাই বলিল, বাড়ীতে থালি মা'ঠান আছেন, আপনারা কোন বাড়ী থেকে আসছেন?

কে বলিল, কানাই নাকি? আলো নিযে আয়।

কানাই গলা শুনিয়া বাধারাণীকে ডাকিল—মাঠান, বাবু এসে গেলেন।

আলো আনিবার জন্য সে ভিতরে ছুটিল।

বাধারাণী লণ্ঠন হাতে বাবান্দায আসিয়া দেখিলেন শেখর, নান্টি ও তারা, এই ত্রিমূর্তি বাবান্দায় দাঁডাইয়া হাসিতেছে।

নান্টি প্রণাম কবিযা বলিল, মা, অসুখ শবীবে তুমি উঠে এলে কেন?

তারা প্রণাম কবিযা বলিল, টেলিগ্রামে অসুখেব কথা লেখেননি, কি অসুখ হযেছে মাসীমা?

সকলেব শেষে শেখর প্রণাম করিল। বলিল, আপনার অসুখের কথা তো কিছু লেখেন নি বাঙা মাসীমা? জংশন স্টেশনে নেমে নান্টিদের সঙ্গে দেখা। নান্টি কেঁদে বলল মাকে বুঝি আর দেখতে পাব না। আমি অনেক আশ্বাস দিতে তবে তার কান্না থামে। তারপর দেখছি পঞ্চক্রোশীর মাটিতে পা দেয়া থেকে সে কেবল হাসছে।

রাধারাণী হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের গলার শব্দ কানে যেতে অসুখটা কমে গিয়েছে। ঘরে চলো।

তারার দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, বৌমা তোমাকে এখানে আসতে দিল তারু মা? নান্টি বলিল, বাবে, আমরা তো সোজা এখানে আসছি।

বৌমা কি জানে যে আমরা এসেছি? অবিশ্যি তারা আসতে চাইছিল না, শেখরদা অনেক বলাতে—

তারা বাধা দিয়া বলিল, সব বানিয়ে বলছে মাসীমা।

নান্টি বলিল, বানিয়ে বলছি বটে? জংশন স্টেশনে শেখরদাকে দেখে তুই মুখ ঘুরিয়ে সরে গিয়েছিলি না? বলেছিলি না—

তারা নান্টির কথা শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

রাধারাণী বলিলেন, শেখর, তোমার অসুখের কথা লিখেছিলে, কি অসুখ হয়েছিল বল?

শেখর—পেটের গোলমালে ভুগছিলাম! তার সঙ্গে অনিদ্রা। এত খারাপ লাগছিল যে কাজকর্ম ফেলে রেখে কলকাতা থেকে কয়েক দিন পালাবার জন্য মন অস্থির হয়েছিল।

রাধারাণী—মনের আর অপরাধ কি? মনের ওপর অনেক উৎপীড়ন হয়েছে, কত আর সহ্য করবে?

শেখর মুখ তুলিয়া রাধারাণীর দিকে চাহিল। কি অর্থে তিনি কথাটা বলিলেন বুঝিবার চেষ্টা করিল।

রাধারাণী বলিলেন, যাও, এবার সবাই হাত মুখ ধুয়ে নাও। খাবার তৈরী হতে বেশী সময় লাগবে না।

শেখর বলিল, আমি একবার শ্যামানাথের সঙ্গে দেখা করে আসি।

রাধারাণী—আমি কানাইকে পাঠাচ্ছি, তুমি সারাদিন তেতে পুড়ে এসেছ। কিছু মুখে দিয়ে বিশ্রাম কর।

খবর পাইয়া শ্যামানাথ ও সুনীতি আসিল। সুনীতি তারাকে লইয়া রাধারাণী যে ঘরে শয়ন করিতেন সে ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

দুই ভগ্নীর মধ্যে কি কথাবার্তা হইল কেহ জানে না। অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিবার সময়ে সুনীতি তারাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রাধারাণীকে একান্তে ডাকিয়া বলিল, তারাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি কাকীমা। এখানে ওর থাকা ভাল দেখায় না।

রাধারাণী তারার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, নান্টি যদি ছাড়ে নিয়ে যাও। এখানে এসে উঠতে ওর কিন্তু বাধেনি।

সুনীতি বলিল, আপনাকে দেখতে এসেছিল এ বাড়ীতে।

রাধারাণী বলিলেন, তা ঠিক।

নাণ্টিকে জানাইলে সে বাধা দিল না। তারা চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে রাধারাণী শেখরকে সে কথা জানাইলেন। বলিলেন, তুমি বললে তারা হয়ত থাকত এখানে।

কথাটা শুনিয়া শেখর লজ্জিত হইল। বলিল, আমার বলা উচিত ছিল, সাহস পাইনি। তারা এখানে সহজ হতে পারছিল না। আপনি যদি বলেন কাল গিয়ে অনুরোধ করব। তবে মনে হয় শ্যামানাথ ও তার স্ত্রী রাজি হবেন না। মনে হল ওঁরা তারার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন এখানে আসবার জন্য।

রাধারাণী বলিলেন, তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এখন শুতে যাও, কাল কথা হবে।

শেখর সত্যই ক্লান্ত হয়েছিল। সে নিজের শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে শ্যামানাথ লোক পাঠাইল রাধারাণী ও শেখরকে ডাকিবার জন্য। রায় বাহাদুর হেমাঙ্গনাথ মৃত্যু শয্যায়।

দুই দিন পরে শেষ রাত্রের দিকে হেমাঙ্গনাথের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সকাল হইতে বহু লোক আসিতে লাগিল তাঁহার গৃহে। একটু বেলা হইতে পঞ্চক্রোশীর নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু মাতব্বর প্রজা, বহু নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ আসিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কালিন্দীকে দেখিয়া শেখর বিস্মিত হইল। কালিন্দীর অনুচরবৃন্দের মধ্যে কয়েকজনকে চোখের জল মুছিতে দেখিয়া সে আরও বিস্মিত হইল। দুর্দান্ত জমিদার, সারা জীবন যাহাদের উপর উৎপীড়ন করিয়াছেন, মৃত্যুকালে তাঁহাদের হৃদয় জয় করিলেন কেমন করিয়া সে ভাবিয়া পাইল না। সে হেমাঙ্গনাথের মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। রোগ ভোগ করিয়া তাঁহার বিরাট দেহ শীর্ণ হইয়াছিল, উজ্জ্বল বর্ণ মলিন হইয়াছিল, কিন্তু তীক্ষ্ণ নাসিকায়, প্রশস্ত ললাটে, দীর্ঘ ভ্রূ যুগলে এখনও যেন তাঁহার স্বভাবসুলভ দাম্ভিকতার রেশ রহিয়াছে।

শেখর ভাবিল অত্যাচারী, দাম্ভিক হেমাঙ্গনাথের মৃত্যুতে তাঁহার শত্রুরাও শোক প্রকাশ করিতেছে, এ যেন এক দিকপালের পতন, এ যেন পুরাকালের কোন কাহিনী, আধুনিক যুগের ও নবীন সমাজের আদর্শের সঙ্গে ইহার কোন সঙ্গতি নাই।

সমারোহে শ্রাদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। শ্যামানাথ ও রাধারাণী ব্যস্ত। সকালে রাধারাণী আসিয়া শেখরের আহারাদি ব্যবস্থার তদ্বির করিয়া যান।

শেখরকে বেশীর ভাগ সময় একা কাটাইতে হয়। মাঝে মাঝে সে বাহির হইয়া পড়ে। লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। দয়াল বাবার আবির্ভাবের কাহিনী তাহার কানে আসিয়াছিল। হেমাঙ্গনাথের গৃহে কালিন্দীকে দেখিবার পরে তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য সে উৎসুক হইল। দীনদয়াল ঠাকুরের সঙ্গে যাহারা ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাদের মধ্যে শ্যামানাথের পরিবর্তন সে আগেই লক্ষ্য করিয়াছিল, রাধারাণীর পরিবর্তনও কিছুটা লক্ষ্য করিয়াছিল। সে ভাবিল কালিন্দীর কি পরিবর্তন হইল? দীনদয়ালের ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে সে তো একজন প্রধান ব্যক্তি ছিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে সে একদিন বেতাই চণ্ডীর থানের দিকে চলিল। দেখিল যেখানে দীনদয়ালের আশ্রম ছিল সেই জায়গায় পাকা মন্দির উঠিতেছে, পাশের এক টিনের মণ্ডপে বেদীর উপরে দীনদয়ালের চিত্র ও এক জোড়া খড়ম রক্ষিত। জিজ্ঞাসা করিয়া সে শুনিল এই চিত্র ও খড়মের নিয়মিত পূজা, আরতি হয়। প্রতিদিন বিকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দয়াল বাবার নাম গান, লীলা কীর্তন হয়। কালিন্দীকে সে দেখিতে পাইল না।

চারদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া সে যখন ফিরিতেছে তখন দেখিল কালিন্দী আসিতেছে।

সেদিন সে দূর হইতে কালিন্দীকে দেখিয়াছিল। আজ নিকট হইতে দেখিল এই তিন চার বৎসরের মধ্যে কালিন্দী হঠাৎ প্রৌঢ়া হইয়াছে, তাহার দীপ্ত যৌবনের রূপ ঝরিয়া পড়িয়াছে। চোখে মুখে যে নিবিড় একাগ্রতার ছাপ তাহার চেহারার বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাও গিয়াছে। এক নজরে জোর করিয়া নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত কিছু আর অবশিষ্ট নাই চেহারায়।

কালিন্দী তাহাকে অতিক্রম করিয়া কিছু দূর গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া আসিল। বলিল, দাদাবাবু না?

কালিন্দী আগে তাহাকে কখন শেখর বাবু, কখন শুধু বাবু বলিত, ঘনিষ্ঠতা প্রকাশের দাদাবাবু সম্বোধন কখনও তাহার মুখে শোনা যায় নাই।

আগাইয়া আসিয়া সে গলবস্ত্র হইয়া সে শেখরকে প্রণাম করিল। হাসিয়া বলিল, এদিকে কুথা আইছিল্যান? বাবার মন্দিরে? কতদিন দেখিনি আপনারে। কঁবে আইল্যান?

শেখর বলিল, এই ক' দিন হল এসেছি। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে, এখন সময় হবে তোমার?

কালিন্দী হাসিয়া বলিল, আপনার সাথে কথা কইব্যার সময় হবিনি কি যে কন দাদাবাবু। আইস্তান।

মণ্ডপের রোয়াকে বসিয়া উভয়ের আলাপ আরম্ভ হইল। দীনদয়াল ঠাকুরের জেলে মৃত্যু, দয়াল বাবার আবির্ভাব, তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রকাশ, তাঁহার পূজার প্রচার, আশ্রম হইতে পলায়নের পর হইতে কালিন্দীর নিজের কাহিনী ইত্যাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তার পরে শেখর বলিল, রায় বাহাদুরের মৃত্যুর দিন তাঁর বাড়ীতে তোমাকে দেখলাম। রায় বাহাদুর তোমাদের অনিষ্ট করেছেন যতদিন বেঁচে ছিলেন ! তোমরা সব ভুলে গিয়েছ বুঝি ?

প্রশ্ন শুনিয়া কালিন্দী মাথা নত করিয়া কি ভাবিল কিছুক্ষণ। সে যখন মুখ উঠাইল শেখর দেখিল তাহার মুখের চেহারা অন্য রকম হইয়াছে। ভাবাবিষ্ট ভক্তের গভীর আন্তরিকতার সুর বাজিয়া উঠিল তাহার স্বরে।

কালিন্দী যাহা বলিল তাহার মর্ম এইরূপ : পরম দয়ালু বাবার কৃপায় সব সম্ভব হয় দাদাবাবু। দস্যু রত্নাকর তাঁহার কৃপায় পরম ভক্ত হইয়াছিলেন, পাপিষ্ঠ জগাই মাধাই তাঁহার কৃপায় সাধু হইয়াছিলেন। দুর্দান্ত জমিদার রায় বাহাদুরের পরিবর্তন হইয়াছিল। তিনি সাধু দীনদয়াল ঠাকুরকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার আশ্রম পোড়াইয়া দিলেন, জেলে পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রাণে মারিলেন। তারপর কি হইল ? দীনদয়াল ঠাকুর মরিয়া আবার দেখা দিলেন দয়ালবাবা রূপে। দেবতা দয়ালবাবাকে বাবুরা ভক্তিভরে মানিয়া লইলেন। বাগ্‌দী সাধুকে যাঁহারা ধ্বংস করিয়াছিলেন বাগ্‌দী দেবতাকে আজ তাঁহারা পূজা করিতেছেন। দয়াল বাবার মন্দিরে উচ্চ নীচ ভেদ নাই, জাতি অজাতি বিচার নাই, সকলে সমান সে মন্দিরে।

কথা শেষ করিয়া কালিন্দী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া শেখরের দিকে চাহিয়া বলিল, দাদাবাবু দয়ালবাবার মন্দির বানাবার জন্যি রায়বাহাদুর আশ্রমের জমি ছাইড়্যা দিছেন, টাকা দিছেন। রায় বাহাদুর দয়ালবাবার বড় ভক্ত হইছিল্যান। আগের কথা আমরা ভুল্যা গিছি। যাব না ক্যান ? মানুষের মন কি চিরদিন এক রকম থাকে ? দোষে- গুণে ওনার মত অত বড় মানুষ পথেঘাটে কয়ডা দেখতি পান দাদাবাবু ?

কালিন্দীর কথা শুনিয়া তাহার অনুপস্থিতকালে পঞ্চক্রোশীর সমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল শেখর তাহার স্পষ্ট আভাস পাইল। তাহার মনে পড়িল কালিন্দীকে একসময়ে সে ফায়ার-ঈটিং গরগন ও জোন অব আর্কের সঙ্গে তুলনা

করিয়াছিল। তাহার তখনকার চলিবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত ক্রুদ্ধা বাঘিনীর কথা মনে করাইয়া দিত। গণবিপ্লবের নায়িকা আজ হইয়াছে নূতন ভক্তিধর্মের প্রচারিকা।

কালিন্দী বোধহয় শেখরের মনের কথা কিছু অনুমান করিতে পারিল। সে বলিল, কি ভাবতেছেন দাদাবাবু? জমিদাব, প্রজা, বামুন, বাগ্‌দী সকলকে আমরা এক ঠাঁয় আনতি চাইছ্যালাম না? কন দেখি তা আনছি কি না? কায়দা পাল্টাইছি বটেক।

কালিন্দীব কথা শুনিযা শেখব সচকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। মনে হইল ক্ষীণ হাসিব বেখা কালিন্দীব ওষ্ঠে মিলাইয়া গেল। সে ভাবিল কালিন্দীব তাহা হইলে মাথা বিগডায় নাই। দয়ালবাবাব পূজাকে সে সজ্ঞানে নূতন ট্যাকটিকস হিসাবে ব্যবহাব করিতেছে?

বেলা হইয়াছিল। শেখর কালিন্দীর কাছে বিদায় লইয়া বলিল, তোমার সঙ্গে কথা বলে বড় ভাল লাগল কালিন্দী। আজ আসি, পারি তো যাবার আগে একদিন এসে তোমাব কথা শুনব।

কালিন্দী বলিল, আসব্যান দাদাবাবু। আপনি এখন কি করতেছেন শোনা হ'ল না।

শেখব হাসিয়া বলিল, কিছু করছি। তোমার কথায় বলছি কায়দা পাল্টাইছি বটেক।

শেখবের কথা শুনিয়া কালিন্দী হাসিতে লাগিল; প্রাণ খুলিযা হাসিতে লাগিল। শেখরের মনে হইল হাসিতে গিয়া কালিন্দী আগেব রূপের ভগ্নাংশ যেন ফিরিয়া পাইয়াছে। সে বলিল, আচ্ছা, আসি।

কালিন্দী বলিল, একটু খাড়ান।

গলবস্ত্র হইয়া সে শেখরকে প্রণাম করিল, তাহার পদধূলি লইয়া মাথায দিল। যতক্ষণ শেখরকে দেখা গেল সে নড়িল না। গাছের আড়ালে শেখব অদৃশ্য হইতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নিজেব কাজে গেল।

শেখর কালিন্দীর কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিল। কালিন্দীর কায়দা পাল্টাইছি বটেক কথাটি তাহাব বড ভাল লাগিয়াছিল। নিজের মনে সে বলিল সী ইজ দি ওনলি সেনসিবল পার্সন আই হেভ কাম এক্রস হিয়ার (এখানে সে একমাত্র কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি)।

শ্রাদ্ধের দিন শ্রাদ্ধের আসরে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেখর উঠিল। তাহার

শরীর খারাপ লাগিতেছিল। রাধারাণীকে বলিয়া বাড়ী চলিয়া যাইবে মনে করিয়া সে অন্দরে গেল। গ্রামের বহু বাড়ীর মেয়েরা আসিয়াছেন, সকলেই তাহার অপরিচিত। সে দেখিল মেয়েদের এই ভিড়ে রাধারাণীকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। নান্টির দেখা পাইলেও চলিত কিন্তু তাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সে ফিরিয়া আসিল।

শ্রাদ্ধের আসর হইতে সে বাহিরে যাইতেছে এমন সময় দেখিল নান্টি একখানা থালায় কি লইয়া অন্দর হইতে বাহির হইল। সে ফিরিয়া আসিয়া নান্টিকে ডাকিল।

নান্টি আসিতে বলিল, রাঙামামীকে বলো আমি বাড়ী যাচ্ছি, শরীরটা খারাপ লাগছে। নান্টি বলিল, সে কি কথা? আপনার এখানে খাবার কথা। মা আপনার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেছেন।

শেখব বলিল, নিমন্ত্রণ খাওয়া বরাতে নেই নান্টি। আমি চললাম, তুমি রাঙামামীকে ব'লো।

নান্টি আপত্তি জানাইয়া কি বলিতে গেল, শেখর আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিল।

পথে চলিতে চলিতে শেখর ভাবিতেছিল দুই তিন দিন পরে সে পঞ্চক্রোশী হইতে পলাইবে। কালকাতায় অনেক কাজ জমিয়া রহিয়াছে তাহার জন্য। আর ভাল লাগিতেছে না এখানে। পঞ্চক্রোশীর সঙ্গে তাহার মিলনের সূত্র ছিন্ন হইয়াছে। যাহাদের সে জানিত, ভালবাসিত, তাহারা প্রত্যেকে এখন আলাদা পথের পথিক, পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়া এখন আর মনের বন্ধন নাই পরস্পরের মধ্যে। শ্যামানাথের সঙ্গে সেদিন তর্ক লাগিয়াছিল কম্যুনিজম ও গান্ধীবাদ লইয়া।

শ্যামানাথ বলিল, নিজের অবস্থায় অসন্তোষ ও পরের প্রতি ঈর্ষা হচ্ছে কম্যুনিজমের ভিত্তি। স্পিরিচুয়াল সেলফ-কণ্ট্রোলের দ্বারা অসন্তোষ দূর করতে হবে, শান্তিপ্রিয়তা ও ভ্রাতৃভাবের চর্চার দ্বারা ঈর্ষা দূর করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দ আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের দুই দিকপাল পুরুষ, তাঁরা এই কথাই বলেছেন।

শেখর বলিয়াছিল, অহিংসা, শান্তিপূর্ণ উপায়, ভ্রাতৃভাবের চর্চা, এগুলো মহাত্মা গান্ধীর নিজের কথা নয়, সারা দুনিয়ার প্রগতিবিরোধী নেতারা এই সব কথা ব্যবহার করেছেন। এসব যৌবনের বাণী নয়, বার্দ্ধক্যের বাণী, ভীরুর

আত্মরক্ষার মন্ত্র। মহাত্মা ইংরাজকে ভয় দেখাবার জন্য দৈত্যকে ঘুম থেকে জাগিয়েছিলেন, কিন্তু জাগ্রত দৈত্যকে সামনে দেখে তাঁর নিজের প্রাণ কেঁপে উঠল। He was scared out of his wits by the Frankenstein he had raised, and he wanted to kill it. দৈত্য মরল না। ছদ্মবেশে সে আবার এগিয়ে আসছে।

শ্যামানাথ বলিল, তার মানে?

শেখর বলিল, তার মানে বোলশেভিক ষড়যন্ত্রের মামলার বিবরণীতে পাবে, কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে পাবে।

শ্যামানাথ গম্ভীর হইয়া গেল, আর কোন কথা বলিল না।

শেখর ভাবিল হাঁ, শ্যামনাথ পোলিটিকসে পুরাদস্তুর রিএকশনারী হইয়াছে, ধর্মে হইয়াছে দয়ালপন্থী, তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া সুখ নাই। কালিন্দীর কাছে যা ট্যাকটিকস শ্যামানাথের কাছে তাহা ক্লীভ। রাঙামামীমা প্রখর বুদ্ধিমতী হইয়াও মহানন্দ আশ্রমের কর্ত্রী, গ্রামসেবা লইয়া মাতিয়াছেন। নাণ্টি ছিল হাসিখুশিভরা, সদ্য ফোটা ফুলের মত চমৎকার মেয়ে, সে হইয়াছে অতি গম্ভীর। আর সন্ধ্যাতারা? আগেকার তারা আর নাই। তারা এখন তাকে উপেক্ষা

হ'ল করে। তাহার হাসি পাইল এই ভাবিয়া যে পঞ্চক্রোশীতে সে ছুটিয়া আসিয়াছে

শেখগ্রামের আশায়, জীবনের দুঃসহ একাকীত্ব—

পান্টাইছি হঠাৎ মেয়েলী গলার হাসির শব্দে সে চমকিয়া সম্মুখে চাহিল।

শেখরের একজন মহিলা ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। বোধহয়

লাগিল। ডীতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় চলিয়াছেন। পথের একপাশে সরিয়া সে তাঁহাদের

যেন ফিরিয়ার পথ দিল। মহিলারা মাথায় কাপড় টানিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া

কালিন্দন। শেখর আবার অগ্রসর হইল। কিছুদূর যাইতে তাহার নাকে একটা

গলবদ্ধ গন্ধ আসিতে সে পথের মধ্যে থমকিয়া দাঁড়াইল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল কোথায় হইতে গন্ধ আসিতেছে। পথের ডানদিকে রাংচিতার বেড়ার ওধারে একটা গোলকচাঁপার গাছ তাহার চোখে পড়িল। আরও চোখে পড়িল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া একটি অল্প বয়স্কা বধূ মাথার কাপড় সরাইয়া সকৌতুহলে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। চোখে চোখ মিলিতে বধূটি মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। শেখর দেখিল একটি ছোট মেয়ে অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে। গোলকচাঁপা গাছের নীচে নীল শাড়ি পরা কিশোরী বধূটিকে দেখিয়া শেখরের ভাল লাগিল। হঠাৎ তাহার

কি মনে হইল, ছোট মেয়েটিকে ডাকিয়া বলিল, আমায় দু'টি গোলকচাঁপা ফুল দেবে খুকী ?

তাহার কথা শুনিয়া বধূটি ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে চকিতে একবার চাহিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। খুকী সাড়া দিল না।

শেখর চলিতে লাগিল। একটু আগে তাহার বাড়ীতে যাইবার পথ বাঁ হাতে বাঁকিয়াছে। সে মোড়ে পৌঁছিয়াছে পিছন হইতে কে ডাকিল, একটু দাঁড়ান না।

পিছন ফিরিয়া শেখর দেখিল ছোট একটি মেয়ে দৌড়াইতেছে। সে দাঁড়াইল।

মেয়েটি কাছে আসিয়া আঁচল হইতে এক মুঠা গোলকচাঁপা ফুল লইয়া তাহার দিকে হাত বাড়াইল। বলিল, আপনি যে ফুল না নিয়ে পালাচ্ছিলেন বড়, নিন।

শেখর চিনিল এই মেয়েটির কাছে সে ফুল চাইয়াছিল। সে বলিল, ফুল দেবার জন্য তুমি এমন করে দৌড়োচ্ছিলে ?

মেয়েটি বলিল, বারে. আপনি চাইলেন যে। বৌদি আমাকে ফুল দিয়ে বলল শেখরবাবুকে এই ফুলগুলো দিয়ে আয় লক্ষ্মীটি, উনি ফুল ভালবাসেন।

শেখর বলিল, আমার নাম তোমার বৌদি জানেন ? তুমি চেন আমাকে ?

মেয়েটি বলিল, খুব চিনি। আপনার বাড়ী থেকে কত গোলাপ ফুল এনেছি।

তখনই সংশোধন করিয়া বলিল, না বলে চুরি করিনি, কানাইকে, বলে নিয়েছি। নিন আপনার ফুল।

শেখর—এস না আমার বাড়ীতে, তোমাকে গোলাপ ফুল দেব।

মেয়েটি—আপনার গোলাপ গাছ তো সব মরে গেছে, খালি বড় একটা গাছ আছে। হল্‌দে হল্‌দে ফুল হয়। কি একটা নাম ওর কানাই বলেছিল, ভুলে গেছি।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া সে আবার বলিল, আপনি বাড়ী থাকেন না তাই তো গাছ সব মরে গেছে। কানাই গাছে জল দেয় না। জল না দিলে কি গাছ বাঁচে ?

শেখর—এসো না আমার বাড়ী খুকী।

মেয়েটি—আমরা বড় তরফে নেমন্তন্নে যাব এখন। কাল আপনার বাড়ীতে যাব। আপনার বাড়ীতে কেউ থাকে না কেন ?

শেখর—আমার কেউ নেই যে। তাই একা থাকি।

মেয়েটি তাহার কেহ না থাকিবার জন্ম একা থাকিবার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল—ও, তাই একা থাকেন। আচ্ছা, কাল যাব।

ফুলগুলি শেখরের হাতে দিয়া সে চলিয়া গেল। কয়েক পা গিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, বৌদি কিন্তু যাবে না, সে বৌ মানুষ কিনা। আমার ভাই টুটু আর আমি যাব।

শেখর বলিল, আচ্ছা, তাই এসো।

মেয়েটি চলিয়া যাইতে শেখর হাতের ফুলগুলি নাকের কাছে লইয়া একবার শুঁকিল। মার্শাল নীলের পরে গোলকচাঁপার স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধ তাহার প্রিয়।

বাড়ী পৌঁছিয়া ফুলগুলি বারান্দায় বেতের টেবিলে রাখিয়া শেখর কানাইকে ডাকিয়া বলিল, আজ তো বাড়ীতে রান্নার পাট নেই, কেমন? তুই ঠাকুরকে নিয়ে বড় তরফের বাড়ী যা, সকাল সকাল ফিরবি। আমি বাড়ী থাকব।

কানাই বলিল, আপনার খাওয়া হয়েছে?

শেখর জানাইল তাহার শরীর খারাপ, সে কিছু খাইবে না।

কানাইয়ের দেওয়া শরবৎটুকু খাইয়া গায়ের জামা খুলিয়া শেখর আরাম চেয়ারখানি জানালার কাছে টানিয়া লইয়া বসিল। ঠাকুরকে লইয়া কানাই চলিয়া গেল।

মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়াছে, হাত পা একটু জ্বালা করিতেছে। বোধহয় জ্বর আসিবে। বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। শেখর উঠিয়া বাক্স হইতে সারিডনের শিশি বাহির করিয়া দুইটি বড়ি খাইল। তারপর বসিবার ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। গোলকচাঁপার ফুলগুলি সে তুলিয়া আনিয়াছিল। বালিশের পাশে সেগুলির স্থান হইল।

সারিডনের ক্রিয়ায় কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রার ভাব হইল শেখরের। তাহার মনে হইল একটা মিষ্টি গন্ধ আসিতেছে কোথা হইতে। কি কথা মনে হইতে তন্দ্রার ঘোর টুটিয়া গেল। হাঁ, এমনি স্নিগ্ধ, মিষ্টি গন্ধ একদা গভীর নিশীথে তাহাকে আকুল করিয়াছিল। কবেকার কথা সে! সে গন্ধ ছিল মার্শাল নীলের। মার্শাল নীলের কথায় মনে পড়িল সন্ধ্যাতারা তাহার কারাকাহিনী মার্শাল নীলের নামে উৎসর্গ করিয়াছে শুনিয়াছিল। সন্ধ্যাতারা এ বাড়ীতে আসে না। আসিলে জিজ্ঞাসা করিত। সে কি উত্তর দিত তাহার প্রশ্নের? দিত না শেখর জানে। ঐ ছোট মেয়েটি পর্যন্ত সহানুভূতি জানাইল সে একা

থাকে বলিয়া। আর সন্ধ্যাতারা? আজ দুই বৎসর পরে কেন সে পঞ্চক্রোশীতে ছুটিয়া আসিয়াছে, সব কাজকর্ম ফেলিয়া পড়িয়া রহিয়াছে এখানে, সন্ধ্যাতারা কি বোঝে না? একদিন দেহ ও মনের অসুস্থ অবস্থায় নিজের দুর্বলতায় লজ্জিত হইয়া সে পলাইয়াছিল। পলাতক আজ ধরা দিতে আসিয়াছে, কিন্তু—

নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে গিয়া তাহার বড় ক্লান্তি বোধ হইল, মাথার যন্ত্রণা আরও বাড়িয়া উঠিল। পিপাসা বোধ করিয়া এক গ্লাস জলের জন্য কানাইকে ডাকিল। ডাকিয়াই তাহার মনে পড়িল বাড়ীতে কেহ নাই। জলের জন্য আর উঠিতে ইচ্ছা হইল না। পাশ ফিরিয়া শুইয়া সে চোখ বুঁজিল।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল সে। প্রবল পিপাসা বোধ হওয়াতে তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেল। জল গড়াইয়া আনিবার জন্য বিছানায় উঠিয়া বসিতে গিয়া সম্মুখের দিকে চোখ পড়িতে সে চমকিয়া উঠিল। খাটের অদূরে মোড়া পাতিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া সন্ধ্যাতারা তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

শেখরকে অমন করিয়া চমকিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহার বোধহয় লজ্জা হইল। দাঁড়াইয়া বলিল, এমন সময়ে শুয়ে রয়েছেন? শরীর কি বেশী খারাপ হয়েছে?

তারপর কৈফিয়ৎ দিবার সুরে বলিল, মামীমা আপনার ঠাকুরের হাতে খাবার দিয়ে সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। খাবেন আসুন।

তাহার কৈফিয়ৎ শুনিয়া শেখর খাটের বাজুতে ঠেস দিয়া বলিল, তেষ্টা পেয়েছে। এক গ্লাস জল দেবে?

সন্ধ্যাতারা জল আনিল। জল খাইয়া শেখর বলিল, এই রৌদ্রে এতদূর আসতে তোমার কষ্ট হয়েছে। রাঙা মামীমা কেন পাঠালেন তোমাকে?

রাঙা মামীমা কেন ঠাকুরকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে এই রোদে এতদূর পাঠাইয়াছেন তারা কেমন করিয়া শেখরকে বলিবে? সে আসিতে চাহে নাই। মামীমা বলিয়াছিলেন ছিঃ তারা, বড় হয়েছ, এত অবুঝ কেন তুমি? জানো না কি জন্য শেখরকে চিঠি লিখে এনেছি তোমাকে টেলিগ্রাম করে এনেছি! জানো না কেন গোবিন্দপুর থেকে আমি নিজে ছুটে এসেছি? সুযোগ কি বারবার আসে মা? নিজের মনকে তৈরী করে নাও। শেখর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে এতদিনে। আর দেরি করো না, শেখর না খেয়ে রয়েছে।

তারা আসিবার সময় তাহার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া মামীমা বলিলেন, হাসি মুখে যা তারা। তোর যাত্রা সার্থক হোক।

এসব তো কাহাকেও বলিবার কথা নয়। তাই তারা শুধু বলিল, আপনি খাবেন না?

শেখর—এখন খেতে পারব না। মাথা ধরেছে, জ্বর আসবে মনে হচ্ছে। তুমি খেয়েছ? ঠাকুর খেয়েছে?

তারা—ঠাকুরের খাওয়া হয় নি, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

শেখরের ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হইল, বোধহয় মাথার যন্ত্রণায়। সে চোখ বুজিয়া বলিল, তাহলে যাও। কানাইকে একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো। অনেকক্ষণ তেষ্টা পেয়েছিল, ওরা কেউ বাড়ী ছিল না বলে—

কথা শেষ না করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ। তারপর বলিল, আচ্ছা যাও। আর দেরি করো না। বড্ড রোদ—

তারা অতি মৃদুস্বরে কি বলিল, শেখর বুঝিতে পারিল না। বলিল, কিছু বলছ?

তারা খাটের কাছে সরিয়া আসিল। বলিল, যাচ্ছি, আপনাকে তাড়াতে হবে না! অমন করে চোখ বুজে রয়েছেন কেন? এ দিকে চাইতে ইচ্ছে হচ্ছে না?

মাথার যন্ত্রণা ভুলিয়া শেখর বিস্মিতভাবে তারার দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি কি বললে বুঝতে পারলাম না তারা।

তারা নিজের ঠোঁট কামড়াইল। বলিল, অসুখে দেখবার কেউ নেই। এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেবার কেউ নেই ঘরে। এভাবে থাকতে ভাল লাগে আপনার?

শেখর হাসিল। বলিল, ছেলেবেলায় আমার মা মারা গেছেন। তারপর থেকে এভাবেই তো রয়েছি। ভাল মন্দ লাগার কথা মনে হয়নি, অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তুমি হঠাৎ এ কথা জানতে চাইছ কেন?

তারা কোন উত্তর দিল না। শেখর আবার শুইয়া পড়িল। বলিল, তোমার খাওয়া হয়নি, ঠাকুরকে নিয়ে যাও।

তারা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দেহ ঈষৎ কাঁপিতেছিল। প্রবল মানসিক উচ্ছ্বাস দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিল সে। একটু পরে খাটের একেবারে পাশে গিয়া দাঁড়াইল সে। ধীরভাবে বলিল, যাচ্ছি। একটা কথা জানতে চাইছি। আমাকে বিদায় করতে পারলে আপনি বেঁচে যান, কেমন?

শেখর কপালের পাশের দুই রগ চাপিয়া ধরিল এক হাতে। তারার দিকে না ফিরিয়া বলিল, আমি বড্ড ক্লান্ত, কিছু ভাবতে পারছি না।

তারা তখনও কাঁপিতেছিল। যেন মরিয়া হইয়া গলার স্বর একটু চড়াইয়া সে বলিল, আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।

শেখর মৃদুস্বরে বলিল, কি তোমার প্রশ্ন?

তারা আবার নিজের ঠোঁট কামড়াইল। বলিল, শুনতে পান নি? আমাকে বিদায় করতে পারলে আপনি বাঁচেন, নয় কি?

শেখর আরও মৃদুস্বরে বলিল, কেমন করে এমন প্রশ্ন করতে পারলে তারা? তোমাকে বিদায় করে বেঁচে যাবার জন্য কি কলকাতা থেকে ছুটে এসেছি? জানো না কেন কাজ কর্ম ফেলে রেখে এখানে এমন করে—

কথা শেষ না করিয়া সে চুপ করিয়া গেল।

তারা এত কাঁপিতেছিল যে তাহার মনে হইল সে বুঝি পড়িয়া যাইবে। তবু শেষ পর্যন্ত শুনিবে সে, শেষ পর্যন্ত না শুনিয়া ছাড়িবে না।

সে বলিল, কেন?

নিজের মন বুঝতে না পেরে যে অপরাধ করেছিলাম তোমার কাছে তার জন্য এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না আমাকে?

শেখর উঠিয়া বসিল। বলিল, আরও শুনতে চাও? কি উত্তর পেলে তোমার মন থেকে সব সন্দেহ যাবে বলো।

শেখর দেখিতে পায় নাই তারার দেহ উত্তেজনায় কাঁপিতেছিল এতক্ষণ। সে দেখিতে পাইল না তাহার শেষ উত্তর শুনিয়া তাহার উত্তেজনা হঠাৎ শান্ত হইয়া গেল। একটুখানি সময় সে স্থির হইয়া শেখরের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর তাহার দুই চোখ খুশি ও কৌতুকের হাসি ঝিলিক দিয়া মিলাইয়া গেল। বলিল, বলছি।

শেখরের কপালের উপরে নিজের হাত রাখিল। বলিল, আপনি শোন। একটু সরে শোন, বসবার জায়গা নেই এ পাশে।

শেখর সরিয়া গেল। খাটে বসিয়া নীরবে তারা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

শেখর মৃদুস্বরে বলিল, বড় আরাম লাগছে। কিন্তু তোমার যে খাওয়া হয় নি।

তারা বলিল, সে ব্যবস্থা আছে। মাসীমা দু'জনের খাবার দিয়েছেন। ঠাকুর যাক, ওর খাওয়া হয় নি।

শেখর মাথা একটু তুলিয়া তারার মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিল। বলিল, 'তুমি একা থাকবে ?

মৃদু হাসিয়া তারা বলিল, আপনার বুঝি লজ্জা করবে ? আমি স্বয়ম্বরা কিনা, আমার লজ্জা নাই। আর একাই বা থাকছি কই, ঐ দেখুন দোরের ওপাশে বসে শাদা বেড়ালটা সব দিকে চোখ রাখছে।

নিজের এই রসিকতায় তারা চাপা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

শেখর তারার হাসিতে যোগ দিল না, শুধু বলিল, তা'হলে ঠাকুর যাক। তারপর তারার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া পরম নিশ্চিন্ততায় সে আবার চোখ বুজিল।

কিছুক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিল, আমাকে ক্ষমা করো, তারা।

মিষ্ট হাসিতে তারার মুখখানি অপরূপ দেখাইল। নত হইয়া শেখরের কানের কাছে মুখ লইয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, করেছি তো। এখনও কি বুঝতে পারছ না ?

তিন

কলিকাতা (১৯২৪-২৫)

হরিশঙ্করের গৃহে রুদ্ধদ্বার কক্ষে স্বরাজদলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। আলোচনার মধ্যে উত্তেজনা ও উল্লাসের ভাব স্পষ্ট। এই উত্তেজনা ও উল্লাসের উপলক্ষ্য রসা রোডের রুদ্ধদ্বার কক্ষে যে আলোচনা চলিতেছিল মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে।

ক্ষিতীশ বসু বলিলেন, জেল থেকে বেরিয়ে এসে মহাত্মাজী স্বরাজদলের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করলেন যারা স্কুল, কলেজ, কোর্ট ও কাউন্সিল বয়কট সমর্থন করে না কংগ্রেস একজিকিউটিভ থেকে তাদের পদত্যাগ করতে হবে। কংগ্রেসে আমাদের পার্টির ষ্ট্রেংথ সম্বন্ধে তখনও তিনি ওয়াকিবহাল হতে পারেন নি, ভাবলেন এই ফতোয়াতে আমরা ঘাবড়ে যাব। তারপর অবস্থা খানিকটা বুঝতে পেরে তিনি সুর পাল্টালেন, বললেন—"If the Swarajists desired to hold the Congress executive for themselves he would leave them to do so and form a party outside the Congress to work his programme." (যদি স্বরাজদল কংগ্রেসের প্রশাসনিক অধিকার আপনাদের দখলে রাখিতে চাহেন তিনি তাহাতে রাজি হইবেন এবং নিজের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য কংগ্রেসের বাহিরে একটি দল গঠন করিবেন।) কিন্তু কংগ্রেস ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায় ?

হরিচরণবাবু বলিলেন, যায় না। তাই ধাপে ধাপে এগিয়ে আসতে হচ্ছে। আমেদাবাদে যে আপোষ হল তাতে নো-চেঞ্জার দল অসন্তুষ্ট হলেন। আমাদের নো-চেঞ্জার দলের নেতা নিমাই শাস্ত্রী তো মহাত্মাজীকে গালাগালি করতে সুরু করলেন।

বিষ্ণুবাবু বলিলেন, এ হয়েছে ভাল মশাই। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বন্ধ করবার জন্য মহাত্মা ফাষ্টিং করলেন। মুসলমানরা বলতে আরম্ভ করলেন গান্ধী হিন্দু নেতা। এ. আই. সি. সি-কে দিয়ে গোপীনাথ সাহা রেজোল্যুশন কনডেম করালেন, টেরোরিষ্টরা অসন্তুষ্ট হয়ে "সোল ফোর্স" নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ

করতে সুরু করল। স্বরাজদলের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করলেন নো-চেঞ্জারদের খুশী করবার জন্য। নো-চেঞ্জাররা তাঁকে প্রো-স্বরাজিষ্ট বলে গাল দিচ্ছে। ভদ্রলোক যাবেন কোন পথে ?

ক্ষিতীশবাবু বলিলেন, একমাত্র পথ স্বরাজদলের সঙ্গে হাত মেলানো। দেশের সব প্রোগ্রেসিভ এলিমেণ্টস আমাদের পক্ষে।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর হরিশঙ্কর বলিলেন, আমার একবার রসা রোডে যাবাব কথা আছে, আজ ওঠা যাক। দাশ-গান্ধী আলোচনার ফলাফল বোঝাই যাচ্ছে, তবু কাল একবার সবাই সন্ধ্যার পর আসবেন। বলাই ওঠো, আমার সঙ্গে যাবে। যাবার আগে মুকুল হককে খবর পাঠাও কাল যেন সে সন্ধ্যার পরে একবার আসে।

বিষ্ণুবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, দাশ সাহেব মহাত্মাজীকে সুভাষের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করতে রাজি করেছেন, সত্যি নাকি ?

হরিশঙ্কর বলিলেন, ঠিক বলতে পারছিনে, তবে শুনেছি টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় তিনি উপস্থিত থাকবেন।

সকলে বিদায় লইলে বলাইকে লইয়া হরিশঙ্কর রসা রোডে রওনা হইলেন।

দুই দিন পরে গান্ধী-দাশ প্যাক্টের খবর প্রচারিত হইল। এংলো ইণ্ডিয়ান কাগজ ও নো-চেঞ্জার দল এই প্যাক্টে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। উভয়েই ঘোষণা করিল Gandhi has capitulated to the Swarajists. এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজের অসন্তোষের অন্যবিধ কারণও ছিল। সেই কারণ গোপন রহিল না। "Mr. Gandhis' captors have exhibited him in triumph in the Town Hall and he has been induced to declare that the arrest of Mr. Das's lieutenant is just as detestable to him as any anarchist activity. Only four months ago the apostle of non-cooperation was trying to oust the Swarajists from the Congress. This hypocritical compromi·e has been effected in the name of unity." (মিঃ গান্ধী যাহাদের হাতে বন্দী তাহারা বিজয়োল্লাসে তাঁহাকে টাউনহলে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাকে দিয়া ঘোষণা করাইয়াছেন যে মিঃ দাশের সহযোগীকে গ্রেপ্তার তাঁহার কাছে যে কোন এনার্কিষ্ট কার্যকলাপের মত ঘৃণার্হ। মাত্র চার মাসে

ত্যাগে অসহযোগের ঋষি স্বরাজিষ্টদিগকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐক্যের নামে এই কপট আপোষ করা হইয়াছে।

স্বরাজ পার্টির নেতা ও কর্মীরা সদলে বেলগাঁও কংগ্রেসে যাইবার তোড়জোড় করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত নিমাই শাস্ত্রী তাঁহার নো-চেঞ্জার দল লইয়া সমস্যায় পড়িলেন। বেলগাঁও কংগ্রেসে যাইতে হইবে কিন্তু পাথেয়ের সমস্যা গুরুতর হইয়া দেখা দিল। তিনি জানিতেন এককড়িবাবুর সঙ্গে বলাই সরকারের এখন খুব সদ্ভাব চলিতেছে; বালাচাঁদের সঙ্গেও তাঁহার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। তাই তিনি এককড়িবাবুর গৃহে গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন যে ভাবেই হউক সদলে বেলগাঁও যাইবার খরচটা সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য।

এককড়ি বাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, বেলগাঁও কংগ্রেসে কি করতে যাবে শাস্ত্রী? যে পুচ্ছ ধরে বৈতরণী পার হবে ভেবেছিলে সেই পুচ্ছ তো হাত থেকে ফসকে গেল। গান্ধীজী এখন দাশ সাহেবের মুষ্টিধৃত।

নিমাই শাস্ত্রী বলিলেন, ব্যক্তির চেয়ে আদর্শ বড়। গান্ধীজী স্বরাজদলের হাতে কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছেন। স্বরাজীরা আদর্শচ্যুত, নিষ্ঠাহীন, সুবিধাবাদী। সার্ভেণ্ট কাগজ অতি সত্য কথা লিখেছে—"মহাত্মাজীর আত্মসমর্পণের ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলন পাশ্চাত্যদেশের যে সকল চিন্তানায়ক এই আন্দোলনকে পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করিতেন তাঁহাদের সমর্থন হারাইবে।

এককড়ি বাবু ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া বলিলেন, শাস্ত্রী, আমাদের জাতীয় আন্দোলন কি যাত্রাভিনয়? পশ্চিমাদের হাততালি পাবার জন্য কি এই অভিনয় করছি আমরা? কথায় কথায় ইষ্টার্ণ কালচারের দোহাই দিে না শাস্ত্রী, একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, আর ভাল লাগে না।

নিমাই শাস্ত্রী এককড়ি বাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া নীরবে মাথা নাড়িলেন। তারপর বলিলেন, কি ব্যাপার এককড়ি? তুমি তো সারা জীবন খবরের কাগজ চালালে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে যেখানে আছে সবাইকে গালাগাল করে। আর সে গালাগালির মূল সূত্র হচ্ছে ইষ্টার্ণ কালচার বনাম ওয়েষ্টার্ণ কালচার। তুমিও কি স্বরাজদলের গোয়ালে—

এককড়ি বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, যাদের সাহস আছে, শক্তি আছে, আমি সব সময়ে তাদের পক্ষে। গান্ধীজীর নেতৃত্ব যখন সকলে মানতেন তখন আমি তাঁর পক্ষে ছিলাম। এখন গান্ধীজী স্বয়ং যাঁদের নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছেন আমি

তাঁদের দলে। গান্ধীজী নো-চেঞ্জারদের পোলিটিকেল অচ্ছুতের পর্যায়ে ফেলে দিয়েছেন। এখনও সে কথা বুঝতে পারছ না?

নিমাই শাস্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, তোমার ফিলোসফি চিরকাল সুবিধাবাদীর ফিলোসফি জানি। তবে তোমার—

এককড়ি বাবু আবার বাধা দিয়া বলিলেন, সুবিধাবাদীর ফিলোসফি নয়, ক্ষুধার্তের ফিলোসফি। তুমিও ক্ষুধার্ত শাস্ত্রী। তোমার রাজনৈতিক মতামতকে একটু নরম কর। বালাচাঁদ এতদিন গান্ধীজীকে ভগোয়ান রামজীর অওতার বলে এসেছে। এখন বলে নন-কো আমাদের ঝুটমুট বেয়াকুব বানাইছিলো। বয়কট আচ্ছা নেহি, বয়কটমে হিংসা হ্যায়। দাশ সাহেব একদম সাচ্চা বাত বোলেছেন। দাশ সাহেব অর্জুন হ্যায়, মহাবলী ভীমকো সহোদর অর্জুন।

নিমাই শাস্ত্রী ম্লানমুখে উঠিলেন। এককড়ি বাবু তাঁহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, শাস্ত্রী, তোমার হাঁড়ির খবর আমার অজানা নয়। হরিশঙ্করের সঙ্গে দেখা করে মিটমাট করে ফেল। নইলে শুকিয়ে মরতে হবে।

নিমাই শাস্ত্রী বলিলেন, তাই মরব তবু নেতৃত্ব হারাবার ভয়ে দাশ সাহেবের কাছে গান্ধীজীর এই আত্মসমর্পণ আমরা মেনে নেব না। আজ স্বরাজ পার্টির জলুসের কাছে দরিদ্র, একনিষ্ঠ, নো-চেঞ্জার কর্মীদের সব ত্যাগ, সব সাধনা ম্লান বলে মনে হচ্ছে; নবাবগঞ্জ, মালিকান্দা, মুড়াগাছা, আরামবাগ, চন্দননগর, আত্রাই, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুরে নো-চেঞ্জার কর্মীদের কাজ মহাত্মাজীর চোখে পড়ছে না। তাদের এভাবে ভাসিয়ে দিয়ে—

ভাবাবেগে নিমাই শাস্ত্রীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল। তাঁহার ময়লা খদ্দরের চাদরখানি কাঁধ হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। নত হইয়া চাদরখানি তুলিয়া লইয়া তিনি দরজা পর্যন্ত আসিয়া এককড়িবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, যেখান থেকে হোক টাকা সংগ্রহ করে বেলগাঁও কংগ্রেসে আমরা যাবই।

নিমাই শাস্ত্রী আবেগের সঙ্গে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন এককড়ি বাবু সেই কথা ভাবিতেছিলেন। কথাটা তাঁহার খুব মনে লাগিয়াছিল। তিনি নিমাই শাস্ত্রীর শেষ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

বেলগাঁও কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিলেন অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করা হইল। অসহযোগ আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে স্থগিত হইবার পরে স্বরাজ্যদলের প্রোগ্রাম ছাড়া দেশবাসীর সম্মুখে আর কোন প্রোগ্রাম রহিল না। কংগ্রেসে ও দেশে স্বরাজ্যদলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। বাংলায়

স্বরাজ পার্টি ও মুসলমান দলের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহা ফল প্রসব করিল। ৬৯-৬৩ ভোটে মন্ত্রীদের বেতনের দাবি অগ্রাহ্য হইল বাংলার আইন সভায়। বাংলায় ডায়ার্কির পতন হইল।

বলাই সরকার তাহার গৃহে স্বরাজ দলের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কর্মীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে মৌলভী নুরুল হক ছিলেন, সর্বেশ্বর ছিল। ডায়ার্কির পতন লইয়া এককড়ি বাবু মাইকেলী ছন্দে লিখিত বৃহৎ এক কবিতা তাঁহার কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এই গুপ্ত পরামর্শের আয়োজনের সংবাদ কোন সূত্রে পাইয়াছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন তাঁহার নিমন্ত্রণ হইবে। বাদ পড়াতে তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। কোন প্রয়োজনে বালাচাঁদজী তাঁহার অফিসে আসিলে এই গোপন নিমন্ত্রণের সংবাদ ফাঁস করিয়া বলিলেন, তোমাকে বাদ দেয়া বলাইয়ের উচিত হয়েছে কি? আমি না হয় গরীব লোক, কাজ ফুরিয়েছে তাই বলাই আমাকে ভুলেছে।

বালাচাঁদজী বলিলেন, বলাইবাবুর কুছ ধরম ভয় নেহী এককোড়ি বাবু। আপনি জানেন কি সলা পরামর্শ হোবে? কোই নয়া ফন্দি?

এককড়ি বাবু জানিতেন আফিস একসেপটেন্স বা মন্ত্রীর চাকুরী গ্রহণ সম্বন্ধে হরিশঙ্কর প্রভৃতি বড় বড় নেতাকে গোপন করিয়া বলাই, মৌলভী নুরুল হক ও আরও কয়েকজনকে লইয়া একটা দল গড়িবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বালাচাঁদজীর কাছে তিনি কিছু ভাঙ্গিলেন না।

বাস্তবিক মন্ত্রীপদ গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বলাই এই আয়োজন করিয়াছিল। মৌলভী নুরুল হক স্বরাজীদের সঙ্গে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহার পথ পরিষ্কার করিবার আশায়। বলাইয়ের গৃহে আসিয়া তিনি জানাইলেন হিন্দুদের সঙ্গে ভোট দেওয়াতে তাঁহার বড় দুর্নাম হইয়াছে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে। স্বরাজীরা যদি মন্ত্রীপদ লইতে সাহস না পায় তিনি নিজে নূতন দল গাড়বেন। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য লাট সাহেবের নিমন্ত্রণ পাইলে তিনি উপকারী হিন্দু বন্ধুদের মনে রাখিবেন, বলাইকে এ আশ্বাস দিতে ভুলিলেন না।

আলোচনা ও আহারের পর সকলে চলিয়া গেলেন, রহিল শুধু সর্বেশ্বর।

সর্বেশ্বরের ভগ্নী অনিমা হরিশঙ্করের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ ছাড়িয়া দিবার পরে পূর্বের স্কুল মাষ্টারী চাকুরিটি পাইবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু পাইল না। যে অস্থায়ী চাকুরী একটা জুটয়াছিল সেটিও শেষ হইয়াছিল। তারপর অনিমা অসুস্থ হইয়া পড়িল। চিকিৎসায় কিছু টাকা খরচ হইল।

সর্বেশ্বর ঋণগ্রস্ত হইল। সে রহিয়া গেল বলাইয়ের কাছে কিছু অর্থ সাহায্যের দরবার্ করিবার জন্য।

ধীরভাবে তাহার আবেদন শুনিয়া বলাই বলিল, সাহায্য করবার মত পয়সা এখন আর হাতে নাই। উন সত্তরটি ভোট হয়েছিল আমাদের পক্ষে। এর মধ্যে পঞ্চাশটি ভোট জোগাড় করতে কত খরচ হয়েছে শুনলে লোকে বিশ্বাস করবে না। মফস্বলের সভ্যদের রাজার হালে থাকবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, তাঁদের রুচিমত আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। লাট সাহেবের মত তাঁরা শুধু হুকুম চালিয়েছেন আমাদের ওপর। যে ব্যাটার বিড়ি কেনবার পয়সা নেই সেও "থ্রি কাষ্টল" সিগারেট চেয়েছে। কত রকমের নেশা, কত রকমের ফুর্তির শখ। থাক্ সে সব কথা। আপনার ভগ্নী হঠাৎ অমন সুখের চাকুরি না ছাড়লে অভাবে পড়তেন না। ব্যারিষ্টার সাহেবের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলতে বলুন ওঁকে। তাঁর দরাজ প্রাণ, আদায় করতে জানলে আপনার ভগ্নী যা ইচ্ছে তাঁর কাছে আদায় করতে পারেন। আর যদি সে চাকুরি করবার ইচ্ছে না থাকে আমি একবার ওঁকে যে অফার দিয়েছিলাম সেই অফার এখনও ওপন রয়েছে।

সর্বেশ্বর—অফার মানে আপনার পারসোনেল এসিষ্টান্টের চাকুরি? ঐ ধরণের চাকুরি সে করবে না বলেছে।

বলাই—অভাব থাকলে এত বাচবিচার করলে কি চলে? বেশ, অফিসে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ দিতে পারি যদি তিনি নিজে এসে বলেন। তিনি কি কাজ পারবেন বা পারবেন না আমাকে জেনে নিতে হবে। অবশ্য তাঁর পক্ষে বেশী ভারী কাজ না হয় আমি তা দেখব।

সর্বেশ্বর—আচ্ছা, আমি তাকে বলব। অনিমা বড একগুঁয়ে মেয়ে, সে রাজি হবে কিনা না জেনে আগে থেকে আপনাকে কিছু বলতে পারছিনে।

ইহার পর অন্য প্রসঙ্গ উঠিল।

সর্বেশ্বর বলিল, আমাকেও আপনার অফিসে একটা কাজ দিতে পারেন না স্যর? আপনাদের দলের কাজ আর বেশীদিন চালাতে পারব মনে হয় না।

বলাই—আপনার আবার কি হ'ল?

সর্বেশ্বর—না, এমন কিছু হয়নি। একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না স্যর। এই ক'বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছি গরীবের পক্ষে আদর্শ-বাদিতা অনেক অনিষ্টের কারণ। এতদিন ওকালতিতে লেগে থাকলে স্থিতি

হয়ে যেত। ওকালতি একবার ছেড়ে দিয়ে আবার তাতে ফিরে যেতে কেমন চক্ষুলজ্জা হ'ল। পেটের ধান্দায় কলকাতা এলাম। আপনি দয়া করে সাহায্য করলেন। এখানে যা দেখলাম, শুনলাম, করলাম, তাতে পলিটিক্সের উপর ঘেন্না ধরেছে। যদি পেট চালাবার মত অন্য কোন কাজ পাই—

বলাই হাসিয়া বলিল, ঘেন্না ধরবার মত কি দেখলেন? পলিটিক্স পলিটিক্স।

সর্বেশ্বর—আদর্শবাদীরা মানতে চান না যে পলিটিক্স স্যাংশনস এভ্রিথিং। সে কথা যাক। নন-কো গেল। স্বরাজদল গড়বার কথা হল। অবস্ট্রাকশন ফ্রম উইদিন, প্যারালিসিস অব এডমিনিস্ট্রেশন ইত্যাদি কত বড় বড় কথা শুনলাম। ডায়ার্কি গেল, দেশের লোক ভাবলেন স্বরাজীরা বাহাদুর বটে। এখন আবার অফিস একসেপ্টান্সের কথা শুনছি। দাশ সাহেব বার্কেনহেড সাহেবের কাছে চিঠি লিখেছেন সম্মানজনক কো-অপারেশনের প্রস্তাব করে। আপোষের জন্য রাউণ্ডটেবিল কনফারেন্সের কথা উঠেছে স্বরাজদলের পক্ষ থেকে। কোথায় গেল স্বাধীনতার দাবি, কোথায় গেল গভর্ণমেণ্টকে প্যারালাইজ করবার কথা? ঘুরে ফিরে আপনারা আবার কো-অপারেশনের দিকে চলেছেন। ১৯১৯ সনে রাউলাট এক্ট পাশ হবার আগে আন্দোলন যেখানে ছিল আবার সেখানে ফিরে গিয়েছে।

বলাই একটু হাসিয়া বলিল, সর্বেশ্বর বাবু, আপনি হচ্ছেন বাই প্রোফেশন একজন ভাড়াটে প্রচারক। পোলিটিক্সের ভেতরের কথা বুঝতে পারলে আপনি হতেন নেতা। কিন্তু প্রেস্টিজ বা টাকা না থাকলে নেতা হওয়া যায় না। এ দু'টোর একটিও আপনার নাই। কাজেই বাজে চিন্তাশক্তির খরচ না করে নিজের কাজ ফেথফুলি করা আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক। আপনি এ ধরণের বাজে চিন্তা করেন জানলে আজকের আলোচনার মধ্যে আপনাকে থাকতে দিতাম না। আপনার ওপর আমার যে বিশ্বাস আছে বেফাঁস কথা বলে সেটা নষ্ট করবেন না। ট্রাই টু বী এ রিয়ালিষ্ট।

সর্বেশ্বর মাথা নত করিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। তারপর বলিল, আপনার কথা বুঝলাম। আজ উঠি।

বলাই—আচ্ছা। ভাল কথা, টাকার অভাবে আপনার ভগ্নীর চিকিৎসার ত্রুটি যেন না হয়। তিনি সুস্থ হয়ে উঠে আমার প্রস্তাবের উত্তর দিলেও চলবে। আপনি টাকার কথা বলছিলেন, না? আপনাকে বলেছি অনেক খরচপত্র হয়ে গেল, হাতে বিশেষ কিছু নাই। তা হোক, কিছু নিয়ে যান।

ব্যারিষ্টার সাহেবের কাজ ছেড়ে দিলেও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব নাই, আপনার ভগ্নীকে একথাটা স্মরণ রাখতে বলবেন। এখন যা সামান্য কিছু দিতে পারি নিয়ে যান। আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।

সর্বেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, আজ থাক, এরপর দরকার হ'লে দেবেন।

বলাই একটু অবাক হইল। বলিল, এর পরে দরকার হলে মানে কি? দরকার তো আপনার আজই হয়েছে। দাঁড়ান, আমি টাকা আনছি।

হাতে কয়েকখানা নোট লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলাই দেখিল সর্বেশ্বর চলিয়া গিয়াছে। এই প্রত্যাখানের অপমানে ক্রোধে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে বলিল, সেন্টিমেণ্টাল ইডিয়ট!

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে স্থির করিল টাকাটা পৌছাইয়া দিবার জন্য তাহাকে একবার যাইতে হইবে সর্বেশ্বরের বাড়ীতে। যে ভাবেই হউক তাহার ভগ্নীকে চাকুরি লইতে রাজি করাইতে হইবে।

বেলগাঁও হইতে নিমাই শাস্ত্রী তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিলেন। হতাশায় ও মনের দুঃখে তিনি কয়েকদিন বাড়ীর বাহির হইলেন না। তারপর অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অভাবের সংসার। অসুখ গুরুতর হইয়া উঠিলে তবে চিকিৎসার কথা উঠিল। চিকিৎসার কথা উঠিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ কোথায়? সংবাদপত্রে আত্মত্যাগী, একনিষ্ঠ দেশসেবক নিমাই শাস্ত্রীর কঠিন অসুখের সংবাদ প্রকাশিত হইল। সত্বর নিরাময় হইয়া দেশের এই দুর্দিনে দেশমাতৃকার সেবায় যাহাতে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন সেজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইল, কিন্তু চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথাও হইতে আসিল না।

নিমাই শাস্ত্রী পলিটিক্সে নো-চেঞ্জার না হইলে, বেলগাঁও কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা ও স্বরাজদলকে আক্রমণ না করিলে পুরাতন রাজনৈতিক সহকর্মী হিসাবে অভাবের সময় তিনি হরিশঙ্করের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতেন না। বড়বাজারের নেতা কোটিপতি শেঠ বালাচাঁদ এক সময়ে নিমাই শাস্ত্রীর ভক্ত ছিলেন এবং নিমাই শাস্ত্রীকে আশ্রয় করিয়া তিনি বাংলার রাজনৈতিক মহলে পরিচিত হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক চক্রের আবর্তনে পণ্ডিতজীর প্রতিপত্তির সূর্য অস্তমিত দেখিয়া তিনি তাঁহার প্রাক্তন গুরুর সংস্রব বর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া শেঠজী এক থালা ফল পাঠাইয়া

কর্তব্য শেষ করিলেন। নিমাই শাস্ত্রীর সহপাঠী ও বন্ধু মৌলভী নুরুল হক তাঁহার নিকট টাকা ধার করিয়া ল পরীক্ষার ফি দিয়াছিলেন। ওকালতির প্রথমদিকে টানাটানি পড়িলে তিনি মাঝে মাঝে নিমাই শাস্ত্রীর নিকট টাকা ধার লইতেন। নামেই ধার, আসলে অর্থ সাহায্য। টাকা ধার লইলে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া মৌলভী সাহেবের স্বভাবে ছিল না। মৌলভী সাহেব উপকারী বন্ধুর গুরুতর অসুখের সংবাদে মন দিবার অবকাশ পাইলেন না, কারণ আইন সভায় স্বরাজদল ছাড়িয়া নূতন এক মুস্লিম দল গঠনের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। অবস্থা যখন সব দিক দিয়া হতাশাজনক, সাহায্য পৌঁছিল অপ্রত্যাশিত-ভাবে। কয়েকমাস রোগ ভোগ করিয়া নিমাই শাস্ত্রী ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

নিমাই শাস্ত্রীর সুস্থ হইবার সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হইবার পর গুণগ্রাহী বন্ধুরা ও নো-চেঞ্জার দলের ভক্তগণ যে গৃহকে সংক্রামক রোগের আশ্রয়ভূমি বলিয়া এতদিন বর্জন করিয়াছিলেন সেই গৃহে আবার একে একে উদয় হইলেন। ইঁহাদের একজনের সঙ্গে একদিন সর্বেশ্বর আসিল নিমাই শাস্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে।

স্বরাজদলের প্রচারকের আর প্রয়োজন ছিল না। তাহা ছাড়া অনিমার চলিয়া আসাতে হরিশঙ্কর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বলাইও নানা কারণে, প্রধানতঃ অনিমার তাহার অধীনে চাকুরি লইবার অনিচ্ছার ফলে, সর্বেশ্বরের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। সর্বেশ্বর চাকুরি রাখিতে পারিল না। ইতিমধ্যে অণিমা আবার একটি মেয়ে স্কুলে চাকুরি পাইয়াছিল। এই চাকুরিটি না পাইলে ভ্রাতা ও ভগ্নীকে অনাহারে মরিতে হইত। সর্বেশ্বর নানা স্থানে চাকুরির চেষ্টা করিতে লাগিল। স্বরাজ দলের রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল সে। তাই নো-চেঞ্জার দলের মধ্যে মনকে আকৃষ্ট করিবার মত কিছু আছে কিনা একবার খোঁজ লইয়া দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল তাহার।

নিমাই শাস্ত্রীর গৃহে প্রথম দিনের কথাবার্তা হইতে সে বুঝিল নো-চেঞ্জার দলের স্বরাজীদের প্রতি যতখানি বিদ্বেষ গান্ধীজীর প্রতি অসন্তোষ তাহা অপেক্ষা কম নয়। গান্ধীজী তাঁহার প্রচারিত আদর্শের একনিষ্ঠ সেবক নো-চেঞ্জার দলকে ভাসাইয়া দিয়া দাশ ও নেহেরুর সঙ্গে হাত মিলাইয়াছেন প্রকাশ্যে এই অভিযোগ করা হইল। নিমাই শাস্ত্রী বলিলেন, ধনীদের প্রতি গান্ধীজীর পক্ষপাতিত্ব এখন আর গোপন নাই। নো-চেঞ্জাররা বেশীর ভাগ

গরীব, তাই তিনি তাদের উপেক্ষা করে অর্থশালী স্বরাজ দলের হাতে কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছেন। গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে এরপর তিনি ঠেকে শিখবেন।

"স্পিনিং ফ্রানচাইজ" অর্থাৎ কংগ্রেসের সভ্য হইবার জন্য হাতে কাটা সূতা দাখিল করিবার যে বিধান ছিল গান্ধীজী তাহা উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিমাই শাস্ত্রী বলিলেন, স্পিনিং ফ্রানচাইজ রদ করা স্বরাজীদের দাবি। গান্ধীজী এই দাবি মানিয়া লইয়া কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে স্বরাজীদের হাতে তুলিয়া দিলেন।

একজন ভদ্রলোক বলিলেন, গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াবেন বোধ হয়।

অন্য একজন ভদ্রলোক বলিলেন, শোনা যাচ্ছে গান্ধীজী আলাদা একটা অরগানাইজেশন তৈরী করছেন নিজের অনুগত দলবল নিয়ে কংগ্রেসের বাহিরে কাজ করবার জন্য।

নিমাই শাস্ত্রী বলিলেন, অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশনের কথা বলছেন? তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের টাকাগুলো কংগ্রেসের হাত থেকে বের করবার চেষ্টা হচ্ছে এই এসোসিয়েশনের নাম করে। টাকাটা হাতে পেলেই স্বরাজ দলের দাবি গান্ধীজী মেনে নেবেন। দাশ সাহেবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে নাকি কথাবার্তা হয়েছে।

লর্ড বার্কেনহেডের সাম্প্রতিক বক্তৃতা লইয়া কথা উঠিল। সেণ্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটির ভোজে লর্ড বার্কেনহেড বলিয়াছিলেন, "The fundamental fact in the Indian situation is that we went to India centuries ago for compromising with the sharp edge of the sword the difference which would have submerged and destroyed Indian civilization." (ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে আসল কথা এই যে কয়েক শতাব্দী পূর্বে আমরা ভারতে গিয়াছিলাম, যে বিরোধের ফলে ভারতীয় সভ্যতা নিমজ্জিত ও ধ্বংস হইয়া যাইত তরবারির সাহায্যে সেই বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য।)

নিমাই শাস্ত্রী বলিলেন, দাশ সাহেব, সম্মানজনক কো-অপারেশনের ইঙ্গিত করেছিলেন, সেই ইঙ্গিতের এই জবাব। এদিকে রিফর্মস রিভিশন সম্বন্ধে মুডিম্যান কমিটির "মাইনরিটি রিপোর্ট অগ্রাহ্য করেছেন লর্ড সাহেব। কংগ্রেস হাতে পেয়ে স্বরাজদল কি করবেন এখন? They are at the end of the tether. (তাঁহারা খুঁটার দড়ির শেষ প্রান্তে পৌছিয়াছেন।)

আলোচনা চলিতেছিল। একজন ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, এইমাত্র খবর এল দার্জিলিংয়ের "ষ্টেপ এসাইড" ভবনে দাশ সাহেব হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

"দাশ সাহেব মারা গেছেন"—নিমাই শাস্ত্রী চিৎকার উঠিলেন।

ঘরে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই অভিভূতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সর্বেশ্বরও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংবাদ ঠিক কিনা জানিবার জন্য সে রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বাংলায় কংগ্রেস দলে নেতৃত্ব লইয়া যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল গান্ধীজীর হস্তক্ষেপে তাহা সাময়িক ভাবে চাপা পড়িল। গান্ধীজী চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার কাজে ব্রতী হইলেন। তাঁহার নেতৃত্বে পাটনায় এ আই. সি. সি.র অধিবেশনে স্পিনিং ফ্রানচাইজ রদ করা হইল। গান্ধীজী বলিলেন দেশবন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ও লর্ড বার্কেনহেডের পত্রের ফলে যে অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া তিনি এই কার্য করিলেন। লোকে বলিতে লাগিল গান্ধীজী এবার কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন। পাটনার অধিবেশনের কিছুদিন পরে অল-ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশনের জন্ম ঘোষণা করিলেন গান্ধীজী। নো-চেঞ্জার দল উৎফুল্ল হইয়া ভাবিলেন গান্ধীজী স্বরাজী কংগ্রেসের আওতা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহারা আর সকলের উপেক্ষিত হইয়া থাকিবেন না। কোন কোন কাগজ বলিল, "The surrender of Gandhi to the Swarajist is complete and has created a sensation and people fear that he will cut off all connection with the Congress and the political movement."

এদিকে কানপুর কংগ্রেসের অধিবেশনের আগেই স্বরাজদলে ভাঙ্গন আরম্ভ হইল "রেস্পনসিভ কো-অপারেশন" অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রশ্ন লইয়া। স্বরাজদলের মহারাষ্ট্রীয় শাখায় এই ভাঙ্গন আরম্ভ হইল প্রথমে। স্বরাজদলের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু মন্ত্রীত্বকামী অনুচরদলের নির্বন্ধাতিশয়ে বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। নো-চেঞ্জার দল 'স্বরাজিষ্ট মানসিকতার" এই পরিচয় প্রকট হওয়াতে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

বলাইকে লইয়া হরিশঙ্কর কানপুর কংগ্রেসে গিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইলে বলাই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, হরিশঙ্কর পুনায় গেলেন। পুনা ও নাগপুরের রেসপনসিভ কো-অপারেশনওয়ালাদের সঙ্গে

আলাপ আলোচনা করিয়া দিন পনের পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি দুইটি অপ্রীতিকর সংবাদ পাইলেন।

প্রথম অপ্রীতিকর সংবাদ তাঁহার বন্ধু মৌলভী নুরুল হক স্বরাজ পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া "নিউ মুস্লিম পার্টি" গঠন করিয়াছেন এবং ঘন ঘন বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতেছেন। গুজব তাঁহার মন্ত্রীপদে নিয়োগ নিশ্চিত।

দ্বিতীয় অপ্রীতিকর সংবাদ পাইলেন বলাই সর্বেশ্বরের বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগে আদালতে নালিশ করিয়াছে। মাবপিটের কারণ ও এই মোকদ্দমা লইয়া কাগজগুলিতে নানারকম মুখরোচক আলোচনা চলিতেছে, মুখ বন্ধ করিতে ওস্তাদ বলাই নাকি হালে পানি পাইতেছে না। একজন বন্ধু জানাইলেন এককড়ি বাবুব "ইয়েলো র‍্যাগ" হরিশঙ্করকেও ইহাব মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

হরিশঙ্কর বলাইয়ের এই কাণ্ডে বিরক্ত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন! এককড়িবাবুকে তাঁহার গৃহে একবার আসিবার জন্য ফোন করিতে গিয়া খবর পাইলেন বড়বাজারে ধর্মের ষাঁড়ের তাড়া খাইয়া দৌড়াইতে গিয়া তিনি পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার একখানি পা ভাঙ্গিয়াছে ও তিনি শয্যাশায়ী। সংবাদটি পাইয়া হরিশঙ্কর উদ্বিগ্নভাব প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মাথায় চোট্ লাগেনি তো? ভাল ডাক্তাব দিয়ে দেখাবেন।

সন্ধ্যার পরে বলাই আসিল। হবিশঙ্কর তখন খোশমেজাজে ছিলেন। বলাই ভাবিয়াছিল পুনার রেশপন্সিভিষ্ট দলের কাছে তিনি কতখানি সাহায্যের আশ্বাস পাইয়াছেন তাহা জানাইবার জন্য ব্যারিষ্টার সাহেব তাহাকে ডাকিয়াছেন। সে অতিমাত্র বিস্মিত হইল যখন আসন গ্রহণ করিবার পর হরিশঙ্কর প্রথমেই সর্বেশ্বরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার কথা তুলিয়া তাহাকে বকিতে আরম্ভ করিলেন।

তারপর বলিলেন, তুমি জানো না এ রকম মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লে ভবিষ্যতে তোমার অনারেবল মন্ত্রী হবার আশায় ছাই পড়বে? স্বরাজীষ্ট মিনিষ্টার্স মাষ্ট বী মেন অব ক্লিন রেপুটেশন। এই মোকদ্দমায় কত রকমের কথা উঠতে পারে জানো? সর্বেশ্বর দলে ছিল, অনেক কথা জানে। নিজের আখের মাটি করতে যদি না চাও মোকদ্দমা তুলে নাও। মোকদ্দমা তুলে নিয়ে

সর্বেশ্বরের সঙ্গে মিটিয়ে ফেল। দি নেকষ্ট ষ্টেপ উড বী টু ব্রিং ব্যাক হিজ সিষ্টার। কি ওর নাম যেন?

বলাই—অণিমা।

হরিশঙ্কর—ইয়েস, অণিমা। ওকে ফিরিয়ে আনো, ও যা পেত তার চাইতে বেশী মাইনে দিয়ে আমার কাজের জন্য রাখব। ফর হার সেক ওর ভাইয়ের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে রাজি আছি। লোকটি পড়াশোনা করে, ভাল বক্তৃতা করে, ওর একটি মাত্র বড় দোষ ও চিন্তা করে। দ্যাট ইজ এবসোল্যুটলি সুপারফ্লুয়াস। ইফ এভ্রি বডি বিগিনস টু থিঙ্ক হোয়াট আর দি লীডরস ফর?

বলাই মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিল। শেষে বলিল, মোকদ্দমা তুলে নিতে আমি প্রস্তুত আছি কিন্তু সর্বেশ্বরের ভগ্নীকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারব না।

হরিশঙ্কর—কেন? সর্বেশ্বরের ভগ্নী, কি যেন ওর নাম, ইজ এন ইণ্টারেষ্টিং পার্সোন্যালিটি। কেন তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না? ইচ্ছে করলে তুমি কি না পারো?

অপ্রত্যাশিত ভাবে সরলা দেবী ঘরে প্রবেশ করিলেন। দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া তিনি উভয়ের আলাপ শুনিতেছিলেন। এরূপ আড়ি পাতিবার অভ্যাস তাঁহার আগে ছিল না। বোধ হয় ক্রমাগত ঘা খাইয়া খাইয়া এই অভ্যাস হইয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়া তিনি বলিলেন, বলাই কেন অণিমাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না জানতে চাও? তার কারণ বলাইকে সর্বেশ্বর বাবু মা... নি, অণিমা তাকে চাবুক পেটা করেছে।

এই নূতন সংবাদ শুনিয়া হরিশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, বলাই মাষ্ট হেভ ডিজার্ভড ইট সামহাউ। সাম টাইমস হি ওয়াণ্টস ইট ব্যাডলি। সে যা হোক, বলাই ইজ ফেথফুল টু মী। আই মাষ্ট ষ্টাণ্ড বাই হিম।

সরলা দেবী বলিলেন, তোমার প্রতি ফেথফুল? বরং বালাচাঁদের প্রতি ফেথফুল বলতে পার। তোমার প্রতি ফেথফুল কিনা এই কাগজখানা দেখলে বুঝতে পারবে হয়ত।

তিনি এককড়ি বাবুর সম্পাদিত কাগজের একখানা সংখ্যা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। সেই সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনামা "কাচিৎ বালিকা

বিষ্ঠালয়স্থ শিক্ষয়িত্রী" এবং কয়েক লাইন পড়িয়া হরিশঙ্কর বুঝিতে পারিলেন অণিমা ও তাঁহাকে লইয়া প্রবন্ধটি লেখা হইয়াছে।

সরলা দেবী বলিলেন, এই রচনা কার ইঙ্গিতে লেখা হয়েছে জানো? তোমার প্রতি ফেথফুল বলাইয়ের ইঙ্গিতে। কেন লেখা হয়েছে? অণিমাকে ব্ল্যাকমেল করবার জন্ম। কিন্তু অণিমা হতদরিদ্র। তাকে ব্ল্যাকমেল করে বলাই কি পাবার আশা করে? এ সব বিষয়ে তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, বুঝতে পারছ কি পাবার আশা সে করে?

তীব্র বিদ্রূপ ও ঘৃণার সঙ্গে কথাগুলি বলিয়া সরলা দেবী ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

সরলা দেবীর এইরূপ ভাব বলাই ইহার আগে কখনও দেখে নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া সে যুগপৎ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু উত্তর দিবার সময় না দিয়া তিনি ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

হরিশঙ্কর বলাইয়ের ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহার দুই চোখ কৌতুকে যেন নাচিতেছিল।

সরলা দেবী ঘর হইতে চলিয়া গেলে হরিশঙ্কর হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলাই তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল।

হরিশঙ্করের অট্টহাস্য মৃদু হাসিতে রূপান্তরিত হইল। বলাইয়ের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে স্নেহবিগলিত স্বরে তিনি বলিলেন, বোধ হয় তুমি একটু বাড়াবাড়ি করেছিলে বলাই, নয় কি? তোমার টাকা আছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে, লোক হাত করবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, বাট মাই ডিয়ার বলাই, তোমার নাই দি গ্ল্যামার অব এ পপুলার হিরো লাইক হরিশঙ্কর। তোমার ম্যানার্স আনকাল্টিভেটেড বলাই, তোমার এপ্রোচ coarse, টাকার গরমে তুমি হয়ত সেটা বুঝতে পারো না, বাট ইট ইজ ট্রু। ইউ ক্যান রেপ এ উওম্যান বাট ইউ ক্যানট সিডিউস হার। (কোন স্ত্রীলোককে তুমি বলাৎকার করিতে পার, তাঁহাকে ফুসলাইয়া বাহির করিতে পার না।)

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তিনি কি ভাবিলেন। তারপর বলিলেন, ডোণ্ট ওরী। আমি একখানা* চিঠি দিচ্ছি। চিঠিখানা অণিমার হাতে দিয়ো, সে নিশ্চয় আসবে।

বলাই এতক্ষণ যেন বাকশক্তি রহিত হইয়াছিল। হরিশঙ্করের অনুরোধ শুনিয়া সে ঢোক গিলিয়া কোনমতে বলিল, আমি কোন মুখে সেখানে যাব?

হরিশঙ্কর বলিলেন, ইউ হেভ মেনি ফেসেস মাই ডিয়ার বলাই। যে মুখে ইচ্ছে সেই মুখে যেয়ো আমার কাজটি উদ্ধার করবার জন্য। আই লাইক দি গার্ল। ও দেখতে এমন কিছু নয়, বাট সী হেজ চৌক এণ্ড ছাট প্রোভোক্স্।

হরিশঙ্কর চিঠি লিখিতে লাগিলেন, বলাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

চিঠি লেখা শেষ হইলে চিঠিখানি লইয়া বলাই উঠিল। হরিশঙ্কর বলিলেন, আই উইশ ইউ সাকসেস ইন ইওর পিস-মেকিং মিশন। গুড নাইট।

বলাই গাড়ীতে বসিয়া আলো জ্বালিয়া চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে চিঠিখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া পথে ফেলিয়া দিল। দন্ত ঘর্ষণ করিয়া স্বগত বলিল, অসচ্চরিত্র মাতাল! মাতালটা বলে কি না সী প্রোভোকস্! লম্পট! আমি অণিমাকে ওঁর কাছে এনে দিই, আব্দার নাকি? দি স্কাউণ্ড্রেল!

একজন অন্যমনস্ক পথিককে বাঁচাইবার জন্য সোফার জোরে ব্রেক কসিল, গাড়ী ঘ্যাচ শব্দ করিয়া থামিয়া গেল। ধাক্কা খাইয়া বলাইয়ের চিন্তার মোড় ফিরিল। তাহার মনে পড়িল নুরুল হক সাহেব পার্টি ফণ্ডে টাকা পাইলে মন্ত্রী মনোনয়নের সময় তাহার কথা বিবেচনা করিবেন আশ্বাস দিয়াছেন। কথাটা পাকা করা দরকার।

গাড়ী আবার ষ্টার্ট দিতে বলাই সম্মুখে ঝুঁকিয়া বলিল, নুরুল হক সাহাবকো কোঠি।

চার

রাজনগর (১৯২৪-২৫)

আলিপুর বোমার মামলার আসামী, আন্দামান-ফেরৎ এক্স-রিভোল্যুশনারী দেবানন্দ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের শেষ ধাপে অজ্ঞ জনতাকে হিংসার প্ররোচনা দিবার অভিযোগে আটাশ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া মুক্তি পাইল ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে।

সে যখন জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল দেশময় অত বড বিক্ষোভের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল না, আপাতদৃষ্টিতে চারিদিক শান্ত।

ইতিমধ্যে রাজনগরে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

উমানন্দ জেল হইতে মুক্তি পাইয়া বাড়ীতে কিছু দিন বসিয়া থাকিবার পবে মাতার উপর রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। ত্রিনয়নী খবব পাইলেন সে নাকি একটা চাকুরি যোগাড় করিয়াছে। আরও কিছু দিন পরে তিনি চিঠি পাইলেন সে আবার কলেজে ভর্তি হইয়া পডাশোনা আবস্ত করিয়াছে, টাকা পাঠাইতে হইবে

উমানন্দের সহকারী হিমাংশু প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া সদরে কলেজে পড়িতেছে। জেল হইতে মুক্তি পাইলে ইন্দ্র তাহাকে বুঝাইয়া পরীক্ষা দিতে রাজি করিয়াছিল, তাহার কলেজে পড়িবার ব্যয়ভার সে বহন করিতেছে।

যোগেন্দ্র অজ্ঞাত আততায়ীর আঘাতে আহত হইয়া ইন্দ্রের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল। সেখানে তাহার চিকিৎসা চলিবার সময়ে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। দেড় বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সে রাজনগরে ফিরিয়া আসে ও ইন্দ্রের সেবকাশ্রমে কাজ করিতে থাকে। কিছু দিনের মধ্যে উমানন্দ ও তাহার মধ্যে কি লইয়া মনান্তর ঘটে ও উমানন্দ তাহাকে অপমান করে। ফলে সে রাজনগর ত্যাগ করিয়া স্ব গ্রাম গোবিন্দপুরে ফিরিয়া গিয়া কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে গোবিন্দপুর খাদিআশ্রম নামে একটি গঠনমূলক কর্মের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

যোগেন্দ্র চলিয়া যাইবার পর ইন্দ্রের সেবকাশ্রমের কাজ বন্ধ হইয়াছে, সেবকাশ্রমের বাড়ীতে আবার বালিকা বিদ্যালয় বসিয়াছে।

যোগেন্দ্র রাজনগর ত্যাগ করিবার কয়েক দিন আগে পুষ্প আশ্রয়দাতা স্বর্গীয় জীবানন্দের গৃহ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের গৃহে স্থায়ী আশ্রয় লইয়াছে।

দেবানন্দের গ্রেপ্তারের পর সরস্বতী তারাপুরে চলিয়া গিয়াছে, মাতার বহু অনুরোধেও সে আর রাজনগরে থাকিতে রাজি হয় নাই। সেই হইতে সে তারাপুরে রহিয়াছে, মাঝে মাতার অসুখের সময় কয়েকদিনের জন্য তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল।

দেবানন্দ সদর জেল হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল ফটকে যোগেন্দ্র ও হিমাংশু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা উভয়ে তাহাকে প্রণাম করিল। সকলের কুশল প্রশ্ন করিয়া দেবানন্দ বলিল, তোমরা কি রাজনগরে যাবে? আমি এখনই রওনা হতে চাই।

যোগেন্দ্র বলিল, আমি আমার গ্রাম গোবিন্দপুরে ফিরে যাব। একটু কাজে এসেছিলাম সদরে। হিমাংশুর সঙ্গে দেখা হতে সে বলল ইন্দ্রবাবু তাকে লিখেছেন আপনার ছাড়া পাবার কথা। এজন্য আমি একদিন অপেক্ষা করেছি। হিমাংশু এখানে হোস্টেল থেকে কলেজে পড়ছে।

দেবানন্দ বলিল, তাহলে তোমরা যাও। আমি দোকান থেকে কিছু কাপড়-জামা কিনে এবেলাটা হোটেলে কাটিয়ে ওবেলা যাব।

হিমাংশু বলিল, ইন্দ্র পিশে মশায়ের বাড়ীতে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। চলুন, আপনাকে নিয়ে যাই। ও বেলা আপনাকে গাড়ীতে তুলে দেব।

যোগেন্দ্র ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়া আনিল। সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

দেবানন্দ যোগেন্দ্রকে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কথা, রিভোলুশনারী দলের অনেকের গ্রেপ্তারের কথা, অসহযোগীদের বর্তমান অবস্থার কথা, রাজনগরের কথা জিজ্ঞাসা করিল। যোগেন্দ্র গোবিন্দপুরে এখন কি করিতেছে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার প্রতিষ্ঠিত খাদিআশ্রমের কথা শুনিল, খাদিআশ্রমের লক্ষ্য ও কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিল। গাড়ী ইন্দ্রের বাড়ীতে পৌছিলে যোগেন্দ্র বিদায় লইতে গিয়া বলিল, আমার হাতে কতকগুলি জরুরী কাজ আছে। বাড়ী ফিরতে একদিন দেরি হয়ে গিয়েছে। নইলে দু' চার দিন আপনার সঙ্গে থেকে মন খুলে আলাপ আলোচনা করতাম।

দেবানন্দ—বেশ তো, কাজ সেরে রাজনগরে চলে এস। আমার অনেক কিছু জানবার আছে তোমার কাছ থেকে।

যোগেন্দ্র রাজি হইল। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সে বিদায় লইল। বিকালে আবার আসিবে বলিয়া হিমাংশুও হোস্টেলে ফিরিল।

বিকালের দিকে রওনা হইবার কিছু আগে হিমাংশু আসিল। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া দেবানন্দ বলিল, তোমার কি অসুখ করেছে? মুখ অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

হিমাংশু একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, আমার শরীর ভাল আছে। আপনি রাজনগরে যাচ্ছেন কয়েকটা কথা বলব ভাবছিলাম। আপনি শুনে কি মনে করবেন ভেবে বলতে মন চাচ্ছে না। তবে রাজনগরে গেলে আপনি সব জানতে পারবেন।

দেবানন্দ—তোমার কাছেই না হয় কিছু শুনি।

হিমাংশু—আমি কিন্তু কাউকে নিন্দে করবার জন্য কিছু বলছিনে, যা হয়েছে তাই আপনাকে জানাচ্ছি।

দেবানন্দ—বেশ, বলো।

হিমাংশু—উমানন্দ কাকা দিদিকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব বলে শাসিয়েছিল। তাই নিয়ে দিদিমার সঙ্গে ঝগড়া হল। উমানন্দ কাকা রাগ করে কলকাতা চলে গেল। লক্ষ্মী পিশীমা দিদিকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তারপর গৌতম হবার পর তাঁর খুব অসুখ হল, দিদি তাঁর কাছেই রয়েছে। আপনি যদি পারেন দিদিকে বাড়ী ফিরিয়ে আনবেন। আমি চাকুরি খুঁজছি। চাকুরি পেলে পড়াশোনা ছেড়ে দেব, দিদিকে আমার কাছে এনে রাখব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, উমানন্দ কাকা যোগেনদার সঙ্গেও ঝগড়া করেছিল। যোগেনদার সঙ্গে দিদি কথা বলত, তাই নিয়ে তার দু' জনের ওপর রাগ। দিদি তো আগে থেকে যোগেনদার সঙ্গে কথা বলত। এতে দোষ কি?

কথা শেষ করিয়া হিমাংশু বলিল, বড়কাকা, দিদি বেশী কথা বলে না। উমানন্দ কাকা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে বললে আমাকে শুধু বলেছিল, তুই মানুষ হ হিমাংশু, তাহলে ভাই বোনে এক সঙ্গে থাকতে পারব।

দেবানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তারপর বলিল, তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা কর। দিদির কথা ভেবে চাকুরির চেষ্টা করতে যেও না হিমাংশু। সে লক্ষ্মীর কাছে আছে, জলে পড়েনি। লক্ষ্মীর কাছে থাকা যা

আমাদের কাছে থাকাও তাই। এ সব কথা ভেবে মন খারাপ করো না, এখন তোমার পড়াশোনা করবার সময়।

হিমাংশু বলিল—আপনি ফিরে এসেছেন বড় কাকা, আমার খুব ভরসা—

দেবানন্দ মৃদু হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল, অসহযোগ আন্দোলনের সময় তো তোমার মত অন্য রকম ছিল হিমাংশু। মত বদলাল কেন?

হিমাংশু কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

দেবানন্দ রাজনগরে পৌঁছিয়া দেখিল গ্রামের চেহারা অন্য রকম হইয়া গিয়াছে, কোথাও উৎসাহ ও উদ্দীপনার লেশমাত্র নাই। কয়েক বৎসর আগে ঘরে ঘরে চরকা চলিয়াছিল, বিশ পঁচিশ খানা নূতন তাঁত বসিয়াছিল। ছেলেরা তখন খদ্দর ছাড়া পড়িত না, তাহাদের মাথায় ছিল গান্ধীটুপী। কোথায় গেল খদ্দর, কোথায় গেল গান্ধীটুপী? এত বড় আন্দোলন চলিয়া গেল, যেন বন্যার জল নামিয়া গিয়াছে, এখন কাদা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

দেবানন্দ দেখিল বাড়ীতে মায়ের শরীর খারাপ, মন ভাল নয়। এক ইন্দ্রের বাড়ীর আবহাওয়া পূর্বের মতই আছে। ইন্দ্র তেমনি শান্ত, উদার, প্রসন্ন, লক্ষ্মী তেমনি ধীর, কার্যকুশলা, স্নেহময়ী আছে, যদিও স্বাস্থ্যহানির পরিচয় রহিয়াছে তাহার চেহারায়। পুষ্প এখনও আগের মত মৃদুভাষিনী, গম্ভীর, অনলসকর্মী। পুষ্প তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দেবানন্দ দেখিল পুষ্পের দুইটি চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। তাহার মুখের দিকে, সর্ব দেহের দিকে একবার নীরবে অশ্রুসিক্ত চোখ বুলাইয়া পুষ্প নীরবে চলিয়া গেল। দেবানন্দের মনে হইল মাতার বাৎসল্য, ভগ্নীর স্নেহ, প্রণয়িনীর প্রেম, ভক্তের ভক্তি একত্র মিলিয়া তাহার উপর বর্ষিত হইল পুষ্পের নীরব, সজল দৃষ্টিপাতে। দেবানন্দ ভাবিল পুষ্পকে এমন রূপে সে তো আগে কখনও দেখে নাই। কি নূতন ভাব পুষ্পের মনের গভীরে জন্মলাভ করিতেছে?

লক্ষ্মীর ছেলেমেয়েদের দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া যায়। ছোট ছেলে গৌতম সবে হাঁটিতে শিখিতেছে। দিদি, দাদার দেখাদেখি সেও বড় মামাকে প্রণাম করিল। তারপর যেন কোন অসম সাহসিক কাজ করিতেছে এই ভাব দেখাইয়া তাহার কোলে বসিয়া পড়িল। তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে দেবানন্দের বুক জুড়াইয়া গেল।

ইন্দ্রের মুখে দেবানন্দ গ্রামের হালচালের ও দেশের সর্বাধুনিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে খবর পাইল।

ইন্দ্র বলিল, একটা কথা আমার মনে উঠেছে, তোমাকে বলছি দেবুদা। স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন, এই দুটো বড় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এলাম আমরা। কেন জানিনে বিশ বছর আগেকার স্বদেশী আন্দোলন চার বছর আগেকার অসহযোগ আন্দোলনের চাইতে মনে যেন স্পষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছে। এটা ঠিক যে স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা নেমে গেলে যে দুরবস্থা দেখা দিয়েছিল অসহযোগ ও আইন অমান্যের পরের দুরবস্থা তার চাইতে বেশী বলে মনে হচ্ছে। দলাদলি, ঈর্ষা, কলহ প্রবল হয়েছে। সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যে উচ্চস্তরের বিরুদ্ধে একটা শত্রুভাব ক্রমে যেন বেশী করে দানা বাঁধছে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আগেকার সহজ সম্প্রীতির সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ এখন যতটা খারাপ হয়েছে আগেকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের পরেও ততটা খারাপ হতে পারে নি, যদিও সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা যত বেশী বলা হয়েছে আর কোন সময়ে তত বেশী বলা হয় নি। এর আসল কারণ কি আমি বুঝতে পারি নি এখনও। আরও বুঝতে পারি নি অসহযোগের মত উচ্চ আদর্শ, ভাব ও নীতিমূলক আন্দোলন লোকের চরিত্র, বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে কেন এমন করে বিকৃত করে দিয়ে গেল—

দেবানন্দ—জেলে অসহযোগী কয়েদীদের মধ্যে বাস করে এটা আমিও লক্ষ্য করেছি। আর কয়েকদিন যাক্, এ বিষয়ে পরে কথা হবে।

মাতার সঙ্গে সাংসারিক অবস্থা লইয়া অনেক কথা হইল দেবানন্দের। অবশেষে ত্রিনয়নী বলিলেন, আমার সংসার যে এমন করে ভেঙ্গেচুরে যাবে কোনদিন ভাবতে পারি নি বাবা। কোন দিকে এখন আর কুল দেখতে পাই না। আনন্দ আমার মনে বড় দাগা দিয়েছে। দেবতুল্য চরিত্রের বাপের ছেলে হয়ে ও যে এমন স্বার্থপর, কুচক্রী হবে স্বপ্নেও ভাবি নি। গাঁয়ের লোক কি বলে জানিস? আনন্দ নাকি পুলিশকে মিথ্যা খবর দিয়ে তোকে ধরিয়ে দিয়েছিল। আমি আগে বিশ্বাস করিনি, এখন মনে হয়—

কথা শেষ না করিয়া ত্রিনয়নী আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, যোগেন্দ্রের সঙ্গে ও বড অসদ্ব্যবহার করেছে, ওর জন্য ছেলেটি গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছে। পুষ্পর মত গুণের মেয়ে আজকাল চোখে পড়ে না। ওর দুর্ব্যবহারে সেই পুষ্পকে বাড়ী ছাড়া হতে হয়েছে।

আবার তিনি আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিলেন।

দেবানন্দের চিঠি পাইয়া যোগেন্দ্র রাজনগরে আসিল। ইন্দ্রের গৃহে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

দেবানন্দ প্রথমে তাহার সাংসারিক অবস্থার কথা জানিতে চাহিল। তারপর তাহার প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দপুর খাদিআশ্রমের কথা খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

তাহার কথা শুনিয়া দেবানন্দ বলিল, রাজনীতিতে তাহলে তুমি নো-চেঞ্জার দলের ?

যোগেন্দ্র বলিল, পোলিটিক্স থেকে আমি বিদায় নিয়েছি। গান্ধীজী যে গঠনমূলক প্রোগ্রাম দিয়েছেন দেশকে, অল্প পরিসরের মধ্যে ও আমার শক্তির সীমার মধ্যে সেই প্রোগ্রাম নিয়ে আমি কাজ করতে চাই।

এই সময় ইন্দ্র সেখানে আসিল। দেবানন্দ আলাপের বিষয় পরিবর্তন করিয়া বলিল, এ সব কথা এখন থাক। শুনছি গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন, নিজের কাজের জন্য নূতন অরগানাইজেশন গড়ে তুলছেন। কংগ্রেসের কি হবে ?

ইন্দ্র বলিল—কংগ্রেস এখন নূতন লিবারেল দলের হাতে। তাঁরা কম্প্রো-মাইজ, অর্থাৎ মণ্টফোর্ড রিফর্মস একটু লিবারালাইজ করবার চেষ্টা করছেন।

যোগেন্দ্র—নূতন লিবারেল দল কারা ? আপনি কি স্বরাজ পার্টির কথা বলছেন ?

ইন্দ্র—তুমি ঠিক ধরেছ।

যোগেন্দ্র—তাঁদের চেষ্টা সফল না হলে তাঁরা কি করবেন ?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, গভর্ণমেণ্ট দশ বছর বাদে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্য কমিশন বসাবেন বলেছেন। দশ বছর হয়ে এল প্রায়।

যোগেন্দ্র—গভর্ণমেণ্ট যদি নূতন কিছু দেন তা গ্রহণযোগ্য মনে না হলে ?

ইন্দ্র—হয়ত আজ যাঁকে বিদায় দিয়ে নিজের দলের জয়গান গাওয়া হচ্ছে তাঁকে আবার ডেকে আনতে হবে।

যোগেন্দ্র—মানে, মহাত্মাজীকে আবার কংগ্রেসের মধ্যে আনা হবে ?

দেবানন্দ—তা হতে পারে।

যোগেন্দ্র—নিজের কাজ ছেড়ে আবার তিনি পোলিটিক্সের গোলমালের মধ্যে আসবেন ? অসম্ভব।

ইন্দ্র—তাঁকে এত খাটো করে দেখছ কেন যোগেন্দ্র ? দেশের জন্য সব রকম কাজ তাঁর নিজের কাজ।

দেবানন্দ—তুমি কি মনে কর গান্ধীজী পোলিটিকসের গোলমাল অপছন্দ করেন? তাঁর নিজের প্রদর্শিত পথে তিনি শেষ পর্যন্ত যেতে পারলেন না। তাঁর এই পরাজয়ের জন্য সকলে সমালোচনা করছে। সমালোচকদের তিনি একটা চান্স দিচ্ছেন।

ইন্দ্র—কিন্তু সমালোচনা তো শুধু স্বরাজদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় দেবু দা, রিভোল্যুশনারী দল, হিন্দু মহাসভার দল, বোলশেভিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট দল সকলেই সমালোচনা করছে। স্বরাজিষ্টদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কেন?

দেবানন্দ—পক্ষপাতিত্বের কথা উঠছে না। স্বরাজীরা লিবারেল হোক আর যাই হোক তারা কংগ্রেসের সভ্য। আর সব দল কংগ্রেসের বাইরের।

ইন্দ্র—তার মানে কংগ্রেস লিবারেল পোলিটিকসের বাহন হয়ে থাকবে?

দেবানন্দ—দেশজোড়া এত বড় অরগানাইজেশনের পক্ষে হয়ত সেইটে হবে স্বাভাবিক। এ সব কথা এখন থাক। যোগেন্দ্র নিজের জন্য একটা কাজ বেছে নিয়েছে। আমি তার এই আদর্শের মধ্যে একটু খুঁত বের করবার চেষ্টা করছিলাম। উদ্দেশ্য যোগেন্দ্রকে একটু সতর্ক করা against disappointment in future.

যোগেন্দ্র—ডিজএপয়েণ্টমেণ্টের কথা বলছেন কেন?

দেবানন্দ—বলছি এই জন্যে যে তোমার লক্ষ্য বড় নয়। তুমি সাধু সন্ন্যাসীর মত কঠোর জীবন, মানে, আদর্শনিষ্ঠ জীবন যাপন করতে চাও। এ রকম জীবনযাত্রার ওপর আমাদের দেশের শ্রদ্ধার ট্রাডিশন আছে। ব্যক্তিগতভাবে তুমি শ্রদ্ধা পাবে হয়ত। কিন্তু তুমি তো বাস্তবিক ঈশ্বরভক্ত সন্ন্যাসী নও। তোমার লক্ষ্য দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল। অসহযোগের সমগ্র রাজনৈতিক প্রোগ্রাম থেকে সুতা কাটা ও তাঁত বোনাকে আলাদা করে নিলে এ দুটো কাজের পেছনে জোর থাকে না। লোকে চরকার ইকোনমিকসে বিশ্বাস করে না। তোমার চরিত্র ও কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তুমি শ্রদ্ধা পাবে, লোকে তোমার আন্তরিকতায় বিশ্বাস করবে কিন্তু তুমি যে সাড়া জাগাতে চাইছ তা জাগাতে পারবে না। একটা ব্যর্থ আন্দোলনের relic হিসাবে তুমি কিছু লোকের কৌতূহলের ও কিছু লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবে।

যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল। শেষে বলিল, আমার মনে হচ্ছে আপনি কোন প্রস্তাব করতে চান—

দেবানন্দ বলিল, আমার বর্তমান প্রস্তাব এই যে অল্প কয়েকজন কর্মী

নির্বাচন করে রাজনগরে একটি খাদিআশ্রমের পরিকল্পনা তৈরী করে দাও আমাকে।

যোগেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, এতক্ষণ খাদিআশ্রমের বিরুদ্ধে এত কথা বলে শেষে—

দেবানন্দ বাধা দিয়া বলিল, বিরুদ্ধে কোন কথা বলিনি তো, তুমি ভুল বুঝেছ। খাদিআশ্রমকে একমাত্র অবলম্বন করে তোমার এমোশনাল জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছ, তাই কথাগুলো বলতে হল। রাজনগরের খাদিআশ্রম অন্য প্রণালীতে চলবে। তুমি তোমার পছন্দ মত একটা পরিকল্পনা করে দাও, তারপর আমার প্রণালী ব্যাখ্যা করব।

ইন্দ্রের মেয়ে মিনু আসিয়া দেবানন্দকে অন্দরে ডাকিল মাতার আদেশে। দেবানন্দ উঠিল। যোগেন্দ্র ইন্দ্রকে বলিল, সেবকাশ্রমের বাড়ীটা কি অবস্থায় আছে আমি একবার দেখতে চাই।

ইন্দ্র বলিল—চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে এখন বালিকা বিদ্যালয় চলছে।

দেবানন্দ অন্দরে প্রবেশ করিতে প্রথমে পুষ্পের দেখা পাইল। লক্ষ্মীর ছোট ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া সে গল্প বলিতেছিল। দেবানন্দকে দেখিয়া সে তাহাকে নামাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দেবানন্দ বলিল, কেমন আছ পুষ্প ?

পুষ্প—ভাল আছি।

দেবানন্দ— তাইতো মনে হচ্ছে। গৌতমবাবু, এসো, তোমার মার কাছে যাই।

গৌতমকে কোলে তুলিয়া দেবানন্দ লক্ষ্মীর শয়নকক্ষের পাশের বারান্দায় গিয়া বসিল।

লক্ষ্মীর সঙ্গে অনেক কথা হইল। বেশীর ভাগ কথা পুষ্পর সম্বন্ধে। যোগেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ স্থির হইলে সেই বিবাহ এড়াইবার জন্য যোগেন্দ্র ও ও হিমাংশুকে সঙ্গে লইয়া সে তারাপুরে পলাইয়াছিল সে কাহিনী দেবানন্দ এই প্রথম সবিস্তারে শুনিল।

লক্ষ্মী বলিল, যোগেন্দ্রবাবুর মত মানুষ হয় না। পুষ্প তাঁকে শ্রদ্ধা করে জানি। কেন ও যোগেন্দ্রবাবুকে বিয়ে করবার ইঙ্গিত কানে নেয় না—

– দেবানন্দ—যোগেন্দ্রের মনোভাব কি জানিস ?

লক্ষ্মী—যতটুকু জানতে পারা যায় তাতে বুঝি পুষ্পের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভাল।

দেবানন্দ কিছুক্ষণ কি ভাবিল। একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে লক্ষ্মী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি ভাবছেন দাদা ?

দেবানন্দ—ভাবছি পুষ্প তোদের কাছে এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা চিন্তিত, তুই চিন্তিত, এক ইন্দ্র এ সম্বন্ধে একটি কথা বলে নাই এ পর্যন্ত।

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, ওঁর কথা ছেড়ে দিন। আমাকে কোন কথা পাড়তে দেন না। বলেন পুষ্পের ইচ্ছে হলে বিয়ে করবে। যদি বিয়ে করতে না চায় সেবকাশ্রমের বাড়ী ও কিছু জমি ওর নামে লিখে দেব, কারো গলগ্রহ হয়ে ও থাকবে না, নিরাশ্রয়ও হবে না।

দেবানন্দ হাসিল। বলিল, খুব ভাল প্রস্তাব। তা তুই এত ভাবছিস কেন ?

লক্ষ্মী বলিল, মেয়েদের ঐটুকু কি সব দাদা ? পুষ্প বিয়ে করলে সব দিক দিয়ে ভাল হয়।

দেবানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল, তা হয়।

লক্ষ্মী ব্যগ্র স্বরে বলিল, তবে সেই চেষ্টা করুন দাদা। আপনি বুঝিয়ে বললে পুষ্প রাজি হতে পারে।

দেবানন্দ—যোগেন্দ্রকে রাজি করাবে কে ?

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, আপনি।

দেবানন্দ—বুঝলাম। আচ্ছা, পুষ্পকে এখানে পাঠিয়ে দে।

লক্ষ্মী উঠিল। গৌতমকে কোলে লইতে গেল। সে মাতুলের হাতখানি টানিয়া নিজের চোখের উপর চাপিয়া ধরিল। ভাবখানা এই যে মা আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। ছেলের কাণ্ড দেখিয়া লক্ষ্মী মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরে পুষ্প খাবারের থালা হাতে লইয়া আসিল। দেবানন্দ বলিল, এত খাবার কি হবে ?

পুষ্প একটু হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

দেবানন্দ—আচ্ছা, তুমি এখানে ব'স। খেতে খেতে একটু ভাল মন্দ কথা বলি তোমার সঙ্গে।

পুষ্প বসিল। দেবানন্দ একটি মিষ্টি তুলিয়া গৌতমের হাতে দিল। দ্বিতীয় মিষ্টি তুলিয়া পুষ্পকে বলিল, এইটে নাও। হাতে করে থেক না, মুখে ফেলে দাও।

পুষ্প মৃদু স্বরে বলিল, আপনি আগে খান।

দেবানন্দ একটি সন্দেশ ভাঙ্গিয়া মুখে দিল। পুষ্প তখনও মিষ্টিটি হাতে লইয়া বসিয়া রহিল। দেবানন্দ বলিল—লজ্জা করছে না কি আমার সামনে খেতে? আড়ালে গিয়ে খেয়ে এস।

পুষ্প হাসিয়া মিষ্টিটি মুখে পুরিল।

দেবানন্দ—ভেরী গুড। মিষ্টি খাওয়ালাম। মিষ্টি করে জবাব দাও আমার কথার। দেবে তো?

গৌতম মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল—ডেবে টো?

দেবানন্দ হাসিল। বলিল, জেল থেকে বেরিয়ে কটকের বাইরে হিমাংশুর সঙ্গে দেখা। ছেলেটা রাজনীতি ছেড়ে পড়াশোনায় মন দিয়েছে জেনে খুশী হলাম। ওর স্বভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে, আত্মীয়স্বজনের কথা ভাবে আজকাল। তোমার কথা এত ভাবে যে পড়াশোনা ছেড়ে চাকুরি করতে চায়। চাকুরি পেলে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে, ভাইবোনে একসঙ্গে থাকবে। আরও দু'একটা কথা বলল সে, তোমাকে তা শোনাবার প্রয়োজন নেই।

পুষ্প দেবানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিল।

দেবানন্দ বলিল, ছেলেটা লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক আমি এই চাই। শিশুকালে তোমরা বাপ মা হারিয়েছ, এতদিন পরাশ্রয়ে কেটেছে। হিমাংশু নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, তার পথে কোন বাধা না আসে দেখতে হবে। তারপর হাসিয়া বলিল, পুষ্প খুব ভাল মেয়ে, বড় সুবোধ। আমি তার কথা ভাল করে ভেবেছি। আমি তাকে বড় ভালবাসি। তার ম· ভালবাসা পাবার যোগ্য মেয়ে কটা দেখা যায়? যে তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে, তার যথার্থ মর্যাদা দিতে পারে, ভালবাসতে পারে সে সৌভাগ্যবান। এমন সৌভাগ্যবান মানুষের দেখা পেলে আমি তাকে বলব, এস বন্ধু, যে মহামূল্য রত্ন তোমাকে দিচ্ছি তাকে চিরদিন শ্রদ্ধা করো, আদর করো, ভালবেসো। জীবনে অনেক দেখেছি আমি, খাঁটি জিনিস চিনি। সংসারে খাঁটি জিনিস বড় দুর্লভ। তোমাকে জানি বলে, তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে বলে আমার পরম স্নেহের ধনটি তোমার হাতে—

গৌতম বড় মামার পাশে বসিয়া সন্দেশ চুষিতেছিল। কি মনে করিয়া সে উঠিয়া পুষ্পর কাছে গিয়া লালাসিক্ত দুই হাত বাড়াইয়া তাহার গলা

জড়াইয়া ধরিল। দেবানন্দের গাঢ় স্বর হঠাৎ রুদ্ধ হইল, সে দেখিল মাথা হেঁট করিয়া পুষ্প মুখে আঁচল চাপা দিয়াছে।

কিছুক্ষণ সে চুপ করিয়া পুষ্পর দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, পুষ্প, আঁচল সরিয়ে আমার দিকে চাও। যদি তোমার মনে কোন দ্বিধা থাকে, যদি মনে হয় আমি জোর জুলুম করছি মুখ ফুটে আমাকে জানাও। বাইরের জগতের চাইতে জেলের জগতের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশী ঘনিষ্ঠ। আমার পক্ষে ভুল করা বা অন্যায় করা সহজ।

পুষ্প কি উত্তর দিবার চেষ্টা করিল, গলা হইতে স্বর বাহির হইল না। দেবানন্দের প্রথম কথাগুলি কানে যাইতে অনেক দিনের অবরুদ্ধ আবেগ মুক্তি পাইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল। কত কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। গতদিনের কত বিস্মৃত আনন্দ ও বেদনা নূতন করিয়া তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। সকল অনুভূতি ছাপাইয়া একটা কথা বিদ্যুৎ চমকের মত তাহার মনের গভীরে চমকাইতে লাগিল বারবার, এত স্নেহ লুকাইয়া রহিয়াছে এই অল্পভাষী উদাসীন মানুষটির মধ্যে যাহার জীবনের অর্ধেককাল কাটিয়াছে দ্বীপান্তরে, নির্বাসনে, জেলে।

দেবানন্দ অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পুষ্প আত্মসম্বরণ করিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, আপনি খেয়ে নিন বড় কাকা, আমি চা নিয়ে আসছি।

দেবানন্দ বলিল, চা আনতে হবে না, তুমি ব'সো। বড় কাকা খাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর কথার জবাব পাওয়া গেল না।

পুষ্প আবার মাথা হেঁট করিল। কি উত্তর দিবে সে? বড় কাকা কি জানেন না তাঁহার যে কোন আদেশ সে মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত?

দেবানন্দ অপেক্ষা করিয়া আছে দেখিয়া সে সঙ্কোচ কাটাইয়া কোনমতে বলিল, আপনি যা বলবেন তাই করব আমি।

দেবানন্দ গম্ভীরভাবে বলিল, অর্থাৎ অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে চেষ্টা করবে?

পুষ্পের মুখে মৃদু হাসি ফুটিল, হাসি গোপন করিবার জন্য সে মাথা নামাইল। দেবানন্দ বলিল, ভয় পেও না, ঢেঁকির চাইতে ভাল বাহন এনে দেব।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমি খুব খুশী হয়েছি পুষ্প। কত খুশী হয়েছি কথায় বলতে পারছিনে। একটু কাজ আছে, এখন যাই। গৌতমকে ওর মার কাছে নিয়ে যাও! তাকে ব'লো—

লক্ষ্মী আসিতেছে দেখা গেল। সে কাছে আসিয়া বলিল, ওকি, আপনি কিছু খাননি দাদা?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, পুষ্প এত ভাল গল্প বলছিল যে খেতে ভুলে গেছি। এখন আর কিছু খাব না। কাজ আছে, আমি চললাম। কাল একবার মার কাছে যাস।

পুষ্প খাবারের থালাখানি উঠাইয়া দেবানন্দের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমার দোষে আপনার খাওয়া হ'ল না, এই মিষ্টি দুটো খেয়ে নিন। গৌতম মাতার কোলে উঠিয়াছিল। নিজের ডান হাত প্রসারিত করিয়া সে বলিল, নিন। দেবানন্দ একটি সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল, নিন।

সকলের হাসির মধ্যে জলযোগ শেষ করিয়া দেবানন্দ বাহিরে চলিয়া গেল।

খাদিআশ্রমের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য পরদিন যোগেন্দ্র দেবানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে তাহার গৃহে আসিল। দেবানন্দ তখন ইন্দ্রের সঙ্গে কি বিষয় লইয়া কথা বলিতেছিল।

যোগেন্দ্র বলিল, দু'একটা কথা জানবার ছিল পরিকল্পনা সম্বন্ধে। আপনি বোধহয় ব্যস্ত আছেন এখন, পরে কথা হবে।

ইন্দ্র—আমরা কেউ ব্যস্ত নই, তুমি ব'স।

দেবানন্দ—আমার নিজস্ব একটা পরিকল্পনা সম্বন্ধে তোমার কাছে দু'একটা কথা জানবার আছে। তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে, ব'স।

দেবানন্দের কথা শুনিয়া যোগেন্দ্র একটু বিস্মিত হইল। কোন কথা না বলিয়া সে বসিল। দেবানন্দ বলিল, তোমার গোবিন্দপুর ..দিআশ্রম সম্বন্ধে আলোচনার সময় তুমি আমার কথায় অসন্তুষ্ট হয়েছিলে মনে আছে?

যোগেন্দ্র বলিল, আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি কে বলেছে? আমার বেশ মনে আছে আমি বলেছিলাম কোন প্রস্তাবের ভূমিকা হিসাবে আপনি যেন আমার কাজের সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে কথাগুলো বলছিলেন। আপনি যা বলেছিলেন আমি অনেক ভেবেছি সে সম্বন্ধে।

দেবানন্দ—কোন সিদ্ধান্তে এলে?

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিল, কোন সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করিনি আমি।

দেবানন্দ—ভাল কথা। কিন্তু সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এ বিষয়ে আমি একটু সাহায্য করতে চাই তোমাকে।

যোগেন্দ্র প্রায় লাফাইয়া উঠিল। বলিল—আপনি কি আমার আশ্রমে গিয়ে কাজ দেখিয়ে দেবেন? এ আশা—

দেবানন্দ—দাঁড়াও যোগেন্দ্র। তোমার মত ঠাণ্ডা মানুষ এত উত্তেজিত হবে কেন? আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই সিদ্ধান্তে আসতে।

যোগেন্দ্র একটু লজ্জিত হইল। বলিল, আপনার যে কোন সাহায্য আমি সানন্দে নিতে প্রস্তুত।

দেবানন্দ—আশ্বস্ত হ'লাম। আমার প্রস্তাবের কথা বলছিলে না? সেই প্রস্তাব ব্যাখ্যা করছি। তোমার খাদি আশ্রমের আইডিয়া ভাল। ত্রুটিও কিছু আছে। আদর্শবাদীর জীবন যাপন করতে চাও তুমি। সংসার কিন্তু আদর্শবাদীকেও রেহাই দেয় না। সমালোচকের রসনা, বিরোধী দলের বাধা, অসাফল্যের হতাশা, নিজের একাকীত্বের দুর্বহ ভার, বঞ্চিত হৃদয়ের বিদ্রোহ—এই সকলের হাত থেকে আত্মরক্ষার কথা ভাব নাই তুমি। যত বয়স বাড়বে এই সকল শত্রু তিলে তিলে, অজ্ঞাতসারে তোমাকে পঙ্গু করবে। কোন আইডিয়ালিজমের সাধ্য নাই সেদিন তোমাকে দাঁড় করিয়ে রাখে।

যোগেন্দ্রের মুখের ভাব বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। দেবানন্দের প্রত্যেকটি কথা যেন তীরের মত তাহার মর্মে আঘাত করিতেছিল। ইন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, দেবুদা, যোগেন্দ্রকে তোমার আসল প্রস্তাবটা বল।

দেবানন্দ বাধা পাইয়া বিস্মিত হইয়া একবার ইন্দ্রের দিকে, একবার যোগেন্দ্রের দিকে চাহিল। তারপর যেন আত্মস্থ হইয়া বলিল—ও, হ্যাঁ। আমার প্রস্তাব এই যে দুর্দিনে আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র তোমাকে দিতে চাই আমি। এ অস্ত্র সর্বদা তোমাকে রক্ষা করবে, পুষ্ট করবে, বলীয়ান করবে, নিজে কখনও ভার স্বরূপ না হয়ে তোমার সকল ভার লাঘব করবে, প্রতিদিন প্রতিপদে তোমাকে সাহায্য করবে। দেবানন্দের সাহায্য তোমার প্রয়োজন নাই, ইন্দ্রের সাহায্য অনাবশ্যক, তোমার প্রয়োজন আমি যার সাহায্য তোমার পক্ষে সহজে আসবার পথ করে দেবার—

কথা শেষ না করিয়া দেবানন্দ চুপ করিল। কপালের উপর এক গোছা চুল আসিয়া পড়িয়াছিল, হাত দিয়া তাহা ঠেলিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে যোগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, আমার মনে হয় পুষ্পকে তুমি তোমার কাজের সঙ্গী করে নিলে তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হবে। আমি কতদিন

রাজনগরে আছি ঠিক নাই। তোমাদের দু'জনকে আমি স্নেহ করি, তাই তোমাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্য—

যোগেন্দ্র এতক্ষণ পরে কথা বলিল। বলিল, আপনি যাঁর কথা বলছেন তাঁর আপত্তি না হলে—

দেবানন্দ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, যোগেন্দ্র, তোমার গোবিন্দপুরের বাড়ীতে কে আছে এখন?

যোগেন্দ্র—আমার এক বিধবা মাসীমা থাকেন, খাদিআশ্রমের দু'টি ছেলেও থাকে।

দেবানন্দ—চল, আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে গিয়ে গোবিন্দপুরে একবার ঘুরে আসি।

যোগেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, আপনি যাবেন? আজই যাবেন?

দেবানন্দ—আজই যাব। গোবিন্দপুর থেকে তারাপুর যেতে হবে সরস্বতীকে আনবার জন্য। সময় নাই হাতে। ইন্দ্র, হিমাংশুকে আসবার জন্য চিঠি লিখে দে।

সে উঠিল। বলিল—আমি আসছি। যোগেন্দ্র, তোমার পরিকল্পনা ইন্দ্রকে অল্প কথায় বুঝিয়ে দাও ততক্ষণ।

দেবানন্দ ভিতরে গেল মাতা ত্রিনয়নীকে সুসংবাদ জানাইবার জন্য। ভিতরে গিয়া দেখিল লক্ষ্মী আসিয়াছে।

দেবানন্দ লক্ষ্মীকে বলিল,—তুই এসেছিস, ভালই হল। চটপট সব ব্যবস্থা কর ফেল। পাঁজি দেখ একবার। এটা ত বিয়ের মাস।

লক্ষ্মী বলিল—যোগেন্দ্রবাবু রাজি হয়েছেন দাদা?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, কৃতার্থ হয়েছেন। তোর সন্দেহ ছিল নাকি?

তারপর বলিল, মা, তোমাদের একটা দায় থেকে মুক্ত করলাম। আর বলতে পারবে না আমার বড় ছেলেটা অপদার্থ।

ত্রিনয়নী বলিলেন, তুই আমাকে কখনও বলতে শুনেছিস এ কথা?

দেবানন্দ মাতার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল, আমি আজ গোবিন্দপুর যাচ্ছি যোগেন্দ্রকে নিয়ে, ফেরবার পথে সরস্বতীকে নিয়ে ফিরব।

লক্ষ্মী বলিল, গোবিন্দপুর যাবেন কেন?

দেবানন্দ—যোগেন্দ্র তো আমার মত বাউণ্ডুলে। বাড়ীঘরের কি শ্রী করে রেখেছে একবার দেখে আসব। পুষ্প সেখানে যাবে। একবার নিজের চোখে দেখে আসতে চাই রে। ইন্দ্র বসে আছে, আমি চললাম।

পনের দিন পরে পুষ্পের বিবাহ হইয়া গেল। বর কনে যাত্রা করিবার সময়ে পুষ্প দেবানন্দকে বলিল, আমি চলে যাচ্ছি। আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না বড় কাকা?

দেবানন্দ—বড় কাকার কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে পুষ্প?

পুষ্প—আর কি এখানে আসা হবে আমার?

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল—আমরা কি তোকে নির্বাসন দিচ্ছি পুষ্প? আট দিন পরে আমি নিজে গিয়ে তোকে আনব। তোর নিজের বাড়ীঘর হল, আমার জুড়োবার একটা জায়গা হল। আমি অতি স্বার্থপর মানুষ রে, সব দিক ভেবে চিন্তে তোকে যোগেন্দ্রের হাতে দিয়েছি। এতদিন বুঝি বুঝতে পারিস নি সে কথা?

পুষ্প রুদ্ধস্বরে বলিল—আটদিন পরে আপনি যাবেন বড় কাকা?

দেবানন্দ পুষ্পের মাথায় হাত রাখিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, কত চোখের জল ফেলেছিস তুই একটুখানি বয়স থেকে, আমি জানি পুষ্প। আজ যাবার সময় আমার সামনে আর চোখের জল ফেলিস না। হাসি মুখে স্বামীর ঘরে যা।

বর কনে রওনা হইল। টোল পাড়া হইতে বনদুর্গাতলা পর্যন্ত অনেকে কনের পালকীর সঙ্গে আসিল। তারপর পাল্কীর বেহারারা ছুটিতে আরম্ভ করিল, যাহারা আসিয়াছিল তাহারা বাড়ী ফিরিল। দেবানন্দ বাড়ী না ফিরিয়া বনদুর্গাতলা হইতে কুড়ুলিয়া বিলের পথ ধরিল।

কৈশোরে কত দিন ইন্দ্রের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে এই পথে জেলেপাড়ার পাশ দিয়া সে কুড়ুলিয়া বিলে বেড়াইতে যাইত। গেঁদা জেলের বাড়ী বিলের কিনারায়। গাব গাছের নীচে বসিয়া সে জাল বুনিত আর ডাবাহুঁকা টানিত। তাহাদের দেখিলেই হুঁকাটি গাব গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া সে গড় করিত, একমুখ হাসিয়া বলিত, বিলে বেড়াতি যাবার মন হইছে? হুই ডিঙ্গা বিলের ঘাটে বাঁধা রইছে। বেড়াতি যাচ্ছেন যান, তা একটা কথা কইছি বাবু, পদ্মবিলের পানে যাবেন না য্যান। ফিরতি আঁধার হবি, দিক ঠাওর করতি পারব্যান না।

গেঁদা জেলে ও তাহার ছেলে হারাণ মরিয়াছে জরবিকারে। ঘরগুলি কবে পড়িয়া গিয়াছে, ভিটায় এক মানুষ জঙ্গল হইয়াছে। গাব গাছটি এখনও বাঁচিয়া আছে। পাশ দিয়া যাইতে যাইতে দেবানন্দ দেখিল চকচকে নূতন পাতায় সজ্জিত হইতেছে গাব গাছ।

বেড়াইবার জন্য গেঁদা জেলের ডিঙ্গি আর বিলের ঘাটে বাঁধা নাই। বিলের কিনারায় দাঁড়াইয়া দেবানন্দ অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিলের ওপারে অস্পষ্ট উদ্ভিদ রেখার দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য পশ্চিমে নামিতেছে, তাহার রশ্মিজ্বালা ধীরে ধীরে শীতল হইতেছে। কাহার অশরীরী হস্ত কুড়ুলিয়া বিলের বুকের উপর সূক্ষ্ম কুয়াশার আচ্ছাদন টানিয়া দিতেছে। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দেবানন্দের ঈষৎ বিক্ষুব্ধ মন ক্রমে শান্ত হইয়া আসিল। কত কথা মনে পড়িতে লাগিল তাহার। কৈশোর হইতে যৌবন, যৌবন হইতে মধ্যবয়সে উপনীত সে আজ। নূতন নূতন ভাবের তরঙ্গাঘাতে বৃহৎ জনসমষ্টিকে কতবার উদ্বেল হইতে দেখিল সে। কত কর্মী আসিল, কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া আগাইয়া চলিল তাহারা। উৎসাহভঙ্গ হইয়া কত কর্মী সরিয়া গেল, মরিয়া কতজন কর্মক্ষয় করিল। কি হইয়াছে তাহাতে? যে উন্মত্ত আশা, মহৎ আকাঙ্ক্ষা তাহাকে ঘর ছাড়া করিয়াছিল কৈশোরে, আজ মধ্যবয়সে তাহার মন কি তাহাতে সাড়া দিতে পারিতেছে না? কি হইয়াছে তাহার? বয়সের ধর্মে তাহার মতে ও পথে সে কি বিশ্বাস হারাইতেছে? কেন সে মানুষের ব্যক্তিগত, হৃদয়গত সুখ দুঃখের কথাকে এত বড করিয়া দেখিতেছে? আজ যাহারা বাঁচিয়া আছে, প্রেমে, ঘৃণায়, ঈর্ষায়, ক্রোধে, লোভে, ভয়ে চঞ্চল হইয়া মানব-জীবনের ধর্ম পালন করিতেছে যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের মত, কাল তাহারা থাকিবে না। নূতন মানুষ জন্মিয়া আবার সেই পুরাতন প্রেম, ঘৃণা, ঈর্ষা, ক্রোধ, লোভ, ভয়ের চিরন্তন তরঙ্গে দুলিবে কয়েকটা দিন, তারপর তলাইয়া যাইবে। উন্নত আশা, মহৎ আকাঙ্ক্ষার আলো বিভ্রান্ত মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্য—

দেবু দা!

দেবানন্দ চমকিয়া উঠিল। ঘাড ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল ইন্দ্র তাহার পশ্চাতে দাড়াইয়া।

ইন্দ্র বলিল, অন্ধকার হয়ে এল, বাড়ী চলো।

দেবানন্দ বলিল, চলো।

বনদুর্গাতলায় পৌছিয়া ইন্দ্র বলিল, চলো আমার ওখানে একটু বসবে।

দেবানন্দ বলিল, একটু লেখাপড়ার কাজ সেরে রাখতে চাই, বাড়ী যাব।

ইন্দ্র বলিল, আচ্ছা, কাল দেখা হবে। যোগেন্দ্র তার লিখিত পরিকল্পনা আমার হাতে দিয়ে গিয়েছে, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

দেবানন্দ— কাল সকালের দিকে তোর ওখানে যাব।

ইন্দ্র বাড়ী পৌছিয়া শুনিল রাজনগরের পোষ্টমাষ্টার কেদারবাবু তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বসিয়া আছেন। বর কনে চলিয়া গেলে ইন্দ্র দেবানন্দের খোঁজে গিয়া শুনিল পুষ্পর পাল্কীর সঙ্গে সে বনদুর্গাতলা পর্যন্ত গিয়াছিল, তারপর কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। পুষ্পের বিবাহ লইয়া দেবানন্দ অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল কয়েকদিন। তাহার কর্মব্যস্ততা শেষ হইলে খানিকটা অবসাদ আসিবে ইন্দ্র বুঝিয়া লইয়াছিল। অবসাদ আসিলে সে নির্জনতা খোঁজে। এই অনুমান হইতে সে দেবানন্দের অনুসন্ধানে কুড়ুলিয়া বিলের দিকে গিয়াছিল। ম্লান সন্ধ্যায় গ্রামের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ছায়া মূর্তির মত দেবানন্দকে বিলের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হঠাৎ ইন্দ্রের মনে অস্পষ্ট আশঙ্কার ছায়া নামিল। তাহার মনে হইল দেবু দা বড় একা। সারাজীবন দেশসেবার অপরাধে অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করিয়া সে পরিবারের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু সে শান্তি পাইতেছে না, স্বস্তিবোধ করিতেছে না। ইন্দ্র আজ আর তাহার প্রকৃত সঙ্গী নয়, তাহার চিন্তার, তাহার বেদনার অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সে আজ ইন্দ্রকে ডাকে না।

বনদুর্গাতলায় দেবানন্দের কাছে বিদায় লইয়া সে ভারাক্রান্ত মনে গৃহে ফিরিল। কেদারবাবু তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন শুনিয়া তাহার একটু বিরক্তি বোধ হইল। এখন কাহারও সঙ্গে তাহার কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। বিরক্তি দমন করিয়া সে বৈঠকখানায় কেদারবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইল।

কেদারবাবু আসিয়া বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বক্তব্য একটু শুনিয়াই ইন্দ্রের ঔদাসীন্য ছুটিয়া গেল, সে সোজা হইয়া বসিল। কেদারবাবু সংক্ষেপে তাঁহার কথা শেষ করিয়া বিদায় লইবার জন্য উঠিলেন, বলিলেন, দেবানন্দবাবুর গতিবিধি সম্বন্ধে পুলিশের লোকের এত কৌতূহল আমার ভাল মনে হল না। ভাবলাম খবরটা আপনাকে জানানো উচিত। লোকটা গাঁ থেকে যায় নি। তাই আঁধার না হওয়া পর্যন্ত আসতে ভরসা করিনি।

কেদারবাবু চলিয়া গেলে ইন্দ্র অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিল। শেষে স্থির করিল অতি শীঘ্র দেবুদাকে তারাপুর বা অন্য কোথাও পাঠাইবার চেষ্টা করিবে।

দেবানন্দ সে রাত্রে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ডায়েরী লিখিল।

মধ্যরাত্র পর্যন্ত একটানা লিখিয়া চলিল। তারপর তৃষ্ণা বোধ হওয়াতে উঠিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া খাইয়া খোলা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া রাস্তা বনদুর্গাতলার দিকে গিয়াছে। অন্ধকারের মধ্যে রাস্তার দিকে চাহিতে সে দেখিল হঠাৎ একটা আলো জ্বলিয়া উঠিয়া তখনই নিভিয়া গেল। মনে হইল টর্চের আলো। সে ভাবিল বোধ হয় গ্রামের কোন লোক টর্চ লইয়া পথ চলিতেছে।

জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া আবার সে লিখিতে বসিবে কে দরজায় আঘাত করিল। দেবানন্দ চমকিয়া বলিল, কে?

বাহির হইতে ত্রিনয়নী বলিলেন, দেবু জেগে আছিস? দোরটা খোল একবার।

দেবানন্দ দরজা খুলিতে ত্রিনয়নী ঘরে আসিলেন। বলিলেন, তুই এখনও জেগে? রাস্তা থেকে বাড়ী লক্ষ্য করে কে যেন আলো ফেলছিল দেখেছিস? বাড়ীতে বোধ হয় চোর ঢুকেছে।

দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, দোর না ভেঙ্গে চোর ঢুকবে কি করে বাড়ীতে? রাস্তায় আমি একবার টর্চের আলো দেখেছি বটে। গাঁয়ের কেউ বোধহয় অন্ধকারে চলতে চলতে বার বার আলো জ্বালছিল। যাও, শুতে যাও।

ত্রিনয়নী—তুই শোগে যা। দেড়টা বেজে গেছে।

দেবানন্দ—এবার শোব।

ত্রিনয়নী চলিয়া গেলেন। দেবানন্দ দরজা বন্ধ করিয়া আবার লিখিতে বসিল। বার দুই হাই উঠিল। সে কলম রাখিয়া ডায়েরীর শেষ লাইনের উপর চোখ বুলাইল, ড্যান ব্রিয়েনের বইটা তাড়াতাড়ি ফেরৎ পাঠালাম। এই বই যত বেশী লোক পড়ে তত মঙ্গল। রুশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার জন্য দেশ তৈরী হয়নি, আইরিশ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত আমাদের উপযোগী। ব্যক্তিগত টেরোরিজম নয়, এক একটা জায়গা বেছে নিয়ে আঘাত হেনে দেশের-লোককে চমকিয়ে দিতে হবে। গান্ধীজীর ওপর আর -

ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। খাতা বাক্সে বন্ধ করিয়া সে শুইয়া পড়িল।

পরদিন ইন্দ্রের সঙ্গে পোষ্টমাস্টারের কাছে শোনা কথা লইয়া আলোচনা

হইল দেবানন্দের। ইন্দ্র কিছু দিনের জন্য তাহাকে তারাপুরে বা গোবিন্দপুরে যাইবার অনুরোধ করাতে দেবানন্দ বলিল, আমি রাজনগর ছাড়বার কথা ভাবছিলাম কয়েকদিন থেকে, পুষ্পের বিয়ের জন্য আবদ্ধ ছিলাম। কিছু দিনেব জন্য অজ্ঞাতবাস করা প্রয়োজন হয়েছে। কোন কাজের অছিলায় আমি বেরিয়ে পড়ব, তারপর তুই মাকে বুঝিয়ে বলবি। দিন সাতেকের মধ্যে বেরুবার চেষ্টা করব।

সাত দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। কথাবার্তার তিন দিন পরে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাংলা হইতে নির্বাসনের আদেশ জানাইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম আসিল।

হুকুমনামাটি ইন্দ্রকে দেখাইয়া দেবানন্দ হাসিয়া বলিল, সবকার বাহাদুরের কৃপায় তোর অনুরোধ এত শীঘ্র রাখতে পারলাম ভাই। আটচল্লিশ ঘণ্টার মেয়াদ, এখনই বেরিয়ে পডতে হবে। পুষ্পটাকে কথা দিয়েছিলাম আট দিন পরে তাকে নিয়ে আসব, কথা রাখতে পারলাম না। তুই মেয়েটাকে একবার আনিস। এরপর ও বোধহয় আব এখানে আসতে চাইবে না।

যাত্রারম্ভ।

দেবানন্দ ও ইন্দ্র কথা বলিতে বলিতে হাঁটিতেছিল, মহিষের গাডী পিছনে আসিতেছিল। কালীবাড়ী পেঁীছিয়া দেবানন্দ দাঁড়াইল, বলিল, এবার তুই ফিরে যা ইন্দ্র! লক্ষ্মী কাঁদছে, মা কান্নাকাটি করছেন, সরস্বতী চোখের জল ফেলছে, দুটো কথা বলে তাদের ঠাণ্ডা করিস। পুষ্পকে আনবার জন্য কাউকে পাঠাস সময়মত। তুই ফের, আমি গাড়ীতে শুয়ে একটা ঘুম দেবাব চেষ্টা করি।

ইন্দ্র দেবানন্দকে প্রণাম করিল। তাহাকে বুকে জডাইয়া ধরিয়া দেবানন্দ বলিল, ছেলেমানুষের মত তোব চোখ ছল ছল কবছে কেন রে?

ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া লইল। বলিল, দেবু দা—

দেবানন্দ তাহাকে আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া বলিল, কি বলবি?

ইন্দ্র—এমনি করে জেলে, নির্বাসনে তোমার জীবনটা কাটবে?

দেবানন্দ হাসিল, প্রাণখোলা হাসি। বলিল, এই কথা? দেবানন্দ কি একজন রে? এমন কত দেবানন্দ রয়েছে দেশে। রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতায় আছে না—

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ
আরো কত দিন হবে,

বিন্দু বিন্দু অমর জীবন
চারিদিক হতে করে আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে ?
কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব
পেয়েছি আমার শেষ,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগোরে সকল দেশ।

মনে আছে কবিতাটা তোর ?

ইন্দ্র মাথা নাড়িয়া জানাইল, আছে।

দেবানন্দ—বাড়ী ফিরে যেতে যেতে কবিতাটা আওড়াস মনে মনে। এবার গাড়ীতে উঠি, কেমন ?

দেবানন্দ গাড়ীতে উঠিল।

ধূলি উড়াইয়া গাড়ী চলিতে লাগিল, ইন্দ্রের বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি তাহার অনুসরণ করিল। বাঁকের আড়ালে গাড়ী অদৃশ্য হইতে ইন্দ্রের বক্ষ ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।